ভাষা আর ভঙ্গিমায় জীবনের প্রতিভাস
শিল্পকৃতি মানবিকতার সম্পদ। এর বিকাশে আমরা সহযোগী।
হিন্দুস্থান ষ্টীল
HSP-10.70 BEN
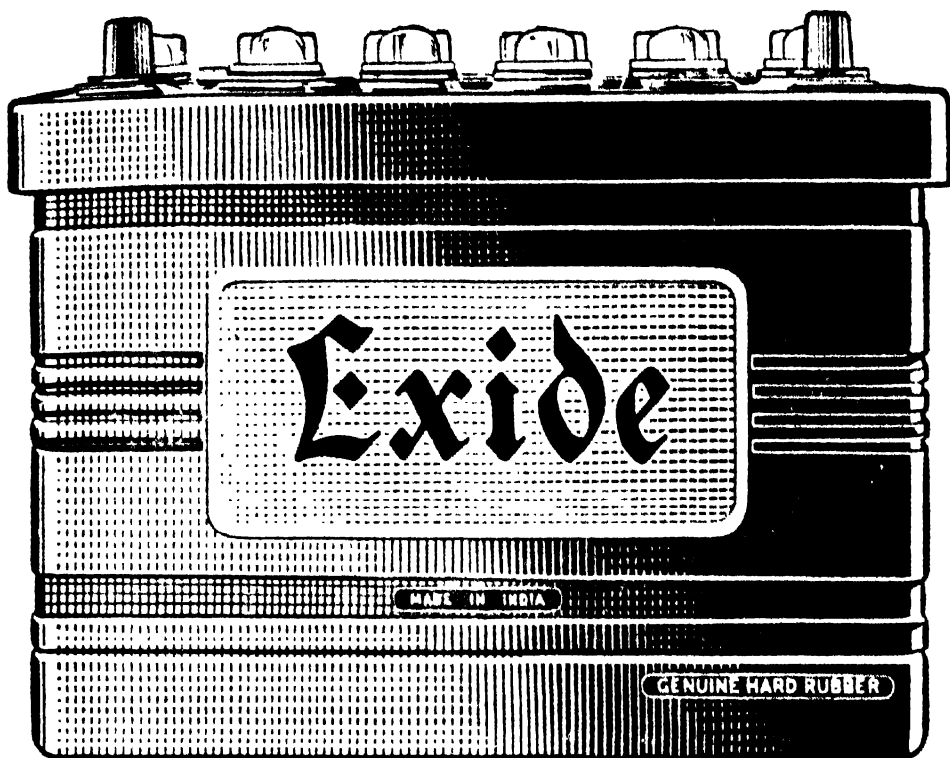
Exide quality is unbeatable

An Exide battery has a built-in-quality that is very hard to beat But you can ruin a good battery or shorten its service life—even an Exide—by using high specific gravity acid or tap water instead of distilled water or letting it lie idle for days without attention

Extend the long life of your Exide battery by observing these simple rules on maintenance :

☐ *Check Electrical system of your vehicle* ☐ *Check and maintain Electrolyte level with distilled water* ☐ *Never top-up with acid.* ☐ *Keep the battery clean and dry.* ☐ *Recharge an idle battery regularly.*

ABMEL ASSOCIATED BATTERY MAKERS (EASTERN) LTD.

আমাদের কর্মীদের নিজের যোগ্যতায় এগিয়ে যেতে আমরা সাহায্য করি

আমরা মনে করি আমাদের কর্মীদের নিয়মমাফিক সুযোগ-সুবিধে ছাড়াও ভালোভাবে জীবনধারণের সবরকম সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে। আর সেইজন্য কাজের স্থায়িত্ব ছাড়াও আরো বহুরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তারা ভোগ করেন।

শুধু তাই নয়।

কর্মীদের উন্নতির প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি এবং তাদের উচ্চতর পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ দিই।

পদোন্নতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কর্মীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়। জামসেদপুরের টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটে বিনা খরচায় কর্মীদের কারিগরী শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ইতিমধ্যে ১০,০০০ কর্মী এখানে কারিগরী শিক্ষা লাভ করেছেন।

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়, মানুষেও।

টাটা স্টীল

TN 2015A

বাটা গোগো।
নকশা ও নির্মাণে, গড়নে ও উপকরণে
এই জুতো একেবারে নতুন।
পোশাকী আর আটপৌরে, সকল সাজে
এবং সব দেখতে মানানসই।
যাঁরা সব কিছুতেই নতুনের সন্ধানী,
সর্বাধুনিক ফ্যাশানই যাঁদের লক্ষ্য,
তাঁদের জন্যই বাটা গোগো।
আজই আসুন বাটার দোকানে
দেখে যান বাটা গোগো-র
বিভিন্ন নকশা।
GoGo
নতুন যুগের নতুন জুতো!
গোগো বুট
৩০.৯৫
গোগো অক্সফোর্ড
৩০.৯৫

বর্ষ ৩৩ বৈশাখ আষাঢ় ১৩৭৮

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ৩৩ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮

ইডিওলজি ও উন্নয়ন

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বোধহয় সর্বপ্রথম সকল মানুষই একই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। সংঘাতমুখর ও সমস্যাকণ্টকিত সমকালীন ইতিহাসই সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে। টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচে যাচ্ছে। মতাদর্শের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদ দেখা গেলেও, ঐক্যের ব্যঞ্জনাটিও উপেক্ষা করা চলে না।

আমাদের এই বিশেষ যুগে পাশ্চাত্যের ভাবুকদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের মতপার্থক্য ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে। দুই পক্ষের ভাবুকেরা হয়তো একথা জানেন না, জানলেও হয়তো সকলেই তা স্বীকার করবেন না। কিন্তু এঁদের সাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায় যে, রাজনীতির ও উন্নয়নের যে ধারণা তাঁরা পোষণ করেন তার মধ্যে ঐকমত্য অনেকখানি।

পাশ্চাত্যের ভাবুকেরা পূর্বে এক ধরনের ভাববাদী ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে 'সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদান'কে কম গুরুত্ব দিতেন। রাজনৈতিক আলোড়নে কিম্বা সমাজ-বিক্ষোভে শুধু চিন্তাভাবনা ও 'আইডিয়া'র সংঘাতই দেখা যায়, আর কিছু নয়, এ বক্তব্য তাঁদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যেত। অধুনা তাঁরাও বলছেন: 'রাজনৈতিক সংঘাতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই মুখ্য।' সমাজ যখন আদিমতার স্তরে, কারিগরি বিদ্যার যখন শৈশবকাল, তখন এসব সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তি হয়তো প্রকাশ পায় ভৌগোলিক কিম্বা প্রাকৃতিক সম্পদ কিম্বা জনসমষ্টিকে আশ্রয় করে। 'পরবর্তী' স্তরে এগুলিই টেকনিক্যাল রূপ নেয়। তারপর দেশ যখন শিল্পায়িত হল তখন শিল্পায়নের স্তরই জীবনযাত্রার মানকে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং জীবনযাত্রার মান রাজনৈতিক সংঘাতের গতিপ্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে। পাশ্চাত্য ভাবুকদের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে মার্কসবাদীদের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ও ইতিহাসের সঞ্চালক শক্তি হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামকৈবল্যবাদের নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। তবে উভয় পক্ষের ভাবুকেরাই আজ মোটামুটি একমত যে সমাজসংস্থার বিকাশের মূলকারণ—টেকনিক্যাল বিকাশ; এবং সমাজসংস্থার উপরই রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সংহতির রূপরেখা নির্ভরশীল।

মার্কসবাদের যে রূপান্তর ঘটেনি ইতিমধ্যে তা নয়। অধুনা মার্কসবাদী ভাবুকেরাও

সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও তাঁরা বুনিয়াদ (base) ও সৌধ (super-structure)-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। পূর্বে তাঁরা বলতেন : 'আইনকানুন, রাজনীতি, শিল্পকলা এমনকি মানুষের চিন্তা ও ধারণা—এ সমস্তই বুনিয়াদের উপর রচিত হয়েছে ও তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।' এখন তাঁরা কার্যত সুপার-স্ট্রাকচারের প্রভাব ও কার্যকারিতাও স্বীকার করেন। এখনও মার্কসবাদীদের চিন্তায় সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই অর্থাৎ বৈষয়িক সংগঠনব্যবস্থাই মুখ্য হিসাবে বিবেচিত। সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি গৌণই, অন্ততঃ বর্তমান স্তরে। কিন্তু পূর্বে সুপার-স্ট্রাকচারকে যেমন নিষ্ক্রিয় ও প্রভাবহীন মনে করা হোত, এখন আর তা করা হয় না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মার্কসবাদীদের বর্তমান অভিমতের অংশীদার পাশ্চাত্যের অনেক ভাবুক এবং এ অভিমত শুধু মনগড়াই নয়।

মার্কসবাদী ও পাশ্চাত্যের ভাবুকদের উভয়ের চিন্তাধারায়ই দেখা যাবে 'বিশুদ্ধ' মূল্যবোধের উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বারোপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে সঞ্চালক শক্তি হিসাবে বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ আদর্শ, বিশ্বাস ও মহৎ পরিকল্পনারও যে স্থান আছে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে এদের প্রভাব বৃদ্ধিও পেতে পারে, এ স্বীকৃতি কোন পক্ষেই নেই। এ এক ধরনের ভ্রান্তিবিলাস। এবং এ ভ্রান্তিবিলাসও দুই মতবাদেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বলা প্রয়োজন, এর মধ্য দিয়েও দুই পক্ষের সম্মতির এলাকা বিস্তৃত হচ্ছে।

সমাজজীবনে সংঘাত যেমন আছে, তেমনি সংহতিও আছে। সংঘাতক্ষুব্ধ ও সংহতি-শান্ত পথপরিক্রমা করেই সমাজ এগিয়ে চলে। এই পথপরিক্রমা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী ও পাশ্চাত্যের ভাবুকদের বক্তব্য খুবই কাছাকাছি। সোভিয়েট নায়ক নিকিতা খ্রুশ্চেভ '১৯৮০ সালের ভাবী কমিউনিজমে'র যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার সঙ্গে 'মার্কিন জীবনধারা'র পার্থক্য কতটুকু? পাশ্চাত্য দেশে এবং কমিউনিস্ট দুনিয়ায় যে সমাজ কাম্য তা হোল সচ্ছল, সমৃদ্ধ, প্রাচুর্যের সমাজ। অকমিউনিস্ট দুনিয়া এবং কমিউনিস্ট দুনিয়া- দুই-এরই আছে নিরতিশয় আশাবাদ। টেকনোলজি ও বিজ্ঞানে দুই-এরই অগাধ বিশ্বাস। কাজেই যদিও দুই দুনিয়ার ভাবুকদের রাজনীতির সামগ্রিক ধারণা ভিন্ন, তবুও তাঁদের অবস্থিতি এমন দুই মেরুতে নয় যার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

সমকালীন দুনিয়ায় বিজ্ঞান, টেকনোলজি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরি-বর্তন ঘটেছে এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক ভূগোল যেভাবে পাল্টে গেছে সেইসব পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে কমিউনিস্ট শিবির এবং অকমিউনিস্ট শিবিরের এক-বিন্দুমুখী হবার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। 'Convergence' পদটি এখনও গোঁড়া মার্কসবাদীমহলে বিবমিষারই উদ্রেক করে। তবে পাশ্চাত্যের অনেক ভাবুক এবং সোভিয়েট দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আন্দ্রে সাখারভ এই convergence-এর অনিবার্যতার কথা বলছেন। সাখারভ বলছেন :

(ক) আমরা সমাজতান্ত্রিক ধারার প্রাণবন্ততা প্রমাণ করেছি। এই ধারা মানুষের বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যা করেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোন ব্যবস্থায় যা হয়নি এই ব্যবস্থায় তা হয়েছে,—সমাজতন্ত্র শ্রমের নৈতিক মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

(খ) অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে প্রায়ই বলা হয় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা অর্থনীতিকে অন্ধ গলিতে নিয়ে যায় অথবা এই ব্যবস্থা স্বতঃই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় নিকৃষ্টতর। এ বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নেই। কেননা একথা বলা যায় না যে 'পুঁজিবাদ শ্রমজীবী মানুষের আত্যন্তিক দুঃস্থতাই নিয়ে আসে।'

গোঁড়ামি-শূন্য মার্কসবাদীর কাছে তত্ত্বের রাজ্যে অধুনা একটা বড় সংবাদ এই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। এ ঘটনা সত্য। এবং এই সত্য ঘটনার উপরই দাঁড়িয়ে আছে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' নীতি। 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর নীতিগত তাৎপর্য হোল এই বিশ্বাস যে, যদি পুঁজিবাদ কখনো অন্ধ গলিতে প্রবেশ করেও তবু তা থেকে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, 'পুঁজিবাদ সামরিক অ্যাডভেঞ্চারে মুক্তির পথ খুঁজবে।'

সাখারভ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, দুই-এরই দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের সম্ভাবনা আছে। একে অপরের কাছ থেকে সদর্থক উপাদান গ্রহণ করতেও পারে। এবং আজকের বাস্তব এমনই যে, এদের ক্রমশঃই কাছাকাছি আসতে হবে অনেক মৌলিক বিষয়ে। সাখারভ আরও বলেছেন : 'আমি জানি একথা বললেই 'শোধনবাদ'-এর অভিযোগ শুনতে হবে। বলা হবে, এই বক্তব্যে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তবে এসব অভিযোগের মধ্যে আমি শুধু দেখি রাজনৈতিক খোকামি ও অপরিপক্কতার বোকা হাসি, তার বেশি কিছু নয়। ঘটনা হোল এই যে, আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে সত্যি সত্যি অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। পুঁজিবাদীরাও আজকাল সমাজতন্ত্রের 'সামাজিক বিধিবিধান' কাজে লাগাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার বাস্তব উন্নতি ঘটেছে ঐ সব দেশে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হোল, সমকালীন ঘটনা দেখাচ্ছে যে দুই ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহাবস্থান এবং সহযোগিতা ছাড়া মানুষের সামনে আর কোন যৌক্তিক পথ নেই। অন্য কোন পথ নিলে মানুষের ভাগ্যে জুটবে নিশ্চিহ্নীকরণ।'

সাখারভ, রেমন্ড আঁরো ও অন্যান্য ভাবুকদের বক্তব্য থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে এবং যার উপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিটি নির্ভর করে, তা হোল এই : পূর্ব ও পশ্চিমের দুই উন্নত এলাকা নিজ নিজ অবস্থানে দীর্ঘকাল থাকবে, কোন এলাকায়ই সহসা মৌলিক পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি 'পুঁজিবাদের পথ' নেবে না। তেমনি আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশও সার্বিক 'কমিউনিস্ট পথ' নেবে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতি যদি চালু থাকে, তবে দুই দুনিয়ারই পরিবর্তন হবে। স্বতন্ত্র ধারায় দুই দুনিয়াই বোধহয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে। পূর্ব দুনিয়ায় ক্রমশঃ দেখা যাবে ক্রম-লিবারালিজেশন। হয়তো দেখা যাবে একপার্টি-নায়কতা ও রাষ্ট্র-নায়কতার কঠিন শাসন থেকে প্রকাশনা, মুদ্রণ-ব্যবস্থা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ও বুদ্ধির মুক্তি। আবার পাশ্চাত্যে হয়তো দেখা যাবে বে-আব্রু স্বাধিকারপ্রমত্ততার রাশ-টেনে-ধরা, অধিকতর 'সামাজিকীকরণ'। এই দ্বিমুখী ধারা নিশ্চয়ই অনেক বাধার সম্মুখীন হবে। ফলে এই দুই ধারার convergence-এর পথে পতন-অভ্যুদয়ও দেখা দেবে। তবে শেষ পর্যন্ত বোধহয় বাস্তব জীবনের দাবি convergence-এর ধারাকে পূর্ণতা দান করবে।

পাশ্চাত্যের মানুষেরা কুড়ি বছর পূর্বেও মনে করতেন, কমিউনিস্ট সমাজ closed society—বদ্ধ সমাজ। আজ স্তালিনোত্তর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বদ্ধ দুয়ার যে কিঞ্চিৎ অর্গলমুক্ত হয়েছে একথা তাঁরাও স্বীকার করেন। কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ যত হবে, নতুন যুগের মানুষ যত সমাজের নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে, উদারনৈতিকতার দাবি ততই প্রবল হবে ওসব দেশে, লিবারালিজেশন-এর আন্দোলনও প্রবল হবে। শিল্পায়িত সমাজ মানুষের বৈষয়িক সমৃদ্ধি এনেছে। বৈষয়িক উন্নতির স্পৃহাকে অবদমিত করা

অসম্ভব। শিল্পায়িত সমাজতান্ত্রিক সমাজের যারা মানুষ তারাও জীবনকে উপভোগ করতে চায়। তারাও চায় টেলিভিশন সেট, টেপ-রেকর্ডার, কাপড় ধোয়ার মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মোটরগাড়ি ও নিজেদের বাড়ি। তারাও চায় সুন্দর স্বাধীন জীবন, চায় শান্তি ও নিরাপত্তা। যতই দিন যাবে ততই তারা চাইবে এমন জীবন যেখানে শাসকদের নির্যাতনের ভয় নেই, নেই পুলিশী নিষ্ঠুরতা। তারা যে সুস্থ জীবন কামনা করবে তার সঙ্গে স্বাধীনতাস্পৃহাও মিশে যাবে। তারা চাইবে বিদেশে যেতে, বিদেশী সংস্কৃতির রসাস্বাদন করতে। তারা চাইবে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, নিজের ভাবনাচিন্তা অকুতোভয়ে প্রকাশ করার স্বাধীনতা, সরকারী ও পার্টি-নীতির সমালোচনার অধিকার, বিরুদ্ধপক্ষের মতামত শোনার অধিকার। অর্থাৎ তারা চাইবে লাল-আলো, নীল-আলোর নিষেধ-বিধির নাগপাশ থেকে মুক্তি, চাইবে স্বাধীনভাবে পথ চলতে। হয়তো সেই পথচলায় পিছলে-পড়ার সম্ভাবনা থাকবে, তবুও।

যুদ্ধ লেগে নিখিল বিশ্ব ধ্বংস যদি না হয় তবে পূর্বে ও পশ্চিমে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি নিত্যনতুন পথে অগ্রসর হবে। ঐ উন্নতির জন্য অসংখ্য মানুষকে করে তুলতে হবে সংস্কৃতিবান। আর এই মানুষদের মধ্যে দেখা দেবে তুলনামূলক বিচারের প্রবণতা ও বিচারনিষ্ঠ মানসিকতা। এরই অপর নাম 'স্বাধীনতা'। বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে ও নানা আবিষ্কারের তাগিদে দুই দুনিয়ার মধ্যে লেনদেন ও যোগাযোগও বৃদ্ধি পাবে। মানসিক আদানপ্রদান ও লেনদেন বন্ধ হলে নানাক্ষেত্রে দেখা দেয় অবনতি, যেমন দেখা গিয়েছিল স্তালিন আমলে। স্বেচ্ছাতন্ত্র অথবা ডিক্টেটরশিপ্ চায় বুদ্ধি ও মননের রাজ্যে বিচ্ছিন্নতা। যদি এই বিচ্ছিন্নতা কেটে যায় এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ধারা নির্বাধ হয়ে ওঠে তবে অচ্ছুৎমার্গী মনোভাব ও উৎকট জাত্যভিমানকে টিকিয়ে রাখা শক্ত। চীন ছাড়া অন্য কমিউনিস্ট দেশে হচ্ছেও তাই। রুশ নেতারা বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু রুশ তরুণেরা টেলিভিশনে পাশ্চাত্যের কর্মসূচী ধরে। ওদেশের নাচগান, নাটক, জাজ্ দেখতে চায়, শুনতে চায়, এসবের দ্বারা প্রভাবিতও হয়। এইভাবে কমিউনিস্ট দেশগুলিতে দেখা দিচ্ছে কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে উদারনৈতিকতার জয়। সমকালীন সমাজবাস্তবই এদের করে তুলছে তুলনায় নমনীয়, গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রের সগোত্র।

সোভিয়েট নেতারা আজও অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভাষ্য করে বলেন, 'ভিন্ন সমাজব্যবস্থাবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে মতাদর্শের ক্ষেত্রে আপোস বোঝায় না এবং বোঝাতে পারে না। বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমরা নীতিনিষ্ঠ সংগ্রাম পরিচালনা করছি।' তবুও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আজ আর দ্বীপের মতো নয় যাকে বেষ্টন করে আছে লবণাক্ত সমুদ্র।

আফ্রো-এশীয় দেশগুলির ভূমিকা কি হবে? তাদের কাজের ফলে 'সমাজতন্ত্রে যাত্রা' ত্বরান্বিত হতে পারে, আবার বিলম্বিতও হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দরিদ্র, অনুন্নত দেশগুলি কোন না কোনদিন সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে। প্রশ্নটা শুধু এই : তারা কি নিজস্ব পথে উপনীত হবে সমাজতন্ত্রে? অথবা তারা কি সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে 'পুঁজিবাদ' হয়ে কিম্বা 'কমিউনিজম' হয়ে? এসব দেশ যদি সোজা রাস্তা নেয় তবে গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছবে তাড়াতাড়ি। অন্য পথ নিলে তাদের বিকাশধারা হবে মন্থর। আগামী দশকে যদি আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন-আমেরিকার দেশগুলি 'চীনের পথই আমাদের পথ' বলে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তবে রুশ দেশে ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির উদারনীতি-করণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। কেননা চীনের হঠকারী নীতির ফলে ওসব দেশের উদার-

নৈতিকেরা কোণঠাসা হবে, শক্তিসঞ্চয় করবে সনাতনী স্তালিনপন্থীরা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও দেখা দেবে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কোন কোন দেশ চীনের বাজারের লোভে হয়তো চীনের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। যদি তাই হয় তবে যুক্তভাবে অন্যেরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধিতা করবার সুযোগ পাবে; ফলে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের আবহাওয়া সহসা প্রশমিত হবে না।

অনুন্নত এলাকার দেশগুলি কি করবে তা এখনই বলা শক্ত। তবে কয়েকটি মন্তব্য হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমতঃ, আফ্রো-এশীয় দেশগুলি সার্বিক পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে আধুনিক হয়ে উঠতে সক্ষম হবে না। দেশী পুঁজি তাদের সামান্য, আর বিদেশীরা এসব দেশে পুঁজি খাটাবে নিজেদের স্বার্থের কথা মনে রেখে। অর্থাৎ তারা পুঁজি খাটাতে চাইবে ঔপনিবেশিক ধরনের সংস্থায়। পুঁজি খাটিয়ে অনুন্নত দেশটির সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদকে তারা কাজে লাগাতে চাইবে যাতে উন্নত এলাকার দেশটির লাভের অঙ্ক বাড়ে। তাতে অনুন্নত এলাকার সামগ্রিক অর্থনীতিতে কুফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেটা বিদেশী পুঁজি লগ্নীকারীদের বিচার্য বিষয় নয়। কথাটা যে সত্য তা বোঝা যায় যখন নানা এলাকায় এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। মধ্য-আমেরিকার কলা, কিউবার চিনি, কাতাঙ্গার হীরা এবং বিভিন্ন দেশের পেট্রোলের উপর এদের শ্যেনদৃষ্টির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

অনুন্নত দেশের পুঁজি কম আর পুঁজির সলজ্জতাও বেশি। এসব দেশে শুরুতে তাই বিদেশী পুঁজিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলা হয়তো সম্ভব নয়। কিছুকাল বিদেশী পুঁজি এসব দেশে খাটবে, বিভিন্ন সংস্থাও গড়ে উঠবে বিদেশী পুঁজির সাহায্যে। তবে হয়তো একসময় এদের 'জাতীয়করণ' করতে হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই স্বার্থে।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এসব দেশে সরাসরি, সোজা পথে স্থাপন করা যাবে বলেও মনে হয় না। অনুন্নত দেশের সামাজিক কাঠামো এবং মানসিকতা এমনই যে, এখানে গণতন্ত্রের রীতি বহাল রাখা ও স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দেবার অনুকূল পরিবেশেরই অভাব। ফলে আফ্রো-এশীয় অনেক দেশেই বহুদলনির্ভর গণতন্ত্রের পাট উঠিয়ে দিতে হয়েছে। সব দেখেশুনে মনে হয়, ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের গণতন্ত্র, কমা-সেমিকোলনসহ, এসব দেশে আমদানী করা যাবে না। আফ্রো-এশীয় সমাজতন্ত্রকে বোধহয় কর্তৃত্বারোপকারী (authoritarian) হতে হবে। এসব দেশের যে পথ খোলা, তা হোল কম-বেশি কর্তৃত্বারোপ এবং নানা ধরনের 'স্বদেশী সমাজতন্ত্র'। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, এসব দেশকে 'সোভিয়েট মডেল' কিম্বা 'চৈনিক মডেল' মেনে নিতে হবে। কেননা ইতিমধ্যে জানা গেছে যে সবচাইতে নৃশংস পথই সর্বাপেক্ষা কার্যকর পথ নাও হতে পারে। এসব দেশ স্বকীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিচিত্র স্তর সৃষ্টি করবে, স্বকীয় অবদানও যুক্ত করবে সমাজতান্ত্রিক ধারায়। খুব সম্ভব, তুলনায় শান্তিপূর্ণ পথে সমাজ-বিপ্লবের কর্তব্য সমাধা করবে এরা। এবং ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ রূপ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখলের পথের নিশানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে এযাবৎ তারা খুব একটা সাফল্য লাভ করেছে বলা যায় না।

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির 'সামাজিকীকরণের' যে কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই খুবই বিলম্বিত ব্যাপার হবে। সহসা কোন শাস্ত্র কিম্বা আপ্তবচন অনুযায়ী, ইতিহাস-নির্দিষ্ট অনিবার্যতার তথাকথিত নিয়ম মেনে আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ কমিউনিজমে উত্তীর্ণ হবে না। একথা অবশ্য শোনা

যাবে যে, 'পুঁজিবাদ সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে, শ্রেণীসংগ্রাম জোরালো হচ্ছে দেশে, অতএব এইসব দেশেও সাবেকি নিয়মে বিপ্লব হবে।' তবে এই বক্তব্য সমকালীন ইতিহাসের দ্বারা পরিত্যক্ত। মার্কসবাদীরা পূর্বে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে অভ্যস্ত ছিল, ইদানীংকালে তার কিছু সংশোধন হয়েছে। তবুও তাঁদের নিভৃত বিশ্বাস এই যে, 'এসব দেশেও একদিন কমিউনিজম আসবে।' হয়তো আসবে, তবে সেদিন এখনই সমুৎপন্ন নয়। কেন নয় তার কারণও আছে।

সম্পন্ন শিল্পায়িত সমাজে (পুঁজিবাদী হলেও) শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা ক্রমহ্রাসমান। শ্রমিকের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা ক্রমবর্ধমান তো নয়ই বরং ক্রমহ্রাসমানই। উনিশ শতকের সাবেকি সর্বহারাশ্রেণীও আজ আর 'সর্বহারা' নয়। এসব দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেনি। বরং অনেক সম্পন্ন দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও টেকনিক্যাল কর্মীরাই আজ সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এসব অনেক দেশেই অর্থনৈতিক সংকটগুলিকে সংযত করা এবং তজ্জনিত আঘাত মন্দীভূত করার কলাকৌশলও আয়ত্তের মধ্যে আসছে।

এসব দেশে শ্রমিকেরা আচারে-আচরণে, বেশভূষায়, জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে মধ্যবিত্তের সগোত্র হয়ে উঠছে। তাদের অনেকেরই টেলিভিশন সেট, টেপ-রেকর্ডার, কাপড় ধোয়ার মেশিন, রেফ্রিজারেটার, এবং এমনকি নিজেদের বাড়িও আছে। পুঁজিবাদের ফলে শ্রমিকের অবস্থা দুর্বল হয়েও পড়েনি। তার পরিবর্তে শ্রমিকেরা শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ, যৌথ দরকষাকষি ও আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। শুধু তাই নয়। প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লব এবং ঢালাওভাবে একই ধরনের জিনিস উৎপাদনব্যবস্থা চালু হওয়ায় আগেকার বহু সৌখীন জিনিসপত্রের দাম কমেছে এসব দেশে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত উন্নত মজুরি ও কম সময় কাজ করার সুবিধাও পেয়েছে। ফলে তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঐসব দেশে চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে।

এসব নানা কারণে সমাজকে সুস্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা দূরে থাকুক আধুনিক পুঁজিবাদ এমন একটা সমাজ গড়ে তুলেছে যেখানে বহু শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে সাম্য বজায় রয়েছে তুলনামূলকভাবে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সম্পন্ন পুঁজিবাদী সমাজে 'শ্রমিক' শব্দটির উল্লেখ মাত্রই তা অভ্রান্তরূপে 'বিত্তহীন', 'সর্বহারা'দের বোঝায় না। তাদের গৃহগুলির মালিক হওয়া ছাড়াও তারা ব্যাংকে টাকা জমায়, ইনসিওরেন্স করে, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার কেনে এবং যে প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করে সেগুলির লব্ধ মুনাফার ভাগও তারা পায়। অবস্থা এমনই যে হার্বার্ট মারকিউসের মতো অনেক বিপ্লববিলাসী শ্রমিকশ্রেণীকে একটি 'রক্ষণশীল' এমনকি 'প্রতিবিপ্লবী শক্তি' বলে উল্লেখ করতেও কুণ্ঠিত নন। ইডিওলজির দাস না হলে পুঁজিবাদী সমাজের এই রূপান্তর অনুশীলনের যোগ্য, যদিও 'শ্রমিক বুর্জোয়া হয়ে যাচ্ছে'- এ তত্ত্ব একপেশেই।

পুঁজিবাদের রূপান্তর সম্পর্কে চোখ-বুজে থাকার যেমন কোন হেতু নেই তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কয়েকটি তথ্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত পাশ্চাত্য ভাবুকদের মনোযোগ এখনও তা আকৃষ্ট করেনি। সে তথ্যগুলি এই :

(ক) পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার তুলনায় 'পরিকল্পিত উৎপাদনে'র টেকনিক্যাল উৎকর্ষ। গলব্রেথের কথা মেনে নিয়ে যদি স্বীকার করাও যায় যে, বিরাট বিরাট করপোরেশনে ও শিল্পসংস্থায় আজ 'পরিকল্পনা' না হোলে চলে না, তবুও একথা ঠিক যে পুঁজিবাদে 'সামগ্রিক পরিকল্পনা'র অভাব।

(খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বমূলক মানবসমাজ গড়ে তোলার অসম্ভাব্যতা। আধুনিক পুঁজিবাদে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, শ্রমিক আজ আর শুধু 'সর্বহারা' নয় একথা সত্য। তবুও পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষ মনে করে তাদের মূল স্বার্থের সঙ্গে মালিকদের স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষই নিজেদের সামাজিক অসমতার শিকার বলে মনে করে।

(গ) পুঁজিবাদ তত্ত্বগতভাবে যে সব মূল্যের প্রতি অনুগত ছিল সেইসব মূল্যের বাস্তব বিকৃতি। পশ্চিমের অনেক ভাবুক এই প্রতিজ্ঞাটি স্বীকারও করেন।

(ঘ) সমাজের এমন অনেক কাজ আছে যা সমষ্টি-প্রচেষ্টা ছাড়া সুসম্পন্ন করা যায় না। সেখানে টাকাকড়ির কিম্বা লাভ-অলাভের হিসাব করলে কাজগুলি করাই যাবে না। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে আসতে হয় এবং 'সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি' অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমাজ যত উন্নত হয় বৈষয়িক দিক দিয়ে ততই কৃষি ও শিল্পের চাইতেও গুরুত্ব পায় জন-কল্যাণ ও সমাজহিতের প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নে পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। পুঁজিবাদ চলে মূলতঃ যোগান-চাহিদার নিয়মে, অর্থনৈতিক লাভালাভের হিসাব করে, এলোমেলোভাবে। সমাজতন্ত্রে থাকে সংগঠন ও পরিকল্পনা। ফোর্ড কারখানায় কিম্বা অন্যান্য আধুনিক শিল্প-সংস্থায় অবশ্যই চমৎকার সংগঠন ও পরিকল্পনা আছে, যেমন আছে স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প-সংস্থায়। কিন্তু পুঁজিবাদের 'সমগ্র অর্থনীতিতে এই পরিকল্পনা আমদানী করা অসম্ভব। পুঁজিবাদ যদি বাজারের নিয়ম না মেনে চলে, যোগান-চাহিদার প্রশ্নকে বাতিল করে 'সমাজহিতে উৎপাদন' করে, তবে পুঁজিবাদ তার স্বধর্মচ্যুত হয়। অতএব একথা মানতেই হয় যে পুঁজিবাদী কাঠামোয় 'সামগ্রিক পরিকপনা' চালু করা সম্ভব নয়।

এ হেন 'সামগ্রিক পরিকল্পনা' চালু করতে পারে রাষ্ট্র, কেননা রাষ্ট্রের হাতেই রাজ-নৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। হিসাব-নিকাশের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন, ভবিষ্যৎ কেমন হবে সে সম্পর্কে প্রাক্-কথন বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ সম্ভব। ফলে রাষ্ট্রই সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যাপক পরিকল্পনা চালু করতে সক্ষম। এবং 'ব্যাপক পরিকল্পনা'র অর্থই হোল যে বেসরকারী প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই তদারকি করতে পারে এবং রাষ্ট্র-নির্দেশিত পথেই এইসব প্রচেষ্টার সমন্বয় হতে পারে।

ইতিহাসের ধারায় 'সমাজতন্ত্র' একটি অধ্যায় কেন? ইডিওলজি-প্রেমীরা বলবেন, 'জানো না, মার্কসবাদে আছে যে ইতিহাসের পাঁচটি স্তর বা পর্যায় আছে এবং 'সমাজতন্ত্র' ইতিহাসের ধারায় পঞ্চম স্তর।' ইডিওলজির কথা বাদ দিলেও যে সব উপাদান থেকে আজ সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের কথা বলা চলে তা এই :

(ক) আজ বিজ্ঞানের ও কারিগরি জ্ঞানের এতই উন্নতি হয়েছে যে খণ্ড খণ্ডভাবে না নিয়ে 'সমগ্র অর্থনীতি'র সুষ্ঠু সংগঠন সম্ভব। এবং অনুন্নত এলাকায় বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি দ্রুত তালে করতে হোলে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এই সংগঠনের দায়িত্ব নিতে হবে।

(খ) প্রতিযোগিতামূলক সমাজে যে কোন সমন্বয় নেই তা নয়। তবে এই সমন্বয়ের তুলনায় 'সামগ্রিক সংগঠন'-এর কার্যকারিতা অনেক বেশি।

(গ) কিন্তু এই সামগ্রিক সংগঠন পুঁজিবাদের চৌহদ্দির মধ্যে সম্ভব নয়।

(ঘ) পুঁজিবাদ ক্রমশঃ ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা হারাচ্ছে।

(ঙ) ফলে পুঁজিবাদের স্থলে সৃষ্টি হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে পরিকল্পিত

উৎপাদন সম্ভব এবং যে ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা শুধু উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের উপর ন্যস্ত নয়।

সমকালীন সমাজের বিকাশধারায় সমাজতন্ত্রের প্রবণতা আজ আর তাই দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবে সামাজিকীকরণ কোন্ পথে হবে, সমাজতন্ত্র কোন্ পথে আসবে, তা আজই সূত্রাকারে লিপিবন্ধ করা সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা হয়তো সরাসরি বাতিল করতে হবে। চালু অর্থে এই ব্যবস্থার নামই 'সমাজতন্ত্র'। অন্য কোথাও দেখা যাবে যে, ইংলন্ডের রাজতন্ত্রের মতো মালিকতন্ত্রের অধিকার ক্রমশঃ খর্ব হবে, তাদের অবস্থা হবে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। দ্বিতীয় পথে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি ক্রমশঃই হয়ে উঠবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মতো। এই ব্যবস্থায় মুনাফা টিকে থাকবে কিনা, থাকলে কিভাবে থাকবে বলা শক্ত। তবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিভিন্ন প্রথা ও সংস্থা অনেকদিন টিকে থাকে, অকস্মাৎ উৎক্রান্তি সে সব দেশে বড় একটা ঘটে না।

পাশ্চাত্যের সম্পন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলি কোন না কোন ধরনের সমাজতন্ত্রে কেন উপনীত হবে তার দ্বিতীয় কারণটি এই। পুঁজিবাদী বিধিবিধানের উপর দাঁড়িয়ে সৌভ্রাত্র-মূলক মানবিক সমাজ গড়ে তোলা যাবে না। পুঁজিবাদের প্রকৃতিই এমন যে এর অসামাজিক না হয়ে উপায় নেই। পুঁজিবাদ স্ব-এর খাঁচায় মানুষকে আটকে রাখে, ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের নাম করে অসমসমাজের জন্ম দেয়। মুনাফা অর্জনই যেহেতু পুঁজিবাদের অভীষ্ট, সেইহেতু বলা যায় যে, মুনাফাকেন্দ্রিক সমাজ জীবনকে স্বার্থসর্বস্ব ও অর্থলোলুপ করে তোলে। মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে সমাজ সেই সমাজের মনস্তাত্ত্বিক সংহতির পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয় পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদে টাকাই হয় ধ্যানজ্ঞান, সমাজসংহতির যে কথা শোনা যায় তার অভিব্যক্তি ঘটে বৈষয়িক লেনদেনের মাধ্যমে (cash nexus), সমাজ চলে নোঙরহীন নৌকার মতো যত্রতত্র ভেসে। এই সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের অবাধ সুযোগ দেখা দেয় এবং অহংসর্বস্বতা পূর্ণতা লাভ করে। আধুনিক পুঁজিবাদও আজ তাই পরিকল্পনার চেষ্টা করে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদও সর্বগুণান্বিত নয়। পুঁজিবাদী সমাজ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়নি, বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে চমকপ্রদ সাফল্যও এনেছে একথা সত্য। তবুও পুঁজিবাদে সম্পন্ন মানুষও নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতায় ক্লিষ্ট। এরিক ফ্রম একে বর্ণনা করেছেন 'সম্পন্ন দেশের অ্যালিয়েনেশন' হিসাবে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সংহতি ও পারস্পরিক নির্ভরতা যত বাড়ছে, এসব দেশে সমাজের সংহতি ততই কমছে। তাই পাশ্চাত্যের মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের আশায় ধর্মের আশ্রয়ও নিচ্ছে। অধুনা ধর্ম-বোধের উজ্জীবনের এটাই বোধহয় অন্যতম কারণ।

খ্রীষ্টধর্ম ও পুঁজিবাদের মধ্যে বরাবরই এক অনপনেয় অসঙ্গতি রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ যখন একই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম ও পুঁজিবাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে তখন তারা দুই বিপরীত প্রভুর সেবাই করতে চেয়েছে একসঙ্গে। বাস্তবে তারা একটির সেবা করেছে, অন্যটির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে ঠাট হিসাবে। খ্রীষ্টধর্মের নাম নিয়ে পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা উপনিবেশে লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে, আর স্বদেশে পুঁজিবাদকে। এখন পাশ্চাত্যের অনেক দেশে খ্রীষ্টান ভাবুকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে আত্মসমালোচনা- প্রকৃত খ্রীষ্টান ধ্যানধারণায় প্রত্যা-বর্তনের প্রচেষ্টা। ধর্ম শুধু আফিম হিসাবে না থেকে মানুষের মুক্তির উপকরণ হিসাবে কাজ করছে ওসব দেশে। অন্ততঃ তার প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে মার্কসবাদীদের সঙ্গে সৎ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের তাই আলাপের সূত্রপাত হয়েছে। প্রাক্তন ফরাসী

কমিউনিস্ট রোজার গারোদি এ আলাপ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে *From Anathema to Dialogue* নামে বইও লিখেছেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের অনেক দেশে অরাজকতার স্থলে পরিকল্পনার মূল্য স্বীকৃত হচ্ছে, স্বীকৃত হচ্ছে যে পুঁজিবাদী নীতির উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃত সুস্থির সমাজ গড়ে তোলা যাবে না। আরও গভীরে গিয়ে বলতে গেলে বলা প্রয়োজন, যে মালিকানা-ভিত্তির উপর পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে, সেই ভিত্তিটাই আজ ন্যায্যতা হারাচ্ছে। লোকে ক্রমশঃই বুঝতে শিখছে, পূর্বে যদি-বা এই ব্যবস্থার কোন যৌক্তিকতা থেকেও থাকে, আজকের দুনিয়ায় এর কোন যৌক্তিকতা নেই। যে বিস্ময়কর কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি আজ ঘটেছে তা সম্ভব হয়েছে মৌলিক গবেষণার ফলে। এই গবেষণা চালাতে হোলে যে বিপুল সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন তার দায়িত্ব নিতে পারে রাষ্ট্র অথবা কোন অপুঁজিবাদী সংস্থা। বেতনভোগী কর্মচারীরা এখন উন্নত মজুরি পেলেও মালিকের তুলনায় অনেকেই মানসিক বৈকল্যে ভোগেন কাজ হারিয়ে কিম্বা কাজ হারানোর ভয়ে। আগে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য যেমন মালিকদের প্রচেষ্টা ছিল, এখন বড় বড় সংস্থার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সেই মুনাফার প্রশ্নটির কোন তাৎপর্য নেই। কেননা আজকাল তাঁদের পরিচালনা বেতনভোগী ডিরেক্টরদের দিয়েই চলে, বিশেষতঃ এঁরা যদি লাভের অংশীদার হন। মালিকদের কোন ভূমিকা নেই এসব সংস্থায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণও ইদানীংকালে লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে বেসরকারী সংস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে নাকি প্রতিযোগিতা করে, ফলে নাকি ভোক্তাদের, তুলনায় সস্তায়, ভাল জিনিস জোটে। কথাটা সত্য মেনে নিয়েও বলতে হয় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ হোলে সেখানেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার পথে কোন বাধা নেই। তাছাড়া উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার আজ আর কোন সামাজিক প্রয়োজন নেই। পূর্বে হয়তো আঁতারপ্রেনিউর এবং বড় ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন ছিল শিল্প সংস্থাপনে ও পরিচালনায়। এখন এদের স্থান নিচ্ছে টেকনোলজিস্টরা এবং বৈজ্ঞানিকেরা। ফলে ইউরোপে এখন মানুষ মনে করছে যে, কোন সংস্থার 'মালিকানা' মানেই অন্য অনেক মানুষের উপর ক্ষমতা খাটাবার সুযোগ। কর্মীদের কাছে মালিক হলেন 'কর্তা', ছোট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কর্তার অভিরুচি অনুযায়ী কর্মীদের বেতন, ছুটি, কাজের সময় ঠিক হয়। কর্তার মর্জি অনুযায়ী তাদের চাকুরি থাকে, যায়, প্রমোশন হয়। বেতন ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত তাদের কষ্টার্জিত ফলও কর্তার হুকুমে পাল্টে যেতে পারে।

ফলে পাশ্চাত্য মানুষের চেতনায় এই সত্য ধরা পড়ছে যে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তি-মালিকানা পাশ্চাত্যে স্বীকৃত মানব-মূল্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। বাবা সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন, কিম্বা প্রশাসনে ছিলেন, কিম্বা রাজনীতিবিদ ছিলেন, কিম্বা বৈমানিক ছিলেন অতএব উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেও এইসব বৃত্তি নেবে একথা আজ আর কেউ বলে না। তবে মালিকের ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে ফ্যাক্টরি, বাগিচা, খনি, শিল্প-সংস্থার 'মালিক' হবে কেন? এই প্রশ্ন আজ উঠেছে। সম্পন্ন শিল্পায়িত সমাজে অধিকাংশ মানুষই বেতনজীবী, অধিকাংশেরই জীবিকা অর্জনের সংস্থান আছে, বার্ধক্যভাতা ও পেন্সন আছে। লেখাপড়া শিখলে রোজগারের পথও আছে। এইসব দেশে তাই 'ব্যক্তিমালিকানা', বাবার সম্পত্তি ছেলেতে বর্তানো, সাধারণের চোখে ভাল ঠেকে না। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণে কোন না কোন ধরনের সামাজিক মালিকানার ন্যায্যতা আজ ক্রমশঃই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

এখনও যে পুঁজিবাদী সমাজ ওসব দেশের মানুষ বরখাস্ত করেনি তার কারণ সোভিয়েট

ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেহারা আজও ফুটে ওঠেনি। স্তালিন সমাজতন্ত্রকে স্বৈরাচারী টোট্যালিট্যারিয়ানিজমের রূপ দিয়ে বিচার-বিবেচনাহীন যে নিপীড়নরাজ গড়ে তোলেন, তাতে পাশ্চাত্যের অনেক মানুষই সমাজতন্ত্রকে ঘৃণা করতে শেখে। ফ্রান্সে জেকোবিনরা 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অপর নাম সন্ত্রাস',—কাজে এই শ্লোগান চালু করে রাজতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে তোলে। স্তালিন আমলের দানবিক কমিউনিজমও পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদকে ইতিহাসগতভাবে শক্তিশালীই করে। এসব দেশের খোকামি রোগ স্তালিনোত্তর যুগে ক্রমশঃ নিরাময় হচ্ছে। সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে একথা এখনও বলা যাবে না, এবং এই উড়কা রোগ যতদিন থাকবে ততদিন পাশ্চাত্যের দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণও বিলম্বিত হবে। তবে এই উত্তরণ থেমে যাবে বলে মনে হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলি যতোই মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে যাবে, ততই বোঝা যাবে যে স্বৈরাচারী কমিউনিজমই পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী ছিল। অবশ্য অন্তর্লীন বিবিধ পরিবর্তনের ফলে হয়তো পশ্চিম দুনিয়ায় কোন না কোন ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আসবে আগে, কমিউনিস্ট দুনিয়ায় আসবে পরে। তবে এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ কথন সম্ভব নয়।

একটা কথা ঠিক। পাশ্চাত্য দেশগুলি এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি গণতান্ত্রিক সমাজবাদে গিয়ে মিলিত হবে। আফ্রো-এশীয় দেশগুলিও ঐ পথে যাবে যদিও তাদের সময় লাগবে বেশী। তার মানে এই নয় যে, পাশ্চাত্য ও পূবের দেশগুলি একই ছাঁচে-ঢালা, একই ধরনের সমাজ গড়ে তুলবে। দুই এলাকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি ঠিক এক নয়। এবং এসবের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হওয়া কঠিন। পুরাতন কাঠামোয় যে মানসিকতা ও মূল্যের জগৎ সৃষ্টি হয় নতুন কাঠামো চালু হোলেই তার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে না। অর্থাৎ চাইলেই তারা ইতিহাস থেকে মুক্তি পেতে পারে না। পূবের দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে, এখনকার কাজ তাকে 'গণতান্ত্রিক' ও 'মানবিক' করে তোলা। পাশ্চাত্যের দেশগুলি রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, এখনকার কাজ গণতন্ত্রের সঙ্গে 'সমাজতন্ত্র'কে সংযুক্ত করা।

তবে পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও পূবের সমাজ একই ধরনের না হবারই সম্ভাবনা। যদিচ কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে দুই সমাজে অনেক মিলও দেখা যাবে।

প্রতিমা ও পুতুল

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এ এক বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির গল্প। প্রথম শুনেও বিশ্বাস করিনি, এখনও তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে—যে এই একটা সাধারণ মানুষ একেবারে রাতারাতি লাখপতি হয়ে গেল। ওহো না, ব্যবসা করে নয় যে ভুঁড়ি ফাঁসানোর কথা ভাবা যায়। আমাদের বন্ধু চাটুয্যা বললে, কও কি, হাফ এ মিলনেয়ার। অন্য বন্ধু ভুজঙ্গ ঘোষণা করল, তা আর হতে হয় না, মাইরি, ক' টাকায় ডলার জানো? পাঁচলাখ টাকায় উনি মিলনেয়ার হচ্ছেন, হুঃ।

ব্যাপারটা নাকি এ রকম ছিল। ওছে, ওরফে অসিতভূষণ তার চালার নিচে ভিজে মাটির প্রলেপ আর বাঁশের চটার সাহায্যে কোন এক প্রতিমাকে অনবদ্যাঙ্গী করে তোলার চেষ্টা করছে, তখন বঙ্কা যার অন্য নাম বঙ্কিমচন্দ্র শী সে এসে বললে যে আর একখানা আছে, ওছে নিয়ে নিক। অসিতভূষণ প্রকাশ করলো যে তার ভাগ্য আদৌ ভালো নয়, তিন টাকা গিয়েছে তার, আর নয়; বঙ্কা পথ দেখতে পারে। বঙ্কা নাছোড়বান্দা। শেষে এই রফা হয় যে অসিতভূষণ ভাগ্যবান প্রমাণিত হলে, বঙ্কা ঠিকঠাক পাঁচ হাজার পাবে, আর না হলে বঙ্কা গরীবের এক টাকা ফেরৎ দেবে।

কিন্তু একদিন অসিতভূষণকে মার কৈলাস বলতে হলো। একেবারেই প্রথমটা উঠে গেলো যাতে করে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে হাজার টাকা খরচ করে খাইয়ে, তার হাতে পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার থেকে গেলো। বঙ্কাও নাকি ওই টিকেট বিক্রি করার দরুন কিছু পায়। সে প্রথম দিনেই ছুটে এসেছিল খবর নিয়ে, সেই তো নাম্বার মিলিয়েছে। সে এসেই লাফঝাঁপ, হাঁকডাক ইত্যাদি করে এক অনর্থ বাধিয়ে তুললো। মিষ্টি খাওয়ার দিনেও সে-ই পরিবেশন করে, প্লেট ভেঙে, অসম্ভব রকমে হট্টগোল করলো। কিন্তু তারপরই মিইয়ে যেতে লাগলো, কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। কখনও অসিতভূষণের চালার সামনে ঘুরঘুর করে কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কথা বলে না। দিন সাতেক এরকম চলার পর একদিন অসিতভূষণ বললো, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে বঙ্কুবাবু, লোক ডাকো।' লোকজন ডাকতে হবে কেন, ধারেকাছেই ছিল। বঙ্কা তাদের সামনে চালার নিচে যেতেই অসিতভূষণ পাঁচ হাজার টাকার পাঁচটি বাণ্ডিল তার হাতে দিয়ে বললো, 'রোক শোধ কেমন!' লোকে বললে যে কি ভাগ্য বঙ্কার!

অসিতভূষণ তার নিজের ব্যবস্থাও করলে। স্টেট ব্যাঙ্কে চার লাখ নানা শর্তের ফিক্সড ডিপজিটে, ইউনাইটেডে প'চাত্তর হাজার চলতি আমানতে এবং ডাকঘরের ব্যাঙ্কে, যাতে যখন তখন তোলা রাখা যায়, পঁচিশ হাজার রেখে সে ভাবলো যে এবার কিছু করা যাক।

সে মিনিপুস্তকাদি পড়তো। একদিন একেবারে হালের একখানা পড়তে তারও বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা হল এবং সে এই বিজ্ঞাপন দিল:

> মাটির কাছে থাকা আর্টিস্ট যুবক যার গায়ে খোস নেই, স্বাস্থ্য ভালো, মাথায় খুসকি নেই, রোজ সাবানে চান করে এবং রদোফেনে দাঁত মাজে, কোন এক কলকাতা ফ্ল্যাটের শেষ দিকের একখানা ঘর ভাড়া চায়। যুবক হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার কথা চিন্তাও করে না, কেননা অঙ্কে তিন সে যতবার পেয়েছে তা দয়ায়। বারবার বহুবার পড়ার ফলে টেলস্ ফ্রম শেক্সপীয়ার এবং লিজেন্ডস্ অব গ্রীস অ্যান্ড রোম নিজে থেকেই পড়ে বুঝতে পারে। ইংরেজিতে চেক সই করে। লিখুন।

অনেক সময়ই কথায় প্রকাশ হলেই আবেগ ফুরিয়ে যায়, অসিতভূষণের তাই হয়েছিল। দু-চারদিনে সে নিজের বিজ্ঞাপনের কথাও ভুলে গেলো। কিন্তু শহর কলকাতায় দেখা গেলো যে তিনটি তেমন ফ্ল্যাট আছে যা অসিতভূষণের মনোমত হতে পারে। সুতরাং এক সকালে অসিতভূষণ গেঞ্জেতে হাজার পাঁচেক, পকেটের ব্যাগে হাজার খানেক আর স্যুটকেসের এ ভাঁজে ও ভাঁজে আর হাজার চারেক নিয়ে কলকাতায় পৌঁছে গেলো। তিনটি ফ্ল্যাটের যেটিকে তার পছন্দ হলো সেটিই সব চাইতে নতুন নয়। কিন্তু একটু বিশেষ ধরনের। দুই নামকরা রাস্তা যেখানে এক সূক্ষ্মকোণ তৈরি করেছে তার উপরে বাড়িটি হওয়ায় দোতলার একটা ফ্ল্যাটের দুই রাস্তার মুখোমুখি শেষ ঘরটা ত্রিকোণাকার। ঘরখানির দুদিকে বারান্দা এগিয়ে সম-কোণের চাইতে অনেক সূক্ষ্ম এ কোণে মিশেছে। চটেযাওয়া সাদা রঙের প্রলেপে মরচেদেখানো লোহার রেলিং ঘেরা সেই দুই বারান্দার ফিট দশক অংশ সুতরাং সেই ত্রিকোণাকার ঘরের অধিকারেই থাকে। সেই ফ্ল্যাটের, যা দোতলার আরও কয়েকটির অন্যতম, যিনি বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর সংগে এরকম কথা রইল যে অসিতভূষণ যেন থেকেও নেই এমনভাবে অপরি-চিত থাকতে চায়। খাওয়ার বন্দোবস্ত স্টোভে কিছু করবে, কখনও যেখানে খুশি খাবে।

সেই ত্রিকোণাকার ঘর গুছিয়ে নিয়ে অসিতভূষণ কলকাতা দেখে বেড়াতে লাগলো। অবসর সময়ে চেয়ার টেনে বারান্দার কোণে বসে একসংগে দুই রাজপথের ট্র্যাফিক দেখেও তার সময় কেটে যায়। দিন সাতেক পরে মিনিবুকে ফ্ল্যাটের সেই ভাড়াটে বিজ্ঞাপন দিল:

'সেই যে যার স্বাস্থ্য ভালো, চুলে খুস্কি ও গায়ে খোস নেই, রোজ সাবানে চান করে এবং রদোফেনে দাঁত মাজে সে এখন কলকাতায় তার মনোমত ফ্ল্যাটের শেষ দিকের ঘর পেয়েছে।'

এর পরে সে নিজে এবং মিনিবুকের পাঠকরা এই কি হয় এই আশা-আকাঙ্ক্ষা রোজ করতে শুরু করলো কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এভাবে একমাস কেটে গেলো অসিতভূষণের:

ইতিমধ্যে একদিন সে কুমোরটুলিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিমা তৈরী দেখে এলো, সেই ভিজে মাটির প্রলেপ আর বাঁশের চটা দিয়ে প্রতিমার বর্তুল ও বাঁকগুলোকে অনবদ্য করে তোলা। অন্য একদিন ফ্ল্যাটের সেই ভাড়াটে যিনি সন্ধ্যায় ড্রেসিংগাউন গায়ে, দাঁতে পাইপ চাপেন তার সংগে আলাপ হলো। এবং আলাপটাকে আলাপে দাঁড় করাতে তিনি টেলস ফ্রম শেক্সপীয়র আর লিজেন্ডস্ অব গ্রীস অ্যান্ড রোমের কথা বললেন যা বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিলো। এমনকি ড্রেসিংগাউনের পাশ পকেট থেকে মিনিবুক বার করে একখানা অসিতভূষণকে দিলেন। তারপর ভদ্রলোক চলে গেলেন। বারান্দা দিয়ে তিনি চলে যেতে যেতে এক দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। সেটা অসিতভূষণের কাছে রহস্যময় মনে হলো। কেননা সে প্রথম দিন ফ্ল্যাটের অন্য ঘরে বসে আলাপ করেছিলো বটে কিন্তু সেটা ঠিক কোন ঘর এবং বারান্দা দিয়ে চলতে পর্দা দেয়া ক'টা জানলা দরজা পেরুলে পৌঁছানো যায় এখন আর তা বলতে পারবে না। সে যাই হোক মিনিবুক পড়ে অসিতভূষণ পরেরখানিতে এই বিজ্ঞাপন দিল: 'হাঁ আমি এসেছি বটে—সেই স্বাস্থ্যবান যুবক।' সকলেই কিছু প্রতীক্ষা করতে লাগলো কিন্তু কিছু ঘটলো না।

এক রাতে সে গাঢ় শান্তির ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সে অনুভব করলো যেন ঘরের আলো উজ্জ্বল, যেন জ্যোৎস্না আসছে জানলায়। ঠিক তখনই সে এক সুঘ্রাণও পেলো যা কিছু বিচার করে বোঝাই যায় তা তার মাথার তেলের নয়, সাবানের নয়, রদোফেনের নয়। কি তার ঘুম ভাঙালো? এই সুঘ্রাণ যা মৃদু, এই আলো যা স্তিমিত। সে উঠলো। দরজা খুললো। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো চাঁদ আছে বটে না থাকার মতো। তাতে বারান্দাটা কিছু রহস্যময় মনে হতে পারে। সে ঘরে ফিরলো। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলো দেয়ালের ব্র্যাকেটে আলো।

ও হো, তা হলে সে আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়েছিলো। সুঘ্রাণটা আর পাচ্ছে না। সে ঘুমাতে গেলো।

পরদিন সকালে ঘরে পায়চারি করতে করতে সে অবাক হলো। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল। একটা ফিরোজা রঙের চকচকে ক্ষুদে প্লাস্টিকের এক চাকতি। টিপ? কপালের টিপ? অবশ্য লুডোর গুটিও হতে পারে যা পথে কোথাও পড়েছিল, যা জুতোর সোলের খাঁজে আটকে এসে খসে মেঝেতে পড়ছে।

সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো শান্তিতে। কিন্তু আবার তার ঘুম ভাঙলো। কে যেন আলো জেলে ঘুম ভাঙালো। সেই সুঘ্রাণটা আসছে। চোখ মেললো অসিতভূষণ। দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। কপালে তার বিনবিন করে ঘাম ছুটলো। ঘরের মধ্যেই বটে। জানালার পাশে। ঘরের দেয়াল-আলমারিটার একটা পাল্লা খোলা। তারই ছায়া পড়েছে। আর তাতেই যেন আরও অপূর্ব। পিঠে কালো ঝরনার মতো চুল, ছোট কপাল যার আধখানা ছায়ায় চূর্ণ অলকের ঝাপটায় ঢাকা। আর সেই বর্তুলতাগুলি যা মেঝেতে লুটিয়ে পড়া শাড়ি নিরাবরণ করেছে। তখন অসিতভূষণের হঠাৎ মনে পড়লো সে অনেক প্রতিমা গড়েছে, বাঁশের চটা দিয়ে যাদের দেহের বর্তুলাভাসগুলোকে দেখে দেখে খুঁত ধরে ধরে নিখুঁত অনবদ্য করে গড়েছে। তখন তার মনে সাহস হলো। এবং সে এই অপূর্ব ভিনাস মূর্তি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা করলো যার নীল শাড়ি খসে খসে পড়েছে। আর কি সুঘ্রাণ! কিন্তু সে বিছানা থেকে পা বাড়াতেই হঠাৎ যেন সে কোথায় গেল।

এবার অসিতভূষণের চিন্তার পালা এলো। সে এরকম চিন্তা করলো : এ কি সবই তার চোখের ভুল! অথবা কি ক্ষুধিতপাষাণের মতো কিছু! কিংবা তন্ত্রের যেসব গল্প শোনা যায় তেমন কোন শক্তি! সে অবাক হলো নিজেকে এমন চিন্তা করতে দেখে। সেই সুঘ্রাণ এখন নেই, কিন্তু সেই নীল শাড়ি, সেই সুগৌর শরীরের ভাঁজগুলি, যা স্তিমিত আলোকে দেখা গিয়েছিলো—সেগুলো মনের মধ্যে থেকেই গেলো।

দুপুরে দেয়াল-আলমারিটার গোড়ায় সে আবার কিছু পেলো। এ কি আশ্চর্য! সে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো। পুরনো, কিছু-বাঁকা-হয়ে-যাওয়া রুপোর একটা চুলের কাঁটা। সে ভাবলে হয়তো আলমারিতে কতদিন থেকে পড়েছিল, কাল বাতাসে পাল্লা খুলে গেলে বাইরে পড়েছে। সে দেয়াল-আলমারি খুলতে গেলো, কিন্তু ঝুলের মধ্যে গোটা কয়েক তেলাপোকা দেখে তখনই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলো। অসিতভূষণ তেলাপোকাকে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে বেশী ভয় পেতো।

দিনটা তার উদাসভাবে কাটলো। একবার তার মনে কেউ যেন ধাক্কা দিল, একটা চুরি ছিনতাই-এর ব্যাপার হতে চলেছে। কিন্তু তা এক মুহূর্তেই। তার মতো ভাগ্যবান লোকের ছিনতাই হবে কেন। তা ছাড়া সে যে পাঁচলাখী অসিতভূষণ তা কারো আন্দাজ করার সুযোগ কোথায়? বরং সেই মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই সে যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হলো। লিজেন্ডস অব গ্রীস অ্যান্ড রোম মনে পড়ে গেলো—এ কি সেই গল্পই যে মর্মরমূর্তি সজীব হয়েছিল। তার তৈরি সেই অজস্র প্রতিমাগুলোর কোন একটি কি এমন করে আসছে? যে বিদ্যুৎ তাকে স্পর্শ করেছে তা মনের মধ্যে আলো হলো।

সন্ধ্যার দিকে সে স্থির করলো আজ সে সংযত থাকবে। রাত্রির আহার সংকোচ করলো। দুধ, পাঁউরুটি, কলা, ডিমসেদ্ধ খেলে ঘুমের ভাবটা কম হবে। সে এক কৌটো ইনস্ট্যান্ট কফি কিনে আনল। কয়েক কাপ খেলে ঘুম আসবে না। সিঁড়িতে উঠতে ডাক্তারের ডিসপেনসারি।

ডাক্তারকে সে রাতে একদম না ঘুমোলে চলে এমন বড়ি দিতে বললো। বানিয়ে বললো পরীক্ষার পড়া করবে। রাত আটটা থেকে দুটোর মধ্যে কয়েক কাপ কফি ও সেই ঘুমকাড়া বড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে সে চোখ বন্ধ করে জেগে রইলো।

ঘড়ির ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে। অসিতভূষণের মনে হলো দুদিন আগে যে আর্মেনি গির্জা দেখে এসেছিলো তার ঘণ্টা বাজছে। এসপ্লানেডের ঘড়ির দোকানগুলোতে সাজানো ছোট-বড় সবগুলি চালু ঘড়ির চিকচিক টিকটিক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো সে এই এতদূর থেকেও। একবার সে ভাবলো ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ইন্স্ট্যান্ট কফির যতটুকু সে ভিতরে নিয়েছে, আর সেই ঘুমকাড়া বড়িগুলি তাকে কি আর ঘুমোতে দেবে কোনদিন। ঘুমের চেষ্টা করতে গিয়ে সে বন্ধ চোখের নিচে সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছে। আলো আর তার উত্তাপও।

কিন্তু হঠাৎ তার কপালে কিছু লাগলো। নরম আর স্নিগ্ধ। আর তখন সে সৌরভ পেলো। তার গায়ে কাঁটা দিলো। তখন সে চিন্তা করলো ভয় পাওয়ার কি আছে। সেই প্রায় দুবছর আগে পাড়ার আর সব মানুষ ঘুমে অচেতন হলেও তুমি, ওহে, হ্যাজাগের আলোয় তোমার চালার নিচে সেই এক প্রতিমাকে কি সারারাতের চেষ্টায় অনবদ্য করে তোলো নি, পাশে খুব নরম ভিজে মাটির তাল আর হাতে বাঁশের চটার ছুরি। প্রতিমার সেই উঁচু বুক, নিম্ন নাভি, নিভাঁজ মসৃণ উদর তোমার আঙুলে বাঁশের চটার টানে নিটোল হয়ে ওঠেনি? তখন কি গা শিরশির করেছিলো? তুমি, তাছাড়া, কি ভীষণ ভাগ্যবান যে তিন বারের বারই পাঁচলাখী হও।

সে চোখ মেললো। ঘরে যেন আলো জ্বলছে চাঁদের। সুঘ্রাণ তো বটেই। আর এ কি আর কারো হতে পারে। আর সেই দণ্ডে অসিতভূষণ তাকে দেখতেও পেলো যে সে এখনও হলপ করে বলতে পারে তার বাঁ স্তনের যা নিটোল উঁচু আর খয়েরি মুকুট পরানো তার পাশে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা অপারেশনের দাগ

অসিতভূষণ উঠে বসলো। তখন সেও উঠে দাঁড়ালো। মশারিটা দুললো। হেঁটে গিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়ালো। আলোতে ঘর ভরে যাচ্ছে। অসিতভূষণ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো। সে ভাবলো আমি পাঁচলাখী তাতে সন্দেহ নেই। আহা সে কি গলে-গলে-পড়া ফিরোজা শাড়িটা তুলে দেবে? গলার হারটা যে উল্টে আছে তা কি সোজা করে বসাবে? সে হাসলো, কথা বলতে পারলো না।

তখন সে দরজা খুললো। বারান্দায় বেরোলো। অসিতভূষণ দেখলো লম্বা বারান্দার ম্লান আলোয় সে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো চলতে চলতে। সে বুঝতে পারলো না এই এতগুলো দরজার কোনটা তার জন্য খোলা ছিল।

ফলত এমন হলো যে অসিতভূষণ তারপর থেকে উদভ্রান্তের মতো কয়েকদিন তার প্রতীক্ষা করলো। এক অনির্বচনীয় অবস্থা হলো তার। অবশেষে সে একদিন মিনিবুকের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে আবার মিনিবুকে বিজ্ঞাপন লিখে পাঠাল:

> 'সেই স্বাস্থ্যবান যুবক যার খুসকি ও খোস নেই, নিত্য সাবানে চান করে এবং রুদোফেনে দাঁত মাজে, যে লেখাপড়া বলতে গ্রীস-রোমের লিজেন্ডস্ ও শেক্সপীয়রের টেলস্গুলিকেই জানে এবং তাই শেষ এবং অন্য কিছুই জানে না, প্রিমিটিব, সে চোখের দেখা, আলাপ, প্রেম, মিলন এই ধাপগুলি মানতে অসহিষ্ণু। লিখুন বক্স...।'

সাতদিনের মাথায় সে চিঠি পেতে শুরু করলো। তার মধ্যে একখানিতে কোন অনুসন্ধান ছিলো না, 'যদি' ছিলো না। তা এ রকম ছিলো: 'আমি প্রস্তুত। সোমবার নাগাদ দুটোয়

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুব দিকে ইটলাল স্ট্যান্ডার্ডের পাদানে বসা ফিরোজা শাড়ি, ক্রোম-ইয়োলো ভ্যানিটি ব্যাগ দেখুন। বাটনহোলে ভায়োলেট রাখবেন। অধ্যাপিকা।'

অসিতভূষণ দেখলো সেদিনই সোমবার।

সেই প্রিমিটিব-হনিমুনের তৃতীয় দিনের বিকেলে সে চোখ মেলে দেখলো পাশের বালিশ জোড়ায় কারো মাথা দেখা যায় না, ঘরের মধ্যে কারো সাড়া নেই। হঠাৎ সে তার ওয়াড্রোবের হাঁ-করা দরজার ধূসর ফাঁকটা দেখতে পেলো যা তৎক্ষণাৎ তার বুকে সেঁধিয়ে গেলো। সিফনের সেমিজের উপরে শাড়ি জড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি ওয়াড্রোবের কাছে ছুটে গেলো। সেই দণ্ডেই সে ওয়াড্রাবের নিচে বসানো স্টিল ক্যাবিনেটটাকে ডালাখোলা অবস্থায় দেখতে পেলো। একটা আর্ত চিৎকারকে সে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটে চাপা দিয়ে ঠেকাল। সে ফ্ল্যাটের এ ঘর দেখলো, বাথরুমের দরজা টেনে খুললো। বাইরের দিকে আগে দৌড়ে গেলো। সে ঘরেই টেলিফোন। তখন সে দেখলে যে সেই ঘরে মেঝের কার্পেটের ওপর অসিতভূষণ কুণ্ডলী করে ঘুমিয়ে আছে।

সে তখন অসিতভূষণকে জাগিয়ে তুললো। বললে মিস্টার প্রিমিটিব, কেউ কি ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলো? অসিতভূষণ জিজ্ঞাসা করলো, সে কি, কেন? সে বললে যে তার ওয়াড্রোব একেবারে খালি। তখন অসিতভূষণ হাসলো। এবং দুজনে একসঙ্গে ফ্ল্যাটের তৃতীয় ঘরে গেলো। সেখানে মেঝের উপরে ভাঁজখোলা শাড়িগুলো ডাঁই করে রাখা। সে, রমণী, দ্রুতবেগে সেদিকে ছুটে গেলো এবং শাড়িগুলো, চেলিগুলো, যাবতীয় অন্তর্বাস এমনকি তার গহনাগুলোকেও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখলো। সে চিন্তা করলো, হঠাৎ যেন খুশি হলো। সে প্রমাণ পেলো অসিতভূষণ অবশ্যই প্রিমিটিব। সে বললো, 'এসো এগুলোকে আমরা আবার ভাঁজ করে তুলি। তুমি গহনাগুলোকে ঠিকঠাক বাক্সে তোল।' পরে তেমন করতে করতে সে হাসিমুখে বললো, 'কেমন, অসিতভূষণ, এগুলো সুন্দর নয়? এরকম করতে নেই।'

সেই সন্ধ্যায় সিনেমা থেকে ফিরতে পথে এক দোকান থেকে সাদা কাগজ আর রঙের বাক্স কিনলো অসিতভূষণ।

একদিন সেই তখন সে বললো,—'এগুলো খুব সুন্দর নয় কি? দেখো। হ্যাঁ, সুন্দর। সুন্দর বৈ কি। চলো আজ সন্ধ্যায় কিছু কিনি যাতে এই গলাটা সম্পূর্ণ ঢাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় ইটরঙের সেই স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে তারা বার হলো। এ দোকান ও দোকান ঘুরে রাত আটটায় অসিতভূষণ এক জড়োয়ার চিক পছন্দ করলো যাতে তার গলার অনেকটা ঢাকে। সে তো নিজের পার্সের কথা ভেবে হতভম্ব এবং ভাবছে এখন দোকানদারকে বলবে কিনা সঙ্গের পুরুষটি এমন যে তার কিছু বাস্তবজ্ঞানের অভাব আছে। অসিতভূষণ জামার ভিতর-পকেট থেকে চল্লিশখানা একশ টাকার নোট কাউন্টারে রেখে তখনই তাকে চিকহার পরে নিতে বললো।

হনিমুনের পনেরো দিন তো প্রায় শেষ হতে চলেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সে দেখতে পেলো ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালানো। অসিতভূষণ কি কিছু লিখছে? পা টিপে টিপে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে সে অবাক হলো। অসিতভূষণ যেন ঘুমের ঘোরে (কিংবা এখন আবার তার ঘুম পাচ্ছে) শাড়ির পাড়ের ডিজাইন আঁকছে—রঙিন ডিজাইন যাতে পাড়ের রং আর জমির রং বোঝা যাবে।

সে বললো,—চলো ঘুমাই গে।

অসিতভূষণ বললো,—চলো, চলো। কেমন, খুব সুন্দর নয়?

নিশ্চয়।

একদিন সকালে, সে ঘুম ভাঙার পরেও ভাবছিলো যে সেদিন রবিবার কলেজ বন্ধ। তাই আবার পাশ ফিরে শুলো কিন্তু তা করতে গিয়ে সে হাসিমুখে চোখ খুললো। সে তো একমাসই কলেজে যাচ্ছে না। আর সে তো একা নয় যে রবিবারের সকাল হলেও পাশ ফিরে শোবে। সে উঠলো। ঘাসের চটি পায়ে গলালো। টেবলে রাখা ঘড়ি দেখতে এগোলো।

তখন তার চোখে পড়লো। ও মা, এ যে এতগুলো টাকা। সব নতুন নোট আর একশ টাকার। এ কি, পাঁচ হাজার হয় যে। নোটগুলো সে তুললো। আচ্ছা প্রিমিটিব দেখছি! সেদিন-কার সেই চিক কেনার পরও! তখন চিঠির মতো কাগজটা চোখে পড়লো: 'আপনার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি আপনার স্থায়ী ক্ষতি করে ফেলিনি।' সে সব ঘরই খুঁজলো। দেখলো অসিতভূষণের সুটকেসটাও নেই।

কেউ কেউ বলে অসিতভূষণ কিছু টাকা তুলতে দেশে ফিরেছিলো। তা নাও হতে পারে। মাস তিনেক পরে সে তার সেই ত্রিকোণ ফ্ল্যাটের শেষ-ঘরে ফিরে এলো। নাইটগাউন পরা পাইপ চিবানো সেই মিনিবুক পড়া ফ্ল্যাটের মূল ভাড়াটের সঙ্গে আলাপ করবে স্থির করলো। সে তো জানতই তার নাম করঞ্জয়। এমনকি একদিন সে করঞ্জয়ের ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে গিয়ে বসলো। তার মনে তখন এ কথাটা উঠলো বটে যে মিনিবুক অনুযায়ী এ ঘর পাওয়ার সময়ে এমন এগ্রিমেন্ট ছিলো কেউ কারো কথায় থাকবে না। এই অবস্থায় সে একদিন তার সে ঘরের বিছানার নিচে সেই লুডোর ঘুঁটির মতো কিছু এবং রুপোর বাঁকা চুলের কাঁটা বার করলো। দেখলো। এবং অবাক হলো সেগুলো উবে যায় নি। তার কি মনে হলো যে দেয়াল-আলমারির পাল্লা খুললো। তেলাপোকা গোটা দুয়েক উড়লো। সে মাথা নিচু করে তাদের সম্ভাব্য জেট-জঙ্গী আক্রমণ এড়ালো এবং সবিস্ময়ে দেখলো যে পাল্লার ওদিকে একটু ফাঁক যাতে অনেক মাকড়সার জালে একটা ধুলোঢাকা পর্দার উপরে। তা হলে এটা একটা ছোট দরজাই যা ব্যবহার কমই হয় এবং যা সে দেয়াল-আলমারি ভেবে আটকায় নি।

একদিন সে করঞ্জয়কে প্রশ্ন করলে যে এদিকের ফ্ল্যাটে কেউ একজন অপূর্বা রূপসী আছেন? করঞ্জয় পাইপ সরিয়ে হাসলো। তখন অসিতভূষণ বললে যে তার বাঁ বুকের পাশে ছোট অপারেশনের দাগ থাকতে পারে।

করঞ্জয় আশ্চর্য হয়ে গেলো। কিছু লুকাতে চাইল। বললো,—ছিলেন। তারপর বোধ হয় সে চিন্তা করলো। ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো মৃতের সম্বন্ধে কিছু গোপন করাই পাপ কেননা মৃত্যু তার সব কিছুকে পবিত্র করে নি কি? সে বললো,—হ্যাঁ, ছিলেন। আমার স্ত্রী ছিলেন তিনি। মিনিবুক মারফৎ আলাপ করে পরে আধুনিক মতো ভালোবেসে বিয়ে করেছিলুম। শোথ হয়েছিলো, নিমুফোম্যানিয়াও। সন্তান-সম্ভাবনা ছিলো। করঞ্জয় উঠে চলে গেলো।

দোতলায় ফ্ল্যাটগুলোতে উঠবার সিঁড়ির কাছেই ডাক্তারের ডিসপেনসারি। একদিন ডাক্তারকে দেখে তার সামনের চেয়ারে চেপে বসলো অসিতভূষণ। একটু ফাঁক পেতেই সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, শোথ হয় কেন?'

—অনেক কারণেই হয়।

—সন্তান-সম্ভাবনা থাকলে?

—আপনার কি রোগী আছে?

—না। তা নেই।

—আমার সময়ের দাম আছে।

পকেট থেকে দলাপাকানো একখানা একশ টাকার নোট বার করে টেবলে রাখলো অসিতভূষণ; বললো,—এতে ভিজিটের চাইতে বেশী হবে।

ডাক্তার বললো,—খেতে না পেলে হয় মশায়। প্রেম করলে হয় না; খেতেও দিতে হয়। বিশেষ সে সময়ে।

—নিম্‌ফোম্যানিয়া কি ডাক্তারবাবু?

—সেও রোগ। একরকমের উন্মাদ। কামোন্মাদ বলা হয়।

ডাক্তারের চারিদিকে সব সময়েই লোক থাকে। একজন বললো, শক পেয়েছে ছোকরা। কপালের শিরা ফুলে উঠছিলো।

অসিতভূষণ পথে এসে দাঁড়ালো। হাওড়া ব্রিজের দিকের আকাশে কমলা রঙের দু-একটি বর্তুল দেখা দিল। কিন্তু সেগুলো যুক্ত হয়ে কোন মূর্তি হলো না। অসিতভূষণ ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

অসিতভূষণ এখন শহরেই আছে। আবার তাকে দেখলুম। পাঁচলাখী সে নিজেই মেলায় দোকান দিয়েছে। পুতুল বিক্রি হচ্ছে তার দোকানে। বেশ ভিড়। ফলে ছোটছোট ফুলের মতো মেয়েরা যে কি খুশী! তার দোকানের কাউন্টারের পিছনে তখন বেতের চেয়ারে বসে মেলায় ঘোরার পরিশ্রম থেকে আয়াশ করছি। আমাদের পিছনে পর্দা আর তার পিছনে যেন স্টোভের শব্দ হচ্ছে। কি সুন্দর পুতুলগুলো অসিতভূষণ বানিয়েছে। গলা থেকে মাথা, কনুই থেকে ম্যানিকিওর করা নখ, হাঁটু থেকে জুতোর ডগা কি অনবদ্য গড়ন! কারো কপালে সিঁদুর, কারো টিপ, কারো ঠোঁট রুজে রং করা টুকটুকে। এমন ভ্রূ চোখ যে দেখে তোমার মনে হবে নকল ভ্রূ আঁকবার কায়দা হলিউড থেকে শিখে এসেছে। কারো ঘোমটা, কারো হর্সটেইল। আর কত গহনা—হার, বাজু, বালা, জড়োয়ার বাউটি। গলার চিক। পরনে শাড়ি কত রকমের, কত রকমেই বা পরা।

পাঁচলাখী অসিতভূষণ বিক্রি করার সময়ে বলে, ভারি সুন্দর, না খুকু? কিন্তু জল লাগিও না যেন। কারণ যত কিছু কায়দা সব কিছু পোশাকে। কেমন কাপড়গুলো, সুন্দর না? কারণ কাপড় ভিজে গেলে কিন্তু পুতুল বসবে না, দাঁড়াবে না। কারণ—

এক ফাঁকে বিক্রি কম হলে অসিতভূষণ আমার পাশে বসলো। বললো সে,—মাস্টার, কেমন দেখছেন পুতুল?

—ভারি ভালো। চমৎকার। কিন্তু কারণ কারণ কথাটা অতবার বলছো কেন? মুদ্রাদোষ হবে যে।

এমন সময়ে পর্দা ঠেলে তিনি এলেন চা নিয়ে। বললুম, সে কি! তুমি চা করলে?

হেসে তিনি বললেন,—দেখলুম বাড়ির বাইরে চা খেতে তুমি বদ্ধপরিকর। কাজেই নিজের হাতে করলুম। যেখানে সেখানে তো খেতে দিতে পারিনে।

হেসে বললুম,—বেশ, বেশ। অসিতভূষণ চা-টা খাও। ইনি কখনও কখনও বেশ ভালো চা করেন। সে এমন ভালো যে কি বলি। দেখ এখন তেমন হয়েছে কিনা। আর সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আর অসিতভূষণ, তোমার বাঁ চোখটাকে ডাক্তার দেখাও। জলের দাগ দেখছি গালে।

১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রুশ ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার সলঝেৎ-সিন-এর নাম দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি লাভ করে। তাঁর লেখা সম্পর্কে আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায় একারণেই যে তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করেন নি, তাঁর আশঙ্কা ছিল 'পাছে আর তিনি দেশে ফিরতে না পারেন।'

সলঝেৎসিন-এর জন্ম ১৯১৮ সালে, কিসলোভড্স্ক-এর ককেশিয়ান স্পা-তে। তাঁর বাবা ছিলেন আর্টিলারি অফিসার। সলঝেৎসিন-এর জন্মের ছ মাস পর তিনি মারা যান। ১৯২৫ সালে মার সঙ্গে সলঝেৎসিন রসটভ-অন ডন-এ আসেন এবং সেখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন। রসটভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিত অধ্যয়ন করেন। ১৯৪০ সালে সহপাঠিনী নাতালিয়া রেসেটোভস্কায়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর্টিলারি অফিসার হিসেবে সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দুবার সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত হন।

এরপর থেকেই সলঝেৎসিনের জীবন নতুন মোড় নেয়। ১৯৪৫ সালে তাঁকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর অপরাধ : তিনি স্তালিন সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে তাঁর বন্দীজীবন কাটে মস্কোয় বন্দী বিজ্ঞানীদের জন্য 'সায়ান্টিফিক ইনস্টিটিউটে', পরে সাইবেরিয়া শিবিরে।

১৯৫৩ সালে তাঁর বন্দীজীবনের শেষে তাঁকে কাজাখস্তানে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি মুক্তি পান, এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন। এ সময় রিয়াজান-এ শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে "নভি মির" পত্রিকায় তাঁর "ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অব আইভান ডেনিসোভিচ" প্রকাশিত হয়। এর বছর খানেক পর লেনিন পুরস্কারের জন্য তিনি অনুমোদন পান; কিন্তু পরবর্তী দিনগুলি তাঁকে সোভিয়েট সাহিত্য সংস্থার তীব্র সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে "ক্যান্সার ওয়ার্ড" প্রথমে আংশিকভাবে "নভি মির" পত্রিকা কর্তৃক ছাপা হয় - কিন্তু পরে তা প্রকাশের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। "দি ফার্স্ট সার্কেল" প্রকাশিত হয় বিদেশে। এর পরই তিনি সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস "১৯১৪" বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। সম্পাদক]

ইয়েসেনিনের গ্রামদেশে

আলেকজান্দার সলঝেৎসিন

রাস্তায় একসূত্রে গাঁথা পরের পর ঠায় একই ধরনের চারটি গ্রাম। ধুলোয় ধুসর। ধারেকাছে না বাগবাগিচা, না বনজঙ্গল। কিলকিলে প্যাকাটির বেড়া। এখানে সেখানে রংচঙে চটকদার ঝিলমিল। রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পাম্পে গা আঁচড়াচ্ছে এক ব্যাটা শুয়োর। একটা সাইকেলের ছায়া পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে যেই না যাওয়া, এক সারে চলা একঝাঁক রাজহাঁস মহানন্দে গলায় ভেঁপুর আওয়াজ ক'রে দাবড়ানি দিল। মুরগির ছানাগুলো খাবারের খোঁজে উঠে প'ড়ে লেগে রাস্তা আর উঠোন আঁচড়াচ্ছে।

কন্স্তান্তিনোভোর গ্রাম্য মুদীর দোকানটিও কম যায় না—দেখতে মুরগির বাসার মতই রোগাপটকা। নোনা হেরিংমাছ। ভোদ্‌কার গোটা-কতক ব্র্যান্ড। এক ধরনের আঠা-আঠা মিঠাইমোরব্বা, বছর পনেরো আগেই লোকরুচি থেকে যার পাট উঠে গেছে। শহরে তুমি যে রুটি কেনো, তার

দ্বিগুণ ভারী গোল গোল কালো পাঁউরুটি—দেখলে মনে হবে ও-রুটি কাটতে ছুরি তো নয়, কুড়ুল লাগবে।

ইয়েসেনিনদের কুঁড়েঘরের ভেতরটা ছোট ছোট নড়বড়ে পার্টিশান দিয়ে ভাগ ভাগ-করা—দেখে মনে হবে ঘর তো নয়, যেন কুলুঙ্গি কিংবা প্যাকিং বাক্স। বাইরে আছে খানিকটা বেড়া-দেওয়া চত্বর। এখানে এক সময়ে ছিল একটি স্নানঘর, সেখানে সেগেই অন্ধকারে নিজেকে বন্ধ ক'রে রেখে তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন। বেড়ার বাইরে নিয়মমত যৎকিঞ্চিৎ চারণভূমি।

আমি গ্রামটাকে বেড় দিয়ে ঘুরি; আর পাঁচটা গ্রাম যেমন হয়। তাদের প্রধান ভাবনা ফসল নিয়ে, কেমন ক'রে দিনে দিনে সঞ্চয় বাড়ানো যায়, পাড়াপড়শীদের সঙ্গে কিভাবে টেক্কা দিয়ে চলা যায়। যত দেখি ততই আমার হৃদয় স্পন্দিত হয় : একদিন যে দিব্য হুতাশন এই দেশখণ্ডকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, আজও আমার দুই গালে তার আঁচ যেন অনুভব করছি। ওকা নদীর উঁচু পাড় বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একদৃষ্টে দূরদিগন্তে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি—খোরভস্তভের বনবাজিনীলা ঐ অরণ্যরেখাই কি কবিচিত্তে এই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটি জাগিয়ে তুলেছিল :

'বনময় কলকোলাহল ওঠে বনমোরগের বিলাপে...?'

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জলার মাঠ দিয়ে যাওয়া এই কি সেই নিরুপদ্রব নদী, যাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

'সূর্যের খড় জলের ডহরে ডাঁই করা আছে'?

হাজার বছর ধ'রে অন্যেরা যে সৌন্দর্যকে মাড়িয়ে চলে গেছে এবং দেখেও দেখে নি—উনুনের ধারে, শুয়োরের খোঁয়াড়ে, ঢেঁকিশালে, ক্ষেতেখামারে ছড়িয়ে-থাকা সেই অফুরন্ত সৌন্দর্যকে গাঁয়ের এক বদরাগী গোঁয়ার ছেলে মনের মধ্যে অসম্ভব নাড়া খেয়ে চোখ মেলে যাতে দেখতে পায়, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে ঐ কুঁড়েঘরে কবিশক্তির কি রকম বজ্রটাই না হানতে হয়েছিল!

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এক কবির শব

আলেকজান্দার সল্‌ঝেনিৎসিন

এখন ল্‌গোভো গাঁ। নিচে ওকা নদী। ওপরে খাড়া পাহাড়। এই
খাড়াইতে একদা ছিল প্রাচীন শহর ওল্‌গভ। সেকালের রুশীরা এ জায়গা বাছাই
করেছিল মন্দের ভাল হিসেবে; পানযোগ্য বহতা জল ছিল তার মাধুর্য।

ভাইদের হাতে খুন হতে হতে দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন ইঙ্গ্‌মার ইগোরেভিচ।
কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি স্থাপন করেছিলেন যীশুমাতার স্বর্গারোহণের উদ্দেশে নিবেদিত মঠ।

দিনটা ঝকঝকে থাকলে এখান থেকে দুই দূরে জলার মাঠ পেরিয়ে বারো
ক্রোশ তফাতে অন্য এক পাহাড়ের খাড়াইতে দেখা যাবে সন্ত জন্‌দেবের মঠের
দীর্ঘাকার ঘণ্টাঘর।

খান বাহ্‌তির ছিল শাপ লাগার ভয়। ফলে, মঠ দুটো টিঁকে গিয়েছিল।

ইয়াকভ পেত্রভিচ পোলন্‌স্কি আর সব ছেড়ে এই জায়গাটাকেই নিজের
ক'রে নেন এবং নির্দেশ দিয়ে যান যে, এখানেই যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা
হয়। মারা গেলে কবরের ওপর দেহমুক্ত আত্মা বিচরণ করবে,
পাহাড়গুলির শান্ত নিসর্গচিত্র অবলোকন করবে—মনে মনে সেটা বিশ্বাস করবার প্রবণতা,
এ বোধহয় চিরদিনই মানুষের মজ্জাগত।

কিন্তু গির্জা-গম্বুজ কিছুই আর নেই; অবশিষ্ট আধখানা পাথরের
দেয়ালের বুক কাঁধ মাথার ফাঁকা জায়গাগুলো ভরা হয়েছে কাঁটাতারে-মোড়া তক্তার বেড়ায়
আর এই প্রাচীন স্থানে জাঁকিয়ে বসেছে সেইসব পরিচিত গা-ঘিন্‌ঘিন্‌-করা বিকট
বিকট মূর্তি:
চৌকিদার শান্ত্রীদের বুরুজ। মঠের তোরণদ্বারে এক গুমটি আর সেইসঙ্গে দেয়াল
ধ'রে এক পোস্টার—কালোকোলো একটি বাচ্চা মেয়ে কোলে ক'রে
এক রুশী মজুর, বলছে 'জাতিতে জাতিতে শান্তি'।

আমরা কিছুই না জানার ভান করি। সেপাইদের ডেবায় ফতুয়াপরা
ডিউটিছুট পাওয়া গেল একজনকে। সে আমাদের কাছে সব খোলসা ক'রে বলল:

'দোস্‌রা দুনিয়ায় এখানে ছিল এক মঠ। শুনেছি পয়লা দুনিয়া
ছিল রোম আর তেস্‌রা দুনিয়া মস্কো। এক সময়ে এখানে ছিল বালখিল্যদেরও
আস্তানা; কিন্তু স্থানমাহাত্ম্য না জানায় দস্যিগুলো এখানকর দেয়াল তছ্‌নছ্‌
করল আর মূর্তি-বিগ্রহগুলো ভেঙে চুরমার করল। এরপর এক সমবায় খামার লাখ
টাকা দিয়ে গির্জাদুটো খরিদ ক'রে নিল—সেই ইঁটে ছ-সারি গোয়ালঘর-
ওয়ালা একটা প্রকাণ্ড গোশালা তৈরির জন্যে। আমি স্বয়ং কাজ করেছি সেখানে।
আভাঙা ইঁট খসাতে পারলে পাঁচ সিকে। আধলা ইঁটের জন্যে
দু সিকে। কিন্তু কক্ষনো সাফাই ইঁট মিলত না—তাতে সেঁটে থাকত চুনসুরকির
দলা। গির্জার তলায় একটা সমাধিকক্ষ পাওয়া গিয়েছিল। দেখা গেল তার মধ্যে এক পাদ্রী।
কঙ্কালমাত্র সার। তবে তার জোব্বাটা তখনও ছিল আস্ত অটুট। আমি আর

আরেকজন টেনেটুনে জোব্বাটাকে দুখানা করার কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু জিনিসটা ছিল এমন খাপী যে, কিছুতেই ছেঁড়া গেল না...'

'আচ্ছা, ম্যাপে রয়েছে যে, এক কবি, নাম পোলনস্কি—তাঁকে এখানে মাটি দেওয়া হয়। বলতে পারেন তাঁর কবরটা কোথায়?'

'পোলনস্কিকে দেখা যাবে না। তিনি আছেন পাঁচিলের মধ্যে।'

কাজেই পোলনস্কি পড়েছেন নিষিদ্ধ এলাকায়। তাহলে আর দেখবার কী থাকল? চুনসুরকির ভগ্নস্তূপ? রও, রও—সেপাইটা তার বউয়ের দিকে ফিরে কী বলছে শোনো—

'পোলনস্কিকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে না?'

দাওয়ায় ব'সে দাঁত দিয়ে সশব্দে বাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে তার বউ বলল, 'হুঁ, রিয়াজানে।'

যেন খুব একটা মজার ব্যাপার, এমনি ভাব ক'রে সেপাইটি বলল, 'মেয়াদ খাটা হয়ে গেছে—কাজেই রেহাই দিয়েছে..'

অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নেভা নদীর ধারে শহর

আলেকজান্দার সল্‌ঝেৎসিন

সন্ত ইস্তাকের বিজান্তিন রীতির গম্বুজ ঘিরে ঝাড়বাতি হাতে
নতজানু হয়ে আছে দেবদূতের দল। সোনায় মোড়া সরু গম্বুজের মোচার মত
তিনটি চূড়া নেভানদীর এপারে ওপারে আর মোইকায় যেন একটি
আরেকটির প্রতিধ্বনি। যেখানেই মুদ্রারাক্ষস, সেখানেই সর্বত্র নজর রাখছে কিংবা
ঘুমোচ্ছে পাহারাদার সিংহ, নৃসিংহ আর ঈগলসিংহ। রসির কল্পনানিপুণ
বক্রতনু খিলানের মাথায় ষড়শ্ববাহিত রথে টগবগিয়ে
চলেছেন বিজয়লক্ষ্মী। শতসহস্র স্তম্ভে, তিড়িং-লাফানো ঘোড়ায়, টান-টান
হওয়া বৃষস্কন্ধে আরূঢ় অলিন্দের পর অলিন্দ...

কি ভাগ্যিস, এ তল্লাটে নতুন কোনো বাড়ি বানাতে দেওয়া হয় না।
নেভ্‌স্কি প্রস্‌পেক্টে পিটুলির ছিরির মত আকাশ-আঁচড়ানো কোনো বাড়ি
গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়তে পারে না, গ্রিবোয়েদভ ক্যানেলটাকে
মাটি ক'রে দিয়ে কোনো পাঁচতলা জুতোর বাক্স মাথা তুলতে পারে
না। যতই পা-চাটা, যতই অপটু হোক,
এমন কোনো জ্যান্ত বাস্তুকার নেই—যে তার প্রভাব খাটিয়ে কালো নদী বা ওখ্‌তার
এদিকে কোনো জমিতে বাড়ি তুলতে পারে।

আমাদের না হয়েও এ আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরব। আজ
এখানকার সরণিতে সরণিতে যখন আমরা পদচারণা করি, কী যে
আনন্দ হয়। কিন্তু এর সমস্ত সৌন্দর্যই রুশীদের হাতে গড়া—তারা
বিষাদময় জলাভূমিতে পচে মরতে মরতে দাঁত কিড়মিড় করেছে আর শাপান্ত করেছে।
আমাদের পূর্বপুরুষদের অস্থিকঙ্কাল প্রাসাদে প্রাসাদে পিষ্ট, শিলীভূত, একাকার হয়ে
গৈরিক, বৃষ রক্তেরাঙা, পাটালি পিঙ্গল, সবুজে রং মিশিয়েছে।

আমাদের মাথায়-হাত-দেওয়া বিশৃঙ্খল জীবনগুলোর কী হবে?
আমাদের একের পর এক ফেটে-পড়া প্রতিবাদ, ফাঁসি-যাওয়া লোকগুলোর
গোঙানি, মেয়েদের অশ্রুর বন্যা—এ সবের কী হবে? এ সবও কি—ভাবতে ভয় লাগে—
চূড়ান্তভাবে বিস্মৃত হবে? এও কি অমন সর্বাঙ্গসুন্দর, চিরঞ্জীব
রূপলাবণ্যের জন্ম দিতে পারবে?

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেগদেন সায়র

আলেকজান্দার সল্‌ঝেনিৎসিন

এ সায়রের কথা কেউ লেখে না, বলবার সময় কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে
বলে। যেন কোনো প্রেতপুরীতে এসে পড়া গেছে; ভেতরে যাবার সব রাস্তাই বন্ধ।
প্রত্যেকটি পথ আট্‌কে প্রবেশনিষেধের একটি ক'রে চিহ্ন—সপাটে মুখের ওপর
সোজা সটান আড় হয়ে আছে।

ঐ চিহ্নের মুখোমুখি হলে—মানুষ হও, পশুপাখি হও—অমনি পিঠটান দেবে।
মর্ত্যের কোনো জাঁহাবাজ ওখানে ঐ চিহ্নটি লাগিয়েছে;
তার ওপারে গাড়ি ক'রে, পায়ে হেঁটে, বুকে হেঁটে, এমন কি মাথায় ভর দিয়েও কেউ
যেতে পারবে না—খবরদার!

নিশ্চুপ বনস্থলীতে সায়রে যাবার পথের খোঁজে যতই তুমি
চক্কর দাও, পথ তুমি পাবে না; কোনো লোক পাবে না জিগ্যেস করার
—কেননা মানুষে ও-বন মাড়ায় না। ভয় দেখিয়ে তাদের ভাগানো
হয়েছে। ভেতরে গলে যাবার আছে একটাই উপায়: তা হল, বৃষ্টিবাদ্‌লার দিনে কোনো
এক গোধূলিলগ্নে গরুর গলার ঘুন্টির ঠুন ঠুন শব্দ শুনে যদি পিছু নিতে
পারো। দুপাশের গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে যেই তুমি এক ঝলক দেখে
নিলে ঝিকমিক ঝিকমিক ঝিকমিক করছে দূরবিস্তৃত সায়র—বাস্‌, পাড় পর্যন্ত
আর তোমাকে পৌঁছুতে হল না, তৎক্ষণাৎ তুমি জেনে গেলে বাকি জীবনটা
তোমাকে এখানেই ক্রীতদাস হয়ে থেকে যেতে হল।

কম্পাসের জোড়া কাঁটায় বৃত্ত আঁকার মত নিখুঁত
গোলাকার সেগদেন সায়র। এপার থেকে চিৎকার করলে (খবর্দার, চিৎকার করেছ
কি ধরা পড়ে যাবে) ওপারে গিয়ে পৌঁছুবে একটা শুধু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। এপারে
ওপারে দুস্তর দূরত্ব। সায়রের ধার বনে বনে সম্পূর্ণ অন্তরীণ, একটানা সারিবন্ধ
গাছে গাছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বন পেরিয়ে জলের ধারে আসা মাত্র আগাগোড়া
নির্বিঘ্ন ডাঙা দৃষ্টির গোচরে আসবে: এখানে সেখানে একফালি হলুদবর্ণ বালি,
খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে শণের নুড়ো, সবুজে সবুজ হয়ে আছে
ছেঁটে-ফেলা ঘাস জমি। নিথর নিস্তরঙ্গ মসৃণ জল; ডাঙার কাছাকাছি কিছু
শ্যাওলার জটা বাদ দিলে স্বচ্ছ জলের ভেতর ধবধব করে সায়রের তল।

এক লুকোনো জঙ্গলে এক লুকোনো সায়র। মুখ তুলে চেয়ে আছে
জল আর তাকে হেঁট হয়ে দেখছে আকাশ। এই বন পেরিয়ে দুনিয়া
ব'লে কিছু আছে কিনা জানা নেই, দেখা যায় না; যদি থেকেও থাকে,
তবে এ জায়গা সে দুনিয়ার বার।

এ এমন এক জায়গা মানুষ যেখানে চিরটা কাল থেকে
যেতে পারে, যেখানে সে পারে প্রকৃতির সঙ্গে সম্ভাব ক'রে থাকতে আর সেইসঙ্গে
ভাবে মাতোয়ারা হতে।

কিন্তু তা হওয়ার নয়। তেরছা-চোখো এক
দুষ্টু রাজা এই সায়রটাকে নিজের ব'লে দাবি ক'রে বসেছে :
ঐ তার দালানকোঠা, ঐ তার স্নানঘর। তার আলালের দুলালটি
পাজীর পাঝাড়া সে এখানে মাছ ধরে, নৌকোয় ক'রে পানকৌড়ি মেরে
বেড়ায়। সায়রের মাথার ওপর এই দেখা গেল একফালি নীলচে ধোঁয়া,
আর তার ঠিক পরক্ষণেই—গুড়ুম।

বনের পেছনে অনেকখানি তফাতে হাঁইও-হো হেঁইও-হো
ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রামশ্যামযদুমধুর দল। পাছে তারা এখানে
অনধিকার প্রবেশ করে, তার জন্যে এখানে আসবার সব পথে আগল
দেওয়া হয়েছে। মাছপোষা, পাখিপালন—সমস্তই লাগছে ঐ দুরাত্মার ভোগে।
এখানে দুটো একটা দাবানল ঘটানোর চিহ্ন চোখে পড়ে; কিন্তু সে আগুন
নিভিয়ে ফেলে আগওয়ালাকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জনগণমন অধিনায়ক, জনশূন্য সায়র।

জননী আমার, আমার দেশ...

: সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পুরনো বালতি

আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন

হ্যাঁ, কার্টুন অঞ্চলটা বেশ-একটু দমিয়ে দেবার মতই বটে। প্রাক্তন একজন সৈনিক এখানে পাবে কী? এরই মধ্যে আবার এমন একটা জায়গা রয়েছে, আঠারো বছর আগেকার নানা চিহ্ন যেখানে আজও মুছে যায়নি। অংশত ধসে পড়েছে, ওগুলোকে দেখলে এখন ঠিক পরিখার সারি কিংবা কামান বসাবার জায়গা বলে মনে হয় না। খুবসম্ভব অজ্ঞাতপরিচয়, ছেঁড়া কোট পরা, গায়ে-গতরে ভারী একদল পদাতিক রুশ সেনা ওখানে তাদের ঘাঁটি বানিয়েছিল। তারপর বছরের পর বছর কেটেছে, গর্তের ছাতের বর্গা গেছে উড়ে, এখন শুধু গর্তগুলোই চোখে পড়বে।

এখানে আমি লড়িনি। আমি লড়েছিলুম এরই কাছাকাছি আর-একটা জংলা জায়গায়। যাই হোক, ঠিক কী হয়েছিল এখানে, সেটা আন্দাজ করবার জন্যে ঘুরে-ঘুরে একটার-পর-একটা গর্ত আমি দেখতে লাগলুম। আর ঘুরতে-ঘুরতেই একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেলুম একটা পুরনো বালতিতে। আঠারো বছর আগে কেউ এটাকে এখানে ফেলে গিয়েছিল। যখন ফেলেছিল, তখনও এটার মধ্যে বস্তু-বলতে কিছু ছিল না।

তখনও, অর্থাৎ যুদ্ধের সেই প্রথম শীতকালেও, এটা ছিল নেহাতই একটা ভাঙা বালতি। হয়ত কোনো চালাক-চতুর সেনা কোনো ভস্মীভূত গ্রাম থেকে এটিকে কুড়িয়ে এনেছিল, তারপর এর নীচের দিকটাকে দুমড়ে নিয়ে জুড়ে দিয়েছিল টিনের স্টোভের সঙ্গে। রণাঙ্গনের এই এলাকায় অগ্রবর্তী ঘাঁটিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে ঠিক কতদিন সময় লেগেছিল, আমি জানি না। হয়ত নব্বুই দিন। হয়ত দেড় শো দিন। আর তত দিন ধরে, এই গর্তের মধ্যে, ভাঙা এই বালতিটার চোঙার ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়েছে। নিশ্চয় খুব তেতে উঠত এই বালতিটা। তেতে একেবারে আগুন হয়ে উঠত। এর উপরে হাত গরম করে নিত সবাই। কে জানে, গনগনে এই বালতির উপর থেকে সিগারেট ধরিয়ে নেওয়া কিংবা এর সামনে রুটি রেখে টোস্ট্ করে নেওয়াও হয়ত শক্ত ছিল না। কত ধোঁয়া বেরিয়েছে এই বালতির ভিতর দিয়ে? যারা এখানে জমায়েত হয়েছিল, তাদের না-বলা ভাবনা আর না-লেখা চিঠির সমান নিশ্চয়ই। হায়, সে-সব মানুষ কবেই হয়ত মারা গিয়েছে।

তারপর এই উজ্জ্বল সকালে পালটে গেল রণ-কৌশল। পরিত্যক্ত হল এই পরিখাগুলি। অফিসার বললেন, "চলো, এগিয়ে চলো!" জলে ডুবিয়ে, ধুয়েমুছে এই বার্লাতিটিকেও এক আর্দালী তখন হয়ত গাড়ির উপরে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু ভাঙা একটা বার্লাতি, কে তাকে জায়গা দেবে?

সার্জেন্ট-মেজর চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "হটাও ওই নোংরা জিনিসটাকে। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আর-একটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়।"

অনেক দূরে যেতে হবে। এদিকে, শীত কেটে গিয়ে বসন্তের বাতাস বইতেও আর দেরি নেই। ভাঙা বার্লাতি হাতে দাঁড়িয়ে রইল সেই আর্দালী; তারপর, একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে, পরিখায় ঢুকবার পথের ধারে সেটাকে ফেলে দিল।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

তারপর অনেক বছর কেটেছে। পরিখার উপর থেকে কাঠের বর্গাগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে; ভিতরকার বাঙ্কগুলো আর টেবিলও এখন নেই। আছে শুধু সেই ভাঙা বার্লাতিটা। গর্তের ধারে পড়ে আছে।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বার্লাতিটা আমি দেখছিলুম। দেখতে দেখতে আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কী চমৎকার মানুষ ছিল তারা। যুদ্ধের সময়কার সেই বন্ধুরা। আমাদের সেই প্রাণশক্তি, যা আমাদের ভেঙে পড়তে দেয়নি, আমাদের সেই আশা, আমাদের সেই নিঃস্বার্থ বন্ধুতা—সবই যেন ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল। আর কখনও কোনো কাজে লাগবে না ওই মরচে-পড়া, ভুলে-যাওয়া...

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কোলখোজ ঝুড়ি

আলেকজান্দার সলঝেৎসিন

শহরতলির বাসে যখন উঠবেন, তখন আপনার বুকে কিংবা পিঠে যদি ওই ঝুড়ির শক্ত কানার খোঁচা লাগে, তা হলে গালমন্দ করবেন না; বরং চওড়া, ক্ষয়ে-যাওয়া ক্যানভাসের স্ট্র্যাপের উপরে বসানো, পাকানো খড় দিয়ে বোনা ওই ঝুড়িটাকে বেশ ভাল করে একবার লক্ষ্য করুন। যার ঝুড়ি, সেই স্ত্রীলোকটি ওর মধ্যে তার নিজের আর দুই প্রতিবেশীর বাড়ির দুধ, ঘরে-তৈরী পনির আর টোমাটো নিয়ে শহরে চলেছে। ওর বদলে সে কুড়িখানা রুটি নিয়ে বাড়ি ফিরবে। দুটি পরিবারের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

চাষীর ঘরের মেয়ের ওই ঝুড়িটা বেশ শক্তপোক্ত। ওর মধ্যে জিনিসপত্র আঁটে প্রচুর। তা ছাড়া শস্তাও বটে। রঙচঙে আরও পাঁচ-রকমের ঝোলা আর ঝুড়ি তো আমরা দেখতে পাই। তাদের মধ্যে ছোট-ছোট সব পকেট থাকে; বকলসও খুব ঝকঝকে। কিন্তু সে-সব বস্তুর সঙ্গে ওর কোনও তুলনা চলে না। এত সব জিনিস এঁটে যায় ওই ঝুড়ির মধ্যে যে, বালাপোষের ভিতর দিয়ে টানা স্ট্র্যাপে যখন টান পড়ে, ওজনের ঠেলায় জোয়ান-মদ্দ চাষীর পিঠও তখন বেঁকে যাবার উপক্রম হয়।

চাষী-ঘরের মেয়েরা তাই একটা কৌশল করে। ঝুড়িটাকে পিঠের উপরে ঝুলিয়ে, তার স্ট্র্যাপটাকে ঠিক লাগামের মতো করে ওরা মাথার উপরে বসিয়ে নেয়। ওজনটা যাতে বুক আর পিঠের উপরে একেবারে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়।

লেখক-বন্ধুরা, এমন প্রস্তাব আমি করছি না যে, আপনারাও ওই রকমের এক-একটা ঝুড়ির ভার সামলান। আমার বলবার কথাটা শুধু এই যে, ঝুড়ির খোঁচা খেতে নেহাতই যদি খারাপ লাগে, তা হলে বরং একটা কাজ করুন, বাস্ থেকে নেমে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ুন।

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আগুন আর পিঁপড়ে

আলেকজান্দার সল্‌ঝেৎসিন

আগুনের মধ্যে আমি একটা চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে দিলুম। পচা, ফোঁপরা কাঠ; তাতে যে পিঁপড়ে লেগেছে, তা আমি খেয়াল করে দেখিনি।

কাঠ যখন পুড়তে থাকে, তখন তার একটা শব্দ হয় তো, সেই শব্দ উঠতেই পিঁপড়েরা অমনি পিলপিল করে কাঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, আর মরিয়া হয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটতে লাগল। ক্রমে তারা এগিয়ে এল চ্যালাকাঠের ডগার দিকে। দেখলুম, তাদের গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছে, তারা ছটফট করছে। কাঠখানাকে ধরে তখন একদিকে পাশ ফিরিয়ে দিলুম। তার ফলে অনেকগুলো পিঁপড়ে যেমন বালির উপরে পালিয়ে আসতে পারল, অনেকগুলো তেমনি পালাতে পারল পাইন-পাতার মধ্যে।

কিন্তু, আশ্চর্য, আগুনের কাছ থেকে শেষপর্যন্ত তারা পালাল না।

ভয় কাটতেই ফিরে দাঁড়াল তারা, গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। মনে হল, যেন কোনও শক্তি আবার পরিত্যক্ত সেই চ্যালাকাঠের আশ্রয়ের দিকেই তাদের টেনে আনছে। তাদের মধ্যে অনেকে সেই জ্বলন্ত কাঠের উপরে উঠে পড়ল। তারই উপরে ঘুরতে লাগল। তারপর পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অনুবাদ : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

দুটি প্রতিষ্ঠান ও গত শতকের হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবী

সুবীর রায়চৌধুরী

কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বর্ষা ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) আনোয়ার পাশা 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে বাঙলার নবজাগরণে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ভূমিকা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অভিনব। লেখকের সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হলেও এবং তাঁর দু-একটি তথ্য বিষয়ে আপত্তি থাকলেও এই প্রবন্ধের প্রধান প্রেরণা আনোয়ার পাশার রচনাটি। আমার ধারণা এ-জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করলে গত শতকের শিক্ষিত হিন্দু এবং শিক্ষিত মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। অবশ্য আনোয়ার পাশা তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) ও 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শগত ভিন্নতা, মানসিক পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণে অধিকতর আগ্রহী। কিন্তু পাশা-র বক্তব্যের আলোচনার আগে এই দুটি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩ খ্রী) ছিলেন এদেশীয় মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম পথিকৃৎ। মক্কার খালেদ-এর উত্তরপুরুষ শাহ্ আজিমুদ্দীন ভারতবর্ষে আসেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁর পুত্র আবদার রসুল দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে জায়গিরদারি পেয়ে পূর্ব বাঙলার ফরিদপুরে বসতি স্থাপন করেন। সেই বংশেই আবদুল লতিফের জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষের বিস্তৃত পরিচয় দেবার কারণ এই যে পরবর্তীকালে নবাব আবদুল লতিফ এদেশের নিম্ন শ্রেণীর এবং উচ্চবর্ণের মুসলমানদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দুটি ভাষার প্রস্তাব করেছিলেন, একটি হল আরবি-ফারশি-বহুল বাঙলা, অন্যটি উর্দু। জাতি হিসেবে উচ্চবর্ণের মুসলমানেরা যে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের চেয়ে স্বতন্ত্র একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। যাই হোক, আবদুল লতিফের পিতা কর্মসূত্রে কলকাতায় চলে আসেন এবং আবদুল লতিফেরও কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে কলকাতায়।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় তখন ইংরেজি প্রবর্তিত হলেও মুসলমানেরা একে বর্জন করে চলতেন। কিন্তু আবদুল লতিফ স্বধর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরেজি শেখেন এবং মাত্র একুশ বছর বয়েসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট রূপেও সুনাম অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের পরিচয় তাঁর লেখা "এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ" (১৮৮৫) বইতে পাওয়া যাবে।

শুধু ইংরেজ মহল বা মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিলো। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, 'সাধারণের ধারণা স্যার সৈয়দ আহ্মদই সর্ব-প্রথমে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ইংরেজী শিক্ষা

বিস্তারের প্রস্তাবও তৎকর্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। এ ধারণার মূলে কিন্তু সত্য আদবে নাই। আবদুল লতিফই সমাজবিজ্ঞান সভায় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত, নানা যুক্তিপ্রমাণ সহকারে ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে [একটি]...প্রবন্ধে দেখাইয়া দিলেন' [বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, বঙ্গসংস্কৃতির কথা, পৃ ১৩৩]। আবদুল লতিফ বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সম্পাদক ছিলেন, বেথুন সভার সদস্য ছিলেন। এদেশে প্রথম নিয়মিত আদমশুমারির (১৮৬৫) সূচনার সময় তিনি এর আবশ্যকতা বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করবার জন্য বিভিন্ন সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। রমাপ্রসাদ রায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন তার প্রমাণ আছে। মধুসূদন ২৭ মে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন:

'দুজন মুসলমান ভদ্রলোককে বিশেষ করে আমার পুরনো বন্ধু আবদুল লতিফকে আমার সেলাম জানিও। লোকটি বেশ চালাক, তাই না? ওকি মদ-টদ টানা কিংবা শুয়োর খাওয়া শিখেছে না কি বিসমিল্লা ধরনেরই রয়ে গেছে? ফিরিঙ্গি শিক্ষার ফলে এসব কিছু কি রপ্ত করতে পেরেছে?'

রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সম্ভবত জাহানাবাদের (বর্তমান আরামবাগ) ডেপুটি কলেক্টর থাকার সময়ে। আবদুল লতিফ খান ঐ অঞ্চলের ডেপুটি কলেক্টর থাকাকালে যে রকম দুঃসাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে ও-অঞ্চলের ডাকাতের উপদ্রব দমন করেছিলেন তাতে স্থানীয় জমিদার রমাপ্রসাদ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে একটি মানপত্র প্রদান করেন।

আবদুল লতিফ ছিলেন অনুগত বৃটিশ প্রজা ও রাজকর্মচারী, মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতৈষী এবং হিন্দুসমাজে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ভারতবর্ষে ওহাবি আন্দোলনের প্রসারে ইংরেজ-মুসলমানের সম্পর্কে ক্রমশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো। তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের পরে এই বিরূপতা প্রবল হয়। আবদুল লতিফ তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দূর করবার জন্য সবসময়ে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি-র সভায় কেরামত আলিকে দিয়ে ফতোয়া লেখান (১৮৭০ খ্রী) যে ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' (ইসলাম বিরোধী) নয়, 'দারুল ইসলাম'—সুতরাং এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অনুচিত। এই ফতোয়া আরবি ভাষায় প্রদত্ত হয়। পরে ইংরেজি এবং উর্দুতেও অনুবাদ করা হয়েছিলো। এই ফতোয়ার পাঁচ হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বিষয়ে আবদুল লতিফ খান লিখেছেন : Being fully aware of the prejudice and exclusiveness of the Mahomedan Community, and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and *Hindoo Society*, I founded the Mahomedan Literary Society in April 1863, which, by its Meetings, Lectures and Annual Conversaziones, held at the Town Hall, has done a great deal to quicken the Mahomedan intellect and lead it in the path of advancement, besides constituting a consultative body for advising government on all occasions wherein Mohamedan interests may be concerned. (*A Short Account Of My Public Life*)

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি যে কয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলো, তা হলো:

১। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে সচেতন করা এবং বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি।

২। ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু তার জন্য ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করা চলবে না। বরং ইসলামি স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সরকার এবং সাধারণকে সব সময়ে সচেতন রাখতে হবে।

৩। ইসলামি ঐতিহ্য বজায় রেখে শুধু ইংরেজদের মধ্যে নয়, হিন্দুদের সঙ্গেও সৌহার্দ্য রক্ষা প্রয়োজন।

৪। বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে টাউন হলে নিয়মিত 'conversazione' ('সোমপ্রকাশ'-এর ভাষায় 'সামাজিক মজলিশ') বা আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা। এই আলোচনা সভার ভাষা ছিলো ইংরেজি কিংবা উর্দু, কখনো ফারশি কিংবা আরবি; কিন্তু বাঙলা নয়। তবে কাজী আবদুল ওদুদ-এর "বাংলার জাগরণ" (১৯৫৬) বইতে আছে, 'শোনা যায়...মুসলিম লিটর্যারী সোসাইটিতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাংলার চর্চাও হতো'। আনোয়ার পাশা-র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কিন্তু স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'স্থান ছিল না কেবল বাংলার'।

এই সোসাইটির বছরের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ 'ভারতে দেশপ্রেম ও জ্ঞানোন্নয়নের প্রয়োজন' বিষয়ে ফারশি ভাষায় বক্তৃতা করেন। নবাব আবদুল লতিফ-এর মতে, স্যর সৈয়দের অনুবাদ সমাজের গোড়াপত্তন এইখানে।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির সভ্যসংখ্যা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পাঁচশোরও অধিক ব'লে দাবি করা হয়েছিলো। প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকতেন বাংলার ছোটোলাট। যোগেশচন্দ্র বাগল এদেশে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে আবদুল লতিফ-এর প্রচেষ্টা স্যর সৈয়দ-এর পূর্ববর্তী ব'লে মনে করেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই আন্দোলনে বাংলাদেশের নবাব আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রী) ভূমিকা স্যর সৈয়দ-এর আলীগড় আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বা দূরপ্রসারী ব'লে মনে করেন না। আনোয়ার পাশা তাঁর প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কাজী আবদুল মান্নান-এর মত উদ্ধৃত করেছেন। মান্নান-এর মতে, 'আবদুল লতিফ ও তাঁর সোসাইটির আন্দোলন মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরে কিছু আশার সঞ্চার করেছিলো। তবে সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে এ'রা বিশেষ কোনো যোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। সামাজিক সমস্যার একটি বিশেষ দিকেই এ'দের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টাই তাঁরা করেছিলেন।...সাধারণ মুসলমান বা তাদের ভাষা বাংলার জন্য এ'দের কোনো দুর্ভাবনা ছিলো না'। বদরুদ্দীন উমরও তাঁর "পূর্ববাংলার সংস্কৃতি" (১৯৭১) বইতে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। রফিক জ্যাকেরিয়া তাঁর "রাইজ অব মুসলিম্‌স ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্‌স" (১৯৭০) গ্রন্থে লিখেছেন: তাঁরা (আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী) সভা-সমিতি করতেন, বক্তৃতা দিতেন, ইস্তাহার ছাপতেন কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুগামী তৈরি ক'রে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। তাঁদের [প্রচেষ্টা] হলো অনেকটা ওলন্দাজ সেনাবাহিনীর মতো— সবাই সেনাপতি, কোনো সৈন্য নেই' (পৃ ৩৩৮)।

সে যাই হোক, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি যদিও ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে

প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার দশ বছর আগে থেকে নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে স্বধর্মীদের সচেতন করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের উপকার' বিষয়ে ফারসি ভাষায় একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একশো টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। নবাব আবদুল লতিফ-এর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, এই প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা, বিহার, বোম্বাই থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সপক্ষে লেখা বোম্বাই থেকে জনৈক প্রতিযোগীর রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহর্স্টকে লেখা রাজা রামমোহনের ঐতিহাসিক পত্রের সঙ্গে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আবদুল লতিফ-এর শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে প্রস্তাবের তুলনা করলে শেষোক্ত ব্যক্তির সংকীর্ণতা চোখে পড়বে সন্দেহ নেই। রামমোহন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজন শুধু বৈষয়িক কারণে অনুভব করেন নি, জাতির সর্বাঙ্গীণ 'আধুনিকীকরণে'র তাগিদে তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। উদার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তিনি স্বয়ং বৈদান্তিক হয়েও বেদান্তচর্চার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে-যুগের হিন্দুসমাজে রামমোহন ব্যতিক্রম। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের ও পরবর্তীকালের হিন্দু শিক্ষাবিদদের মতামত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো তাঁদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বর্জন ক'রে শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। নবাব আবদুল লতিফও অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মীয় আদর্শ বজায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর সংখ্যার 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ নবাব আবদুল লতিফ-এর এই মত উদ্ধৃত হয়েছে:

"The fruits of English Education will show off to the best advantage, in conjunction with scholarship in the Mahomedan Classics. Unless a Mahomedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mahomedan Society. . . Consequently, a Mahomedan who has received an English Education, and has omitted the study of the Persian and Arabic, is little able to impart the benefit of that education to the members of his community,. . . But, if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires influence in society, and is, of course, sure to use his influence in the interest of the Government."

এই সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীলতা কি হিন্দুদের মধ্যেও ছিলো না?—হিন্দু কলেজ, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ, হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মূলে কোন্ প্রেরণা কাজ করছিলো? বারাঙ্গনা হীরা বুলবুলের ছেলে হিন্দু কলেজে ভর্তি হ'তে চাইলে তৎকালীন হিন্দুসমাজ আপত্তি করলেন এই মর্মে যে: 'হিন্দু কলেজের হিন্দুত্ব আর রক্ষা হয় না'। 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' খোলার সপক্ষে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ বঙ্গাব্দের "সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো:

'হিন্দু প্রজাদিগের ইংরাজী বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত হিন্দু মহাশয়েরা প্রথমতঃ এই মহানগর কলিকাতায় হিন্দু কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।...পরে গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে হিন্দু মেনেজারগণের সকল ক্ষমতা অপহরণ করিয়া হিন্দু কালেজে যবনাদি সকল বর্ণকে

নিবদ্ধ করিবার নিয়ম করাতেই হিন্দুরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া আপনাপন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ সংস্থাপন করিয়াছেন,...বালকদিগের কোমলান্তঃকরণে বিধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা কোন প্রকার বিরূপ ভাব উদয় না হয়, যবনাদি বহুবর্ণের সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক উপদেশ গ্রহণ না করিতে হয় ইত্যাদি অভিপ্রায়েই হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ খোলা হইয়াছে...' [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, পৃ. ৭৬৮-৮]

ঠিক একই প্রেরণায় হাজী মহম্মদ মহসীন (১৭৩০-১৮১২ খ্রী) প্রদত্ত ইসলামি শিক্ষা-তহবিলের টাকা যখন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হুগলি কলেজের জন্য খরচ হতো, তখন নবাব আবদুল লতিফ আন্দোলন ক'রে তা বন্ধ করেন (১৮৬১ খ্রী)। এর ফলে হুগলি কলেজের বায়বরাদ্দ থেকে মহসীন তহবিলের টাকা আলাদা ক'রে ঐ টাকায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহীতে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত টাকায় সব সম্প্রদায়ের ছাত্র পড়ে এমন কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়।

নবাব আবদুল লতিফ-এর মাদ্রাসা শিক্ষা সংরক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আনোয়ার পাশা বলেছেন এ হচ্ছে, 'মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বজায় রেখে আধুনিকতার সঙ্গে সামান্য সন্ধি স্থাপন'। কিন্তু গত শতকের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বহু হিন্দু নেতাও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত নন। সেজন্য তিনি যতো সহজে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার কালে হিন্দুদের মোহমুক্তি শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে মনে ক'রেছেন, বাস্তবে এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেক স্ববিরোধ ও বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজপ্রীতি, মুখে মাতৃভাষার জয়গান করলেও ইংরেজিপ্রীতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা হিন্দুদের মধ্যেও যথেষ্ট ছিলো। হিন্দুমেলার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন না।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে নবাব আবদুল লতিফ শুধু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নয়, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, বেথুন সোসাইটি, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

তাছাড়া সিপাহিবিদ্রোহ জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনায় নবাব আবদুল লতিফের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ শিক্ষিত হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পার্থক্য ছিলো না। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বৃটিশের সমর্থক ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র মধ্যে বাঙালির শৌর্য-বীর্যের দৃষ্টান্ত সংগ্রহের মধ্যে বিশেষভাবে জোর দেন সেই সময়ের 'celebrated "fighting Moonsiff" who figured in the late Sepoy Rebellion on behalf of the English.'

সিপাহিবিদ্রোহের সময় রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর সহকর্মীরা কী করতেন তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ আছে 'আত্মচরিত' বইতে: 'আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিলো। কোন পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল।'

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ্ নামে আততায়ীর হাতে নিহত হন বিচারপতি জে. পি. নরম্যান। এর কিছুদিন পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি শের আলি

খান-এর হাতে নিহত হন বড়োলাট বাহাদুর লর্ড মেয়ো। এই দুটি হত্যাকাণ্ডেরই তীব্র প্রতিবাদ ক'রে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি-র সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দুমেলারও ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষ দিন লর্ড মেয়োর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং 'সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলা-ক্ষেত্রে লর্ড মেয়োর অপঘাত মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন' (যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, ২য় সংস্করণ, পৃ ২৯)।

আনোয়ার পাশা-র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার আপত্তি তিনি সামগ্রিকভাবে আবদুল লতিফ-এর কার্যাবলির মূল্যায়ন করেন নি। যেমন আবদুল লতিফ-এর আরবি-ফারশি চর্চার মধ্যে কিছুটা অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিলো। রাতারাতি সমগ্র দেশবাসীকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় না, এমনকি দুশো বছরেও যে পারা যায় না তার প্রমাণ তো আমরাই। যতোদিন পর্যন্ত ফারশি আদালতের ভাষা ছিলো (১৮৩৬ খ্রী), ততোদিন পর্যন্ত কতকগুলি বৃত্তিতে যেমন কাজীর পদ, ওকালতি-মোক্তারি, মুনশিগিরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু আদালতে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং নবাবি আইনের বদলে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রবর্তনের ফলে বহু মুসলমান বেকার হলেন। তার ওপর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনের বলে কাজীর পদ একেবারে তুলে দেওয়া হলো। তখন নবাব আবদুল লতিফ সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন করলেন যে, অন্তত মুসলমান বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধনের ব্যাপারে এই পদ যেন বহাল রাখা হয়। তাঁরই উৎসাহে সরকার শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। না হলে আরো অনেকে বৃত্তিচ্যুত হতেন সন্দেহ নেই।

আবদুল লতিফ-এর বাংলা ভাষা বিষয়ে মতটি অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম দৃষ্টান্ত। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মাতৃভাষা বিষয়ে বক্তব্য ও ব্যবহারে অনেক বৈপরীত্য ছিলো এবং সেকথা হিন্দুমেলা-র উদ্যোক্তাদের জীবন পর্যালোচনা করলেও পাওয়া যাবে। কিন্তু নীতি-গতভাবে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে এটা সবাই অল্প-বিস্তর স্বীকার করতেন। দু-একজন ব্যতিক্রম থাকলেও তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি দাবি করতেন যে কুলীন ব্রাহ্মণ-দের মাতৃভাষা সংস্কৃত আর অন্যান্যদের বাংলা। কিন্তু আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যেও দুটি ভাগ ক'রে গেছেন: একটি হলো ভারতের বাইরে থেকে আগত এদেশে বসবাসকারী মুসলমান; দ্বিতীয়টি হলো অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মুসলমান। তাঁর বক্তব্য:

'...my opinion as regards Bengal is that Primary Instruction for the lower classes of the people, *who for the most part are ethnically allied to the Hindoos,* should be in the Bengali language—purified, however, from the superstructure of Sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the numerous words of Arabic and Persian origin which are current in everyday speech; for this the Bengali of the Law-Courts furnishes a good example.

For the middle and the upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recognized as the Vernacular. That is the language which they use in their own Society in the town and country alike and no Mahomedan would be received in respectable Society amongst his own co-religionists if he were not acquainted with Urdoo. *The middle and upper*

classes of Mahomedans are descended from the original conquerors of Bengal, or the piosu, the learned and the brave men, who were attracted from Arabia, Persia and Central Asia to the service of the Mahomedan Rulers of Bengal....'

নবাব আবদুল লতিফ-এর এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বোধহয় তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো প্রভাব রাখতে পারেননি। যে-ওহাবি আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন, কয়েকটি ব্যাপারে তার চেয়েও রক্ষণশীল মন যে তাঁর ভেতরে-ভেতরে (ওহাবিরা অন্তত ইসলামধর্মীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করেনি) কাজ করছিলো তা তিনি হয়তো নিজেই জানতেন না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে শুধু এ ধরনের অভিমানের জন্য নবাব আবদুল লতিফ-এর অন্যান্য প্রগতিশীল ভূমিকা অস্বীকার করা অনৈতিহাসিক। তাহ'লে উনিশ শতকের নবজাগরণে অনেক মনীষীর কৃতিত্বই ভুলে যেতে হয়। তাছাড়া বৈপরীত্য কি হিন্দুমেলা-র প্রাণ 'জাগ্রত জাতীয়' নবগোপাল মিত্রের মধ্যেও ছিলো না?

আনোয়ার পাশা হিন্দু মেলা-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই সভার বৃটিশ শাসন সম্পর্কে মোহমুক্তি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের সূচনার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি শ্রীনেপাল মজুমদারের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, 'হিন্দু মেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে পারে নাই। বস্তুত হিন্দু মেলার সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইতে শুরু করে।' কথাটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে। কেননা হিন্দুমেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্যক্তিদের কর্মধারা পর্যালোচনা করলে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া দুরূহ। বস্তুত কয়েক বছর বাদে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' হিন্দু-মুসলমানকে এক করে আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলো, তখন হিন্দু মেলার অনেক কর্মীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় মেলা বলতে হিন্দুমেলার ধারণার মধ্যে নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা আছে, কিন্তু সেযুগে হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এমন তীব্র ছিলো যে নামে জাতীয় হলেও দু-সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দই গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা ভাবতেন। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তাঁর শৈশবে কোনো সাম্প্রদায়িকতা তিনি দেখেননি। অথচ পরবর্তীকালে তাঁর পক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করা সবসময়ে সম্ভব হয়নি। এই আমীর আলী কংগ্রেস প্রস্তাবিত এদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। কেননা তাঁর আশংকা ছিলো চাকরির ক্ষেত্রে তাহলে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হিন্দুদের আধিপত্য আরো বেড়ে যাবে।

হিন্দুমেলা এবং হিন্দুসভাকে এক করে দেখার মধ্যে ঐতিহাসিক বিকৃতি আছে। এ-বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল-এর অভিমত হলো:

'আজিকালি আমরা স্বাদেশিকতা বলিতে কেবল হিন্দুয়ানী বুঝি না। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ ভাবটা ফুটিয়া উঠে নাই। এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতির এদেশের উপর কোনও বিশেষ

দাওয়াদাবী আছে, ইহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনে উদয় হয় নাই।...আর এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহবিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। ...ইংরাজেরা এদেশে যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করেন, তাহারই ফলে আমরা বহু শতাব্দীর ঘোর নিদ্রার অবসানে আধুনিক চিন্তা ও কর্মজগতে জাগিয়া উঠিয়াছি' ["হিন্দু-মেলা ও নবগোপাল মিত্র," নবযুগের বাংলা, পৃ ১৪০-১]

বিপিনচন্দ্র পালের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সত্যি-সত্যি সাম্প্রদায়িক হতো, তাহলে পরবর্তীকালে নিজেই একে 'সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা' বলে অভিহিত করতে পারতেন না। তাছাড়া সেযুগেও দু-একজন জাতীয় সভার 'হিন্দুমেলা' নামকরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। তার প্রমাণ যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত" (২য় সংস্করণ) বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, আনোয়ার পাশা লিখেছেন, 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিতে হিন্দুরাও যোগদান করতে পারতেন এবং করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।* কিন্তু হিন্দুমেলায় কোনো মুসলমান বা মুসলমানের কোনো কিছু কখনোই স্থান পায়নি।' এছাড়া অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'হিন্দুমেলা ছিল মূলতঃই বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। সেখানে অবাঙালী হিন্দুদের কোনো ভূমিকা দেখিনে।'

হিন্দুমেলায় মুসলমানেরা যোগ দিতে পারতেন না একথা ঠিক নয়। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫ খ্রী) সঙ্গীতশিল্পী মৌলাবক্স-এর যোগদান করার সংবাদ পাচ্ছি। তিনি সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য একটি সুবর্ণপদকও পেয়েছিলেন। মৌলাবক্স শুধু মুসলমান নন, অবাঙালি। তাছাড়া চতুর্থ অধিবেশনে (১৮৭০ খ্রী) 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বিবরণ অনুযায়ী "মেলাস্থলে উক্ত দুই দিবসই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙালী হিন্দুস্থানী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক একত্রিত হইয়াছিল"।

হিন্দুমেলায় অবাঙালি হিন্দুর যোগদান প্রসঙ্গে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অধিবেশনে 'বিদুষী পণ্ডিত রমাবাঈয়ের বক্তৃতা'র উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া বাঙালি বনাম পাঞ্জাবি মল্লদের কুস্তি-প্রতিযোগিতার বিবরণও পাই। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মেলার প্রদর্শনীতে বারাণসী কাপড়ও ছিল। এই বছরই দিল্লি থেকে একজন স্ত্রীলোক প্রদর্শনীর জন্য সাচ্চা কাজ ও বস্ত্রাদি পাঠিয়েছিলেন। আসলে হিন্দুমেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুদ্ধিজীবীদের দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি সচেতন করে তোলায়। সেজন্য দেখতে পাই, দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি রচনায় তাঁরা উৎসাহ প্রদর্শন করছেন, স্বদেশী কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, স্বদেশের ইতিহাস-ভূগোল রচনায় আগ্রহ বোধ করছেন (ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অঙ্কিত বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার মানচিত্র প্রদর্শিত হয়।)। আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে এসব সভায় অনেক মহিলাও অংশগ্রহণ করতেন।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটিরও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো ইতিহাস-বিজ্ঞানের চর্চা।

---

* টাউন হলে অনুষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির ইতিহাস বা বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তাদের মধ্যে যেসব হিন্দুদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন: ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায়, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মিস্টার জে. (জগদীশ) সি. (চন্দ্র) বোস, বাবু প্রিয়লাল দে প্রমুখ।

কিন্তু নবাব আবদুল লতিফ বাঙলা ভাষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলে হিন্দুমেলা-র মতো তাঁর সোসাইটির প্রভাব এতো ব্যাপক হয়নি। তবে এ-ও মনে রাখতে হবে যে সাধারণের কাছে মেলার আবেদন যতো বেশি, একটি আলোচনাচক্রের এতোটা হ'তে পারে না। মেলায় যাঁরাই যেতেন, তাঁরাই যে খুব স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, এমন মনে করবার কারণ নেই। কেননা "অমৃতবাজার পত্রিকা" তো একবার স্পষ্টই সমালোচনা করেছিলো যে, 'এটি ক্রমে ইংরাজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফিয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে'। আসলে হঠাৎ শুনলে আপত্তিকর মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বৃটিশ শাসনপ্রীতি ও ইংরেজদের প্রতি অনুরাগে নবাব আবদুল লতিফ ও 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাছাড়া নবগোপাল মিত্রদের বঙ্গভাষাপ্রীতি কতটা খাঁটি, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নবগোপালের স্বাদেশিকতার মধ্যে অনেক সময়ে ইংরেজদের কাছে বাহবা পাবার প্রত্যাশা ছিল। ভুল ইংরেজিতে হলেও নবগোপাল ইংরেজিতেই পত্রিকা প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন, বাঙলাতে নয়। রাজনারায়ণ বসুর 'A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' ইংরেজিতেই প্রথম লিখিত হয়। তিনি বাঙলা মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনাও প্রথমে ইংরেজিতেই করেছিলেন। এই বৈপরীত্যের কথাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব সুন্দরভাবে বলেছেন: 'দেখ একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism-এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন Patriot, আমিও সেইরকম Patriot হব -এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল।...নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগা-গোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত।...একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, দেশী painting দেখাইতে পার'? সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম -'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করিয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ'? ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তার ঝোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া-কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম। সে বড় বড় ইংরাজ কর্মচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব যাওয়াআসা করিতে পারিত।' "পুরাতন প্রসঙ্গ", বিপিনবিহারী গুপ্ত, নতুন সং, পৃ ২৯৮।]

আনোয়ার পাশা যেটা লক্ষ করেননি সেটা হলো হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মুসলমান সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য নয়, ভাবের ঘরে চুরি। সেজন্য ন্যাশনাল নবগোপাল আয়োজিত হিন্দুমেলার 'গৃহপ্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্তৃক পারিস-কর্দমে নির্মিত অভিষেক বেশধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্তি সন্নিহিত ছিল'।

হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানে গীত ও পঠিত গান-কবিতা নিয়ে পরবর্তী যুগে অনেক উচ্ছ্বাস করা হয়েছে। কিন্তু সেসব হ'ল উত্তরকালের অতিরঞ্জন। বস্তুত হিন্দুমেলা-য় বক্তৃতাদিতে 'স্বাধীনতা' শব্দটি প্রায় জুজুর ভয়ের মতো উচ্চারিত হয়েছে। মনোমোহন বসুর বক্তৃতা থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

'আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তাদ্বিনিময়ে ঐকানামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ

স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত বক্তবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলী মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না'! (হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃ ১০-১১)।

এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিলো দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। পাঁচ বছর বাদে একই ভাষায় মনোমোহন বসুকে বক্তৃতা করতে দেখি:

'বাঙ্গালাদেশে দৈহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাব উদয় হইতেছে, যেন জ্ঞান নামক পুরুষ বিদ্যা নাম্নী রমণীর সহযোগে একটি অপূর্ব কন্যার উৎপাদন করিলেন। সে কন্যার নাম যুক্তি। যুক্তি দিন দিন বর্ধিতা ও বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতা সুপাত্রের অভাবে মহা উদ্বিগ্ন। এমন সময় ব্যায়ামের বংশধর সাহস নামা সুপাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাহাকে ঐরূপ গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই পবিত্র বিবাহ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে, "স্বাধীনতা" নাম্নী সুর-মনোমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন'। [ঐ পৃ ৭৪-৫]

'ম্যাট্‌সিনি-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ' তৎকালীন নবযুবকদের এই জাতীয় বক্তৃতায় কী রকম প্রতিক্রিয়া হতো আজ আর জানবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে ঠাকুর-বাড়িতে স্বাদেশিকের সভা বিষয়ে যা বলেছেন, মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদি সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে: 'আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না'।

মোটকথা সেযুগে আমাদের শিক্ষা, সামাজিক, 'রাজনৈতিক' আন্দোলনে সাহেবদের ছাড়া ভাবতে পারতাম না। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ করলে সাহেবকেই অধ্যক্ষ করতে হয়, আলিগড় আন্দোলনেও সাহেব ছিলেন। এমনকি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য "পুরাতন প্রসঙ্গে" লিখেছেন, 'যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট অত খাতির পাইয়াছিলেন। সাহেবদের নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙালি মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না'।

কৃষ্ণকমলের এই মত নেহাৎ ব্যক্তিগত বলে মনে করা যায় না। কারণ সিপাহি-বিদ্রোহের পরেও সেযুগের পত্র-পত্রিকায় বৃটিশ শাসন সম্পর্কে যেরকম প্রশস্তি লক্ষ করি তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয়। যেমন 'সোমপ্রকাশ' ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২৮ সংখ্যায় লিখছেন:

'হিন্দু ও কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীতে এমত লোক বা জাতি আর নাই, যাঁহারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ন্যায় দেশ শাসন করিতে পারেন'।

অনেক সময় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কারা বেশি রাজভক্ত তা নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে যেতো। পূর্বোক্ত পত্রিকায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৭ পৌষ সম্পাদকীয়তে অভিযোগ করা হয় এই মর্মে:

'আমাদের ন্যায় রাজভক্ত জাতিকে রাজদ্রোহী বলিতে অনেকের অভ্যাস জন্মিয়াছে।

আমীর আলি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে সেই নিন্দুক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই'। [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ, পৃ ৪৭৪]

অনেক নেতা ও ঐতিহাসিক পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বলেছেন যে ন্যাশনাল নবগোপালকে আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ এতো অস্পষ্ট এবং অমূল তরুর মতো ছিলো যে 'ন্যাশনাল' নামের তাৎপর্য তিনি বৃহত্তর জাতির চেতনায় সঞ্চারিত করতে পারেননি। কেননা এবিষয়ে তাঁর নিজেরই কোনো স্থির ধারণা ছিলো না। সেজন্য জাতীয় মেলার দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর ন্যাশনাল পেপার-এ (১৮৬৮ খ্রী) লেখা হলো:

'We despise race distinctions. It should be our object to raise up a vast nationality in India composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mahomedan governed by one interest, and one faith viz.—faith in the supremacy of human love and charity'. [শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪, পৃ ১০১]

চার বছর বাদে একই পত্রে লেখা হয়েছিলো : 'We do not understand why our correspondent takes exception to the Hindoos who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a National Society'. [৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২]

আনোয়ার পাশা 'হিন্দুমেলা'র নামকরণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক দ্রুত সামান্যীকরণে এসেছেন। হিন্দুমেলা-র মধ্যে একটিও ইংরেজি কথা নেই সত্য, কিন্তু এর ইংরেজি নামও ছিলো। তাছাড়া হিন্দুমেলার কর্মসূচি দেখলে বোঝা যায় যে তাঁদের সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য যতোটা স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ততোটা নয়। বরং মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি নামে সাহিত্যসভা হলেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েছে। যেমন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি'কে প্রতিনিধি পাঠাতে বললে নবাব আবদুল লতিফ অস্বীকার করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে দেখতে পাই এই সোসাইটি বৃটিশ সরকারকে সমর্থন করছেন। তখন অবশ্য নবাব আবদুল লতিফ বেঁচে নেই।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সূত্রপাত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে। বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ভেদনীতি হিশেবে ব্যবহার করেছে অনেক পরে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, শত্রুকে জয় করবার চারটি পথ আছে: সাম-দান-ভেদ-দণ্ড। তেমনি ভারতের হিন্দু-মুসলমান বিষয়ে বৃটিশনীতিরও চারটে স্তর আছে। প্রথম পর্বে সাম বা সন্ধির মতো ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি। এই কারণে খ্রীষ্টান মিশনারি সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোম্পানির আমলাদের এতো বিরূপতা ছিলো। দ্বিতীয় পর্বে দান অর্থে বলা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা দান। উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তখন মুসলমান সম্প্রদায় নানা কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুকূল ছিলেন না। ফলে চাকরি এবং অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেক এগিয়ে গেলেন। শ্রীপ্রদীপ সিংহ তাঁর 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল: অ্যাসপেক্টস অব সোশাল হিস্টি' (১৯৬৫) গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' থেকে ১৮৫৮-৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ স্নাতকদের যে-তালিকা মুদ্রিত করেছেন তাতে দেখা যায় প্রায় সতেরো শো গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন মুসলমান। একে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তার ওপর শিক্ষায় এতোটা অগ্রসর হয়ে যাওয়ায় সাম্প্রদায়িক

গোঁড়ামি ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়ায়। মুসলমান সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আপেক্ষিক অনগ্রসরতা কালে কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির প্রধান অস্ত্র হলো। আলীগড় আন্দোলনের মতো শিক্ষা-আন্দোলন কেন এবং কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হ'লো তার কারণও সহজেই অনুমান করা যায়।

শুধু নতুন চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূ-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন হয়েছিলো। নতুন রাজস্ব-নীতিতে বহু মুসলমান ভূস্বামী নিঃস্ব হলেন, তার বদলে এলেন বহু হিন্দু জমিদার। পরবর্তী কালের অনেক জমিদার-প্রজার সংঘর্ষ যে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিলো, তার সূত্রপাত হয়তো এখান থেকে। তাছাড়া 'গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার আয়োজন হইলে দেখা গেল, বাংলাদেশে ভূমির দুই-তৃতীয়াংশ নিষ্কর এবং ইহার বৃহত্তর অংশের ভোগদখলদার মুসলমান সমাজ' (যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নবজাগরণের কথা, পৃ ১৮০)।

এই অর্থনৈতিক ব্যবধান থেকে ক্রমে দেখা দিলো পারস্পরিক অবিশ্বাস আর সন্দেহ, যার চরম ফল সাম্প্রদায়িকতা। বৃটিশপূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এতো তীব্র ছিলো না তার কারণ তখন হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার চেহারাটাই ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবাবি আমলে হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক শাসক-শাসিতের ছিলো। তখন হিন্দুরা উঁচুপদ পেলেও মুসলমানদের কখনোই এই বোধ হ'তো না যে তাঁরা বঞ্চিত। কিন্তু বৃটিশ শাসনের ফলে প্রাক্তন শাসক আর শাসিত সম্প্রদায় এক শ্রেণীভুক্ত হলো। ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে শুধু কর্তাবদল হ'লো, কিন্তু মুসলমানেরা হারালেন কর্তৃত্ব। এই অভিমানে মুসলমানেরা বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা উপেক্ষা ক'রে চললেন। যখন তাঁরা এ-বিষয়ে সচেতন হলেন তখন হিন্দুরা বৈষয়িকভাবে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

ফলে 'অখণ্ড স্বার্থবোধ'-ও আর সে-সময়ে রইলো না। সেজন্য সেযুগে হিন্দু বা মুসলমান যতোই তাদের সংগঠনের নামের আগে ন্যাশনাল বা জাতীয় কথা জুড়ে দিন না কেন, খুব কম ব্যক্তিই সাম্প্রদায়িক গণ্ডির বাইরে যেতে পারতেন। দ্র রসিক জ্যাকেরিয়া প্রণীত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৯]। সেই চৈতন্য আমরা ঠেকে শিখেছিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দণ্ডনীতি প্রবল হবার পরে। তবে তাদের ভেদনীতির কাছে আমাদের শেষ পর্যন্ত যে হার মানতে হয়েছে তার প্রমাণ ভারত-বিভাগ। কিন্তু সে তো অন্য প্রশ্ন।*

* নবাব আবদুল লতিফ-এর স্মৃতিকথা এখানে দুষ্প্রাপ্য, তবে কয়েক বছর আগে পাকিস্তানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'-র নতুন সংস্করণ (শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করেছেন, মৈত্রী, কলকাতা।

জনক জননী

উৎপলকুমার দত্ত

আমি ও ছোড়দি শুয়ে পড়বার অনেকক্ষণ পরে বাবা শুতে আসেন। মা অবশ্য আরও দেরি করবে। বাসনপত্র সব তুলে রেখে, রান্নাঘর ধুয়ে তবে মা আসবে। এই ঘরের মেঝেতে লম্বা লম্বা বিছানা পাতা হয়। আমি, ছোড়দি, মা আর বাবা শুই এ ঘরটাতে। আমাদের কোনো খাট নেই। ছোটমত তক্তপোশ আছে একটা। পাশের ঘরে বড়দা সেটায় একলা শোয়।

বাবা ঘরে এসে আলো জ্বালতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সারাদিনে আমার সঙ্গে বাবার দেখা হয় খুব কম। আমি ঘুম থেকে ওঠবার অল্পসময় পরেই, সকালে, বাবা সাইকেল চড়ে কারখানায় চলে যান। তারপর দুপুরে যখন খেতে আসেন তখন তো আমি স্কুলে। কেবল রাতে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়। বাবা কম কথার মানুষ। এমনিতে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না, চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়েন। বরং আমরাই মাঝে মাঝে বাবার কাছে ইংরেজী ট্রানশ্লেশন জেনে নিতে যাই, বাবা বলে দেন। সামান্য দু-চারটে কথা হয় তখন।

বাবা ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে প্রথমে ওষুধ খান। ওষুধ খেতে বাবার অনেকক্ষণ সময় লাগে। ওষুধ খাবার ছোট্ট গেলাস আর চামচ আছে বাবার। আমি চোখ বুজেই বাবার চামচ নাড়ানোর শব্দ শুনতে পাই। ওষুধ খেয়ে বাবা চকচক শব্দ করে জল খান। তারপর সেসব যথাস্থানে রেখে দিয়ে বাবা একবার পেচ্ছাব করতে বাইরে যান। ফিরে এসে চারদিক ভাল করে দেখে শুয়ে পড়েন। শোবার আগে বাবা একবার আমাদের দিকেও তাকিয়ে দেখেন। ঘুমের ঘোরে ছোড়দির গায়ের ঢাকাটা প্রায়ই সরে যায়। বাবা সেটা ঠিকঠাক করে তুলে দেন। এর কিছুক্ষণ পর মা এসে আর একবার আলো জ্বালায়।

মাকে দেখতে রোগা আর ফর্সা। চোয়ালের হাড়টা একটু বেশী উঁচু, চোখগুলো খুব বড় আর ঠাণ্ডা। মায়ের বয়স হয়েছে কিন্তু তেমন চুল পাকে নি। শুধু মুখের নানা জায়গায় মেছেতার দাগ পড়েছে। মা বড় শীতকাতুরে। সবসময় হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করে আছে, চোখে-মুখে শীতকাতুরে ভাব। মা আলো জ্বালিয়ে অনর্গল কথা বলতে থাকে, যেমন, 'হ্যাঁ গো, বারের ঘরে তালা দিয়েছিলে তো?' 'ওষুধ খেয়েছো?' অথবা 'তোমার গেঞ্জিটা কাল কাচতে দিয়ে যেও। বড় ময়লা হয়েছে।' চেয়ারের গায়ে সবসময় একগাদা জামাকাপড়—বাবার লুঙ্গি, গেঞ্জি, বড়দার শার্ট আর রুমাল, আমার পায়জামা ইত্যাদি স্তূপাকার হয়ে আছে। মা সেগুলো পাট করে একে একে আলনায় গুছিয়ে রাখতে থাকে। এসব করতে মার একটু সময় লাগে। মাঝে মাঝে বাবা বিরক্তভাবে চেঁচিয়ে বলেন, আঃ, আলোটা নেবাও না। কি যে করো এতক্ষণ ধরে—

মা বলে, এই যে হয়ে গ্যালো। ঘরটা একেবারে আঁস্তাকুড় করে রেখেছে, আজ সেনেদের বাড়ির বৌটা এসে আবার এই ঘরেই বসেছিল। মাগো, এমন লজ্জা করছিল, সুজনিটার দুজায়গায় আবার ছেঁড়া—কথা বলতে বলতেই মা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর গুটিশুটি মেরে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে। মা এসে শুয়ে পড়লেও আমার ঘুম আসে না। বাবা আলো জ্বালাতে সেই যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তারপর অনেকক্ষণ আর ঘুম আসে না। অন্ধকারে

সব কেমন অস্বাভাবিক আর অলৌকিক বলে মনে হয়। অন্ধকারে এখন আর ছোড়দির মুখ দেখা যায় না। গাঢ় ঘুম হচ্ছে ওর। এই একটু আগে যখন খাবার ঘরে আলো জ্বলছিল আর মশারির গায়ে একটুকরো আলো এসে পড়ছিল, তখন সেই আবছা আলোয় ঘুমন্ত ছোড়দির মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কেমন সহজেই ওর ঘুম এসে যায়। আর ঘুমোলে ছোড়দিকে ভারী অদ্ভুত লাগে। একটু বেঁকে এবং ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে ঘুমোয়, আধবোজা চোখের মধ্যে দিয়ে চোখের তারাও দেখা যায়। হাতদুটো মাথার ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অল্প হাঁ করে ঘুমোয় ছোড়দি। তখন কেমন অসহায় অসহায় লাগে ওকে। অথচ দিনের বেলায় এই ছোড়দি একেবারে অন্যরকম। স্কুল ফেরত একদল মেয়ের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে ভীষণ আড্ডা দেয়, সারাদিনটা এর ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আর আমাদের পাশের কোয়ার্টারের বসন্তদার সঙ্গে মাঝে মাঝেই কোথায় যেন যায়। শেষেরটা মা অবশ্য জানে না। বাড়ির কেউই জানে না। এইসব সময়ে অর্থাৎ দিনের বেলায় ছোড়দি বেশ ফিটফাট থাকে। খুব স্মার্ট আর ছটফটে লাগে ওকে। তাই রাতে ঘুমের ঘোরে ছোড়দি যখন জিভ আর তালুর সাহায্যে কেমন অদ্ভুত একধরনের শব্দ করে অথবা কথা বলে ওঠে, তখন সব আমার কেমন অদ্ভুত লাগে। আমার ঘুম আসতে চায় না। আমি ঘুমোবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি অথচ আদৌ ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে ছোড়দি ওর ভারী পা-টা আমার গায়ের ওপর তুলে দেয়। আমার এত ভার লাগে যে কি বলব! আমি ফিসফিসিয়ে বলি, এই ছোড়দি, তোর পাটা সরিয়ে নে না। আমার লাগছে। ছোড়দি শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু পাটা সরিয়ে নেয়।

বছর তিনেক আগেকার কথা। তখন আমাদের কোয়ার্টারের পেছন দিকে হাসপাতালের ঠিক পাশের কোয়ার্টারটায় থাকত রজনীকান্ত কাপুরেরা। রজনীকান্তর বাবা যশোবন্ত কাপুর ছিল বাবাদের ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার। আমার তখন বয়েস আরও কম। তবে মনে আছে, বড়দি প্রায়ই কাপুরদের কোয়ার্টারে যেত। দু-একবার রজনীকান্তর সঙ্গে বড়দিকে হাটের দিকেও বেড়াতে দেখেছি। কোনো কোনো দিন রাত করে ফিরলে, বড়দিকে মা খুব ধমকাত। তারপর হঠাৎ একদিন কাপুরেরা এখান থেকে চলে গেল। চলে গেল মানে বদলী হয়ে গেল। আর তার ঠিক দু-একদিন পরে দুপুরের দিকে (ছুটির দিন ছিল সেটা, মনে আছে) বড়দি কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরল। প্রথমে ভেবেছিলাম দুর্ঘটনা, পরে মা-বাবার চাপা কথাবার্তায় কান পেতে বুঝলুম বড়দি আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনার সঙ্গে যে রজনীকান্তর যোগ আছে, তা-ও বুঝেছিলাম। প্রথম প্রথম রজনীকান্ত যখন আমাদের বাড়িতে আসত আর বড়দির সঙ্গে গল্প-গুজব করত, তখন মা কিছুই বলত না। বরং বেশ হাসিমুখে ওকে ঘরের মধ্যে এনে বসাত, ঘরের তৈরী নানারকম মিষ্টি খাওয়াত। এমনকি রজনীকান্তর সামনে বড়দিকে একা বসিয়ে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলে যেত। বড় একটা ওদের সামনে আসত না। তারপর দেখতে লাগলাম বড়দির সঙ্গে কি নিয়ে রোজ মার কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। বাবাও একদিন রেগে উঠে কি সব যেন বলেছিলেন বড়দিকে।

বড়দির মৃত্যুর পর কয়েকদিন খুব হৈ-চৈ হল। অনেকে আবার বলতে লাগল, বড়দি নাকি মরে গিয়ে ভালই করেছে। বাবাকে বাঁচিয়ে গেছে। বড়দি মারা যাবার পর মা যেন একটু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল। দুপুরের দিকে বাদামী রঙের রোদে পিঠ দিয়ে বসে মা সোয়েটার বুনতে বুনতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না। বিকেল বেলায় দূরের মাঠে যখন ভেড়ার পাল চরিয়ে পাহাড়ী লোকেরা ফিরত আর ভেড়ার গলার ঘণ্টার মৃদু ঝুনঝুন শব্দ শালবনের অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত তখন সোয়েটার

বোনা কথ রেখে মা কেমন অসহায় আর দুঃখী দুঃখী মুখে রান্নাঘরের উনুনে আগুন দিতে উঠে যেত। ভারী কষ্ট হত আমার। আমি ভেবেছিলাম, বড়দির কথা মা নিশ্চয় ভুলে গেছে, মার মনে হয়ত এখন আর কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। রাত্রে আমার যখন ঘুম আসে না এবং অন্ধকারে সব যখন অস্বাভাবিক মনে হয় তখন আমি শুনতে পাই, মা কাঁদিছে। খুব জোরে নয়। আস্তে আস্তে চাপাস্বরে মা কাঁদিছে। মায়ের কান্না শুনলে আমার যেন কেমন করে, বুকের মধ্যে ব্যথা করে ওঠে। ইচ্ছে করে, মাকে চুপ করতে বলি। কিন্তু আমি পারি না। আমার কেমন লজ্জা করে। আমি যে এতক্ষণ ধরে জেগে আছি একথা জানলে বাবা আর মা দুজনে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। এবং সেকথা ভেবেই আমার খুব লজ্জা হয়। আর কি ভাষায় এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতে হয় তাও তো আমার জানা নেই! কি বলবো মাকে? কি করব বুঝতেই পারি না।

প্রত্যহ আমায় শুনতে হয় মায়ের কান্না। এক-একদিন বাবা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, চুপ করতে বলেন মাকে। বাবাও তো কম কষ্ট পাচ্ছেন না, মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কিন্তু সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাবা আর রোজ রোজ কত শোক করবেন? একেই বাবার শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। আগে বাবাকে খুব খাটতে দেখতাম বাড়িতে। খুব শক্তসমর্থ লোক ছিলেন। আজকাল কেমন যেন অথর্ব মনে হয়। দৈবের ওপর খুব বেশীরকম বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। মা কত জায়গা থেকে মাদুলি খুঁজে এনে পরিয়ে দেয়। বাবা নির্বিবাদে সেসব পরেন। দুহাতে চারটে মাদুলি বাবার। সকালে উঠে তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে স্তব করেন। চোখের চাউনি অত্যধিক ভীরু আর দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাবার চিন্তা এখন বড়দাকে নিয়ে। বড়দি মারা গেলেও সংসারে অশান্তি যে যায় নি, রাত্রিবেলা মা এবং বাবার কথাবার্তায় তা বুঝতে পারি। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করবার পর থেকেই বড়দা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। দুবার বাড়ি থেকে না বলেকয়ে কোথায় যেন পালিয়ে গিয়েছিল, শেষবার বি এ. পরীক্ষার ফিস্-এর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে। মাস দুয়েক কোনো পাত্তা ছিল না, তারপর হঠাৎ একদিন সকালে কোথা থেকে এসে বাবার পা জড়িয়ে ধরল। মা কান্নাকাটি করে বাবাকে থামিয়েছিল তাই বড়দা বেঁচে গেল সেবার। অথচ বড়দা আজকাল মার সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে। যা মুখে আসে তাই বলে। বড়দার চেহারাটাও যেন দুপুরের মত রুক্ষ আর কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মুখে হাসি নেই। সর্বদা দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকলে মানুষের মুখে যেমন তিক্ততার ছাপ পড়ে, বড়দার মুখের চেহারা অনেকটা সেইরকম। বাড়ির কারো সঙ্গে ও বিশেষ কথা বলে না। নিজের ঘরটায় একা বসে থাকে সবসময়, এবছর পরীক্ষা দেবার কথা। তবে দুপুরের দিকে প্রায়ই কোথায় বেরিয়ে যায়, ফিরতে দেরি হলে মা অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়ে। তারপর বাড়ি ফিরলে চা করে আর গরম গরম পরোটা করে ওর পড়ার টেবিলে দিয়ে আসে। রাত্রে শোবার আগে ওর মশারি টাঙিয়ে দেয়—যদিও বড়দা নিজেই মশারি টাঙিয়ে নিতে পারে।

বাবা এক-একদিন রাত্রিবেলা মাকে জিজ্ঞেস করেন,—মিন্টু পড়াশুনো করে তো ঠিকমত না বেরিয়ে যায়?

মা শ্বাস ফেলে বলে,—বেরোলে আটকাতে পারি কৈ?

বাবা পাশ ফিরে শুতে শুতে বলেন,—একটু চোখে চোখে রাখো এ বছরটা। বি. এ টা পাস না করলে কি করে চলবে? আমার তো এই শরীর। এখন থেকে সাবধান হও। তোমার কেবল রাতদুপুরে কান্নাকাটি—শাসন করবে না, কিছু না—

মা রেগে যায়,—আহা তুমি যেন খুব শাসনে রেখেছ। তুমি যদি একটু কড়া হতে তাহলে কি আর বীথি অমন কেলেঙ্কারিটা করতে সাহস পেত? মরত আগুনে পুড়ে? মার কথায় বাবা একটু চুপ করে যান। তারপর চাপাস্বরে বলেন,—যে গেছে তার কথা বাদ দাও। যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে সামলাও। কেবল আদর দিয়ে কি ছেলে মানুষ হয় সুধা? মিন্টুর জন্যে বড় ভাবনা হয়। আমার তো বছর তিনেক আর আছে। মা বলে,—কি জানি আমার অদৃষ্টে বা কি আছে। সংসারের জ্বালায় আমার মাথার মধ্যে কেমন করে। কেউ আমার কথা শোনে না। মুখী পোড়ারমুখীটাও দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে, একটু যদি কাজকর্ম শিখত, একটুও যদি সাহায্য করত আমায়—কথা বলতে বলতেই মার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। সারাদিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির পর মার চোখ ক্লান্তিতে বুজে যায়। খুব শীত পড়েছে এবার। আমাদের কাঁচের শার্সিতে বাতাসের শব্দ হয়। দূরে রেললাইন দিয়ে মালগাড়ি চলে যাবার শব্দ বাতাসে ভাসে। পাহাড়ের নীচে আদিবাসীদের ঘরের দেয়ালে আগুনের ছায়া অনবরত কাঁপে। কড়ির মত সাদা জ্যোৎস্নায় আমাদের বাংলোটা অদ্ভুত দেখায়। আমরা কেউ সেকথা জানতেই পারি না।

সকালবেলাটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমার অভ্যাস এবং যেহেতু এই সময়টা ভারী মনোরম অর্থাৎ পাখির ডাক, ভোরের মৃদু বাতাস, শিশিরের গন্ধ সবই প্রাণবন্ত আমি তাই বাংলোর বারান্দায় চুপ করে বসে থাকি। কান পেতে থাকলে এইসময় অনেকরকম পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায়। ভোরবেলার পৃথিবী খুব পবিত্র— চারিদিকে কেমন সতেজ ভাব, আমি শঙ্কাহীন, দ্বিধাহীন হৃদয় নিয়ে বসে থাকি।

বাবা আপিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বারান্দায় রোদে বসে পড়ি। ঘরের ভেতর ছোড়দি সুর করে ভূগোল মুখস্থ করে। কলঘরের বড় ড্রামটায় সশব্দে জল ভরতে থাকে মা। বড়দা বোধহয় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে চা খায়। কলঘর থেকে বেরিয়ে মা তোলা উনুনটা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে বারান্দা থেকে রান্নাঘরে নিয়ে যায়। হিটার থেকে চায়ের কেটলিটা নামিয়ে নিতে নিতে দাদাকে চেঁচিয়ে বলে, আর এককাপ চা খাবি মিন্টু, জল চাপাব?—

তারপর মা কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরঘরে যায়। ঘণ্টা নাড়াবার এলোমেলো আওয়াজ, মায়ের মুখে স্তোত্রপাঠের শব্দ ভেসে আসে। তারপর খানিকটা চিনি আর কলা আমাদের বিতরণ করে মা আবার রান্নাঘরে ঢোকে। মা খুব বাংলা নভেল পড়তে ভালবাসে। ছুটির দিনে দুপুরবেলায় দেখেছি, মা তন্ময় হয়ে বই পড়ছে। মার জন্য আমাকে প্রায়ই মিতুদের কোয়ার্টারে যেতে হয়। মিতুর কাকীমার অনেক বই। মা আমাকে দিয়ে প্রায়ই বই চেয়ে পাঠায়। বই পড়বার সময় মা সত্যিই একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যায়। কোনো কোনো বই ছোড়দি আগেই শেষ করে ফেলে, মার তখনও হয়ত অনেকটা বাকী।

এমন সময় মা ছেলেমানুষের মত ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করে,—হ্যাঁরে, মেয়েটা শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারবে তো? কি হবে শেষটায়? বল্ না—

ছোড়দি বলে, শেষ অবধি পড়েই দ্যাখো না। আগে বলে দিলে ভাল লাগবে কেন?

—ঐ গিরীন লোকটা কি পাজী দেখেছিস? মেয়েটাও বাবা বড্ড বোকা। কেন যে ওদের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল! আহা, ওর বাবার জন্যে বড্ড কষ্ট হয়—

এইসব সময়ে মাকে খুব ভাল লাগে। খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই তো মা বেশ সহজভাবে কথা বলছে। মায়ের মনে যে কোনো দুঃখ আছে একথা মনেই হয় না। আমি তো

জানতামই না। নেহাত আজকাল রাত্রে আমার ঘুম আসে না এবং মার কান্না শুনতে পাই, তাই তো জানতে পারলাম। মা যখন মিতুর কাকীমা কিংবা বসন্তদার মার সঙ্গে গল্প করে, ছোড়দির সঙ্গে লুডো খেলে, বাগানের ফুলগাছে জল দেয়—যখন মা বাড়িতে কড়াইশুঁটির কচুরি বানাতে গিয়ে আমাদের ডেকে বলে, ওরে ও যূথী, ও মনু, একটু পুরটা চেখে দ্যাখ্ না—নুনটুন সব ঠিক হল কিনা—তখন মনে হয় না মা কোনোদিন দুঃখ পেয়েছিল। তখন মনে হয় না মা আজ রাত্রে আবার কাঁদবে। বড়দার কথা ভেবে, বড়দির কথা ভেবে, আমাদের সবাই-এর কথা ভেবে মায়ের ঘুম আসবে না অনেক রাত। মনে হয় আর সব সাধারণ মায়ের মত আমার মারও সব সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয়েছে।

অথচ একা একা বসে মা যখন গালে হাত দিয়ে কোনো কথা ভাবে অথবা বড়দার কাছে গালাগালি খেয়ে চুপচাপ রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে থাকে তখন মাকে দেখে বুঝতে পারি মার কত দুঃখ। তাও জেনেছি বলে। কিন্তু মা জানে না এবং জানে না বলে মা হয়ত আমার কাছে কিছু প্রকাশও করে না। হতাশ হয়ে যায়, বার বার ঘা খেয়ে মা আশা করাও বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। আমি খানিকটা অসহায় আর লাজুকমুখে দূর থেকে মার দিকে চেয়ে থাকি। মার কাঁধে, থুতনির কাছটায়, রোগা রোগা হাত দুটোতে, চোখের কোণটায় অসম্ভব দুঃখী দুঃখী ভাব।

আসলে আমাদের সংসারে শান্তি বলে কিছু নেই। সেজন্য দায়ী বড়দা আর ছোড়দি। সত্যি, এক-এক সময় মনে হয় বাবা আর মা বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। বড়দাকে মাঝে মাঝে কোথা থেকে একটা মেয়ে আসে ডাকতে। খুব উগ্র ধরনের চেহারা, তেমনি সাজগোজ। রঙচঙে শাড়ি, চুলে গাঢ় রঙের রিবন বাঁধা, একটু রোগা আর ছোট মত দেখতে। খুব রুক্ষ কথাবার্তা। যেন সারা শহর ঘুরে এসেছে এরকম ব্যস্ত আর ক্লান্তভাবে আসে। দাদার খোঁজ করে। মা প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে ভাগিয়ে দেয়। দাদার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। এক-একদিন দাদা কি করে জানতে পেরে যায় সে কথা। সেদিন সারাদিন ধরে মাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। রাত্রিবেলায় খুব দুর্বলভাবে মা কাঁদতে থাকে বাবার সামনে। বলে, আমার ভয় করে। আমি আর পারি না গো। এইবার মিন্টু না একটা কিছু সর্বনাশ করে বসে। ঘুমের ঘোরে বাবা হয়ত কিছু সান্ত্বনা দেন, কিন্তু সেটা চাপা কান্নার মত।

আর ছোড়দিকে দেখে মা বোধহয় তেমন কিছু বুঝতে পারে না। সাধারণত, আমাদের কোয়ার্টার থেকে কিছুটা দূরে, বড় পাঁচের রাস্তার কালভার্টের ধারে অথবা হাসপাতালের ওদিকটায় ওরা ঘুরে বেড়ায়। ছোড়দি আর বসন্তদা। আমাকে দেখলে ওরা কেমন অস্বাভাবিক-ভাবে ঠান্ডা মেরে যায়, বসন্তকে আমার ভাল লাগে না, ওর মুখে সবসময় একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, খুব সন্দিগ্ধ ও সতর্ক ভাবের চাউনি, ওকে আমি খুব কম হাসতে দেখেছি। ছোড়দির সঙ্গে কথা বলবার সময়ও ওর চোখমুখ সরল, স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না। ছোড়দিও ওর সঙ্গে মিশে যেন আগেকার চেয়ে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে গেছে। ছোড়দি আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে ক্লাস ইলেভেনে পড়ে, এবং আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়, অথচ ওকে যেন একটু বেশী বয়সের বলে মনে হয়। সেটা শাড়ি পরার জন্যে না গালে ব্রণ ওঠার জন্যে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ওরা আমাকে দেখলে বিরক্ত হয়। একদিন আমাদের খালি সার্ভেন্ট্স্ কোয়ার্টারের পেছন দিকে ইউক্যালিপ্টাস গাছের আড়ালে ওদের আমি খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমায় দেখে চমকে উঠেছিল ওরা। ছোড়দি সরে এসে বলেছিল, মনু প্লিজ মাকে বলিস না রে, বলবি না তো? আমার সেই গোল্ডেন ট্রেজারি বইটা তোকে একেবারে দিয়ে দেব।

মন্, শোন্—

আমি লাজুক মুখে সরে এসেছিলাম। এসব দেখলে আমার খুব ভয় করে, বড়দির ঘটনাটা মনে পড়ে যায়, অথচ ছোড়দি বা বড়দা সেকথা আশ্চর্যজনকভাবে ভুলে গেছে। ওরা আমার চেয়ে বড়, তাই ওরা বোধহয় খুব সাহসী। ঠিক জানি না।

আমি না বললেও, ব্যাপারটা একদিন কিন্তু জানতে পেরে গেল মা। এমনিতে ছোড়দি স্কুল থেকে ফেরে চারটের সময়, আমি আসবার একটু আগেই, অথচ সেদিন আমি ফিরে এলাম, তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু ছোড়দি বাড়ি আসে না। আমি জল-খাবার খেয়ে বারান্দায় এসে বসলাম, আমাদের বাগানের গাছগুলোয় পরিচিত পাখিরা সব ফিরে এল, কিছুক্ষণ কলরবের পর সবাই ঘুমিয়েও পড়ল, ছোড়দি তখনও ফিরল না।

মা ব্যস্ত হয়ে ঘরবার করছে। অন্যদিন এসময় ঠাকুরঘরে চলে যায় মা, আজ এখনও দেরি করছে। বাবা এখনও ফেরেন নি, বড়দা দুপুরের পর কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমি ছাড়া কেউ নেই। মা আমায় এসে বলল, এত দেরি তো হয় না যুথীর। একবার এগিয়ে দেখবি মনু? তোর বাবা ফিরে এলে যে রাগারাগি করবে—

আমি বললুম, মালিদের কোয়ার্টারে একবার দেখব মা? সন্ধের পর তো কতদিন ওখানে—

তাই যা দেখি। কোথায় আবার যাবে?

আমি জামা পরে বাইরে এলাম, আমার বুক ঢিবঢিব করছিল। আমাদের বাড়িতে তখন প্রতিদিনই এমন একটা অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটছে। হয় বড়দাকে, নয় ছোড়দিকে কেন্দ্র করে। ওরা যদি মাঝরাতে একবার জেগে উঠে মায়ের কান্নাটা শুনত, অথবা বাবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকত তাহলে ওরা এমন নিষ্ঠুরতা করতে পারত না বোধহয়।

ঠিক এইসব সময়ে আমার খুব ভয় হয়। ভয় পেলে আমার যা হয়, অর্থাৎ হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আসা, শরীরের মধ্যে কাঁপুনি, গাটা যেন হঠাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী গরম হয়ে যায়। আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল শুরু হয়, অনেক তুচ্ছ কথা, যেমন বছর শেষ হয় কতদিনে এই সামান্য কথাটাও আমার মনে পড়ে না।

বেশীদূর যেতে হল না, খানিকটা এগোতেই রাস্তার আলোয় ওদের স্পষ্ট দেখলাম। বসন্তদা আর ছোড়দি পাশাপাশি হাঁটছিল। ছোড়দির কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, ওরা দ্রুত হেঁটে আসছিল এবং খুব কাছাকাছি এসে পড়লে বাংলোর বারান্দা থেকে মা-ও ওদের দেখতে পেল। বসন্ত নিজেদের কোয়ার্টারের পথ ধরে বেঁকে গেল আর ততক্ষণে ছোড়দি আমাদের বাংলোর ভেতরে এসে পড়েছে। ওর পেছন পেছন আমি। বাড়ি ঢুকে ছোড়দি খুব স্বাভাবিকভাবে কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখল আলনায়। ওর শরীরে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। শুধু মুখটা একটু তেলতেলে লাগছে।

একটু চুপ করে থেকে মা বললো কোথায় গিয়েছিলি? এত দেরি হল যে?

ছোড়দি চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললো, কেন, কি এমন দেরি হয়েছে? সবে ছটা বাজে—

—তা তোর ইস্কুল ছুটি হয় তিনটেয়, ছটা পর্যন্ত কি আছে? ইস্কুলে না অন্য কোথাও গিয়েছিলি? বসন্তকে সঙ্গে দেখলুম। ওর সঙ্গে তোর কি?

—কি আবার? ছোড়দি খাপাটে গলায় তর্ক করলো, ওর সঙ্গে কোথাও গেলে কি হয়েছে? সিনেমায় গিয়েছিলুম।

—সিনেমায়? সেই টাউনে? বসন্তর সঙ্গে!

—বেশ, তাতে কি হবে?

—তোর ভয় করে না?

—ভয়? কিসের? তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো। দেখি সরো···

মা এগিয়ে এসে খপ করে হাতটা ধরলো ছোড়দির। তারপর বিনুনি শুদ্ধ ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে নামাল মাটিতে। মার শরীরের মধ্যে একটা ভেঙে পড়ার ভাব। আমি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বিবর্ণমুখে দেখছি। ভাবছি, বাবা কখন আসবেন। এত দেরি হচ্ছে কেন বাবার? আমি সময় দেখলাম।

মা বলতে লাগলো,—তুই কি কিছু বুঝতে পারছিস না পোড়ারমুখী? মরবি তুই, মরবি, বীথির কথা মনে নেই তোর?

- হ্যাঁ বেশ করব, মরব। মরবই তো- তোমার সবসময় যত খারাপ সন্দেহ, তোমার জন্যে শান্তি নেই কারো—

মা যেন কিছু বলতে পারছে না খুলে। কেমন যেন কিসের একটা ভয়ে মার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। মা ছোড়দির চুল ধরে ঝাঁকাচ্ছে, ছোড়দির মধ্যে একটা বেপরোয়া জেদী ভাব। আমার মনে হল ওদের দুজনের চোখেই জল এসে পড়বে এক্ষুনি। আমি আবার সময় দেখলাম।

তোকে খুন করে ফেলব আমি। তোকে খুন করলে আমি বাঁচি, শান্তি পাই। আমার এত কোন মুখপুড়ী, আমায় শান্তি দে বাঁচা আমায় বলতে বলতে মা ছোড়দির মাথাটা ধরে জোরে দেওয়ালে ঠুকতে লাগল। এখন মার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। মার শুধু কাঁধ দেখা যাচ্ছিল। কেন মার এই ভেঙে পড়া, কেন এই ভয়- আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম না যেন। কিন্তু মায়ের ঐ ভয়টা শীতের কুয়াশার মত জমাটভাবে আমার চারপাশেও ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি দেখলাম ছোড়দি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলছে আমি আর এ বাড়িতে আসব না। কখনো না। আমি রেললাইনে মাথা দেব আমি । ছোড়দি বেরিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর বাবা ফিরলেন। সব শুনে কারখানার পোশাকেই আবার বেরিয়ে গেলেন। আবার অনেক রাতে বাবা ছোড়দিকে নিয়ে ফিরে এলেন। ছোড়দি নাকি শালবনের ধারে একটা ঢিপির ওপর চুপ করে বসে কাঁদছিল।

এক অবসাদ আমাদের সবাইকে গ্রাস করে, বিষণ্ণতা ছড়াতে থাকে আমাদের বাংলোয়। আমাদের মনে হয় না যে এর বাইরে আর কোথাও স্বাভাবিকতা আছে, সুখ আছে। হয়ত আমার মত আরও অনেকের এরকম মনে হয়। মনে হতে থাকে। মনে হয়, কলকাতায় চলে গেলে বেশ ভাল হত। যদিও কলকাতা থেকে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা চিঠিতে লেখে, কলকাতার অবস্থা খুব খারাপ। বেশী রাত্তিরে বেরোনো যায় না। তবু, আমার মনে হয়, কলকাতায় এত দুঃখ নেই। নেই এত শূন্যতা ও বিষণ্ণতা।

সব যখন খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে, তখন একদিন রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শীত পড়েছিল খুব, সহজেই ঘুম এসেছিল। কিন্তু ভেঙে গেল। ঘুমচোখে তাকিয়ে দেখি, বাবা বিছানায় উঠে বসেছেন, আর ছেলেমানুষের মত কাঁদছেন খুব। ঘরের আলোটা জ্বলছে, মা বিছানায় নেই। কি ব্যাপার? শরীর এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে নড়তেও পারলাম না। বাবা কেন কাঁদছেন? কি হয়েছে? এমন সময়ে মাকে দেখলাম। বাবার ওষুধের গেলাসে চামচ নাড়াতে নাড়াতে মশারির মধ্যে হাত গলিয়ে বাবাকে ওষুধ দিচ্ছে। মা স্খলিতস্বরে বলছে,

নাও, খেয়ে নাও। চুপ করো, কেঁদো না। এক্ষুনি কমে যাবে। স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলে।

বাবা ওষুধটা খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলছেন, না গো। মিন্টুকে ডাকো ও-ঘর থেকে। মনু আর যূথীকে ডেকে তোলো। জমির দলিলটা আলমারিতে আছে, আলমারিটা খোলো—সব দেখিয়ে যাই ওদের—

মা বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সান্ত্বনার সুরে বলছে, অমন উতলা হয়ো না তুমি। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। দেখি শোও, আমি লেপটা ভাল করে দিয়ে দি। দেখি—

বাবা শুনছেন না। বলছেন, না গো বুকের ব্যথাটা কমছে না—তুমি ও-ঘর থেকে মিন্টুকে ডাকো। চাবিটা খুলে জমির দলিলটা, ইনসিওরেন্সের কাগজগুলো সব বার করো—একদম জলে পড়বে বেচারারা—শিগ্‌গির বার করো—

খুব অসহায়ভাবে মা থামাতে চাইছে বাবাকে। মা'র কপালের ওপর দু-একটা চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। এখন বোধহয় আমার উঠে পড়া দরকার। বাবা ওরকম অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন কেন? মা'কে বলবো, আমি জেগে আছি? না, তা হয় না। ওরকম আমি করতেই পারব না। আমার বুকে এত জোর শব্দ হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল এখুনি ওরা শুনতে পাবে। আমি বুকে হাত চাপা দিলাম।

মা বলছে, তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু বুকে হাত বুলিয়ে দি। কেঁদো না—

বাবা ফুঁপিয়ে উঠলেন, ওদের সব দেখো সুধা। ওরা কেউ মানুষ হল না, মিন্টুটা যদি —কি যে হবে সব—

—ওগো চুপ কর। চুপ কর।

—কেন এমন স্বপ্নটা দেখলাম সুধা? এই দ্যাখো, আমার বুকের এইখানটায়। এখনও কাঁপছে। আমি আর বাঁচব না। আমার মন বলছে। আমি আর ছেলেমানুষের মত চোখ রগড়ে কাঁদতে লাগলেন বাবা। বাবা মরে যাবেন? কেন এমন অর্থহীন, অদ্ভুত হয়ে যায় সব-কিছু এই রাত্রিবেলায়? বাবা মরে গেলে, মাকেই বা কে দেখবে? আর তো কিছুই থাকবে না মায়ের। বাবা তখনও কথা বলছিল।—মরে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না সুধা। অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা পেয়েছি, কিন্তু তবু বাঁচতেই ইচ্ছে করে। খুব ইচ্ছে করে—

মা-ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে বাবার কণ্ঠস্বর। যেন অনেক-দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে বাবার কথাগুলো।—সুধা, আমরা বড় দুর্বল। আমরা কিছু করতে পারলাম না। স্বপ্নটা বড় ভয়ের ছিল—

ঘুমিয়ে পড়, ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—সুধা, আমার ভয় করছে।

এবং একসময় আস্তে আস্তে ওঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু নিদারুণ ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। আমার ঘুম এল না। আমি ঘুমের জন্য কত প্রার্থনা করলাম। তবুও আমার ঘুম এল না।

প্রায় সারারাত জেগে জেগে শেষরাতের দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমার বিছানার ওপর জাফরি-কাটা রোদের ছায়া। আমার মনে হল, কিছুতেই আমি যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না। কাল সারারাত আমার যেন খুব জ্বর হয়েছিল। অনেক জ্বরের পর শরীর যেমন ভীষণ অবসন্ন ও ক্লান্ত লাগে, আমারও তাই লাগছে। আমি হাত-পা ছড়িয়ে বুঝলাম আমার শরীর খুব দুর্বল। আমি অনেকক্ষণ

বিছানায় চোখ বুজে পড়ে রইলাম। বাবার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে নিশ্চয়ই বাবা কারখানায় চলে গেছেন। রান্নাঘর থেকে মায়ের হাতনাড়ার শব্দ আসছে। অন্যদিনের মতই পাশের ঘরে সুর করে পড়া মুখস্থ করছে ছোড়দিন। বাগানে পাখিদের যাওয়া-আসার শব্দ—কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, কেউ মনেও রাখে নি কিছু। রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভুলে গেছে সব।

তবু কাল রাতের ঘটনাটা ভুলতে পারছিলাম না, চারিদিক থেকে এক ধরনের শূন্যতা-বোধ আমায় ঘিরে ধরল। দুই ঘুমের মাঝখানে স্বপ্নের মত একটা ক্ষণিকের ঘটনা, আজ সবাই ভুলেও গেছে সে ঘটনার কথা, তবু আমি কেন ভুলতে পারছি না কিছুতেই? কোনো এক প্রিয়জনকে নিয়ে ট্রেন ছেড়ে গেলে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যেমন লাগে, তেমন আমার বুকের ভেতরটা খালি খালি ঠেকছিল।

অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে আমি চোখে-মুখে জল দিলাম। তারপর মা'র কাছ থেকে জলখাবারের থালাটা চেয়ে নিয়ে বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কালকের ঘটনাটা তুচ্ছ, ওটা একেবারেই ভুলে যাওয়া উচিত আমার, বিশেষত আজ যখন সব আগেকার মত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ তো মা সারা দুপুর আবার ছোড়দি আর মিতুর কাকীমার সঙ্গে ছেলেমানুষের মত লুডো খেলবে। গল্পের বই পড়তে পড়তে শেষ না করে উঠতে পারবে না, রান্নাঘরে যেতে দেরি হয়ে যাবে খুব। আর সন্ধ্যেবেলায় বাবা কারখানা থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়বেন। আমরা ট্রানস্লেসন জেনে নিতে যাবো। বাবা বলে দেবেন। হয়ত রান্নাঘর থেকে খাবার জল আনতে পাঠিয়ে বাবা ছোড়দিকে ভুতের ভয় দেখাবেন। আর যে-ছোড়দি সেদিন বেপরোয়াভাবে মা'র সঙ্গে তর্ক করেছিল, সেই ছোড়দি মা'র দিকে চেয়ে নাকিসুরে বলবে, একটু দাঁড়াবে চল না মা···। তবু আমি কিছুতেই সহজ, স্বাভাবিক হতে পারব না। আমার কেবলি মনে হতে থাকবে, আমাদের এই সংসারটা শবাধারের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমরা সবাই শ্মশানে চলেছি। অন্ধকারে মায়ের কান্নাটা দূর থেকে শুনতে পাওয়া হরিধ্বনির মত লাগবে। খুব অসহায়ভাবে আমরা সবাই বাঁচবার চেষ্টা করবো। আর কিছুতেই সংসারের এইসব অনিবার্য ঘটনাগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে বড়দি আত্মহত্যা করে বাঁচবার চেষ্টা করবে, বড়দা ভীষণ রুক্ষ আর নির্মম হয়ে উঠবে দিন দিন। ছোড়দি সাংঘাতিক বেপরোয়া। তারপর আবার কোনোদিন অনেক রাতে স্বপ্ন দেখে বাবা যদি ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠেন, তবে ঘুম ভেঙে যাবে আমার। আমি ঘুমের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করতে করতে শুনবো, বাবাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মা-ও চাপাস্বরে কাঁদছে।

অবনীন্দ্রনাথ : গদ্যের নানা মহলে

উজ্জ্বল মজুমদার

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে, সবুজপত্রের সবুজ নিশান তখনও ওড়েনি, সেই সময়ে বাঙলা সাহিত্যসংস্কৃতির জগতে নতুন দিগ্‌দর্শনীর ভূমিকা নিয়েছিল ভারতী পত্রিকা। সেই ভারতীর আসরে যে-সব কবি-শিল্পী জমায়েত হতেন তাঁরা শিল্পসাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ সূত্র মানবার চেষ্টা করতেন। সেই সূত্রগুলির মধ্যে অন্তত দুটি সূত্র এই আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে: ১. সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রথাগত দৃষ্টি বর্জন করতে হবে, রচনা-রীতিতে আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষতার রস আনতে হবে এবং তা আনতে গেলে সহজ কথ্যভাষার কাছাকাছি একটা ভাষা-মান আনা চাই। ২. আর্টের প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ বাড়াতে হবে এবং কর্মে ও আচরণে এই শিল্পানুরাগের প্রকাশকে প্রতিফলিত করতে হবে। এই সূত্রটি ধরে মোগল-রাজপুত চিত্রকলার অনুশীলন বাড়তে থাকে এবং ভারতীগোষ্ঠীর রচনায় ফারসী শব্দের প্রতি বিশেষ ঝোঁকও পড়ে।

বিশেষ করে এই দুটি সূত্রের উল্লেখ করছি এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই এই সূত্রগুলি গৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো মূল উৎস, তিনি এই আসরের ধ্যানে-মননে সর্বত্রই ছিলেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় আর-একটি স্বতন্ত্র উৎসের মতোই তখন প্রেরণাময় হয়ে উঠছিলেন। উল্লিখিত দ্বিতীয় সূত্রটি বিশেষ করে অবনীন্দ্র-প্রতিভার উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত। প্রথম সূত্রটিতেও তাঁর দানের দীপ্তি কম নয় কারণ বাঙলাসাহিত্যে অদ্ভুত ও কৌতুক রস, স্বপ্ন-জাগরণের আবছা জগৎ, সম্ভব-অসম্ভব, অতীত-বর্তমানের মিশ্র বিচিত্র বর্ণময় জগৎ একবারেই প্রথামুক্ত এবং এযাবৎ অচর্চিত। আর ভাষা-মাধ্যমের (কিছু সাধুভাষায় লেখার কথা ছেড়ে দিলে) কথা তুললে বলতে হয় গদ্য-পদ্য, আলাপ-প্রলাপ, ছড়া-বাগ্‌বিধি, রূপকথা-মন্ত্রকথা, ছবি আর ধ্বনির এমন সূক্ষ্ম মিশ্রণের পরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথের যে সিদ্ধি তার কাছাকাছি কোনো লেখকই নেই। কথ্য ভাষাকে সাহিত্যিক বাহনরূপে স্বীকৃতির বহু আগে থেকেই অবনীন্দ্রনাথ এই কথ্যভাষাকে গল্পকথনে আশ্চর্যভাবে কাজে লাগিয়ে আসছেন অথচ গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে গবেষকদের কাছে চলতিভাষার লেখকরূপে তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি দেখিনি। সবুজপত্রের আগেই রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের হাতে এ চলতি গদ্য বর্ণনার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে, আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষতার রস বলতে যা বোঝায় তা তাঁদের চলতিরীতিতে প্রকাশ পেয়েছে, দার্শনিক মানসিকতা থেকে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ জীবনের বর্ণনা, সুদূরতম সূক্ষ্ম কল্পনা থেকে নিটোল সূক্ষ্ম রুচির ছবি, সাধারণ কৌতুক থেকে ক্ষুরধার ব্যঙ্গের ঝাঁজ -কোনো কিছুই এ দুই গদ্যশিল্পীর স্পর্শ করতে বাকি থাকেনি।

২

আমাদের দেশীয় লৌকিক ঐতিহ্যকে নতুন রূপে নবজন্ম দিয়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং প্রথম রচনাটিতেই তিনি দক্ষ শিল্পী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। গদ্যচর্চার আগেই তিনি চিত্রশিল্পীর সিদ্ধি পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরবাড়িতে গল্প-বলিয়ে

বলে তাঁর সুনাম ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখতে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' একাধারে চিত্রশিল্পী এবং কথকের ক্ষমতা নিয়ে বাঙলা গদ্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন বলেই প্রথম থেকে তিনি বাঙলা গদ্যের গতানুগতিক পদ্ধতি এড়াতে পেরেছিলেন। 'শকুন্তলা' (১৮৯৫) গদ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল,

> তারপর কি হল?/দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।/ .....আর কি হল?/পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা-দুজনের মালাবদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।/তারপর কি হল?/তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয় সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

এ গদ্যের বাগ্‌ভঙ্গিকে সমান মাত্রায় কেটে কেটে ছবির পর ছবি সাজিয়ে এবং ছবিতে ছবিতে অন্তর্লীন যোগসূত্র রেখে রূপকথার ভঙ্গিকে বর্ণনাত্মক গদ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ গদ্যের ভিত হল রূপকথার বাগ্‌রীতি কিন্তু রূপকথা-কথনের লৌকিক রূঢ়তা ঝরে গেল, রূপকথার স্বাভাবিক অবিন্যাস ও স্থানিক বাগ্‌ভঙ্গির মাঝে মাঝে যে আশ্চর্য শিল্পরুচি চোখে পড়ে সেই রুচিটিকেই আত্মসাৎ করলেন তিনি আর সঙ্গে নিয়ে এলেন সূক্ষ্ম তুলির টান, সূক্ষ্ম ধ্বনির রেশ। নন্দলালকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (২৪শে জুন, ১৯২৫): 'আর্টিস্ট মাটিছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এটা ভাবি সত্যি . প্রথম মাটি হতে হবে তারপর জলে গলতে হবে তারপর কল্পনার ডানায় ভর ও ওড়া।' তাই বাঙলাদেশের লৌকিক বাগ্‌-রীতিকে নির্ভর করেই শিল্পী-লেখক অবনঠাকুর ঐতিহাসিক, দেশী-বিদেশী লোককথা এবং অদ্ভুত-কৌতুকের রোমাঞ্চকর জগতে পাড়ি দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) প্রাচীন সাহিত্য পুরাণ লোককথা এবং বিদেশী লোককথা ও সাহিত্যিক কাহিনীর পুনর্লিখন, পুনর্বয়ন -যেগুলিতে অবনীন্দ্রনাথের স্বধর্মই প্রবল হয়ে উঠেছে। (২) আজগুবি কল্পনা-প্রধান রচনা ও যাত্রাপালা জাতীয় রচনা। (যাত্রাপালাগুলিও প্রধানত প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর কিন্তু রূপায়ণে স্বকীয় অদ্ভুত-কৌতুকরসের প্রাধান্য।) (৩) স্মৃতিচিত্র জাতীয় রচনা। (৪) শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধাবলী। প্রথম শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'শকুন্তলা'র কথা আগেই বলেছি। ওই ধরনের রচনারীতির আর-একটি প্রমাণ 'ক্ষীরের পুতুল'। 'শকুন্তলা'র কিছু পরেই এটি লেখা। এ বইতেও সেই নিপুণ শিল্পীর বাক্যবয়ন,

> সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য সেখানে কেবলই ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সরবন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আমকাঁঠালের বাগান; গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে গোলচোখ বোয়াল মাছ, কচুবনে মশার ঝাঁক; আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসিপিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন।

আবার এই ছবি-আঁকতেই কখনো কখনো সূক্ষ্মতা, তারল্য ও রঙ-বাহারের ছোঁয়া লাগে:

> সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকণ, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল

রেশমের শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়।
১৮৯৫-৯৬ নাগাদ যখন এইসব লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল তখন সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের গদ্যচর্চায় চলতিরীতির দ্যুতি অনেকের লেখাতেই আসছিল কিন্তু কেউই চলতিভাষায় লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যকে তো ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই এই তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণ লেখক চলতিভাষায় রূপের জাদু সৃষ্টি করলেন। রূপকথা কি পৌরাণিক গল্প বলেই এমনটি হয়েছে একথা যদি কেউ বলেন তাহলে বলবো, সমসাময়িক কোন উল্লেখযোগ্য লেখক প্রাচীন কাব্য-কাহিনীকে চলতিভাষায় শিশুপাঠ্য করে পরিবেশনের চেষ্টাও তো করেন নি। বরং বলবো অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাদুটির প্রায় বছর বারো বাদে দক্ষিণারঞ্জন যে 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৩১৪) প্রকাশ করেন তা মা-দিদিমার মুখের কথার ভিত্তিতে গড়া হলেও সাধু-রূপে লেখা। কোথাও কোথাও চলতি মিশ্রণ অবশ্য হয়েছে, চলতি ক্রিয়াও যে আসেনি তাও নয়। এবং একথাও ঠিক যে, তা রূপে প্রধানত সাধু হলেও ভঙ্গিতে চলতি। কিন্তু তার বহু আগেই তো অবনীন্দ্রনাথ রূপে-ভঙ্গিতে একাত্ম, শিল্পময় এক বিন্যস্ত চলতিভাষার আদর্শ সৃষ্টি করে গেছেন রূপকথার নবজন্ম দিয়ে।

কিন্তু এ গদ্যের শিল্পোৎকর্ষ যাই হোক, এ গদ্যের ব্যবহারিক সার্থকতা রসের এক বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এ গদ্য যত বেশি সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণে ব্যস্ত, ব্যবহারিক গতিশীলতায় ততই পশ্চাৎগামী, মন্থর। কিন্তু চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যতই ঐতিহ্যসচেতন হলেন, মোগল-রাজপুত ছবির আশ্চর্য রঙের জগৎ যতই তাঁকে মুগ্ধ করলো, লেখক অবনীন্দ্রনাথ ততই সেই রঙের জগতের আড়ালে দ্রুতগতিশীল রোমান্স্ ইতিহাসের বুভুক্ষু হয়ে পড়লেন। "রাজকাহিনী" তারই ফল। চিত্রাত্মক সূক্ষ্ম কারুকার্যের গদ্যকে কিছুটা শাসনে রেখে তিনি এক অপূর্ব বর্ণনাত্মক গদ্যের সৃষ্টি করলেন। এ গদ্যেও ছবি আছে, স্তরে স্তরে সৌন্দর্যের উন্মোচন আছে, কিন্তু বর্ণনাত্মক গদ্যের যে গুণ--প্রবহমানতা সেই প্রবহমানতার চোরা স্রোতের টানে ওপরকার কারুশিল্পের কাজগুলো ভেসে চলেছে; হাতে যেন পেয়ে গেছেন সেই ঐতিহাসিক জগতের চাবিকাঠি--কতকগুলি শব্দ, আবহসৃষ্টিতে যাদের জুড়ি নেই, আর সেই শব্দগুলি দুর্দান্ত শক্তিতে বাক্যগুলিকে অনেকখানি ঠেলে নিয়ে গিয়ে তবে বিশ্রাম নিতে চায়, কিন্তু তার আগে ব্যঞ্জনাশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে দিয়ে যায়। 'বাপ্পাদিত্য' থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে,

> তারপর রানী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগলো --পিছনে তার শত শত ভীল—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীরধনুক! মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাংস থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটি তীর তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে...

এ দৃশ্যে গতিশীলতার একটি আশ্চর্য স্থিরচিত্র আঁকা হয়েছে, এখানেও ছবি আছে, তবে ছবিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, সর্বস্ব নয়, ছবিগুলি একটি বেগের আবেগকে বহন করে এসে

থমকে দাঁড়িয়েছে। 'সংগ্রামসিংহ' থেকে আর-একটি ঐতিহাসিক সকালের বর্ণনা দেখা যাক— যে সকালে একটি নাটকীয় রাত্রির অবসান ঘটিয়ে একটি প্রতিশোধের মৃত্যু বিষাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে.

> তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে—কতদূরে সকালের আগুনবরন আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে—'ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।'

রাজকাহিনীর এই গদ্যাংশ দুটি প্রমাণ করে যে এক আদর্শ বর্ণনাত্মক গদ্য অবনীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি হয়েছিল এবং সে গদ্য সবুজপত্র-নিরপেক্ষভাবেই স্বনির্ভর হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রথম গদ্যাংশটি সবুজপত্রের আগেকার, পরেরটি সবুজপত্র প্রকাশের বেশ কিছু পরেকার। কিন্তু গদ্যের ধর্ম একই আছে; অসাধারণ চিত্রময় অথচ গতিশীল, অভিজাত অথচ অন্তরঙ্গ। এ গদ্য একদিকে যেমন শৈশব-কৈশোরের বিস্ময়খচিত, অন্যদিকে তেমনি বয়স্কের বিবেচনা-বোধে ভারসাম্যময়।

এই শ্রেণীর আরো কয়েকটি বই আছে: "নালক", "বুড়ো আংলা", "আলোর ফুলকি"। এগুলিও দেশী-বিদেশী ইতিকথা বা রূপকথা-কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। এইসব কাহিনীর পুনর্বয়নে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য আরও পরিণতির দিকে এগিয়েছে। "রাজকাহিনী"র বর্ণনা-গুণের সঙ্গে মিলেছে "শকুন্তলা"-"ক্ষীরের পুতুলে"র কবিত্ব, সূক্ষ্ম ছবি আর সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য সুরের মূর্ছনা—এইসব বইগুলিতে। গভীরে রয়েছে গল্পের টান—জীবনের, প্রাণের টান, ওপরে ফুটে উঠেছে ছবি, ছবি থেকে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে সুর আর সেই সুরে ঝরে পড়ছে মানুষ, প্রকৃতি ও পশুর ওপর শ্রদ্ধা। গদ্যের ভিতর থেকে এই বিচিত্র শক্তির আমূল নিষ্কাশন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার দ্বারাই বা সম্ভব হয়েছে। তিনটি বই থেকে তিনটি উদাহরণ নিয়ে একথার সত্যতা প্রমাণ হবে আশা করি:

১। রাত ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলছেন—নমো...("নালক")

২। রিদয় টুপ ক'রে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাততালি দিতে দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পক রথের মতো! ("বুড়ো আংলা")

৩। পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ ক'রে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুকপাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' ("আলোর ফুলকি")

ধ্বনি, ছবি আর সুর—এই তিন শক্তিকে এই তিনটি বই-এর গদ্য নিঃশেষে টেনে বার করেছে।

এবং এই তিন শক্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে রূপকথার ভঙ্গিকে, গদ্য ও ছড়ার মিশ্ররীতিকে ব্যবহার করেছেন, ধ্বনিকে অর্থদ্যোতনায় মুখর ক'রে দিয়েছেন, কখনো অন্তর্লীন মিল এনে শব্দজাল বুনে তার নিজস্ব আবহের জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি।

৪

পুরোনো কিংবা অন্যের কথিত কাহিনীকে নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিতে উজ্জ্বল করেই অবনীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। এই রি-টেলিং জাতীয় লেখাগুলি লেখক হিসেবে অনেকখানি আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল তাঁর মনে। এই আত্মবিশ্বাস এক অসাধারণ কল্পনাশক্তির উন্মোচনে মুক্তি পেল। এক উদ্ভট আজগুবি জগতে সেই কল্পনাশক্তি এগিয়ে গেল। ত্রৈলোক্যনাথের কথা মনে রেখেও বলবো এই আজগুবি অদ্ভুত-কৌতুক রসের জগৎ বাঙলাসাহিত্যে তুলনাহীন, কারণ ত্রৈলোক্যনাথে সেই জগৎ ব্যঙ্গের বাহন কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ নিছক সেই উদ্ভট রসের জগৎকেই স্বাধীন স্বরাট ক'রে প্রকাশ করলেন। চিত্রকর ও কবির সঙ্গে উদ্ভটরসিক যোগ দিলেন, যোগ দিলেন মজলিশী কথক। বাক্যগুলি দীর্ঘ, অন্তর্বাক্যে ভর দিয়ে দিয়ে সেগুলি ছুটেছে, তৎসম শব্দ কমে এসেছে, অর্ধ-তৎসম মৌখিক উচ্চারণের ভঙ্গি বেড়ে গিয়ে কথকের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, লেখা-গল্পের ভাষা ছেড়ে বলা-গল্পের ভাষা পেয়ে গেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে বলেছিলেন, 'যেমন ক'রে তুমি গল্প কর তেমনি ক'রেই লেখো' তার থেকেই প্রমাণ হয় তিনি তাঁর গল্প কথন ও বয়নের নিজস্ব ভঙ্গিকে এখন থেকে পেয়ে গেলেন। "ভূতপত্‌রীর দেশ", "খাতাঞ্চির খাতা" এবং যাত্রাপালা জাতীয় অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে মধ্যে অন্য ধরনের লেখাও চলেছে যেমন পূর্বোল্লিখিত "নালক" কিংবা "মাসি"। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে —ইতিহাসকাহিনী বা স্মৃতিচিত্র- বিষয় বুঝে ভাষাপথ বদল করেছেন শিল্পী। কিন্তু যাত্রাপালা জাতীয় রচনায় তিনি ঠিক সেই বৈঠকী খোসমেজাজী মৌখিক রূপটিকে রাখবার চেষ্টা করেছেন। দু-একটি উদাহরণে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যেতে পারে :

১। আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো, কাজলের মতো কালো,—বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে-ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে; আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেট কেটে বসে গেছে; ধুলেও ওঠে না, মুছলেও যায় না,—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে। ("ভূতপত্‌রীর দেশ")

২। তিনি দেখলেন, সোনা তার আঙুটি পাঙুটি জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাকলে— 'আয় পুতু—উ— উ!' অমনি পুতু হিজুলি পাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এলো, সঙ্গে তার জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো! আলোটি ঘরের মধ্যে এসে ঝমঝমে কোরে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোণটিতে গিয়ে বসলো। ("খাতাঞ্চির খাতা")

৩। জাম্ববান বললেন, 'আহা হনুমান মলে, হয় তোমাকে নয় আমাকে জবরদস্তি লাফ

দিতে হত শত যোজন সিন্ধুলোর—সুগ্রীব ছাড়ত না!

তাই শুনে অঙ্গদ বললেন, 'চেপে যাও, কথাটা চেপে যাও।' ("চাঁইবুড়োর পুঁথি") এই বৈঠকীরীতি ঠিক প্রমথ চৌধুরীর চার-ইয়ারী কথার বৈঠকীরীতি নয়। প্রমথ চৌধুরীর রীতিতে বৈঠকী মানুষগুলি বুদ্ধির মুখোস পরে বসে, বুদ্ধির তির্যক তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে জীবনকে, জীবনের রহস্যকে যাচাই করে দেখ। কিন্তু সবুজ-যুগের সমসাময়িক কালের "বুড়োআংলা" ... "ভূতপত্রীর দেশ" কিংবা পরবর্তী কালের "খাতাঞ্চির খাতা" কি "মারুতির পুঁথি" "চাঁই-বুড়োর পুঁথি"র যে বৈঠকী ভঙ্গি তাতে অবাধ শৈশবকল্পনার বর্ণময় জগৎটি বুদ্ধির পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে, বৈঠকের শ্রোতারা বুদ্ধির মুখোস খুলে বসে কিংবা তারা বয়স্ক মুখোস পরতেই ভুলে যায়। বৈঠকের রসিকতাও বুদ্ধির তির্যকভঙ্গিতে ধারালো না হয়ে অদ্ভুত-কৌতুকের প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

৫

গল্প-স্মৃতিচিত্র জাতীয় রচনায় ("দেবীপ্রতিমা" বা "পথে বিপথের" 'গমনাগমন'-এর মতো সাধু ভাষার রচনা হলেও) অবনীন্দ্রনাথ মূলত সেই "রাজকাহিনী"র চিত্রাত্মক সংক্ষিপ্ত-কারুকার্যময় অথচ প্রবহমান বর্ণনাত্মক গদ্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। "পথে বিপথে", "ঘরোয়া", "জোড়াসাঁকোর ধারে", "আপন কথা", "মাসি" এজাতীয় বই। কিন্তু সাধুভাষার দু-একটি রচনা বাদে এই গদ্যে আরও একটি নতুন গুণ যুক্ত হয়েছে। তা হলো ওই যাত্রাপালা-অদ্ভুতরসের কাহিনীগুলির বৈঠকী ভঙ্গি। যদি "ঘরোয়া" ও "জোড়াসাঁকোর ধারে" দুটির ভাষা অবনীন্দ্রনাথের মৌখিক ভঙ্গির অন্যের লিখিত ভাষারূপ বলে বাদও দিই তাহলেও "পথে বিপথে", "আপন কথা" কিংবা "মাসি"র বর্ণনাত্মক গদ্যের তুলনা পাওয়া দুর্লভ। এই রূপময় কথাভঙ্গির ভাষা গল্পকাহিনী বর্ণনায় "পথে বিপথের" রচনাগুলির মধ্যে শুধু বৈঠকী ভঙ্গির অন্তরঙ্গ সারল্যটুকু দেখিয়েছিল। ক্রমশ স্মৃতি-চিত্র রচনায় তাঁর রূপময়তা আরও মৌখিক হয়ে এক ব্যক্তিক রূপকথার জগৎ সৃষ্টি করেছে। উদাহরণে এই পরিবর্তনের ক্রমটি স্পষ্ট হবে,

১। অনেক দূরের একটা পাহাড়, তার গায়ে এক-একটি গাছ স্থিপ্রহরে চাকা চাকা কালো দাগ ফেলেছে, যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো· এরই উপরে চির-তুষারের ধবলমূর্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। (বিচরণ· "পথে বিপথে")

২। স্মৃতির সূত্র নদীধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় এক সময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে - তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি-ছবিতে, লেখাতে, গল্পে - যদি কোনো গতিকে তারা গেলো তো বর্তে রইলো সেকাল বর্তমানেও। না হলে, পুরোনো ঝুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেলো একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে। ("আপন কথা")

৩। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পাল্কি-দোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পাল্কি-দোরের উপরে বসিয়ে দিয়ে-ছিলেম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে—ন্যাদোগোঁধা, চাঁদ ওঠার দিকে চেয়ে। ("মাসি")

পথে বিপথে কি আপনকথা-র উদ্ধৃত্ত অংশে (যদিও আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে এই মৌখিক ভঙ্গির পরিবর্তন বোঝানো যায় না) যে দু-চারটি তৎসম শব্দ ব্যবহৃত (যে শব্দগুলির বিকল্প তদ্ভব রূপ ব্যবহার করা যেতে পারে) হয়েছে, "মাসি"তে তাও নেই। গল্প-বলার এই অন্তরঙ্গ সম্পূর্ণ মৌখিকভঙ্গির লিখিত রূপ অবনীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব কীর্তি।

৬

এই মৌখিকরীতি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রবন্ধাবলীর ভাষাতেও যথেষ্ট প্রকট। অবশ্য গল্পের মৌখিক ভঙ্গি শিল্পসাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় সর্বত্র রক্ষা করা যায় না, কিন্তু জাত-লেখকের হাতে সেই ভঙ্গির প্রয়োগ যতটা সম্ভব অবনীন্দ্রনাথের লেখায় ততটাই আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় যুক্তি-তর্কের সঙ্গে অনুভব আছে, উপমার অসাধারণ প্রয়োগ আছে, যুক্তি-তর্কাতীত সত্যের প্রকাশে তিনি কবিত্বশক্তি ও কবিদৃষ্টিকে প্রকাশের পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথও সে সুযোগ নিয়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছে কথকের নিজস্ব ভঙ্গি, গল্পের রস, নাটকীয়তা। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের আলোচনাভঙ্গির আভাস পাই ; কিন্তু যেখানে তিনি স্বকীয় সেখানে তাঁর বাক্যগুলি অনেক সময়েই ক্রিয়াহীন ('আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরির তপস্যা, সমঝদারের তপস্যা' "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী"), কখনো ক্রিয়া বাক্যের অগ্রদূত ('নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছোলো মন্দিরে' - "বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী"), বিশেষ্য-বিশেষণ হয়তো বক্তব্য ফুটিয়েও ছবি জাগায়, হয়তো পুরো বাক্যটাই একটা ছবি, একটা উপমা, আগে-পরে ক্রিয়া বসে বাক্যের ভারসাম্য আনে, ছন্দবোধ জাগায় (যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমতো সুন্দর করে বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে-ঠুকেই মরে, সুন্দর-অসুন্দরের জোয়ার ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে! "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী"), ক্রিয়ার মধ্যেও আবার সাধারণ অতীতকালের বহুল প্রয়োগে ঘটনার দ্রুত-পরিণতির আভাস আনে—যেন ক্রিয়েটিভ প্রসেস চলছে আর সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা দ্রষ্টার ভূমিকায় নেমে অডিও-ভিসুয়াল রীতিতে বুঝিয়ে চলেছেন গল্পচ্ছলে—এমন একটা ভাব। যেমন,

> একদিকে রইল রস দেবার নানা উপকরণ প্রকরণ নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে যে আর্টিস্ট সে, আর একদিকে রইল রস-উপভোক্তা রসিক সে। ..এদিকে রইল বাগানের মালী, ওদিকে রইল বাগানের মালিক, মাঝে রইল ফুলের তোড়া, ফুলের মালা নানা কৌশলে গাঁথা। ("শিল্পায়ন")

একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যশিল্পতত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্যিক ভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন। 'ভঙ্গি' বলাটা হয়তো অন্যায় কারণ ওই ভঙ্গিটাই তাঁর স্বভাব। এই ভঙ্গিকে হয়তো শিল্পশাস্ত্রীরা পছন্দ করেন না; কিন্তু শিল্পতত্ত্বের মুগ্ধ উপভোগের দিকটা তিনিই আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন প্রথম। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এই রীতিকেই আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। শিল্পতত্ত্বের প্রবন্ধাবলী পড়তে পড়তে তাঁর শারীরিক উপস্থিতির বদলে তাঁর চলনবলনের ভঙ্গিটাই দেখতে পাই, খুব সাবলীলভাবে পায়ের তলার ধুলো থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত টেনে তুলে নিয়ে এসে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ বুঝিয়ে দেন তিনি

আর মুগ্ধ শ্রোতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মতোই শিশুর বিস্ময়ে রহস্যাগত রহস্য বুঝতে থাকে। শিল্পের কথাতেও অবনীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব তাঁর কথকরূপটিকে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গি যেন স্টেজের বক্তার ভঙ্গি, যবনিকা তুলে দেখান, আমরা দূরে বসি। অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গি যেন আধুনিক রঙ্গমঞ্চের ভঙ্গি, দর্শকের পাশে বসেই পট খুলে দেখান তিনি, তখন তাঁর নির্দেশ ভেসে আসে সৃষ্টির লীলা দর্শক-প্রদর্শকে মিলে, আর মঞ্চ আর প্রেক্ষাগৃহ তখন একাকার হয়ে যায়।

সংস্কৃতি সাময়িকী

বাংলা থিয়েটার ও নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি

যুদ্ধ-পূর্ব বাংলা থিয়েটারের একটাই সত্তা ছিল, দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে তার চরিত্র ছিল ব্যবসায়িক। শুধুমাত্র শিল্প-প্রকাশের তাগিদে প্রায় কখনোই সেই থিয়েটার নিয়ন্ত্রিত হয়নি। অবশ্যই এর মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের প্রায় একক প্রচেষ্টাতে বাংলা থিয়েটারে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌পরিবর্তন ঘটে, প্রথম জন্ম নেয় 'পরিচালকের থিয়েটার'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই প্রবণতায় সাময়িক দীপ্তির ছটা থাকা সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণতা পেতে পারেনি, দীর্ঘ-স্থায়ী হয়ে উঠতে পারেনি, কোন বিশেষ ধারার রূপ নিতে পারেনি। কারণ একদিকে নিঃসঙ্গ শিশির-কুমারের কাজ, ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত ছিল; অপরদিকে ছিল ব্যবসায়িক থিয়েটারের চাপ। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য রচিত শম্ভু মিত্র পরিচালিত "নবান্ন" নাটকের প্রযোজনা এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর পরে সংগঠিত হলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ; নাটক বিষয়বস্তুতে পরিবেশনায় লোকের অনেক কাছে চলে এল, জনমানসে ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা পেল। ধীরে ধীরে অন্য থিয়েটারের জন্ম হলো বাংলা রঙ্গমঞ্চে। সুপ্রতিষ্ঠিত হলো পরিচালকের থিয়েটার। রঙ্গমঞ্চ আর বিচ্ছিন্ন এককভাবে আলোকশিল্পী বা মঞ্চস্থপতি বা রূপসজ্জাকর বা আবহসাংগীতিক বা অনিন্দ্য কণ্ঠ অভিনেতার লীলাক্ষেত্র রইল না। পরিচালকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনায় সবকিছু একত্রিত হলো সর্বাঙ্গীণ সুষমায়। এল 'টোটাল থিয়েটারে'র যুগ। এই 'অন্য থিয়েটারে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য ঐকান্তিকতা, মননশীলতা ও শিল্পমনস্কতা। এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয়েই আজকের রঙ্গমঞ্চে বিপ্লব ঘটে গেছে। এই কর্মকাণ্ডের ফলেই প্রমাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেও মহৎ নাট্যকার; প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার ও শ্রীবটুকের মত নাট্যকারেরা, সোফোক্লেস, শেক্সপীয়ার, মলিয়ের, ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ, চেহভ, পিরানদেল্লো, ও'নীল, মিলার, অ্যালবী, ইয়োনেস্কো, বেকেট, ওয়েস্কার, ব্রেশ্‌ট প্রমুখ ধ্রুপদী ও আধুনিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকারদের নাটক নিয়মিত প্রযোজিত হচ্ছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে; নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শক্তিশালী পরিচালকেরা; বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, ক্যালকাটা থিয়েটার, রূপকার, শৌভনিক, নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, মাস থিয়েটার্স, নক্ষত্র, থিয়েটার গিল্ড, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, সিল্যুয়েট প্রভৃতি বহুতর গোষ্ঠী অবিরাম কাজ করে চলেছেন। বাংলা থিয়েটার আজ কর্মচঞ্চল। এই থিয়েটারের গর্ব করার মত অনেক কিছুই আছে। আছে অজস্র নিবেদিতপ্রাণ নাট্যগোষ্ঠী, আছেন দেশী-বিদেশী অনেক নাট্যকার, আছেন একাধিক দুঃসাহসী প্রযোজক, আছেন শক্তিমান সুযোগ্য পরিচালকের দল এবং অজস্র শক্তিশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী। বাংলা থিয়েটারের সত্যিই অজস্র সম্পদ। অভাব শুধু অর্থের, উপকরণের, আয়োজনের। এই ৮০ লক্ষ লোকের শহর কলকাতায় নিয়মিত রঙ্গালয়ের সংখ্যা মাত্র সাতটি। অপরপক্ষে প্যারিস শহরে থিয়েটারের সংখ্যা ষাটের ওপর, লন্ডনে পঁচাত্তরটিরও বেশী। এই সাতটি রঙ্গমঞ্চেও আবার মালিক বা পরিচালকেরা অভিনয় করে থাকেন সপ্তাহে তিনদিন। অর্থাৎ ৭টি রঙ্গালয়ে ৪ দিন করে সপ্তাহে মাত্র ২৮টি অপেশাদারী অভিনয় সম্ভব। এর ওপরে আছে অফিস ক্লাবগুলোর ভীড়। নিয়মিত রঙ্গালয়ের বাইরে অভিনয়যোগ্য মঞ্চ আছে কলামন্দির যার ভাড়া ৮০০৲, আছে এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস যার ভাড়া ৬০০৲। এছাড়া আছে সরকার পরিচালিত রবীন্দ্রসদন। ৫০-৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যখন এই মঞ্চটি তৈরী হয় তখন শোনা যায় এটি হবে জাতীয় নাট্যশালা। তা হলো না। এটির ভাড়া বর্তমানে ১০০০৲ এবং অফিস ক্লাবের থিয়েটার, যাত্রা বম্বের নাচ, ফ্যাশান প্যারেড, গীতিনাট্য, ম্যাজিক শো জাতীয় সব কিছুই এখানে হয়, যা সবচেয়ে কম হয় তা হলো ভালো থিয়েটার। পৌরকর্তৃপক্ষের ভূমিকাও এ-ব্যাপারে অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে থিয়েটারের প্রসারের ক্ষেত্রে পৌরকর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা

একেবারেই উদাহরণ নেওয়া যাক জার্মানী থেকে। জার্মানীতে (পূর্ব ও পশ্চিম অংশেই এবং সন্নিকটবর্তী অস্ট্রিয়া প্রভৃতি জায়গাতেও) এমন কোন শহর নেই যেখানে লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী অথচ পৌর উদ্যোগে নির্মিত ও পৌরপৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত রঙ্গালয় নেই। আমাদের ৮০ লক্ষ লোকের মহানগরীতে এ-জাতীয় কোন ভূমিকা পৌরসংস্থা নেননি। তাঁদের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক শুধু ট্যাক্স নেওয়ার ব্যাপারে। আমাদের কলকাতা শহরে "রয়াল শেক্সপীয়র কোম্পানি" বা "থিয়েটর নাসিওনাল পপুলেয়ার" বা "পোলিশ ল্যাবরেটরি থিয়েটার" বা "শিলার থিয়েটার" বা "মস্কো আর্ট থিয়েটার" বা "বার্লিনার অঁসম্ব্‌লে"র মতো কোন সরকারী সাহায্যপুষ্ট দল বা সংস্থা আজো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই প্রচণ্ড সরকারী ঔদাসীন্য, পৌরকর্তৃপক্ষের এই অস্বাভাবিক ভূমিকা এই নিদারুণ অভাব-অনটনের মাঝখানে কর্মযজ্ঞের সাধনা অম্লান রেখে গেছেন থিয়েটার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু শুধু ঐকান্তিকতা দিয়ে, শুধু শিল্পমনস্ক পাগলামো দিয়ে কতোদিন চালানো যায়? স্বভাবতই এত কাজের মাঝেও গত কিছুদিন ধরে ক্রমশই দেখা দিচ্ছে বন্ধ্যাত্ব, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা।

এই হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বাংলা থিয়েটারকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। অন্য কারো ওপর ভরসা রাখা আত্মঘাতী হবে বুঝতে পেরে বহুরূপী, রূপকার, নান্দীকার প্রমুখ কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে তৈরী করেছেন "বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি"। এই সমিতির সম্পাদক শম্ভু মিত্র, সভাপতি গঙ্গাপদ বসু এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছেন সত্যজিৎ রায়, উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ, বিষ্ণু দে, রবিশঙ্কর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, বাদল সরকার, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা। এই প্রতিষ্ঠা সমিতির লক্ষ্য দ্বিবিধ। একদিকে এঁরা চান এমন একটি মঞ্চ তৈরী করতে যেখানে স্থানীয় থিয়েটার প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ও বিকাশ ঘটবে অর্থাৎ যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে নির্দ্বিধায়, যেখানে ধ্রুপদী ও আধুনিক নাট্যকর্মের নির্বাধ অনুশীলন ঘটতে পারবে। অপর পক্ষে এই সমিতির উদ্দেশ্য হলো নাট্যশিল্পের মূলধারাকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচানো, তাকে সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত করা। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা তৈরী করা যেখানে নাট্যকর্মে অবাধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে, নতুন নাট্যশিক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হবে, সঙ্গীতের শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা যাবে, নতুন চিত্রশিল্পীরা ও ভাস্করেরা স্টুডিও করতে পারবেন, সহজে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারবেন, নতুন প্রয়াসের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে, নিয়মিত কবিতা-গল্প পাঠের ও শিল্পসম্পর্কিত আলোচনার বৈঠক বসানো যাবে।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে গত আটষট্টি সালে নাট্যমঞ্চ সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই তিন বছরে সমিতি শিল্পরসিকদের কাছ থেকে ১০০, করে এককালীন দান সংগ্রহ করে, সঙ্গীতানুষ্ঠান করে এবং একাধিক নাট্যোৎসব করে প্রায় ১ লক্ষ ষাট হাজার টাকার মত সংগ্রহ করেছেন।

এই কর্মনিষ্ঠার খতিয়ান ও অর্থসঞ্চয় নিয়ে গত বছর নাট্যমঞ্চের পক্ষ থেকে পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয় একখণ্ড জমির জন্য যাতে বিনামূল্যে জমি পাওয়া গেলে অবিলম্বে প্রাথমিকভাবে একটি মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। আবেদনে একথাও বলা হয় যে নাট্যমঞ্চ সমিতি তার কাজ সম্পূর্ণ করে জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীদের নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে তার হাতে পরিচালন-দায়িত্ব তুলে দেবেন। এর উত্তরে প্রথমে পৌরকর্তৃপক্ষ দেওয়ার মত জমির অভাবের কথা বলেন। তখন একাধিক জমি দেখিয়ে দেওয়াতে একটা আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, মনে হচ্ছে জমি পাওয়া যাবে, তখন হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পৌরকর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে মেয়রের ঘরে শেষ আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যমঞ্চের প্রতিনিধিরা (শম্ভু মিত্র, উদয়শঙ্কর, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা) দেখেন অভিনেতৃ সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, শিল্পী পরিষদ ইত্যাদি দলের লোকেরাও সেখানে ভাগীদার রূপে উপস্থিত। যোগাযোগ-অযোগ্যতা ইত্যাদি নানা প্রশ্নের আলোচনার পর পৌরপ্রধান জানান, তিনি পরে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আজ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক বছর পার হয়ে গিয়েছে, ভাগের মা থিয়েটার এখনো গঙ্গা পাননি। সম্ভবত পৌরকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাগীদারদের মধ্যে কারা যোগ্যতম সে সিদ্ধান্ত করে উঠতে না পারাতেই এই বিলম্ব।

আশার কথা নাট্যমঞ্চ কর্তৃপক্ষ হতাশ না হয়ে কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আশা করবো কোন একদিন বাংলা থিয়েটারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পীঠস্থান নিয়ে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

যাত্রাকর্মীদের দর্পণে

গত কয়েক বছরে, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৯৬১-৬২ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা-উৎসবের পর থেকে যাত্রার বাজার বেশ সরগরম। কাগজে যাত্রা-অভিনয়ের বিজ্ঞাপন থাকে হরদম। বেশ কয়েকবারই দেখেছি রবিবারের কাগজে সিনেমা-থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট অংশের অধিকাংশটাই যাত্রার বিজ্ঞাপনে ভরতি হয়ে আছে। টিকিট বিক্রিও প্রচুর। টিকিটের অভাবে দর্শক নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন—এমন ঘটনা তো বিরল নয়-ই, এমনকি টিকিটের জন্য মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দুটি জনপ্রিয় পালা, সোনাই দীঘি ও বাঙালীর রেকর্ড বেরিয়েছে এইচ এম. ভির মত নামী প্রতিষ্ঠান থেকে। শ্রদ্ধেয় অভিনেতা স্বর্গত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শোনা যায়, নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা অনেকে চার অঙ্কের বেতন পান। থিয়েটার জগতের ঝড়তিপড়তিরা তো বটেই, এমনকি জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্তের মত অদ্যাবধি সৃজনশীল শিল্পীরাও যাত্রা পরিচালনায় উৎসাহী হচ্ছেন। সব মিলিয়ে কী বলব: পুনরুজ্জীবন?

নীচে ইদানীং কালের যাত্রা সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য এবং এ জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া গেল। ওপরের প্রশ্নের উত্তর পেতে সুবিধা হতে পারে।

রবীন্দ্রকানন ছাড়িয়ে চিৎপুরের ট্রাম যেখানে বাগবাজারের দিকে বেঁকে গেছে সেদিকে গেলেই সারসারি সাইনবোর্ডে বিভিন্ন যাত্রা দলের নাম চোখে পড়বে: গণেশ অপেরা তারকনাথ অপেরা মীনা ভ্যারাইটিজ, শ্রীমা অপেরা, প্রভাস অপেরা, সত্যম্বর অপেরা লোকনাট্য শিল্পীতীর্থ, ভারতী অপেরা, মাধবী নাট্য কোম্পানি, তরুণ অপেরা সুশীল নাট্য কোম্পানি নিউ রঞ্জন অপেরা, জনতা অপেরা, নিউ রয়াল বীণাপাণি অপেরা নাট্যভারতী, আর্য অপেরা, নট্ট কোম্পানি, বৈকুণ্ঠ নাট্য কোম্পানি, সুতপা অপেরা, রঙ্গভারতী, কালিকাটা মিলনতীর্থ ইত্যাদি হরেকরকমের নাম। নোংরা দুর্গন্ধ গলি, ছোট্ট একটু ঘুপচি ঘর, আশেপাশে প্রকাশ্যেই বহুবিধ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম চলছে এই পরিবেশে অধিকাংশ যাত্রা পার্টির অফিস। ঘরগুলো দেখে কল্পনা করাই মুশকিল যে এর মধ্যে অন্তত কয়েকটি ঘরে হাজার হাজার টাকার লেনদেন চলে। যাত্রাজগতে অ্যামেচার বলে কিছু নেই। শিল্পীরা সবাই এসেছেন অভাবে পড়ে, চাকরির বাজার মন্দা বলে আজকাল গ্র্যাজুয়েট ছেলেরাও এ লাইনে ঘোরাঘুরি করছেন। যাত্রা দর্শকদের একটা বড় অংশ এখনও গ্রামীণ মানুষ। কিন্তু শিল্পীরা প্রায় সবাই কলকাতা কিংবা কোন মফঃস্বল শহরের বাসিন্দা। গ্রামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আর-পাঁচটা শহুরে মানুষের মত এঁরা অনেকেই রীতিমত অজ্ঞ। শো-এর জন্য ছাড়া অনেকে কখনও কোন গ্রামে যান নি। ঠিকঠিক বলতে গেলে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে যাত্রার শো-ও বিশেষ হয় না। কাজেই "গ্রামীণ সংস্কৃতি", "নাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ" ইত্যাদি কথা বলার সময় একটু সমঝে বলা ভাল। যা বলছিলাম অভিনেতা অভিনেত্রীরা সবাই পেশাদার। বেশির ভাগই মাস মাইনের চাকুরে। কোন কোন বাঁধা অভিনেতা বা অভিনেত্রী "নাইট" হিসেবে টাকা নেন। দলের অবস্থা পড়ে গেলে নো ওয়র্ক, নো পে বৈষয়িক দিকটা একজন যাত্রা-অধিকারীর জবানিতে বলি: "পাওনা-থোওনার ব্যাপারটা ঠিক হয় অভিনেতার প্রয়োজনীয়তা বুঝে। যাঁরা নতুন আসছেন, প্রথমে তাঁদের একটা ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয় আগে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারি; প্রথমেই দেখা হয়, চেহারা কেমন। তারপরের কথা হল, পর্দার জ্ঞান। মেলো অ্যাকটিং থেকে শুরু ক'রে যাকে বলে গিয়ে ন্যাচারাল অ্যাকটিং তা পর্যন্ত সব পর্দার গলা খেলে কিনা দেখে নিই। মনে ধরলে, এক সীজনের চুক্তি করি। সীজনের মাঝামাঝি বুঝে নিই কোন কোন লোকটা কাজের। তাদের তখন আগাম দিয়ে আটকে ফেলি। মহালয়া, কিংবা পুজোর সময়

থেকে সীজন শুরু হয়ে জষ্ঠিমাস অবধি টানা কাজ চলে। বর্ষাটা মন্দা যায়, তবে আজকাল তো হলের মধ্যে যাত্রা হয়, তাই ঠাউকো শো বর্ষাতেও দু-একটা হয়।" বড় বড় দলগুলো বছরে দেড়শো থেকে দুশোটার মত শো করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা, বিশেষ করে কোলিয়ারি অঞ্চল, ক্যানিং-কাকদ্বীপ-ডায়মন্ড হারবার, এছাড়া বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, মালদা ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রচুর 'কল' আসে। আর বাংলাদেশের বাইরে আসামে যাত্রার চাহিদা খুব। এক-এক বছর, এক-একটা দল এক-একটি বিশেষ রুট বেছে নেন। কেউ হয়ত কোলিয়ারি থেকে শুরু করে আসাম গেলেন, তারপর উত্তরবঙ্গ হয়ে নামলেন। আবার কেউ বা ডায়মন্ড হারবার-ক্যানিং থেকে যাত্রা করলেন। বড় গ্রাম ও শহরের দর্শকের রুচির মধ্যে আজকাল আর খুব বেশি ফারাক নেই। তবে এলাকা হিসেবে পছন্দের তারতম্য আছে। যেমন ধরুন, কোলিয়ারি অঞ্চলে, কি আসামে শরীর-দেখানো নাচ-টাচ না থাকলে দর্শকের মন ওঠে না। আবার হুগলি-হাওড়ার দর্শকেরা চান একটু রাজনীতির মিশেল। দর্শকের চরিত্র বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের রূপ বদলাতে বাধ্য। পুরনো আমলে জমিদারবাড়ির দুর্গোৎসবে কি বিবাহোৎসবে মূলত কৃষিজীবী দর্শকের সামনে যে-যাত্রা হোত, তার সঙ্গে চা-বাগিচার কুলি ও কারখানার শ্রমিক-দর্শকের সামনে অভিনীত আধুনিক যাত্রার তফাত আছে।

পুরনো আমলের যাত্রার সঙ্গে হাল আমলের যাত্রার কী কী তফাত লক্ষ করছেন জিজ্ঞাসা করায়, যাত্রাজগতের দীর্ঘদিনের বন্ধু শম্ভুনাথ সিংহ পরপর বলে যান :

(ক) "আগে, মানে আমি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি, তখন সন্ধ্যা রাত্রির সাতটা-আটটা থেকে যাত্রা আরম্ভ হোত, শেষ হোত সূর্যোদয়ের পর। আজকাল সময় অনেক কমে গেছে। অতক্ষণ যাত্রা করবে বা দেখবে, লোকের শরীরের সে তাকত কই? সে খাওয়া কই? ধৈর্যও কমে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আজকাল লোকে অল্পকথায় বুঝে যায়, অত ফেনিয়ে বলার দরকার করে না।"

(খ) এক আসির (বাচ্চা ছেলের) রোল কমে এসেছে। প্রায় উঠেই গেছে।

(গ) সাবজেক্ট ম্যাটার বদলাচ্ছে। হিটলার, লেনিন, রাহুমুক্ত রাশিয়া, নাম শুনেই তো বোঝা যায় সাবজেক্ট ম্যাটার পাল্টাচ্ছে। আমার মনে হয় তরুণ অপেরাই প্রথম এধরনের জিনিস আনল।

(ঘ) সাবজেক্ট ম্যাটার পাল্টানোর সঙ্গে টেকনিকও পাল্টাচ্ছে। সেট সিনারি, লাইটের ব্যবহার হচ্ছে। এই তো একটা পালায় সূর্য সেনের ফাঁসি দেখানো হচ্ছে। তাপসবাবুর ডিরেকশান। হরাইজন্টাল বার, সিঁড়ির ধাপ সাজিয়ে, পর্দার ওপর শ্যাডো ফেলে সূর্য সেনের ফাঁসি দেখানো হয়।

(ঙ) স্টেজে যাত্রা অভিনয় হয়।"

প্রশ্ন করি, মঞ্চে যাত্রা-অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ব্যবহার, আলোর কারসাজি এগুলো কি যাত্রাশিল্পের ঐতিহ্যবিরোধী নয়?

উত্তর, "ঐতিহ্যবিরোধী বৈ কি? কিন্তু লোক টানতে হবে তো। সব আর্টিস্টদের টাকার খাঁই আছে। সবাইকে মাইনে দিতে হবে। গভর্নমেন্টকে দস্তুরমত অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স দিতে হয়। তাছাড়া লোকে যদি চায় আলোর কারসাজি দেখতে, তাহলে ঠেকাবে কে? মঞ্চে অভিনয় কেন জানেন? পাবলিসিটির জন্য। দশ-পাঁচটা কাগজের গণ্যমান্য লোকেরা মাটিতে বসবেন? অ্যারিস্টোক্র্যাট লোকেরা মাটিতে বসতে চাইবে? আপনি চাইবেন?"

দ্বিতীয় প্রশ্ন : যে যাত্রা মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে, যাতে মঞ্চসজ্জা ও আলোর কারসাজি আছে, তার সঙ্গে থিয়েটারের তফাত কি রইল?

উত্তর : "আছে, তাও তফাত আছে। আমাদের কনসার্ট পার্টি থাকে স্টেজের ওপর। এইটেই তো একটা বড় তফাত।"

যাত্রাজগতে বড়ফণীবাবু ও ছোটফণীবাবুর পরই যাঁর নাম-ডাক সবচেয়ে বেশি, তিনি শ্রীপঞ্চু সেন। কলকাতার পাইকপাড়ায় বাংলা ১৩১৮ সালে তাঁর জন্ম। পাড়া সম্পর্কে দানীবাবুকে দাদামশাই ডাকতেন। এঁর কাছে ও লেখক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে পনের-ষোল বছর বয়স থেকে গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল ইত্যাদির কথা শুনে শুনে অভিনয় সম্পর্কে পঞ্চু সেনের উৎসাহ হয়। প্রথমে শখে করতেন, পরে অভাবের তাড়নায় পেশাদার হন। পঞ্চুবাবু গত ছত্রিশ বছর যাত্রা করছেন, এ পর্যন্ত প্রায় শ-দেড়েক পালায় অভিনয় করেছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শোভাবাজার রাজ-

বাড়ির উৎসবের পর শহুরে দর্শকের কাছে যাত্রা আবার নতুন করে জনপ্রিয় হল কেন?

উত্তরে পঞ্চুবাবু বললেন: "লোকের মনে মেলোড্রামার হাঙ্গার ছিল প্রচন্ড। সিনেমা ও চলন্তি থিয়েটার এটা সাময়িকভাবে চেপে দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু মেলোড্রামা-হাঙ্গার থাকবেই। দেখেন না, এখনও কর্ণার্জুন কিংবা সিরাজদ্দৌলা নাটক হলে হাউসফুল হয়ে যায়। মেলোড্রামা-হাঙ্গার মেটাতে পারে বলেই যাত্রা আবার নতুন ক'রে পপুলার হোল।"

প্রশ্ন করি: বর্তমানে যাত্রায় যেসব পরিবর্তন আসছে, সেগুলি আপনি সমর্থন করেন?

উত্তর: "কিছু কিছু ব্যাপার তো সাপোর্ট করিই। যেমন ধরুন, বিষয়বস্তুর পরিবর্তন। আগে মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান খুব বড় ছিল। তাই তখন যাত্রার বিষয়বস্তুও ছিল ধর্মীয়। তারপর এল ইতিহাস, আমাদের পূর্বপুরুষরা কেমন ছিলেন, কি করেছিলেন এসব থেকে নিজেদের বোঝার এবং নীতিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা। এখন মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল বাঁচার। তাই বাঁচার পথ খুঁজতে যাত্রায় রাজনৈতিক-সামাজিক প্লট আসছে। যাত্রার মাধ্যমে দেশকে বোঝার, গণচেতনা জাগানোর সুযোগ আছে। আমি নিজে খুব প্রোগ্রেসিভ আউটলুকের লোক। বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, থিয়েটারে একটা নতুন যুগ আসছে। এককালে সৌরীন চাটুজ্যে মশায়কে দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এটাকে পালা ফর্মে এনে অভিনয়ের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু কিছু হোল না শেষ পর্যন্ত, আমরা তো আর মালিক নই।"

যাত্রা ক'রে কী হয়? যাত্রার সামাজিক ভূমিকা কী?

"এই যে বললাম, গণচেতনা বাড়ানো যায়। আমাদের পুরো সমাজটা এখন বিকৃত স্তরে নেমে যাচ্ছে। হিন্দি সিনেমার খপ্পরে প'ড়ে দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মেয়েদের নগ্নরূপে দেখার জন্য লোকে পাগল। ব্যবসার সুবিধার জন্য যাত্রাতেও এসব ঢুকে পড়ছে। অনেক অভিনেত্রীও এসব চায়। আমি এসবের বাইরে যেতে চেষ্টা করছি। আমি বিদ্রোহাত্মক নাটকের ভক্ত। অনেক দিন ধরে চ গোভারা জোন অফ্ আর্ক মাথায় ঘুরছিল। তারপর ভাবলাম স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে যাই কেন? ঠিক করেছি রানী গুইদালোকে নিয়ে নাটক করব। প্রফুল্ল রায়ের পূর্বপার্বতী পড়েছি, পিয়র্সন পড়েছি। কিরণ মৈত্র মশায় পালা লিখে দিতে রাজি হয়েছেন। দেখবেন, নগ্নতা এতেও থাকবে, গুইদালো বন্য মেয়ে তো, কিন্তু যাকে বলে যৌনবিকৃতি, তা থাকবে না।"

মঞ্চে যাত্রা-অভিনয় সমর্থন করেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় পঞ্চু সেন বললেন: "না, একেবারে না। আসরে দর্শকের মুখ দেখে বোঝা যায়, দর্শক কতটা নিতে পারছে, বা আর কতটা ইমোশান দিতে হবে। আসরে একেবারে নিআরেস্ট কনেকশান দর্শকের সঙ্গে। কিন্তু অডিটোরিয়ম যে-ই অন্ধকার হয়ে গেল, অমনি স্টেজে তো আমি দর্শকের রি-অ্যাকশান থেকে একেবারে বঞ্চিত। হাততালিতে, বা হঠাৎ একটা হাসিতে হয়ত কিছুটা বোঝা গেল। কিন্তু সে কতটুকু? আসরে তো আমি সব সময় দর্শকের মুখ দেখতে পাই। স্টেজে দর্শকের সঙ্গে অ্যাক্টরের কতটুকু কানেকশান?" যাত্রায় চিত্রাভিনেতাদের চলন-বলনের অনুকরণ, থিয়েটারী আলোকসম্পাত ইত্যাদি ব্যাপারে ওঁর মতামত খুব স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করলেন একটিমাত্র বাক্যে: "আজকালকার যাত্রা, থিয়েটার আর সিনেমার জারজ সন্তান"। আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, "উপায় কী বলুন? কমার্শিয়াল ভ্যালুর জন্য সব করতে হচ্ছে। স্টেজে না করলে পাবলিসিটি পাব না। কায়দাকানুন না দেখালে লোক টানতে পারা যাবে না। দর্শকের রুচি বুঝে তো চলতে হবে। এতগুলো লোকের জীবিকার ব্যাপার!"

যাত্রা-অভিনয়ের উপযোগী কোন স্থায়ী জায়গা তৈরী করার কথা ভাবেন আপনি?

"ভাবি বৈ কি। গোল করে ঘেরা আসর, মধ্যিখানে গোল ডায়াস, ডায়াসের ধার ঘেঁষে সিমেন্ট-করা গোল গোল গর্ত। সেগুলির মধ্যে চেয়ার পেতে অর্কেস্ট্রাপার্টি বসবে। গর্তে বসার বাজনদারদের, যাতে তাদের মাথাগুলো অভিনেতাদের শরীরের কোন অংশ ঢেকে না ফেলে। দর্শকদের বসার জন্য ডায়াসের চারদিকে গোল করে গ্যালারি হবে। কবে হবে জানি না। হয়ত কোনদিন হবে।"

সরকারের কাছে কী ধরনের সাহায্য চান প্রশ্ন করায় বললেন: "সরকার একটু স্থিরতা এনে দিন। বর্তমান পরিস্থিতি একটু বদলাক। আমাদের কাজকর্মের সুবিধা হোক। নিজের জন্য আর কী চাইব? আমার জীবন ধন্য। এখন প্রার্থনা করি বড়ফণীবাবুর মত যেন যেতে পারি। "বাঁশের কেল্লা" পালায় অভিনয় করছিলেন ফণীবাবু। 'বাদশা আমার' বলে চীৎকার করে সেই যে পড়লেন,

আর উঠলেন না! কত সাধনা করলে তবে অমন পোশাক গায়ে দিয়ে অমন করে যাওয়া যায়!"

যাত্রাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ও গায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্তকেও সাম্প্রতিক যাত্রার বিষয়বস্তু ও রীতি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, পুরাণ-ইতিহাস বাদ দিয়ে বর্তমান কালের কথায় চলে আসার ব্যাপারটা ওঁর ভাল লাগে। পালার বিষয়বস্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক হলে মনে হয়, নিজের কথা অনেক বেশি ক'রে ফোটাতে পারছেন। কিন্তু গানের সংখ্যা কমে যাওয়া ওঁর মতে দুর্লক্ষণ। বললেন, "যাত্রার আদত নামই হল পালাগান। গানের সংখ্যা কমে গেলে যাত্রা থিয়েটারঘেঁষা হয়ে যায়।" মঞ্চে যাত্রা-অভিনয় উনি সমর্থন করেন না। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খোলা জায়গায় গোলমালের আশঙ্কা, প্যান্ডেল করার বিরাট খরচের ধাক্কা ইত্যাদি অসুবিধার জন্য আপাতত মঞ্চে করা ছাড়া উপায় নেই বলে মনে করেন। কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায় যে সাম্প্রতিক যাত্রার যেসব বিকৃতি নিয়ে আমরা অভিযোগ করি—যেমন, মঞ্চে অভিনয়, দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার, আলোর কায়দা, অভিনয় মেকী অস্বাভাবিকতা, চিত্রাভিনেতাদের অনুকরণ ইত্যাদি, সেগুলি সম্পর্কে সৎ যাত্রাশিল্পীরাও অনেকেই খুব অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু দুঃখের কথা, এ অবস্থা পাল্টানোর জন্য এ যাবৎ কোন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল যাত্রাজগতে টাকা তথা মালিকের প্রাধান্য। মালিকরা অনেকেই যাত্রাকে কেবল একটা ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন, এ শিল্পের জন্য তাঁদের কোন দায় নেই। এ ব্যবসা ফেল পড়লে তাঁরা মাছ, আলু বা অন্য যে কোন কিছুর ব্যবসা খুলবেন, এইরকম একটা মনোভাব তাঁদের। পেশাদারী থিয়েটারের অবস্থাও হয়তো তাই। কিন্তু বাংলাদেশে পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে যে মস্ত বড় একটা জগৎ আছে, সে জগতে কর্তৃত্ব করেন শিল্পী ও পরিচালক, মালিক নামক বিভীষিকাটি সেখানে অনুপস্থিত। এইসব শিল্পীদের অধিকাংশেরই অন্য জীবিকা থাকায় তাঁদের শারীরিক কষ্টের, পরিশ্রমের অন্ত নেই ঠিকই, কিন্তু টাকার জন্য সব করতে হবে, এরকম মনোভাব থেকে তাঁরা অনেকাংশে মুক্ত। অপর পক্ষে যাত্রাজগতে সবাই পেশাদার অভিনেতা। মালিকের টাকার অনেকটাই যায় নামী অভিনেতাদের পেট মেটাতে। বয়স পড়ে এলে, পার্ট থাকার গ্যারান্টি হিসেবে এইসব অভিনেতারা কেউ কেউ দলের নতুন পালার জন্য টাকা দাদন দেন। কিন্তু এর বাইরে দলের যাত্রা-শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার কথা এঁরা চিন্তাও করেন না। কারণ কে কখন কোন দলে থাকবেন, তার কোন স্থিরতা নেই। বার বছর একদলে কাজ করার পর বারটাকা বেশি পেলে অনেকেই অন্য দলে চলে যান। তাঁরা জানেন রোগ অক্ষমতা-বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়লে দলও তাঁদের পুছবে না। কাজেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই চান, বয়স থাকতে মোটা টাকা পিটিয়ে নিতে। এঁরা একটা ব্যাপারে ভুল করছেন। এঁরা বুঝতে চাইছেন না যে যাত্রা যে পথে যাচ্ছে, সে পথে চললে আর কিছুদিন পরে এ তৃতীয় শ্রেণীর থিয়েটারে পরিণত হবে। সিনেমার নকল ক'রে তো সাত্যি ওরা সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না, এবং তখন আর মোটা টাকা দেওয়ার লোকই থাকবে না, অথাৎ দর্শক থাকবে না। শুধুমাত্র লাভজনক ব্যবসা হয়ে থাকতে গেলেও যাত্রাকে সিনেমা থিয়েটারের থেকে আলাদা কিছু দিতে হবে, অর্থাৎ যাত্রার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে। যাত্রা-অভিনয়ের উপযোগী একটি স্থায়ী জায়গা তৈরী ক'রে এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এককভাবে কোন শিল্পী বা কোন একটি বিশেষ দলের পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব। আর বিভিন্ন যাত্রাদলের মধ্যে রেষারেষি এত বেশি যে যৌথ উদ্যোগে কোন কিছু করার মত মানসিকতা নেই তাঁদের। ভাবতে অবাক লাগে যে এব্যাপারে যাত্রা-শিল্পীসংঘেরও কোন ভূমিকা নেই। আসল কথা সমস্যাগুলো শুধু বাইরের নয়, সর্ষের মধ্যেই ভূত। যাত্রা-শিল্পীদের নিজেদের ভিতরেই মূল্যবোধের সংকট আছে। এই প্রতিভাবান যাত্রা-অভিনেতাও ভুল উচ্চারণে, মানে না জেনে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের মোহ ছাড়তে পারেন না, গ্রামের জমিদারের ভূমিকাভিনেতা ড্রেসিং গাউন পরেন, মেয়েদের নাচে টুইস্টের আদল আসে, পরিচালকরা তাপস সেনকে দিয়ে আলোকসম্পাত করান, থিয়েটারের নকল ক'রে মনে মনে গর্ব অনুভব করেন। এই প্রচ্ছন্ন গর্ববোধের উৎস সন্ধান করতে গেলে অবশ্য কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। কারণটা বোধহয় এই যে সাহেবদের উচ্ছিষ্ট খেতে আমরা বড় বেশি পছন্দ করি। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই উচ্ছিষ্টভোজনজাত অস্বাস্থ্য ও অসামঞ্জস্যের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে উল্লিখিত গল্পের নায়কের মত অবস্থা

আমাদের। সে বেচারী সারা শীতকাল অল্প অল্প ভিক্ষে ক'রে যখন গরম কাপড় কেনার মত পয়সা জোগাড় করত, ততদিনে গ্রীষ্ম এসে পড়ত, আবার সারা গ্রীষ্ম ভিক্ষে ক'রে যখন সুতোর জামা কিনে উঠতো, ততদিন পৌষ মাস এসে গেছে। আমাদেরও সেই অবস্থা। 'ন্যাচারালিজম্' ব্যাপারটা আমাদের থিয়েটারে এসেছে সাহেবদের কাছ থেকে ধার ক'রে। আবার থিয়েটার থেকে ধার ক'রে আসছে যাত্রায়। এদিকে সাহেবরা কিন্তু ইতিমধ্যে ন্যাচারালিজম্-এর সংকীর্ণ পরিধি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আলোর কারসাজি, তথাকথিত "ন্যাচারাল অ্যাকটিং" আর মঞ্চের ড্রয়িংরুমকে ঠিক বাস্তবের ড্রয়িংরুমের মত করে সাজানোর ছেলেমানুষি ছেড়ে দিচ্ছে। আর যাত্রা-শিল্পীরা সেই সাতবাসি ন্যাচারালিজম্কে এনে ঢোকাচ্ছেন এমন একটি শিল্পমাধ্যমে, যার প্রধান গুণই ছিল কল্পনার মুক্তি, যে মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারাকে পুষ্ট করেছিল। তলোয়ারের খাপে খাঁড়া ঢোকানোর নিষ্ফল প্রচেষ্টায় তাঁরা নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছেন। কিছুটা হয়ত অবস্থার চাপে---কিন্তু বাইরের জড় প্রতিকূলতাকে নিজের প্রাণশক্তির তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়াকেই তো বলে পুনরুজ্জীবন। শিল্পের প্রতি যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং যে আত্মমর্যাদাজ্ঞান এই প্রাণশক্তিকে বজায় রাখতে পারে, যাত্রাজগতে তার অভাব আছে বলেই, হিটলার লেনিন ইত্যাদি আপাত-আধুনিক বিষয়বস্তুর আড়ালে যাত্রা আজও এক বস্তাপচা পুরনো মূল্যবোধের আড়ত হয়ে আছে। টিকিট বিক্রি, নাম-ডাক, বিদেশে আমন্ত্রণ ইত্যাদি মিলিয়ে বাইরের চাকচিক্য বজায় থাকছে ঠিকই, কিন্তু একটা শিল্পের পুনরুজ্জীবন বলতে কি শুধু এই বোঝায় ?

ভবিষ্যতের রূপ

আমরা যে সমাজে বাস করি সেই সমাজে মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখে বস্তু হিসেবে দেখা হয়। কারখানায় শ্রমিক উৎপাদনের উপকরণমাত্র, সেখানে তার পরিচয় সে কত নম্বর কর্মী। ব্যাঙ্কে আমরা টাকা তুলতে টাকা জমা দিতে দু'নম্বর কাউন্টারের ব্যক্তির কাছে বা ছ'নম্বর কাউন্টারের ব্যক্তির কাছে যাই। স্কুলে তবু ছাত্রছাত্রীর নাম থাকে, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু রোল নম্বর। দেশের লোকের খবর পেতে হলে পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় দেশে কত কোটি লোক বাড়ল, তার কত কোটি পুরুষ, নারী, ১৮ বছর বয়সের কম ইত্যাদি। কলকাতার মারামারিতে কে রোজ মারা যাচ্ছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় না, জানা যায় শুধু কতজন মারা গেল, কোন্ দলের তারা। ছেলেরা সংসারের উপার্জনের উপকরণ, মেয়েরা সংসার চালানোর অথবা যৌনতার।

মানুষের এইভাবে বস্তুতে রূপান্তর সাহিত্যে প্রতিভাত হতে বাধ্য। নাটকে উপন্যাসে একটা ব্যাপ্তি থাকে বলে সেখানে মানুষের এই বস্তুতে রূপান্তর হঠাৎ চোখে পড়ে না। কিন্তু ছোটগল্পে পরিসর ছোট বলে এটা নগ্নভাবে চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক বাঙলা ছোটগল্প লেখকরা যারা নিষ্ঠাভরে তাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চাইছেন, তাঁদের লেখায় তো আরও বেশি। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

শেখর বসু (দশটি গল্প) তাঁর চরিত্রদের নাম পর্যন্ত দিতে চান না, তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকাকে চিহ্নিত করেন, যেমন গোঁফ, হাওয়াই শার্ট, সাদা পাঞ্জাবি, হলুদ স্কার্ফ, নীল ব্লাউজ বলে। বলরাম বসাকের (কার্পেট) গল্পে নায়কের নাম নেই, তাকে কে ডাকে মানুষ মানুষ বলে, ছেলে মাকে ডাকে 'এই নারী এই নারী'। কল্যাণ সেন (পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন) 'তাদের' পরিচয় দেন 'তারা চারজন' বলে। অমল চন্দ (বারান্দা) তাঁর গল্প শুরু করেন এইভাবে 'এখানে আমি, আঙটি, ও ঘড়ি একসঙ্গে থাকি। আমরা কথা বলতে পারি না, কেননা ..। আমরা শুনতে পাই না ..কেননা। আমরা দেখতে পাই না ..কেননা।" সুনীল দাশের (স্বরচিত প্রতিবিম্ব) গল্পে নায়ক নায়িকার কাছে মন হালকা করতে চায়, কিন্তু নায়ক নায়িকার পরিচয় যুবক যুবতী, তার বেশি নয়।

যেসব লেখকের এবং তাঁদের গল্পসংকলনের কথা বলা হলো, তাঁরা যে সবাই একই জাতীয়

গল্প লেখেন তা নয়, বা তাঁদের গল্প যে রসোত্তীর্ণ তা-ও নয়। বরং এঁরা প্রায় সবাই এখনও হাত মক্স করার পর্যায়েই আছেন। তবে সাহিত্যসৃষ্টিতে সফল না হলেও একথা বলা যায় যে এঁরা চেষ্টা করছেন এঁদের জীবনদর্শন গল্পের মধ্য দিয়ে পেশ করতে।

নায়ক-নায়িকা বা চরিত্রের শরীর থেকে এই নাম অপহরণের মূলেই আছে বর্তমান সমাজের মানুষের স্বাতন্ত্র্য লোপের ব্যাপারটা। তাই চরিত্রকে কোন বিশেষ নামে চিহ্নিত করা এঁরা বাহুল্য অথবা অসত্য বলে মনে করেন। সব মানুষই যখন এক এবং প্রায় রোবোটে পরিণত তখন নাম দিয়ে তার বিশেষায়িত করা কেন? এই নতুন গল্পলেখকেরা আমাদের সাবেকি গল্পলেখকদের চাইতে অনেক বেশী মননশীল। এঁদের চোখে মানুষের মনুষ্যত্বলোপ অনেক সহজে ধরা পড়েছে। আমাদের আগেকার লেখকেরা এটা বুঝতে পারেননি, তাই তাঁরা সাবেকি ঢঙে প্রত্যেক চরিত্রের আলাদা নাম দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের ব্যক্তিরূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও মানুষের স্বাতন্ত্র্যলোপের ঘটনাটাই সত্য, তাই তাঁরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই কথা বলা নয় যে আগেকার দিনের তুলনায় আজকালকার লেখকেরা ভালো লিখছেন। বরং যাঁদের নাম করা হলো, তাঁরা তাঁদের নতুন দর্শনের দম্ভে তাঁদের বক্তব্য পরিবেশনে যথেষ্ট সাধনা করেননি। অনেকেরই ভাষাজ্ঞান নেই, কারো গল্প লেখার হাতই নেই, কারো চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা নেই। অনেকেরই সম্ভবত ধারণা ছোটগল্প যেহেতু একটি আইডিয়া, একটি অনুভব, একটি আবহাওয়া তোলার ব্যাপার, যেহেতু ছোটগল্প লেখকের মনের একটি মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ, যেহেতু ছোটগল্পে গল্প বানিয়ে তোলার কোন অবকাশ নেই, মুহূর্তকে খণ্ডকে চকিত আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত করাই আসল, অতএব এখানে গল্প বলার দায় নেই, চরিত্রসৃষ্টির দায় নেই, বিন্যাসের দায় নেই।

এঁদেরই সমসাময়িক দুজন গল্পকার কিন্তু শক্তিধর। উদয়ন ঘোষ (অবনী বনাম শান্তনু) এবং সুনিমল মিত্র (হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি)। এঁদের আলোচনা করার আগে সম্ভবত মানুষের বস্তুতে রূপান্তরণ সম্পর্কে আর একটি কথা বলা দরকার।

যে রাজনীতিতে অর্থনীতিতে মানুষ বস্তু বলে গণ্য, তা ভালো হোক মন্দ হোক, সাহিত্যে যখন তা প্রতিফলিত হয় তখন তাকে সত্য বলে আমাদের স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে ওঠে, যা চিরকালই উঠেছে, বিভিন্ন কালে যার জবাব বিভিন্নভাবে এসেছে। আমাদের কালে আমাদের সমাজেও এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরই দিতে হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কী সম্পর্ক? সাহিত্য কি সমাজের প্রতিফলনমাত্র অথবা আরো কিছু? উত্তর অবশ্যই এই, সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন তো বটেই এবং আরো কিছু। প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই বস্তাপচা মনে হয়, অথচ ভালো করে ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে সাহিত্যিকেরা সমালোচকেরা সংভাবে এর উত্তর দিলে পাঠকদের এ নিয়ে অপ্রাপ্তিজনিত অসন্তোষের কারণ ঘটত না।

অতীতের এবং বর্তমানের বিশ্লেষণ আমরা সাহিত্যে যেমন পাই, তেমনি পাই বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানে যেটা পাই না, তা হলো ভবিষ্যতের পরিচয়। বিজ্ঞানের উপর সাহিত্যের জয় এইখানেই। অতীত বর্তমান আমাদের দেয় জ্ঞান। ভবিষ্যৎ দেয় সৌন্দর্য। শুধু সচেতনতা, শুধু বিশ্লেষণ, শুধু জ্ঞান দিয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না, যদিও সচেতনতা, বিশ্লেষণ, জ্ঞানের ভিত ছাড়া সাহিত্য সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের আভাস দেয় বলেই সাহিত্য সুন্দর নতুবা সাহিত্য সমাজদর্শন বা ইতিহাস হতো। ভবিষ্যতের আভাস সাহিত্য দেয় বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে নয়, দেয় ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়।

আমাদের সমাজে মানুষ মানুষেতর জীবে পরিণত হয়েছে, সাহিত্যিকেরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য, নতুবা তাঁরা সামাজিক বাস্তবতা রক্ষা করবেন না। কিন্তু মানুষ মানুষেতর জীবে পরিণত হলেও, মানুষ সবসময় এই রূপান্তর স্বীকার করে নিচ্ছে না। অনেক মানুষই সজ্ঞানে অজ্ঞানে মানুষকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে, বহির্জগতে, অন্তর্জগতে, কাজে স্বপ্নে, আশায় আকাঙ্ক্ষায়। এটা যদি সত্য না হতো তাহলে মানুষের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ হিসেবে মানুষের বাঁচা থেমে গেছে, এটা সত্য নয়, কোথাও কোথাও, হয়ত বেশির ভাগ জায়গাতেই

মানুষের অগ্রসরতা স্তব্ধ হয়ে গেলেও, পুরো মানুষ জাতটার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেছে, এটা স্বীকার করা কঠিন। যাঁদের মধ্যে মানবতাবোধ এখনও অটুট আছে, মানুষে বিশ্বাস আস্থা হারান নি, তাঁরা মানুষকে বস্তুতে রূপান্তরিত দেখে আঘাত পেয়েছেন পাচ্ছেন কিন্তু তা স্বীকার করে নেন নি। কাফকা বেকেট সার্ত্র মানুষের বস্তুতে রূপান্তরণ দেখে তাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন, তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী। কিন্তু তাঁদের অন্ধকার সাহিত্য আমাদের দমিয়ে দেয়, তাঁদের সাহিত্যজগতে প্রবেশ করে আমাদের দমবন্ধ হয়ে যায়, বাঁচার অভিলাষ জিইয়ে রাখা মুশকিল হয়। অথচ আমরা সকলেই বাঁচার চেষ্টা করি, বাঁচার স্বপ্ন দেখি। যদি কাফকা বেকেট সার্ত্র পুরো সত্যটাই উদ্ঘাটন করে থাকতেন তাহলে আমাদের এই স্বপ্নদেখাটা কী করে সম্ভব? এঁরা সত্যকে দর্শন করেছেন, কিন্তু আংশিকভাবে। তাঁদের সাহিত্যজগৎ সত্য কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। সাহিত্যের দরবারে এঁরা সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন না, সাহিত্যিক মনের ঐতিহাসিক বলেই চিহ্নিত হবেন। ভবিষ্যতের মানুষ এঁদের সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাবেন না, আনন্দময় সাহিত্য যা উজ্জীবিত করে মানুষকে, প্রেরণা দেয়, তা এঁদের নয়। শেকসপীয়ারের অন্ধকারতম দুঃখের সাহিত্যেও আশার আলো কখনও নির্বাপিত হয়নি। তাই আজও আমরা শেকসপীয়ার পড়ে আনন্দ পাই, খুঁজে পেতে শেকসপীয়ার পড়ি। যদি না পেতাম, তাহলে আমরা শেকসপীয়ারকে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের ঐতিহাসিক বলে গণ্য করতাম, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজদের আত্মিক অবনতির সাক্ষ্য বলে মেনে নিতাম কিন্তু চিরকালের মানুষের সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতাম না।

আমাদের নবীন ছোটগল্প লিখিয়েদের এটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। উদয়ন দক্ষ শিল্পী। তাঁর গল্পের নায়ক নিজেকে চিনতে পারে না, নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে, পরিচিত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কেউই তাকে চিনতে পারে না, সেও অন্যকে চিনতে পারে না, সব মেয়েকেই নিজের স্ত্রী বলে ভুল করে। মানুষের এই আইডেনটিটি, পরিচয় হারিয়ে ফেলা উদয়ন নিপুণ শিল্পীর মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও এই অ্যান্টি হীরো প্রবণতা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহু দিন ধরে চলছে, আমাদের দেশেও নিতান্ত নতুন নয়, তবু উদয়নের গল্প পড়ে থমকে পড়তে হয় তার কারণ এই পরিচয়ের নিতান্ত উপলব্ধি উদয়ন আত্মস্থ করেছেন। যার ফলে তাঁর লেখা অনুকরণ মনে হয় না, বোঝা যায় এটা তাঁর নিজস্বই। তাঁর ভাষা অনবদ্য, গল্প বলার ঢঙে একটি সহজ সাবলীল গতি আছে, তাঁর ইমেজে মনে কলকাতার বাঙালার রূপ স্বচ্ছ, তাঁর প্রেমহীনতা অনীহা প্রবল শক্তিতে প্রকাশিত। অথচ শেষ পর্যন্ত মনে হয়, এই মর্বিডিটিই তাঁর কাল হয়ে উঠেছে। অতীত আর বর্তমান তাঁকে এমন এক নির্মোহ জগতে নিয়ে গেছে যা থেকে বেরুতে পারা তাঁর নিতান্ত দরকার আপন স্বাস্থ্যের জন্য। মানুষের বস্তুরূপে রূপান্তরিত হওয়া ব্যাপারটা তাঁকে এক অন্ধগলিতে নিয়ে গেছে। গলিটি নেই, তা নয়, কিন্তু গলিটি অন্ধ। যে জন্য তাঁর কাছে সময় স্তব্ধ। মানুষ নামগোত্রহীন। তাঁর কাছে এটাই অস্তিত্বের ফ্যাক্টটি মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা অস্তিত্বের বহিঃরূপ। অস্তিত্বের অন্তঃরূপও আছে, যা থেকে তিনি বঞ্চিত যেহেতু তিনি মানুষের সমাজের ইতিহাসের গতিময়তা লক্ষ করছেন না, ভবিষ্যৎ-এর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করছেন না। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অসঙ্কোচে বলা যায়, বর্তমান বাঙলা গল্প-লেখকদের মধ্যে উদয়ন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতোই, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে, ফর্মহীন অন্তঃসারহীন গল্পের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শেখর বসু, বলরাম বসাক, কল্যাণ সেন, অমল চন্দ, সুনীল দাশও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের শক্তিহীনতার জন্য তাঁদের আত্মকথন বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। উদয়নের আত্মকথন এঁদের তুলনায় আরো সরব, অথচ ভালো লাগে তার কারণ উদয়নের বৈদগ্ধ্য।

তুলনায় সুবিমল মিশ্র উদয়নের মতো শক্তিমান নন। তাঁর ভাষা ততটা পরিশীলিত নয়, তাঁর দর্শন উদয়নের মতো টান সহ্য করতে পারে না, অনেক তাড়াতাড়ি সুবিমলের গল্প ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবিমলের গল্পের জোর বেশি, তার কারণ সুবিমলের লেখায় ঝাঁঝ বেশি, ক্রোধ বেশি, উত্তাপ বেশি। তিনিও লেখেন, 'লেখক আর রাস্তায় পড়ে থাকা ইঁদুরটি একই আকাশের নীচে একই আলোর তলায় অতি দ্রুত পচে যাচ্ছে' কিন্তু এই পচে যাওয়াটা সুবিমল স্বীকার করে নিতে পারছেন না। তাই তিনি এটা বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন না যে হারান মাঝির বৌয়ের মড়া না সরালে সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল পাওয়া যাবে না, তাই দেখনচাচাকে মারতে মারতে ফেলে দিলেও, দেখন-

চাচার ঠোঁটে রক্তাক্ত হাসি লেগে থাকে, ভিখিরির রক্তে চিহ্ন করা নিশান মনুমেন্টের ওপর পৎপৎ উড়ল সারারাত।। উদয়ন তাঁর মত জগৎটা মেনে নিয়েছেন, তাঁর ক্রোধ নেই অনীহা আছে। সুবিমলের অনীহা অনীহাতে থেমে থাকে নি, ক্রোধে পরিণত হয়েছে, যা থেকে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায়। উদয়ন মানুষের ইতিহাসে আস্থা রাখেন না, তাই ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে অবান্তর। সুবিমল হাল ছেড়ে দেননি। তাই উদয়নের দক্ষতার সমান দক্ষতা সুবিমলের না থাকলেও, তাঁর ভাষা অতটা তীক্ষ্ণ অতটা মার্জিত অতটা বক্র না হলেও, শেষ পর্যন্ত সুবিমলের লেখাই মনে দাগ রেখে যায়।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সাংবাদিকতা এবং উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে

দেবেশ রায়কে ধন্যবাদ, সাংবাদিকতা এবং উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছেন এবং আমার কয়েকটি ভ্রান্তি নিরসন করার সুযোগ দিয়েছেন। ভ্রান্তিটা অবশ্য কার সে বিষয়ে আমি তাঁর প্রশ্নগুলো শুনেও নিশ্চিত হতে পারছি না। সাংবাদিকতা এবং উপন্যাসের সম্পর্কে আমার কথাগুলো নেহাতই আমারই, কিছুকাল ধরে বাঙলা উপন্যাস পড়তে পড়তে আমার যা মনে হয়েছিল। এই আলোচনার সাহায্যে তা হয়তো কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে আসবে। তবে বলে রাখা ভালো, আমার পূর্ব রচনার কোন কথাই আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না, অর্থাৎ দেবেশের প্রশ্নগুলো শুনেও ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

আমার লেখা পড়ে দেবেশ লজিকের বিভ্রাটে পড়েছেন। আমার মনে হয় মেটেরিয়াল লজিক ত্যাগ করে ফর্মাল লজিক আশ্রয় করার জন্যই তাঁর এই বিভ্রাট। তবে তাঁর ফর্মাল লজিকও ছিদ্রহীন নয়।

সাংবাদিকতা কাকে বলে, উপন্যাস কাকে বলে, তার আলোচনায় আমি এই সূত্রগুলি নিয়েছিলাম। উপন্যাস অখণ্ড জীবন নিয়ে, সাংবাদিকতা খণ্ড জীবন নিয়ে। ঔপন্যাসিক তাঁর বর্ণিত ঘটনা দেশের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মেলান, সাংবাদিক মেলান না। ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র দেশের বিশেষ চরিত্রগোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়, সাংবাদিকের হয় না। উপন্যাসে শান্তি আছে সান্ত্বনা আছে, সাংবাদিকতায় নেই।

এই চারটি সূত্রের প্রথম ও শেষটি নিয়ে দেবেশ কোন আলোচনা করেন নি। মধ্যের দুটিকে বদল করেছেন। শুধু বদল করেছেন তা নয়, দুটোকে তিনি উলটে নিয়ে গ্রহণ করেছেন। আমি তজ্জন্য দায়ী নই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, এখন যা মনে হচ্ছে তাতে আমার প্রথম আলোচনাতেও বলা ভালো ছিল, তা হলো, সাংবাদিকতা এবং উপন্যাস এই কথাদুটিতে কোন মূল্যমান আরোপ করা উচিত নয়। সাংবাদিকতা অতি উচ্চস্তরের হতে পারে, উচ্চস্তরের সাংবাদিকতার আবেদন উচ্চস্তরের উপন্যাসের সমকক্ষও হতে পারে, যেমন উচ্চস্তরের প্রবন্ধ, কবিতা নাটক উচ্চস্তরের উপন্যাসের সমকক্ষ। তাই বলে প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা আর উপন্যাস একগোত্রের নয়। সাংবাদিকতা এবং উপন্যাসও একগোত্রের নয়। দুয়ের ফর্ম আলাদা। সুতরাং অসীম রায় বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বা মতি নন্দীকে সাংবাদিক বলায় এবং ঔপন্যাসিক না বলায় তাঁদের রচনায় কোন মূল্যমান আরোপ করা হয় নি। বলা চলতে পারে অবশ্য, সন্দীপন মতি উচ্চস্তরের সাংবাদিক, অসীম রায় নন। সেটা নির্ভর করেছে, তাঁদের ফর্মে কে কতোটা সিদ্ধহস্ত তার উপর।

দেবেশের প্রশ্ন থেকে প্রথমে ফর্মাল লজিকের গলতিগুলো উল্লেখ করছি। তিনি নিশ্চয়ই ঘটনা থেকে ঘটনাস্রোতকে আলাদা করেন নি এবং মূল ঘটনাস্রোত কথাটির তাৎপর্য বিচার করেন নি। ঔপন্যাসিক যে কোন দেশের, যে কোন কালের ঘটনা লিখতে পারেন, যথা প্রাচীন বা বর্তমান, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু যে দেশের এবং যে কালের ঘটনা, বাস্তব বা কাল্পনিক, নিয়ে তিনি লিখছেন, তা যদি সেই দেশের বা সেই কালের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয় তবে তার আবেদন কালজয়ী হতে পারে না। সাংবাদিকের সেই দায়িত্ব নেই। তিনি দৈনন্দিন ঘটনা লিপিবদ্ধ

করে যাচ্ছেন, একটার সঙ্গে আর-একটার যোগ আছে কি নেই তা বিচার করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় না। তাই অধিকাংশ ঘটনার বিবরণ পরের দিন বা পরের মাসে বা পরের বছর বাসি মনে হয়। উপন্যাস বাসি হয় না। মূল স্রোত অর্থাৎ সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ যা থেকে অন্যান্য ঘটনা গতিলাভ করে তার সঙ্গে যোগাযোগ না দেখাতে পারলে ঔপন্যাসিক পূর্ণ চিত্র হারিয়ে ফেলেন, ফলে তাঁর জগৎ তৈরি করতে অসমর্থ হন। দেবেশ যে সমুদ্রের মৌন সাধনাকে মূল ঘটনাস্রোত নিরপেক্ষ মনে করছেন, সেই সাধনা যদি উপন্যাসপদবাচ্য হয়, তাহলে দেবেশ নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, তার সঙ্গে দেশের বা কালের মূল ঘটনাস্রোতের কোন না কোন যোগ আছেই। কবির রোমান্টিকতা হঠাৎ মনে হতে পারে, দেশকালনিরপেক্ষ। কিন্তু তাই কি? তাহলে এলিজাবেথীয় রোমান্টিকতা শেলীর রোমান্টিকতা, রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতা এবং হেমিঙওয়ের রোম্যান্টিকতায় এতো পার্থক্য কেন? পৃথক, কারণ, তাঁদের প্রত্যেকের আপন দেশের, আপন কালের ঘটনাস্রোতের প্রভাব।

দেবেশের ফর্মাল লজিকের দ্বিতীয় গলতি পরিষ্কার, আমার উপন্যাস-সাংবাদিকতা-সম্পর্কের তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে বক্তব্যে। উপন্যাস বা নাটকের সর্বজনবিদিত চরিত্রগুলো একই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিসত্তায় উজ্জ্বল আবার নিজ দেশের নিজ কালের প্রতিভূ। হ্যামলেট বললে বলে দিতে হয় না যে শেকসপীয়ারের নাটকের চরিত্র, এমনই জীবন্ত চরিত্রটি। তার এই স্বতন্ত্র চারিত্র্যের সঙ্গে, হ্যামলেট আবার শেকসপীয়ারের কালের ও দেশের প্রতিনিধি, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের গোরার ব্যক্তিসত্তা যেমন পরিষ্কার, আবার তার সামাজিক প্রতিভূত্বও পরিষ্কার, বুর্জোয়া জাতীয়তার প্রতিভূত্ব। যে কোন সার্থক চরিত্রের আলোচনা করলেই তার দেশ-কালের প্রতিভূত্ব বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এই প্রতিভূত্ব না থাকলে চরিত্রটি বাস্তব হতে পারে না, তা অসত্য হয়ে দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, দেবেশ টাইপ অর্থে প্রতিভূত্ব কথাটি গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর আপত্তিকর মনে হয়েছে। কিন্তু টাইপ অর্থে গ্রহণ করলেও, যা আজকের উপন্যাসের অনেক অ্যান্টি-হীরো, সেই টাইপ চরিত্র আধুনিক অনেক ঔপন্যাসিকের ইচ্ছাসৃষ্ট। অনেক অসার্থক ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন টাইপ হয়ে ওঠে, আবার অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই টাইপ চরিত্র তৈরি করেন। নাটক থেকে একটা সহজ উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের দাদাঠাকুরের দল। এদের ব্যক্তিসত্তা তেমন প্রবল নয়, কিন্তু তাই বলে সামাজিক প্রতিভূত্ব নিশ্চয়ই অনুপস্থিত নয়। সামাজিক প্রতিভূত্বের নিতান্ত প্রয়োজন, ব্যক্তিসত্তা ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের মর্জিমতো।

ফর্মাল লজিক বাদ দিয়ে এবার মেটেরিয়াল লজিকে আসা যাক। দেবেশ বলেছেন, অসীম রায় তাঁর "শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসে মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রীর ছেলের রাজনীতি, মন্ত্রীর ভাইপোর ডটস্পতো এগুলো দেশকালের মূলঘটনার সঙ্গে মিলিয়েছেন। তাহলে এই উপন্যাসকে সাংবাদিকতা আখ্যা দেওয়ার কী অর্থ।

অর্থ তো আমার রচনায় পরিষ্কারভাবে বলাই আছে। অসীম রায়ের উপন্যাসের বিষয়টিই ভ্রান্ত, অসত্য। সুতরাং তা দেশকালের প্রতিভূত্ব করতে সক্ষম নয়।

আমার যে তিন লাইনের সংক্ষিপ্তসার দেবেশ "শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার বলে গণ্য করেছেন, তা আসলে অসীম রায়ের ঔপন্যাসিক বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার। সেই বক্তব্য এমনই সাদামাটা যে তিন লাইনে সারতে না পারার কথা নয়। দেবেশ যদি বলেন, ওটা আরো কমিয়ে এক লাইনে সারা যায়।

এখানে অবশ্য, দেবেশও অসীম রায়ের মতো ভেবেছেন, বাঙালীদের দুর্ভাগ্য যে তারা শব্দের সংজ্ঞার্থ হারিয়েছে। আমি পরিষ্কার একথা লিখেছিলাম, এটা অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। দেবেশ কীভাবে ভাবেন যে শাসিতশ্রেণী শোষিতশ্রেণী তার নিজের কথাগুলি খাঁচা থেকে বের করে আনতে সমর্থ হবে? কোন দেশের শোষিতশ্রেণী কি আপন চেষ্টায় নিজেকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে, যদি না মুক্তশ্রেণী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী তাকে সাহায্য করে? এই মোহমুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব শোষিতশ্রেণীর নয়, তার দায়িত্ব শোষিতশ্রেণীর নেতৃত্বের। শোষিতশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহমুক্ত হয় না। যে নেতৃত্ব এই মোহমুক্তি দেওয়ার চেষ্টা না করছে সেই নেতৃত্ব শোষকশ্রেণীর হয়ে কাজ করছে, শোষিতশ্রেণীর নয়। এখানেই শোষিতশ্রেণীর নেতৃত্বের আসল চরিত্র প্রকট। অসীম রায়ের মতো দেবেশও এই নেতৃত্বের চেহারা বুঝতে পারছেন না। তাই হরু ঠাকুর কেন্দ্রীয় সচিবকে দেখেন

বন্ধুয়াজী হিসেবে, শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে নয়। শাসিতশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনগুলি যদি বিপ্লব শব্দকে অর্থহীন করে তোলে, তাহলে তাকে দুর্ভাগ্য বলে মাথা না চাপড়ে, তাকে শোষকশ্রেণীর দালাল বলে ত্যাগ করতে না পারার কারণ কী? দেবেশ অবশ্য এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা লিখেছেন, তা তাঁর লঘুরসিকতা অথবা অজ্ঞতা বোঝা গেল না। শহরের দেয়ালে দেয়ালে কৃষিবিপ্লবের আহ্বান দেওয়ার অর্থ কৃষকশ্রেণীর সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে সচেতন করে দেওয়া, এতে বিপ্লবের জাতহানি হয় না। আর যদি কোনো দল রাজ্যশাসনক্ষমতা দখলকে বিপ্লবের অঙ্গ মনে করে থাকে, তাতেও অবাক মানার কী আছে। রাজ্যক্ষমতা দখলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব নিশ্চয়ই বাড়তে পারে, যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে সাহায্য করে।

"শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসের অন্যান্য দুর্বলতার জন্য তা কেন উপন্যাস বলে বিবেচিত হবে না, পূর্ব আলোচনায় যথেষ্ট রকমই করা হয়েছে। এর বিন্যাসে গতিহীনতা, এর চরিত্রসৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা, এর ভাষার দুর্বলতা আলোচিত হয়েছে। উপরন্তু দেবেশকে ধন্যবাদ তিনি আর-একটা সূত্র দিয়েছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতেও "শব্দের খাঁচায়" দাঁড়ায় না। দেবেশ বলেছেন, ঘটনায় আটকে থেকে ঘটনার ভেতরে চলে যাওয়াটাই উপন্যাসের লক্ষণ। সেই লক্ষণে "শব্দের খাঁচায়" টেঁকে কি? "শব্দের খাঁচায়" যে মন্ত্রীর পরিচয় পাই, সেই মন্ত্রী কী গুণে তাঁর মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, টিঁকিয়ে রেখেছেন, মন্ত্রীটির শক্তির উৎস, ইত্যাদি কোন আভাস কি পাওয়া যায়? মন্ত্রীটির বহিরঙ্গের রূপটিই পাওয়া যায়, সেই রূপটিও আবার তাচ্ছিল্যভরে দেখা। এবং একই কথা খাটে সবকটি চরিত্রের বেলায়। এর কারণ, যা বলা হয়েছিল, অসীম রায়ের দৃষ্টি নৈতিমূলক। নৈতিমূলক দৃষ্টি দিয়ে উপন্যাস রচনা অসম্ভব। কারণ তাতে চরিত্রগুলির শক্তিময়তার কারণ উদ্ভাসিত হয় না। এবং "শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসের সবকটি চরিত্র, ঔপন্যাসিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, টাইপ চরিত্র, যে-টাইপ চরিত্রের সঙ্গে চণকা সেন, নিমাই ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের চরিত্রের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। এদের স্থান বাঙলা সিনেমার ড্রেসিঙ-গাউন-পরা বাবাদের একাসনে।

দেবেশের মূল প্রশ্নগুলো এই। দেবেশ অবশ্য কতকগুলো আনুষঙ্গিক আপত্তি জানিয়েছেন যা আমার পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত। তিনি বলেন, বহির্বিশ্ব দিয়ে রচিত হয় সাংবাদিকতা, অন্তর্বিশ্ব দিয়ে সাহিত্য। এটা যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে বলতে হতো স্ট্রীম অফ কনশাসনেস নিয়ে যাবতীয় উপন্যাসই সার্থক। জেমস জয়েস বা প্রুস্তের উত্তরাধিকারী মাত্রেই কি ঔপন্যাসিক? আবার হোমারের ওডেসি তো বহির্বিশ্ব নিয়ে লেখা, তাই বলে কি তা সাহিত্য নয়? ওডেসি অবশ্য উপন্যাস নয়। তবে উপন্যাস আর সাংবাদিকতার বিচারও হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, খণ্ড জীবন না অখণ্ড জীবন?

আমি অসীম রায়, মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে বেছেছি, তার অবশ্যই কারণ আমি এদের বর্তমান বাঙলা উপন্যাসক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি মনে করি। কিন্তু তা মনে হওয়ার দরুন এদের ঔপন্যাসিক বলতে অস্বীকার করার বাধা কোথায়? সমসাময়িক বাঙলা উপন্যাস কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? লেখকের নোটবই বা জার্নাল বা ছোটগল্প-বা-উপন্যাসের ফ্রেমে না সাংবাদিকের মন্তব্য সবই মোটামুটি একার্থক, সাংবাদিকতা, এবং উপন্যাস নয়। উপন্যাস আর সাহিত্য সমার্থক ধরে নেবো এমন অন্যমনস্কতা বা মূর্খতা আমার আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা জানি না, তবে সাহিত্যের সঙ্গে, দেবেশ যেটা অনুমান করেছেন, সাংবাদিকতার বৈরিতা নেই। সাংবাদিকতাও এক ধরনের সাহিত্য। উপন্যাসের বিপুল আবেদন এতে নেই, কিন্তু লিরিকের আবেদন সাংবাদিকতায় মর্যাদা পেতে পারে। অনেক জার্নাল, অনেক ছিন্নপত্র, অনেক ডায়েরি সাহিত্য, কিন্তু উপন্যাস নয়। আমার আলোচনা ছিল বিপুলপরিধি সাহিত্য নিয়ে নয়, তার একটি ফর্ম, উপন্যাস নিয়ে। সেই জন্যই আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম, অনেকে বলেন এটা সাংবাদিকতার যুগ, উপন্যাসের যুগ নয়। সাংবাদিকতাই, তাঁদের মতে, এযুগের সাহিত্য, এযুগের উপন্যাস। আমি একথার সত্যাসত্যের বিচার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

স মা লো চ না

The Parade's Gone By. *By* Kevin Brownlow. Alfred A. Knopf. $13·95

চলচ্চিত্র স্বভাবতই অচিরস্থায়ী। বিগত যুগের কোন ছবি পুনর্বার দেখার জন্য আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয় এমন কতগুলো অবস্থার উপর যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। পুরানো সকল ছবির অনিবার্য পরিণতি বিলুপ্তি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে ভালো ভালো ছবিগুলি বিভিন্ন দেশের ফিল্ম লাইব্রেরিতে রক্ষিত হচ্ছে। তবুও তাদের পুনর্দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। একালের লোকেরা চলচ্চিত্রের 'সুবর্ণকাল' সেই নির্বাক যুগের অজস্র অসামান্য ছবি দেখার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সবাক চিত্র দেখাতে অভ্যস্ত আমরা এখন নির্বাক চলচ্চিত্রের পুরোপুরি রসগ্রহণে অসমর্থ। চোখে দেখার সাথে সাথে এখন আমরা কানেও শুনতে চাই। এই যুগপৎ প্রক্রিয়া ভিন্ন চলচ্চিত্র এখন আর আমাদের কাছে যথার্থ অর্থবহ হয়ে ওঠে না। চলচ্চিত্রের গল্পের অন্তর্নিহিত শক্তি নির্বাক ছবিতেই সার্থকরূপে প্রকাশিত। সেজন্য চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞরা নির্বাক চলচ্চিত্রের কাঠামো বা প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর খুব মনোযোগ দেন। মানুষের মনের ভাব কথার আশ্রয় ছাড়া কীভাবে ছবিতে প্রকাশ করা যায় নির্বাক যুগে এটা ছিলো প্রধান গবেষণার বিষয়, আজও এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। সুখের বিষয় ইদানীংকালে বিদেশের নানাস্থানে নির্বাক যুগের ক্লাসিক সৃষ্টি-সমূহকে বারবার দেখা হচ্ছে, লুপ্তপ্রায় ছবিগুলিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ফরাসী দেশের যে আঁভা গার্দ আন্দোলন সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার নবীন বিদ্রোহী পরিচালকেরা নির্বাক যুগের ক্লাসিকাল সৃষ্টিসমূহকে পাঠ্যবিষয়ের মতো শিক্ষণীয় বলে মনে করেন। বাস্টর কীটন চ্যাপলিন, অ্যাবেল গান্স, স্ট্রোহাইম, আইজেনস্টাইন, কার্ল ড্রেয়ার প্রমুখ খ্যাতনামা পরিচালকদের ছবি দেখে বর্তমানকালের বহু পরিচালক তাঁদের নিজেদের কাজে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

বস্তুতপক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালকেরা ধীরে ধীরে কিভাবে ক্যামেরার মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র শিল্পভাষার সৃষ্টি করল তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন ও প্রয়োগ করতে হলে আমাদের নির্বাক যুগের ছবি দেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ পুরানো নির্বাক ছবি দেখার সৌভাগ্য বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো দৈবাৎ মেলে। এর জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয় ফিল্ম সোসাইটির উপর বা যে দেশে ভালো ফিল্ম লাইব্রেরি আছে তাদের দাক্ষিণ্যের উপর। সম্প্রতি নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট অনেকগুলো ভালো ছবি নিয়ে একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম করে সারা পৃথিবী জুড়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলো।

তবে পুরানো নির্বাক ছবিকে পুনরুদ্ধারের কাজে এ সকল প্রক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে এককথায় প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো দুঃসাধ্য কাজ করে ফেলেছেন এক ইংরেজ তরুণ কেভিন ব্রাউনলো। মাত্র তিরিশ বছর বয়সের এই তরুণ প্রচণ্ড ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের স্বাব এক প্রকাণ্ড বই লিখেছেন *The Parade's Gone By*। নির্বাক ছবি সম্পর্কে এর আগেও অনেক বই লেখা হয়েছে। তবে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। অজ্ঞতা থেকে এক ধরনের উন্নাসিকতা জন্ম নেয়, কোন ভালো নির্বাক ছবি না দেখেই অনেকে একে নস্যাৎ করে দিতে

চান। সুতরাং পুনরুদ্ধারের কাজে, যখন সকলকে ছবিগুলি দেখানো সম্ভবপর নয়, তখন সেসম্পর্কে লিখিত বিবরণ ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে। নির্বাক ছবির সুবর্ণ যুগ ছিলো উনিশ শ ষোল থেকে উনিশ শ আটাশ সাল পর্যন্ত। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু যুগান্তকারী ছবি তৈরী হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই, অন্য শিল্পশাখার যে ক্রমবিকাশের ধারা দেড়শ দুশো বছরের ইতিহাসে লক্ষ করা যায়, চলচ্চিত্রের এই নির্বাক যুগে তার সবকটি বৈশিষ্ট্যই বারো তেরো বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একদিকে যেমন আইজেনস্টাইন বা গ্রিফিথের ক্লাসিকাল স্ট্রাকচারের ছবি যেমন ব্যাটেলশিপ পটেমকিন বা ইনটলারেন্স (অবশ্য গ্রিফিথের ছবির মধ্যে উপন্যাসের ঢঙে বর্ণনারীতির লক্ষণ স্পষ্ট) অন্যদিকে তেমনি ফ্লাহার্টির ন্যাচারলিস্টিক সিনেমা নানুক অব দি নর্থ। আবার বুনুয়েল-সালভাদর দালির বা ভিগোর স্যুর-রিয়লিস্টিক ছবির (L'age P'or বা Unchien Andalu) সাথে ডভজেঙ্কোর রিয়লিস্টিক ছবি 'আর্থ'। চ্যাপলিন বা কীটনের ছবিগুলি শ্লেষমিশ্রিত হাসির, জার্মানিতে তখন নির্মিত হচ্ছে এক্সপ্রেশনিস্ট সিনেমা। জন ফোর্ডের ছবি আয়রন হর্স, পুরো ওয়েস্টার্ন মেজাজের পরবর্তী বছরগুলিতে নির্মিত হয় রোমান্টিক মেজাজের ছবি সানরাইজ বা ফ্লেশ অ্যান্ড ডেভিল (রেনোয়ার ছবিগুলির মধ্যেও রোমান্টিসিজম্-এর সুর স্পষ্ট)। এভাবে শিল্পের সবকটি ধারাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় একই সাথে চলচ্চিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রতিতুলনা অন্য যে কোন ইতিহাসে বিরল। চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমের এই দ্রুত উন্নতির মূলে রয়েছে এর অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনা যার আকর্ষণে বহু প্রতিভা-ধর শিল্পী চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ও তাঁদের কথা বাজিয়ে, সে যুগের সৃষ্টি সম্পর্কে তদানীন্তন যে আলোড়নের আভাস পুরানো পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো আছে তাকে একত্রে জড়ো করে আর সেই সাথে অজস্র ছবি দেখে কেভিন ব্রাউনলো এই বইখানি লিখেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। তাঁর নিজস্ব কাজের ফাঁকে ফাঁকে বহুবার হলিউডে পাড়ি দিয়ে তাঁর লেখার মাল-মশলা যোগাড় করে শুধু নিষ্ঠা আর ভালোবাসার টানে এই অমানুষিক কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গবেষণা নির্বাক যুগ সম্পর্কে শুধু নতুন তথ্যই উদ্ঘাটিত করেনি, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছে। যারা কোন নির্বাক ছবি আজও পর্যন্ত দেখে নি বা যারা পুরানো আমলের লোক অনেক নির্বাক ছবি দেখেছে তাদের সকলের কাছেই বইখানির মূল্য অপরিসীম। নির্বাক ছবি সম্পর্কে আমাদের সকল মামুলী ধারণা ও মতামতকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন। নির্বাক ছবি সম্পর্কে উন্নাসিকেরা এই বইখানি পড়ে জানতে পারবেন যে, সে যুগের পরিচালকেরা কত সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে, একদিকে যেমন ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন অন্যদিকে তাঁদের সৃষ্টিভান্ডারকে গড়ে তুলেছেন। ১৯১৬ সালে ইনটলারেন্স-এর যে সেট নির্মিত হয়েছিলো তা আজও যে কোন শিল্প-নির্দেশকের কাছে অপার বিস্ময়। অথচ সে সময়ে শিল্প-নির্দেশক বলে কোন আলাদা ভূমিকা ছিলো না। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ রবিনহুড তৈরী করেছিলেন একটুকরো কাগজের উপর লেখা সামান্য কয়েক লাইন হিজিবিজি থেকে, প্রথাসম্মত কোন স্ক্রিপ্ট লেখা হয়নি। প্রতি ছবিতেই কিছু নতুন আবিষ্কার ও পুরানো পদ্ধতির সংস্কার করে গ্রিফিথ উনিশ শ পনের সাল নাগাদ সিনেমা ভাষার একটা স্পষ্ট চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে প্রতিকূলতা আর সংকটের মধ্য দিয়ে সে যুগের বেনহুর ছবিটি তৈরী হয়েছিলো সেই বিচারে তার Chariot Race-এর দৃশ্যাবলী আজকের যুগের Panavision ছবির চাইতে কোনো অংশে কম লোমহর্ষক নয়।

(ব্রাউনলো তাঁর বইয়ে The Heroic Fiasco: Ben-Hur অধ্যায়ে, এই ছবিটির প্রতিটি শট ও তার নেপথ্যকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, 'The Chariot Race is breath-takingly exciting, and as creative a piece of cinema as the Odessa steps sequence from Battleship Potemkim.) বস্তুতপক্ষে, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, চ্যাপলিন বা কীটনের আবেদন আমাদের কাছে আজও অম্লান রয়েছে তার প্রধান কারণ এই সকল স্রষ্টারা তাঁদের তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণক্ষমতার সঙ্গে অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টিকর্মকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাজ করলে কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা জন্মে, প্রভূত বিলাসিতার মধ্যে থেকেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে না, নির্বাক যুগের ইতিহাস পড়ে একথা পুনর্বার প্রমাণিত হয়। সে সময়ে ছিলো থিয়েটারগোষ্ঠীদের থেকে প্রবল চাপ, অভিজ্ঞতার অভাব, পারস্পরিক রেষারেষি আর অর্থসংকট। রবিনহুডের সেট দেখে খুব খুশী হয়ে চ্যাপলিন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের কাছে এর একটা অংশকে ছবিতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন চেয়েছিলেন। ব্যবসায়িক দিকটার কথা ভেবে ডগলাস চ্যাপলিনের প্রস্তাবে সম্মত হন নি। নির্বাক ছবির স্রষ্টারা তাঁদের সকল সংকটকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রধানত দুটি কারণে: এক, বহু প্রতিভাধর শিল্পীর সমন্বয়, দুই, মাধ্যমের অসীম সম্ভাবনা। ব্রাউনলো শুধু পরিচালকদের কাজের বিবরণ না দিয়ে বা শুধু ছবির আলোচনা না করে, সংশ্লিষ্ট অন্য সবপ্রকার কর্মীর যেমন, ক্যামেরাম্যান, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক, স্টান্টম্যান, কার্পেন্টার, লাইটম্যান ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন। আয়তনে বইখানি যেমন বিরাট (মোট ৫৭৭ পৃষ্ঠা) তেমনি অজস্র ছবিতে সমৃদ্ধ। এই ছবিগুলির থেকেও যে-কোনো পাঠক তখনকার দিনের ছবির আলোকসম্পাত বা দৃশ্য-পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজের নমুনা দেখতে পাবেন। একালের থেকে সে যুগের এ জাতীয় খুঁটিনাটি কাজও যে কোনো অংশে কম নয় তা এই বইখানি পড়ে ও পাশাপাশি ছবি দেখে সহজে অনুমান করে নেওয়া যায়। ব্রাউনলো নিজে একজন চিত্র-পরিচালক ও পুরানো ছবির সংগ্রাহক। ছবি সংগ্রহ করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে যে নির্বাক ছবির অনেক বিষয় আমাদের কাছে সুপরিজ্ঞাত নয়। তাঁর বইয়ে তিনি যে হলিউডের বর্ণনা দিয়েছেন, সে হলিউড আজ মৃত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠনের ভেলকির থেকে যান্ত্রিক কুশলতাকে সম্বল করে একটা আর্টের জন্ম হলো, ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি, শাখাবিস্তার, চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিশেষে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। টকি আসার সাথে সাথে ভেতরের রস শুকিয়ে গিয়েছিলো বা সৃষ্টিশীলতার কোন অভাব ঘটেছিলো। এর প্রধান কারণ ব্যবসায়িক চাপকে সহ্য করার মতো শক্তি এর ছিলো না। অবশ্য এই পরিণতির অন্তর্গত কারণ নির্বাক যুগেই নিহিত ছিলো। চলচ্চিত্র প্রথমাবধি সম্পূর্ণই ব্যবসায়-নির্ভর। আজও যেমন রঙীন ছবির চাপে সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।

বইখানির সবচেয়ে প্রধান আকর্ষণ ব্রাউনলোর লেখার ভঙ্গী। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনাকে তিনি লেখার কায়দায় সজীব করে তুলেছেন। এর পরিকল্পনাও চমৎকার। লেখার বিষয়কে তিনি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন: প্রথমে তাঁর নিজের আহরিত তথ্য ও মতামত, পরে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সে যুগের গৌরবের অধিকারী মানুষেরা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অন্ধকারে। তাঁদের কথা পড়তে মনটা বিষাদে

ভরে ওঠে। বছর দশেক আগে, য়ুরোপে বাস্টার কীটনের ফিল্মের পুনর্দর্শন হয়েছিলো। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পী হিসেবে কীটন চ্যাপলিনের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না, যদিও তিনি চ্যাপলিনের মতো জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, চ্যাপলিনের ছবির বিষয় যেমন মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ কীটনের ছবি সেই তুলনায় কিছুটা আবেগহীন ও নৈর্ব্যক্তিক—যদিও তাঁর ছবিতে মননশীলতার পরিচয় অন্য অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়। নির্বাক ছবির পর সবাক যুগে কীটন আর ছবি করেন নি। নির্বাক যুগে যিনি ছিলেন প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ ও অনাহত অধীশ্বর, পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় কি বিপুল মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিলো তা সহজেই অনুমেয়। বিস্মৃতপ্রায় এই মানুষটি শেষ জীবদ্দশায় ভেনিসে পুরস্কার পাওয়ার পর খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন। নানাস্থানে তাঁর ছবির পুনঃপ্রদর্শন, সমালোচকের জয়গান ও ভেনিসের সম্মান তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে অন্তত কিছুটা আরাম দিতে পেরেছিলো। আলোচ্য বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর লুপ্তপ্রায় অনেক ঘটনা ও মানুষকে নতুন আমাদের পরিচয়ের আলোকে টেনে এনে কেভিন ব্রাউনলো নিশ্চয়ই অনেককে সেই গুণের আরাম দিতে সক্ষম হয়েছেন। নির্বাক যুগের সার্থক স্রষ্টাদের সম্পর্কে আমরা যদি অজ্ঞতাপ্রসূত বিরূপ সমালোচনা থেকে নিবৃত্ত থেকে তাঁদের যোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে পারি তবেই আমরা সঠিক কাজ করবো।

সুনীত সেনগুপ্ত

কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত—ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য ৪০·০০ টাকা।

ডাক্তারেরা যে রোগীর আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তাকে যদি কোনো চিকিৎসক দক্ষতা, ধৈর্য এবং সহানুভূতি দিয়ে চিকিৎসান্তে তার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন, তাহলে সেই জীবনদাতার একদিকে যেমন থাকে পরম পরিতৃপ্তিবোধ, তেমনি তিনি পান সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির পরিজনদের কৃতজ্ঞতা। অনুমান করি ডক্টর মুনীন্দ্রকুমার ঘোষেরও অনুরূপ আনন্দ হয়েছিলো যখন তিনি সঞ্জয়-বিষয়ে তাঁর অসাধারণ এবং বিপুল গবেষণা শেষ করে বাঙলা ভাষার প্রথম মহাভারত রচয়িতারূপে সঞ্জয়কে পুনরুদ্ধার করেন।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের সংশয় ছিলো যে কাশীরাম দাসের কোনো পূর্বসূরি ছিলেন কিনা, সৃষ্টিপ্রতিভায় যিনি কাশীরামের সমতুল্য। অবশ্য শ্রীকর নন্দী ছিলেন, যাঁকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মনে করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরই অন্য নাম (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকা দ্রঃ)। অনেকের ধারণা তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি। এছাড়া আছেন বিজয় পণ্ডিত যিনি সম্ভবত "পরাগলী মহাভারত" সংক্ষিপ্ত করে 'বিজয় পাণ্ডব' নাম দিয়ে রচনা করেন। সর্বোপরি আছেন সঞ্জয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অনেক ইতস্তত করার পর বলেছেন যে সঞ্জয় এমন কিছু কবি নন যে তাঁর নাম করা যেতে পারে। অনেকে আবার অনুমান করেন যে মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয়-এর নামের আড়ালে কোনো অজ্ঞাত কবি আত্মগোপন করে আছেন।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৫৭ সালে যখন মুনীন্দ্রকুমার ঘোষকে সঞ্জয়-রহস্য অনুসন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই কাজের দুরূহতা অনুভব করেছিলেন। বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট এবং পুণা ভাণ্ডারকার ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত রামায়ণ-মহাভারতের সটীক সংস্করণে অনুসৃত পদ্ধতিতে তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে উদ্যোগী হন। তারপর সেগুলির বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে সুবিন্যস্ত করেন।

সম্পাদকের ভূমিকায় (পৃ. ১০-১৬) পূর্ব-পশ্চিম বাংলা এবং আসামের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত প্রায় সত্তরটি পাণ্ডুলিপির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে: পাণ্ডুলিপিগুলির গুরুত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা অনুসারে তিনি সেগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন।

১। সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি, যেখানে ভণিতায় একমাত্র সঞ্জয়েরই নাম পাওয়া যায়।

২। সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি যেখানে ভণিতায় সঞ্জয় ছাড়াও বিভিন্ন পর্বে বা বিশেষ কোনো আখ্যানে অন্য অনেক কবির নামও আছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলির সংকলক ছিলেন অনেকে। সঞ্জয়ের মহাভারতের জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর রচনা থেকে বহু অংশ এইসব সংকলনে প্রক্ষিপ্ত।

৩। সঞ্জয়ের ভণিতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্বের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি। এগুলি বোধহয় কথকেরা যে যে পর্ব বা পর্বাংশ-পাঠের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই অনুসারে সংকলন করেছেন।

৪। কোনো বিশেষ পর্বের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি।

৫। বিভিন্ন কবি থেকে সংকলিত পাণ্ডুলিপি।

৬। বিচ্ছিন্ন আখ্যানের পাণ্ডুলিপি।

তারপর আছে ষাটেরও অধিক পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত বিবরণ। প্রতিটি পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার পর সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। কবি নিজের বিষয়ে কী বলেছেন, সে-বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সম্পাদক। অসংখ্য উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি যে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হাজির করেছেন, তা থেকে সহজেই নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসা যায় :

১। সঞ্জয় নিজেকে বাঙালি কবি বলে পরিচয় দিয়েছেন।

২। সঞ্জয় হচ্ছেন প্রথম কবি যিনি বাঙলায় পুরো মহাভারত অনুবাদ করেন।

৩। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ সাধারণ মানুষের জন্য মহাভারত রচনা করা। তিনি বর্ণনাকে মধুর এবং আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো এই মহাভারত পাঠের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মুক্তি।

৪। একই নাম হলেও মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয় এবং তাঁর মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে তিনি সচেতন।

৫। তিনি লাউড়ের অধিপতি ভগদত্ত বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

৬। তিনি নিজেকে ভরদ্বাজগোত্রীয় 'ব্রাহ্মণকুমার' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

সম্পাদক কী পদ্ধতিতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আলোচ্য সংস্করণের পাঠ তৈরি করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। এটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, তিনি সৌভাগ্যবশত মহাভারতের বেশির ভাগ অংশ মানে আদি থেকে অনুশাসন পর্ব পর্যন্ত

একটি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। সেই পাঠই তিনি প্রথম সতেরোটি পর্বে অনুসরণ করেছেন। বাকি চারটে পর্ব তিনি অন্যান্য পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে তৈরি করেন।

সম্পাদক বানান বিষয়েও বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির অঞ্চলভেদে বানানে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সম্পাদক তৎসম শব্দাবলির মূলানুগ বানান রেখেছেন। তদ্ভব এবং আঞ্চলিক শব্দের ক্ষেত্রেও বানান-সাম্মিতি আনা হয়েছে।

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক-গবেষকদের সঞ্জয়ের অস্তিত্ব এবং সাহিত্যকৃতি বিষয়ে আলোচনা করে ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে সঞ্জয়ের জীবনী সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে হলো এই :

১। সঞ্জয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমরা কোথাও তাঁর পুরো নাম পাই না। সঞ্জয় তাঁর ছদ্মনাম হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে।

২। তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। সংস্কৃত মহাভারতে ভগদত্ত হলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি। কিন্তু সঞ্জয় তাঁকে প্রায় সবসময়ে লাউড়ের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা অনুমান হয় যে লাউড়ের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিলো। অন্যদিকে লাউড় ভরদ্বাজগোত্রীয় একটি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসভূমি বলে খ্যাত। তাই মনে করা যেতে পারে যে, সঞ্জয় লাউড়ে জন্মেছিলেন এবং তিনি এই বিখ্যাত পরিবারেরই বংশধর।

৩। বাঙালি কবি সঞ্জয়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। তিনি তাঁর প্রতিভা বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সংস্কৃত মহাভারতের চরিত্র সঞ্জয়ের নামের আড়ালে আত্মগোপন করার প্রচেষ্টা তাঁর নেই।

৪। সঞ্জয়ের জীবনকাল বিষয়ে বলার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে তিনিই প্রথম পুরো মহাভারত বাঙলায় অনুবাদ করেন। বহু উদ্ধৃতি সহযোগে ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ দেখিয়েছেন যে সঞ্জয়ের মহাভারতের আগে মূল মহাভারত সাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো। সঞ্জয়ের উদ্দেশ্য 'সংস্কৃত ভাষারূপ অন্ধকার হইতে বাঙলা ভাষারূপ আলোকে তাহা প্রোজ্জ্বল করিয়া অসংস্কৃত ব্যক্তিদের নিকট বোধগম্য করিয়া' তোলা। তিনি আশা করেছিলেন এইভাবে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সাধনার উৎস যা এতোদিন সাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো তা তাদের কাছে পেঁাছে দেওয়া যাবে।

পরাগল খান মহাভারত পাঠ করে এর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েন। তাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। সম্ভবত পৃষ্ঠপোষকের (ধর্ম)বোধ আহত না করার জন্য তিনি সঞ্জয়ের মহাভারতের ধর্মীয় শিক্ষাবিষয়ক কাহিনীগুলি বাদ দেন। এটা লক্ষণীয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে সঞ্জয়ের মহাভারতের দুটি জনপ্রিয় আখ্যান রেখেছিলেন যা মূল সংস্কৃত মহাভারতে নেই।

কাশীরাম দাস সঞ্জয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে এর পর বোধহয় অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কাশীরাম সঞ্জয়ের পরবর্তী : তাঁর কাব্যে যে বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা সঞ্জয়ের রচনায় নেই।

সংস্কৃত মহাভারত এবং সঞ্জয়কৃত বাঙলা রূপান্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় বাঙালি কবি সাধারণ মানুষের অধ্যাত্মসাধনার কথা ভেবে মূল সংস্কৃতের কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। তাছাড়া প্রতি পর্বের আখ্যানগুলির বর্ণনায় তিনি কতকগুলি

জনপ্রিয় লৌকিক কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলি মূল মহাভারতে নেই। তাঁর বর্ণন-শক্তি অসাধারণ এবং সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনাতেও তিনি অসামান্য। তিনি নিজস্ব রীতিতে মহাকাব্যের নায়কদের কাহিনী বিবৃত করেছেন।

ডঃ মনীন্দ্রকুমার ঘোষের দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ ভূমিকার উপসংহারে আছে সঞ্জয়ের ভাষা বিষয়ে আলোচনা। অনাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বহু সমস্যার মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে তিনি যেভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করেছেন, তা আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে একজন আবিষ্কারকের উদ্যমের সমন্বয় ঘটেছে। সঞ্জয়ের মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বিদ্বান এবং সাধারণনির্বিশেষে সবার কাছে একটি মূল্যবান উপহার।

রবার্ট আঁতোয়ান

নিঃশব্দের তর্জনী—শঙ্খ ঘোষ। অরুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

বড়ো শক্ত ধাঁধা জানে ছোটো একটি মেয়ে। কথা বললেই কোন্ জিনিস ভেঙে যায়? আরো শক্ত জানতেন অবশ্য দার্শনিক কীয়েকের্গার্দ...ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের কি কিছু বলার আছে আরেক মানুষকে? কেননা তখন তো, তাঁর মনে হয়, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পরমের সঙ্গে তার সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কেরই তো অন্য নাম নীরবতা? কিন্তু এমনও কথা কি নেই যাতে নীরবও গড়ে ওঠে?

সকলেই মনে করলেন শঙ্খ ঘোষের নতুন কবিতা এই নিঃশব্দের তর্জনী, বলে ভুল করলেন। তা নয়; বরং যা ভাবা যায় না এ তাই, শঙ্খ ঘোষের নতুন নিবন্ধগ্রন্থ "নিঃশব্দের তর্জনী" শুরু হয়েছে অবিকল এভাবে।

সময়সাপেক্ষভাবে কিছু কিছু কিছু জিনিস এরকমভাবে আসে। চাঁদ আসে একলাটি নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে। কিছু বই আসে। শঙ্খঘোষের "নিঃশব্দের তর্জনী" এভাবে এসেছে, চাঁদের মতন, সমব্যাপারে পূর্বাবর আর-সব বইয়ের নক্ষত্রদীপ্তি নিবিয়ে দিয়ে। দেশীবিদেশী কমবেশি পাঠঅভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের মত এভাবে একদিন হাতে এসেছিল ভালেরির দি আর্ট অফ পোয়েট্রি।

নিঃশব্দের তর্জনী পড়ে এখুনি এই তিনটি কথা মনে হয়েছে যে, শঙ্খ ঘোষ প্রণীত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি শঙ্খ ঘোষ ছাড়া আর-কেউ লিখতে পারতেন না; অবশ্য শ্রেষ্ঠতার এটাই একমাত্র শর্ত হয়ে থাকে না। অপরপক্ষে, যে-কোনো গর্হিত কাজ সম্পর্কে যা যথার্থ, দুঃখের বিষয় শ্রেষ্ঠতা ব্যাপারেও তাছাড়া, তার বেশি-কিছু, বলা যায় না যে, বাঙলা কবিতার আধুনিকতা-বিষয়ে এর আগে আমরা কোনো, কখনো, কারো বই পড়িনি, কারণ তা লেখা হয়নি; পরিশ্রমী শব্দচয়ন নয়, নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দজাত সকল মিথ্যেকে উপেক্ষা করে, ছলনার জাল ছিঁড়ে, শব্দের নতুন সৃষ্টির দিকে—দুটি শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো বিপজ্জনক লাফে বারংবার পেরিয়ে এর আগে অগ্রণী কেউই, কোনো প্রবন্ধকার, এভাবে ছুটে যাননি শব্দ-মধ্যবর্তী সেই অন্তর্জগতের দিকে, শব্দজননী চিরস্তব্ধতার যা গর্ভ-আঁধার, যেখানে ছবিতে আলোয় সুরে শব্দে মেশামেশি হয়ে শরীরকে সুস্থ করে নিয়েছে শিল্পবাহন। শরীর, সে তার

সমস্ত আর্তনাদ বাঁকিয়ে ধরে তৈরি করছে ছবি নাচ কবিতা।' (শব্দ থেকে পালানো। পৃ. ৯)। এবং, যে, শঙ্খ ঘোষের বিচারবোধ সম্পর্কে একটি কথাই গভীরতরভাবে ভেবে জানায়; তা হল, আজ বাঙলাদেশে এই একটা লোক যিনি আপাদমাথা সীরিয়াস এবং নিজে এ'কে নিয়্‌পায়ভাবে নিতে হবে, অর্থাৎ সীরিয়াসলি।

বাস্তবিক, প্রথম পৃষ্ঠার ঐ উদ্ধৃত অংশ থেকে গোটা বইটি এক আশ্চর্য অভিযান। বা, যেন অপারেশন-টেবিলের ওপর কবি শুয়ে রয়েছেন প্ররোচিত ঘুমে, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জেতে পুরে একটি জীবাণু-সাবমেরিনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কবির রক্তস্রোতের মধ্যে, তারপর লক্ষ-লক্ষ-লক্ষ গুণে বড় করে আমাদের দেখানো হচ্ছে বিধাতার অপূর্ব কারুকার্যময় কবিশরীরের অভ্যন্তরব্যাপী রক্তসমুদ্রের ভেতর দিয়ে, কবির সৌরিন্দ্রামের দিকে, রোমহর্ষক এক অভিযাত্রা! এই রক্তসমুদ্র পারাপারহীন, কবির নাড়িতে তিনটি করে শব্দের মানে হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত একটি করে রক্তস্রোত, যেদিকে দু'চোখ যায় কোটি কোটি ভাসমান সেল বা কোষ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিমূর্ত প্যাটার্ন সব, প্রতি কোষে একটি করে ক্রোমোজোম বা জ্যোতি। শুধু রক্ত, রক্তের ধোঁয়া ও ঢেউ, তার প্রবল উত্থান ও পতন। চারিদিকে রক্তশব্দ, ভীতিশব্দ, মৃত্যুশব্দ- ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। স্বপ্নে-দেখা প্রলয়ের এই আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে থাকি কবির হৃদয়ের দিকে যেখানে, বিদীর্ণ বিস্ময়ে আমরা দেখতে পাই 'দিবসের শেষ সূর্যে'র অন্তর্গত 'শ-ষ-স'র ক্রটগুলি, এবং "'মেলে নি' কথার 'ি' ধ্বনির চাপা টান যেন নিচু করে আমাদের ধরে রেখেছিল ঐহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনো না মিললেও একদিন জীবনরঙ্গসীমা থেকেই মিলবে-বা কোনো উত্তর, কিন্তু এখন এই পরিণামসময়ে, হতাশ নিষ্ফলতার বোধ যেন 'না' শব্দের প্রসারিত 'আ'-কারে লেগে মুহূর্তমধ্যে জ্যামুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এক নিরন্ত শূন্যতার অন্তঃসারে।" (প্রসঙ্গঃ রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' শীর্ষক পদ্য। পৃঃ ৬৪-৬৫)

হৃদয়! আধুনিক কবির হৃদয়, সেখানে সাইক্লোনের আবহাওয়া। 'সুলভ, সুলভ, এত সুলভ বড়োবাজার! দিকদিগন্তে স্ফুলিঙ্গের মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এমন অকাতরে বলেই আমরা ভেঙে পড়ছি বড়ো রাস্তার মাঝখানে। মজ্জার ভিতরে গর্ব কই, উপেক্ষা কই? মুখ ঘুরিয়ে উদাসীন সরে দাঁড়ানো কই? এখন আমরা দাম্ভিক কিন্তু গর্বিত নই, নির্জীব কিন্তু উদাসীন নই, লুব্ধ কিন্তু লিপ্ত নই' এ-ভাবে দক্ষিণ হৃদয় থেকে রক্তের গতিপথ অনুসরণ করে কবিশরীরের ফুসফুসে আমরা পৌঁছে যাই। সেখানেও বিভীষিকা, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কার্বন-ডায়াক্সাইড ও অক্সিজেনে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, দূর থেকে ঘুম-ভাঙা আগ্নেয়গিরির মত দেখায়। তার ওপর হাভানা চুরোটের ঝাঁঝালো গন্ধ, কবি আবার ছিলেন চেন্ স্মোকার। 'আইয়ুব লক্ষ করতে বলছেন, প্রশ্নটি ছিল কী তুমি বা কেন তুমি নয়, কে তুমি। প্রণয়িনীগণ মাঝে মাঝে রাগ করে বলে থাকেন বটে, "তুমি একটা কী!" (আইয়ুবের সঙ্গে বিচার। পৃঃ ১০০।)

সহসাই একটি রক্তোচ্ছ্বাস সাবমেরিনটিকে ক্যারোটিড শিরা থেকে ঠেলে নামিয়ে দেয় ও উপশিরা দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে কবির মধ্য-ব্রেনে নিক্ষেপ করে। অতিকায় দাঁড়া নেড়ে ও বিশাল হাঁ করে কোটি কোটি শ্বেতকণিকা সেটা আক্রমণ করে। শ্বেতকণিকাগুলি মার্ক্সের নির্দেশ মানে না, তাদের কাজ অনেকটা সংশপ্তকদের মতন, ৩৫ ট্রিলিয়ন লোহিতকণিকা তাদের মদৎ দেয়। শুরু হয়ে যায় ভীষণ যুদ্ধ, সাবমেরিনটি টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, এখন

সন্তরণরত অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে অভিযাত্রী এগিয়ে যাচ্ছেন সৌরিগ্রামের দিকে, যেখানে আলোর অবসান, 'কবিতার শেষে নেমে আসে ক্ষীণ অন্তর্জ্যোতির্লিপ্ত তমসা।'

'...ঐখানে মৃত্যুবাঁধনে জড়িয়ে থাকে তারা,' দুটি শব্দ, 'দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর ওপর আক্রমণটাই সবচেয়ে জরুরী।...অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর এই ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে আসে শব্দগুলি...তারা যেন অন্ধভাবে একে অন্যের গায়ে এসে লেগে যায়...তার মধ্যেকার সংযোগসূত্রগুলি ছিঁড়ে আলগা করে দিতে হবে বলেছিলাম। কে দেবে?...প্রতি দুই শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে সরে যায়, তখন কোনো শব্দকেই মনে হয় না মৃত, নিছক পুরোনোও মুহূর্তমধ্যে মায়াময় নবীন হয়ে ওঠে'...এখানে, 'কীটসের সমস্ত চিৎকারে কতো সত্য মূল্য আর্ত হয়ে আছে : See here it is—I hold it towards you!' (শব্দের পবিত্র শিখা। পৃঃ ১৮, ১৯ ও ২১।)

এ-পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বৎসর মূক স্তব্ধতায় কাটিয়ে, তারপর, মাত্র দু-চার হাজার বছর আগে মানুষ তার ভাষা পায়, বাঙলা অক্ষরমালা তো এই সেদিনের কথা। তবু, এ-কথা সকলেই জানেন যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে যেমন, আমাদের সংস্কৃতিজগতেও আজ তেমনই নেমে আসছে এক অন্ধকার বর্বর যুগ, এবং, ঠিক এই অ-বেলায়, কলেজ স্ট্রীট নামে বিখ্যাত বটতলায় সমবেত মুণ্ডিতমাথা শ্রাদ্ধাধিকারীদের সংঘর্ষের ভেতর থেকে শঙ্খ ঘোষ বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর 'নিঃশব্দের তর্জনী', এই দুর্দিনে, ফাটকার বাজারে, শঙ্খ ঘোষের অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্বের ঋজুতাও থেকে গেছে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

The French Lieutenant's Woman. *By* John Fowles. Panther Books London. 8*s.*

ভিকটোরিয়ান যুগ নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেক বই লেখা হয়েছে : পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা, উপন্যাস দুই-ই। আলোচ্য বইটির প্রথম আকর্ষণ, এটি ওই যুগ নিয়ে, পরস্পর-বিরোধী না হয়েও, একাধারে জ্ঞান-সমৃদ্ধ আলোচনা ও উপন্যাস। দ্বিতীয় আকর্ষণ - প্রথমটি বস্তুত এটির অঙ্গ- উপন্যাসটির রচনাশৈলী, যদিও তা বিষয়বস্তুতে পুরোপুরি সম্পৃক্ত।

১৮৬৭ সাল ও লাইম নামে একটি মফঃস্বল শহরকে কেন্দ্র করে ফাউলস্ তাঁর গল্প গড়েছেন। ভিকটোরিয়ান সামাজিক জীবনের সব বৈশিষ্ট্যকেই তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রধান অবলম্বন ওই যুগের যৌন-মনস্তত্ত্ব। তবে যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর উপাদান থাকলেও, তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই চাঞ্চল্যকর নয়; ওই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি সমস্ত যুগটার আত্মিক গঠন, তার স্ববিরোধিতা ও মানবিক ঐতিহ্যকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

ফরাসী লেফটেন্যান্টটি বইয়ে একান্তই অনুপস্থিত; মহিলাটি অবশ্য এবং অবশ্যই গল্পের প্রধান উপাদান। গভর্নেস শ্রেণীর জটিল চরিত্রের এই মেয়েটি, সারা যার নাম, তার প্রণয়ী চার্লস নামে এক বিদগ্ধ ও হবু ব্যারনেট, ও চার্লসের বাগ্দত্তা এক ধনী ব্যবসায়ী-

কন্যা, এই তিনজনকে নিয়ে গল্পের বিষয়বস্তু।

সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি এই সব বিষয়ে ফাউলস খুবই চোখস কিন্তু তা সত্ত্বেও বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার টেকনিক—আরও এইজন্যে যে টেকনিকটি যুগ-চেতনার প্রতিফলনও বটে। আধুনিক উপন্যাসের রচনাশৈলী বলতে সচরাচর ধরা হয়ে থাকে গল্পের বিবরে লেখকের স্বাধীনতাকে খর্ব করা। ফাউলস এই ধারাকে একেবারে অস্বীকার করে তাঁর ভিকটোরিয়ান গল্পকে ভিকটোরিয়ান পদ্ধতিতেই লিখেছেন। কখনও কয়েকটি লাইনে, কখনও বড় অনুচ্ছেদে, কখনও বা পুরো অধ্যায় ধরে, লেখক তাঁর "আমি"কে যদৃচ্ছা ব্যবহার করছেন, সবাইকে জানিয়ে যেখানে খুশী যাতায়াত করছেন, গল্প থামিয়ে ইতিহাস বর্ণনা করছেন। ফুটনোট দিচ্ছেন, উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলছেন এবং পাঠককে অনবরত সম্বোধন করছেন—আধুনিক মাপকাঠিতে যার সব কটিই নিয়মবহির্ভূত। এবং এগুলি তিনি করছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে, কারণ আজকের উপন্যাসের সাদ্রা রব্-গ্রিয়ে অবধি যে বিবর্তন হয়েছে, তার সব খবরই তিনি রাখেন (নিজের লেখাতেও প্রয়োজনমত আধুনিক কায়দা আমদানি করেন।)

দুটি বা তিনটি কারণে ফাউলস এই পদ্ধতিতে লিখেছেন। প্রথমত, ভিকটোরিয়ান যুগকে যথাযথভাবে দেখানোর জন্যে, চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের মিল থাকাতে যাতে আমরা বিভ্রান্ত না হই ; যেমন নায়কের চরিত্র এক জায়গায় এইভাবে বোঝাচ্ছেন :

This—the fact that every Victorian had two minds—is the one piece of equipment we must always take with us on our way back to the nineteenth century. . . and Charles had at least that.

দ্বিতীয়ত, সব প্রভেদ সত্ত্বেও, আমাদের যুগ ও ভিকটোরিয়ান যুগ একই মানবিক বস্তুরের অংশ, এই কথা লেখক খুব জোর দিয়ে বোঝাতে চান, যে জন্যেও তাঁর স্বাধীনতাকে তিনি ব্যবহার করছেন ; যেমন, নায়িকার কেনা এক ধরনের কিউরিও কিরকম ভঙ্গুর তা তিনি এইভাবে বোঝাচ্ছেন :

As I can testify, having bought it myself a year or two ago for a good deal more than the three pennies Sarah was charged.

এই টেকনিকের তৃতীয় ও সর্বোত্তম ব্যবহার ঘটেছে গল্পের দ্বিতীয়ার্ধে, যেখানে সব আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত। গল্পটির তিনটি সমাপ্তি, তিনটি আলাদা কাহিনীর মত। ৪৩ অধ্যায়ে চার্লস প্রণয়িনী সারার সঙ্গে দেখা করার প্রলোভন উপেক্ষা করে বাগদত্তার কাছে গিয়ে মিলিত হল : And so ends the story, what happened to Sarah I do not know. এটাকে বলা যায় (১) সমাপ্তি। ৪৫ অধ্যায়ে লেখক কিন্তু বলছেন, না, গল্পের শেষ একটু অন্যরকমভাবে ঘটেছিল ; অতএব, ৪৫-৪৬ অধ্যায়ে, ৪৩ অধ্যায়ের ঘটনার পরিবর্তে চার্লস প্রণয়িনীর কাছে গেল ও যৌন সংসর্গ করলো। এরই ফলে বাগদত্তার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে ৬০ অধ্যায়ে সারার সঙ্গে, যার খোঁজ এতদিন পাওয়া যায় নি, পুনর্মিলন - এটিকে বলা যায় ২(ক) সমাপ্তি। শেষ অধ্যায়ে লেখক ইম্প্রেসারিওরূপে নিজেকে দাঁড় করিয়ে গল্পটির আরও একটি সমাপ্তি ঘটাচ্ছেন : পূর্ব অধ্যায়ের ঘটনার পরিবর্তে, চার্লস সারার আকূতি অগ্রাহ্য করে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল—যাকে বলা যাবে ২(খ)।

লেখকের এই আপাত যথেচ্ছাচারের গূঢ় অর্থ আছে। তিনটি (সম্ভাব্য) পরিণতি ভিকটোরিয়ান বাস্তবতার তিনটি দিকের ঘোষণা, যার মূল কথা সারা চার্লসের জীবনে

স্বাধীনতার প্রতীক। ১নং সমাপ্তি নিখুঁতভাবে ভিকটোরিয়ান : চার্লস আত্ম-প্রবঞ্চনা করে সামাজিক রীতিকে মেনে নিল—এই সত্যের ঘোষণা। ২(ক) বিপরীত বিন্দুতে : চার্লস তার স্বাধীনতাকে মেনে নিল—যা ভিকটোরিয়ান যুগের বিপরীত অন্তঃস্রোতের প্রতীক; চার্লস এখানে আশির দশকের সৌন্দর্যবাদী ও পরের ডেকাডেন্টদের পূর্বসূরী (লক্ষণীয়, ডি. জি. রসেটির বাড়িতে এই ঘটনা ঘটছে।) ২(খ) আর-একটি বাস্তবতার ঘোষণা : স্বাধীনতাকে স্বীকার-অস্বীকার কিছু না করে, তাকে অবদমন করা, ভিকটোরিয়ান দ্বিধাবিভক্ত মনের ছবি। লেখক বলতে চাইছেন, তিনটি সম্ভাবনাকে নিয়েই সমগ্র বাস্তব, একটি সমাপ্তি দিয়ে যা বোঝানো যেত না (এর পেছনে অবশ্য সমান্তরাল অস্তিত্বের দর্শনও রয়েছে); লেখকও এইজন্যে তাঁর খোলস পালটাচ্ছেন। জটিলতায় সমৃদ্ধ বইটিতে লেখকের পুরোনো স্বাধীনতার এই ব্যবহার প্রতীকী বন্দেজের এক কায়দা হিসেবে আকর্ষণীয় ও অভিনব তো বটেই, উপরন্তু গভীর অর্থে নিঃসন্দেহে আধুনিক।

অমিতাভ সিংহ

Confessions of an Indian Woman Eater. *By* Sasthi Brata: Hutchinson London. £2.00.

আমার পক্ষে, যেসব ভারতীয়রা ইংরিজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁদের প্রতি একটা বেদনা-ময় শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না ক'রে পরিত্রাণ নেই। এটা বোধহয় আমাদের শিক্ষার দোষ। কেউ যদি অবলীলায় কোনো বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন, যে ভাষা আয়ত্ত করতে আমাকে অনেক দিনরাত্রি খরচ করতে হয়েছে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া ভিন্ন আমার কোনো পথ নেই। যদিও জানি, সাহিত্য এমনি একটি দুরূহ কর্ম এবং তা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত ভাষা এমনি এক উপাদান যার নিজস্ব কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কোনো অভিঘাত নেই; যেমন আছে অন্যান্য শিল্পকর্মে ব্যবহৃত উপাদানে - যথা সংগীতের বেলায় সুর, অঙ্কনে রং। ফলে সাহিত্যের জন্য ব্যবহৃত উপাদান, কতোগুলো মূল অর্থবহ ধ্বনি ও শব্দ, যা লেখকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আজ্ঞাবহ সৈনিকের মতো, তাদের ব্যবহারের কৌশল লেখককে আয়ত্ত করতে হয়। বস্তুত, এটাই লেখকের প্রধান কর্তব্য। এই কৌশল না জানলে, সেইসব জড়ভরত ধ্বনি ও শব্দ তাদের এলোমেলো পদক্ষেপে লেখকের অধিত বক্তব্যের শৃংখলা বিনষ্ট করবে। উপ-মাটা তাই, আমার মতে, সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর অনুরূপ।

ষষ্ঠীব্রতর নূতন উপন্যাসখানি হাতে পেয়ে উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমি ষষ্ঠীব্রতর প্রথম উপন্যাসটি পাঠ করিনি। শুনেছি, লেখক বাঙালী এবং এককালে কলকাতাবাসী ছিলেন। বর্তমানে বিদেশে থাকেন। ইংরিজি ভাষার লেখক হবার বাসনায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছেন ইংলন্ডে। এবং তাঁর প্রথম উপন্যাসে, "মাই গড ডায়েড ইয়ং", তাঁর আত্মচরিতমূলক প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, কলকাতার জীবনের কথা আছে।

"কনফেশন্স অব এন ইন্ডিয়ান ওম্যান ইটার", ষষ্ঠীব্রতর দ্বিতীয় উপন্যাসও মূলত আত্মচরিতমূলক। উপন্যাসের মূল চরিত্রের নাম অমিত রে। যদিও রবীন্দ্রনাথের অমিতের সঙ্গে ষষ্ঠীব্রতর নায়কের কোনোরূপ আত্মিক, ব্যবহারিক অথবা দৈহিক সাযুজ্য নেই। উপ-

ন্যাসের আরম্ভে অমিত কলকাতা ত্যাগ ক'রে দিল্লী যাত্রা করেছে, সঙ্গে নিয়েছে তোয়ালে, টুথব্রাশের সঙ্গে কিছু শাদা কাগজ ও নয়টা বই। বইয়ের তালিকায় আছে, লেনিন, নেহেরু, রাসেল, এলিয়ট, মেটারলিঙ্ক, শেখানোভ ও সিরিল কোনোলি। অমিত প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজের শেষ পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে, এই জীবন অসার জ্ঞান ক'রে, প্রেমের টানে আকর্ষিত না হ'য়ে, জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে অমিত পৌঁছুল দিল্লীতে। যেখানে তার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি, একই কলেজের বন্ধু কমল।

এরপর থেকেই অমিতের অভিজ্ঞতার রহস্য উন্মোচন শুরু।

যদিও, ষষ্ঠীব্রত বারংবার গ্রন্থের কয়েক পাতা অন্তর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নায়ক অমিত বস্তুত একজন লেখক হ'য়ে উঠতে চায় এবং একজন লেখক হবার জন্যই সে তার ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তথাপি তার দিল্লীতে পৌঁছানো পর্যন্ত পাঠক এমন কোনো ইঙ্গিত পাবেন না যাতে তাঁর এই বক্তব্য যথার্থ মনে হ'তে পারে। একজন আর্টিস্টের শিক্ষানবীশী বিষয়ে কিছু উপন্যাস বাংলা ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় রচিত হয়েছে। এইসব রচনা পাঠে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যায় যে একজন লেখকের শিক্ষা মূলত ব্যাপক ও দুরূহ। যেমন, জয়সের "পোর্টেট অফ এন আর্টিস্ট এজ এ ইয়ংম্যান"। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সে-রকম কোনো শিক্ষানবীশী এই উপন্যাসের নায়কের মধ্যে দেখতে পাই নি। পক্ষান্তরে যা আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে তা হ'চ্ছে ষষ্ঠীব্রতর উপন্যাসটি জুড়ে অজস্র রমণক্রীড়ার বর্ণনা। এবং যেহেতু, বইটির ভাষা আধুনিক ও ঘটনার এক অন্তর্লীন টান উপন্যাসটিতে বর্তমান সেইহেতু গ্রন্থটি শেষ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু, অন্তত, আমি এটি পড়তে সুরু করেছিলাম একটি ভালো গ্রন্থপাঠের উত্তেজনা নিয়ে। সেইখানে ষষ্ঠীব্রত আমাকে বঞ্চিত করেছেন।

এমন কি ষষ্ঠীব্রতর উপন্যাসের 'নয়াদিল্লী' অংশ রচনায় লেখকের যে মমতা, যে শ্রদ্ধা তাঁর নায়কের প্রতি আছে ব'লে মনে হয় তাও গ্রন্থটির পরবর্তী অধিকাংশ পৃষ্ঠায় অনুপস্থিত। শিল্পীর মিমি ও স্টেটসম্যানের সাংবাদিক অমিত—তাদের ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হওয়া, মিমির সঙ্গে যৌন সম্পর্কের প্রথম ও শেষ চন্দ্রালোকিত রাত্রি, মিমির অবহেলা, ঘৃণা; তারও আগের অমিতের জুতো পালিশ ক'রে জীবনযাপন, সহকর্মীদের জীবনবর্ণনা অথবা স্টেটসম্যানের টুকরো টুকরো ঘটনা, বিদেশী লেখকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এ-সবই পাঠকের উৎসাহ জোগাবে। খানিকটা আস্থাও জন্মাবে লেখকের উপর। অবশ্য এখানেও লেখকের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। কেবল কাহিনী বুনে যাওয়া। কেবলি 'মজার লেখা' হ'য়ে ওঠা। তবু আশা করেছিলাম, এমনি সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হয়তো অমিত একজন লেখক হয়ে উঠবে।

উপন্যাসটির প্রথম অংশের অর্থাৎ 'নয়াদিল্লী' অংশের প্রধান নারী চরিত্র মিমি। কিন্তু মিমি চরিত্রের এখানেই শেষ। এই অংশটুকু প্রায় একটা ভালো ছোটো গল্পের মতো। এরপর অমিত ভারতবর্ষ ত্যাগ করলো। কারণ মনেমনে সে দীর্ঘদিন ধ'রেই প্রস্তুত হচ্ছিল ইংলণ্ডের জন্য। মনেমনে ঠিক ক'রে ফেলেছিলো লন্ডনই তার উপযুক্ত বাসভূমি। সাহিত্যের পটভূমি। সেখানে তাকে একদিন পৌঁছুতে হবে। হতে হবে ইংরিজি ভাষার একজন লেখক।

ভারতীয় বিমানে রোমে যাবার পথে প্রথম রাতে অমিতের কল্পনার একটু অংশ: 'আমি বিশ্বজুড়ে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করবো। লিখবো মহৎ ও চমৎকার সব উপন্যাস। বক্তৃতা করবো এমন সব সভায় যেখানে হাজার হাজার মানুষ জমা হয়েছে। মেয়েরা পাগলের মতো আমার প্রেমে পড়বে, মিমি আবার এসে আমার ভালোবাসা প্রার্থনা করবে, আর নিউ স্টেটস-

ম্যান 'ভারতবর্ষের এক ব্রাহ্মণযুবক' এই শিরোনামায় প্রকাশ করবে আমার প্রোফিল।' বস্তুতঃ এটাই ছিলো পূর্বাপর অমিতের মনের কথা। এই অহংকার নানা ভাবে নানা সময়ে সে বলেছে। এমন কি রোমে যখন তাকে একটা বড়ো হোটেল থেকে অর্থাভাবে চ'লে আসতে হয় তখনও সে বলেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়ে এখানেই আবার এসে উঠবো। এই অহংকার পাঠকের ভালোই লাগে, কারণ কখনোই পাঠক নতশির লেখক পছন্দ করে না। কিন্তু লেখকের অহংকারের একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি আছে। তা পালন না করতে পারলেই সবটা হাস্যকর হ'য়ে ওঠে। 'লন্ডন, আমার কাছে প্রাণের প্রস্রবণস্বরূপ, এখানেই আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটেছে, ঘটেছে মহৎ ও বিস্ময়কর সব ঘটনা, যেখানে ভাবীকালের চাবি রয়েছে, রয়েছে অতীতের চাবি সেখানেই আমি বর্তমান কালে উপস্থিত থাকতে চাই। যদি এমন কোনো স্থান থাকে যেখানে ন্যায়বিচার আছে তবে সেই স্থান লন্ডন। যদি এমন কোনো মানদণ্ড কোথাও থাকে যাতে আমি পরিমাপিত হ'তে চাই তবে তা হচ্ছে, ইংরেজদের সমালোচনাপ্রবণ বুদ্ধিমান সাহিত্যিক পরিমাপ। যদিও আমি এখনো কিছুই রচনা করিনি, কিন্তু স্থির জানি আমি কিছু লিখবোই।' এই অংশগুলো উৎসাহিত করে আমাদের। কিন্তু আমাদের সমস্ত অনুভবকে দীর্ণ ক'রে মন্ঠীব্রিং বিরাট এক পাঠককুলের কল্পনায় লেখেন এমন সব ঘটনা যা যুগপৎ অবাস্তব ও বিরক্তিকর। লেখক যা লেখেন, যা লিখবেন তার জন্য পাঠককে প্রস্তুত করা লেখকেরই কর্তব্য। কিন্তু মন্ঠীব্রিত অধিকাংশ সময়ই তাতে সক্ষম হন নি। যেমন, উপরি উল্লিখিত বর্ণনার পর বিমানে অমিতের পাশে উপবিষ্ট একজন সুইডিস পুরুষ ও একজন নরোয়েজিয়ান রমণীর রতিক্রীড়া। ঘটনাটি ঘটছে অমিতের চোখের সামনে বিমানভরা যাত্রীদের উপস্থিতিতে। মনে রাখতে হবে বিমানটি ভারতীয়। এবং অমিতের প্রশ্নের উত্তরে বিমানসেবিকার উত্তর, 'এখন ওদের বেশিক্ষণ লাগবে না, স্যার। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে, আমার মনে হয়, আপনি আপনার সীটে যেতে পারবেন। কেউ আর আপনাকে বিরক্ত করবেন না।' এই চতুর বাক্যালাপ কেন জানি না সার্থক উপন্যাসের পক্ষে বেমানান, কষ্টকর।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশের মূল নারী চরিত্র সেলিয়া। সে-ই বস্তুত প্রথম অমিতকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা তুলনায় অধিক দীর্ঘস্থায়ী। যদিও অমিত-সেলিয়ার কিছুদিনের প্যারী-প্রবাস সুখপাঠ্য তবু মনে হয় মন্ঠীব্রিত নিশ্চিত ভাবে ওদের দুজনের মাত্র একটা সম্পর্কই উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং তাই তিনি করেছেন। মনে হয় মন্ঠীব্রিত আসলে, অন্তত এই উপন্যাসে, মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে চান নি—চেয়েছেন অন্য কিছু, যা সহজেই পাওয়া যায়, এবং তিনি নিশ্চিত তা পাবেন।

শেষ পর্যন্ত সেলিয়ার সঙ্গেও অমিতের বিচ্ছেদ ঘটে। সেলিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়বার যখন অমিত লন্ডনে ফিরে আসে তখনই তার আর্থিক অনটনের দিন শেষ হয়। তখনই সে পায় ভালো চাকুরি, কিনতে পারে গাড়ি, হ্যাম্পস্টেডে ফ্ল্যাট। অবশ্য অমিত দীর্ঘদিন ধ'রে রচনা করছিলো তার উপন্যাস। উপন্যাস শেষ হ'লে পাঠিয়েছিলো কয়েকজন প্রকাশকের কাছে এবং যথারীতি তা ফেরৎ-ও এসেছিলো। তারপর তার য়ুরোপ প্রবাসের ঠিক দশ বৎসর পর তার একটা ছোটোগল্প প্রথম প্রকাশিত হলো একটা সাহিত্য পত্রিকায় আর তৎক্ষণাৎ জুটে গেল তার প্রকাশক। প্রথম প্রকাশক। গ্রন্থের নাম, "গুডবাই টু ইন্ডিয়া"। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমিত রে হ'য়ে উঠলো একজন লেখক। ইংরিজি ভাষার লেখক। আর তখন তার মনে হ'লো দেশের কথা। পুরোনো দেশের কথা। কিনে ফেললো একটা বিমানের টিকিট, কলকাতার। কতদিন সে কলকাতায় থাকবে স্থির করে নি। যদিও স্থির করেছে,

এখন থেকে সে নিজেকে একজন লেখক বলে ভাববে। কারণ তার একটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে. প্রকাশ করেছেন ইংলন্ডের একজন প্রকাশক।

কমলেশ চক্রবর্তী

কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক— সুনীল বসু। রূপোদ্ধরি। পরিবেশক · সিগনেট বুক-শপ। কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা।

কবিতা দু ধরনের। এক. যেখানে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক ভিন্ন অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় এক তৃতীয় অভিজ্ঞতার; শেষ পর্যন্ত এই তৃতীয় অভিজ্ঞতাই রূপ নেয় কবিতায়। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার দূরত্ব অনেকখানি; ব্যক্তিগত ও সর্বজনীনতার সংঘর্ষে উদ্ভূত অভিজ্ঞতা তথা কবিতার প্রাথমিক. কাঁচা অনুভূতিগুলি যায় হারিয়ে—কবিতা বেরিয়ে আসে বিস্তৃত তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে. সম্পূর্ণ অন্য রূপে। তাই এখানে সর্বজনীন অভিজ্ঞতার প্রাভুত্ব। আরো এক শ্রেণীর কবিতা আছে. যেখানে সংঘর্ষ ঘটে অনুরূপভাবে; কিন্তু. 'সর্বজনীন' সেখানে 'ব্যক্তিগত'কে গ্রাস করতে পারে না; বিশ্বকে তিনি টেনে আনেন নিজের ভিতরে। ব্যক্তিত্বের ভিতরের জোর যে-কবির যতো বেশি. ভিতরের অহংকার ও ক্ষরণ যার যতো প্রবল. নিরন্তর আত্মরতিতেই যার অভিমান ও অভিজ্ঞতাগুলি শেষ হয়ে থাকে একমাত্র তিনিই পারেন এমনটি করতে। এই দুই বিন্যাসের সঙ্গে কবিত্ব ও প্রতিভার উদ্বীলনের সম্পর্ক নেই কোনো। কিন্তু. মনে হয়. যে কোনো কবি বা কবিতার আলোচনায় কবিচরিত্রের এই বৈপরীত্য বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার।

সুনীল বসুর সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই "কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক" আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত দ্বিবিধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো তিনি কখনো ব্যাপকভাবে আলোচিত হন নি. এমনকি দীর্ঘকাল কবিতা রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও এই মুহূর্তেও তাঁকে ঘিরে পাঠক-সমালোচকের নিস্পৃহতা ও অন্যমনস্কতা চোখে পড়ে। বহুদিন পরে. প্রায় নিরাসক্তভাবে তাঁর নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হলো। সম্ভবত এ সমস্তের মূলেই আছে তাঁর দুর্ভেদ্য স্বকীয়তা একগাড়ি মানুষের পাশাপাশি একাকী হেঁটে-যাওয়া পদযাত্রীর মতো তাঁর গতানুগতিক অনুষঙ্গহীন কবিতা. কবিতার পটভূমি. ভাষা ও অভিজ্ঞতা। এদের সম্মিলিত রূপকে একটিমাত্র বিশেষণেই সংহত করা যায়; এগুলি অন্ধকার রক্তের কবিতা। কিছুটা বিমূর্ত শোনালো হয়তো; কিন্তু অনুভূতিমান পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন এতদ্দ্বারা কী বোঝানো হলো। সুনীল বসুর কবিতায় সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টির মাথাব্যথা নেই—নেই সেই বস্তু যাকে বলা যায় সর্বজনবোধ্য আবহ; বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ও একান্ত এইসব কবিতায় পাওয়া যায় এমন এক কবিকে—যুগাই যাঁর শ্রেষ্ঠ অনুভূতি. প্রেম কৌমার্যহীন ও হিংসাপরায়ণ. দস্যুতাই যাঁর একমাত্র নির্ভর. অস্তিত্বের সঙ্গীত স্বীকার করে নিয়েও যিনি বিক্ষুব্ধ পশুর সঙ্গে আত্মার সহমর্মিতা অনুভব করেন—

'ফার্নান্ডিজ মূর্তিমান ধূর্ত ক্রূর শয়তান, রুপোর গেলাসে
আগুনের মত মদ গিলে খেত অট্টহাসে, নৈশভোজে তার

লাগত তিনটে আস্ত মুর্গি উনুনে ঝলসানো,
আর বিছানার পাশে
থাকা চাই ছিন্নভিন্ন লজ্জাবস্ত্র, লুঠ করা কোন অন্ধকার—
গাঢ় চুল, ভিনাসের মত দক্ষ নারীর শরীর :...' (সমুদ্র নেকড়ে/পৃঃ ১০)

'নেমে এল তাম্র-দেহ, প্রায় নগ্ন নৃত্যে করে ঢিলা
বাঘছাল, হাতে নেয় অঙ্গারের ধোঁয়ানো ধুনুচি ;
তার সঙ্গে নেচে ওঠে একপাল উন্দাম গরিলা
ওই তনুর তন্দুরে রক্ত সেঁকে হতে চাই শুচি॥' (জাগুয়ার/পৃঃ ১২)

'তুমি সুন্দর মেয়ে, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ছোট্ট মেয়ে
তবু আমি জানি, তুমি আমার নিয়তি, নিয়তি, নিয়তি :
তোমার জন্যে আমি কাজ করতে পারি না, খেতে পারি না, শুতে পারি না
তুমি আমার স্বর্গসুখ, তবু জানি, তুমি আমার সর্বনাশ, তুমি আমার ক্ষয়
এবং ক্ষতি।
দু'রকম ভূমিকা কি করে আমি নেব, কি করে নেব, কি করে হা কপাল
আমি রাজা হই প্রতি মুহূর্তে, ভিখিরি হই প্রতি মুহূর্তে,.. ' (কাল/পৃঃ ৩১)

উদ্ধৃত প্রথম কবিতাটির নাম 'সমুদ্র নেকড়ে' ; বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি সুনীল বসুর মধ্যে যে-কবি তিনি মাঝে মাঝে একাত্ম হয়ে পড়েছেন অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লবণাক্ত জলে হিংস্র দাপট নিয়ে তাঁর ভ্রমণ, পেশীবহুল ও কামার্ত, যাঁর অভিপ্রায় 'ওই তনুর তন্দুরে রক্ত সেঁকে হতে চাই শুচি।' কিন্তু শরীরী উন্দামও তাঁকে শেষ পর্যন্ত কোথাও নিয়ে যায় না কোথাও কোথাও নিয়তি-নির্ভর হয়ে তিনি মেনে নিয়েছেন ব্যর্থতা ও বিষাদ ; এই দুই বোধও তাঁর কবিতায় প্রবলভাবে সোচ্চার। ক্রূর, ধ্বংসোন্মুখ অথচ হতাশায় আক্রান্ত -পরস্পরবিরোধিতার চমৎকার দৃষ্টান্ত সুনীল বসুর কবিতা। ঠিক এই মুহূর্তের বাংলা কবিতার আর কোনো কবির মধ্যে তাঁর প্রতিতুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানি না। অন্ধকার রক্তে আলোড়িত তাঁর অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যেই উন্মুক্ত ও বন্ধ ; শব্দ থেকে উপমা, উপমা থেকে নাটকীয়তায় আরোহণ-অবরোহণের প্রতিটি স্তরে বর্তমান-নিরপেক্ষ এক রোমশগন্ধ দার্ঢ্য রূপের প্রকাশ।

দিব্যেন্দু পালিত

ওফেলিয়াকে—অসিতকুমার ভট্টাচার্য। এম. সি. সরকার। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা

সৎ কবিতার আলোচনায় বিলম্ব ঘটলে তেমন কিছু এসে যায় না। কালের মুকুর তো কালের পুতুল নয়। অসিত ভট্টাচার্য সৎ ও শিক্ষিত, অবস্থাগুণে একক কবি, যদিও দুর্বোধ্যতায় তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তবে যে রচয়িতার মতে (দ্রঃ 'প্রস্তাবনা') 'কবিতা নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা' শুধু নৈঃশব্দ্যই একদিন তাঁর আশ্রয় হবে এমন আশঙ্কা হতে পারে। সে-কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

১৯৬০-৬৮ সালের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থে দেখা যাবে একালীন বৈদগ্ধ্য, বেদনা ও গ্রামীণ সরলতার—যা সরলতাকাঙ্ক্ষীর এক সজীব সমাবেশ, কোথাও যেন পরস্পর বিরোধ নেই। অথচ দেশ, কাল, পাত্র-পাত্রী, কবিমানসের নানা মহলের কত সংবাদ সেখানে। সৌর শিশুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে হারানো স্বপ্নের পরিশীলিত সুর, আশ্চর্য সহজ চিত্রকল্পের সহায্যে আমরা উত্তীর্ণ হই সেই স্বচ্ছ চৈতন্যের জগতে কবিতা যার আর-এক নাম :

সমস্ত প্রবাল দ্বীপ আমার খেলনা।
নদী আমার আঙুল। ঢেউ আমার মুঠি। (ভোরের মাঠে জন্ম নিলাম)

আমরা কোথায় যাবো? সকালে মেঘের মতো ভেসে
সোনালী রোদের হ্রদে অবুঝ হাওয়ার মতো একা
দূর চেতনার দ্বীপে। (দিনলিপির থেকে)

আমরা সে দ্বীপে যাবো, যেখানে যায় নি ইতিহাস।

শেষের পঙক্তিটিতে মানবহৃদয়ের অমলিন স্বপ্নকে এক নূতন প্রতিমা দিয়েছেন কবি। কিন্তু এই রমণীয় বেদনা কি তাঁকে সার্বিকভাবে স্পর্শ করেছে, উজ্জীবনের গোপন রহস্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সেই সূক্ষ্ম জীবনজিজ্ঞাসা? এই সমস্যা ও বিপদ আজকের ও তাঁর একার নয়। সুন্দরের স্বপ্ন ইচ্ছাকে প্রদীপ্ত না-ও করতে পারে। আনন্দের প্রার্থনাতে, একই সূত্রে ধরা পড়তে পারে কালাতীতের আকৃতি ও স্পর্শকাতর মনের পলায়নী বা রাখালী স্বাক্ষর।

কিন্তু ক্লান্তি ('ক্লান্তিই আমার সঙ্গী') ও অবসাদকে ('অবসাদে আচ্ছন্ন শরীর') স্বীকার করলেও কবিমনের গভীরে বেজেছে 'চারিপাশে ঈশ্বরের স্বর', সে-মূর্ছনায় মেশা এ জীবনের যা-কিছু সুন্দর

নীল তারা গ্রহের বন্দনা
উজ্জ্বল সিন্ধুর কলরব,
সকালের শিশুর উৎসব,
মর্মরিত অরণ্যের স্তব,
মেঘমালা আকাশের পর
প্রার্থনায় দীপ্ত চরাচর।

'দীঘা : ১৯৬০', সেই সহৃদয় স্নিগ্ধ সংগীতে কি তারই আর এক রূপ :

মনে পড়ে পাশাপাশি সকালের নির্জন আলোয়
তুলেছি ঝিনুক, মৃদু উজ্জ্বলতা। বসেছি ঢালুতে
নরম পায়ের পাতা মুঠোমুঠো ঢেকেছি বালুতে।
তোমার জড়ানো কথা...দ্বিধাভরা কথার...কথায়।
সময় জড়ানো বুঝি। দিনগুলি একা পায়ে পায়
প্রান্তরে হারালো—দূরে অন্ধকারে। প্রিয়তমা সে-ই
মুহূর্তে অটুট মুক্তা সঞ্চিত স্মৃতির ঝিনুকেই
নাকি সে বালুর পথে, পথিকের পায়ের তলায়
একাকার বালুতে বালুতে।

মৃদু উজ্জ্বলতার কবিকেই আবার জ্বলতে দেখি 'পিতার প্রতি রুদ্ধ রোষে অনির্বাণ'।

'ইনটারভ্যু'-এ 'সারি সারি জন্তুরা জাঁকালো...একাকার শাদা আর কালো'-র পরিবেশে সে অন্য এক কবি। সে আর্তি ও আক্রোশ বুঝি ব্যঙ্গের চাইতে অসহায়তাকে প্রকট করেছে বেশি।

কিন্তু সমস্ত-কিছুকে ছাপিয়ে, কেবল নির্জন নিভৃতে নয়, ঈশ্বরের স্বর এক রমণীয় মধুবৃন্তে। কবির দেহ-মনে ধরা পড়েছে এই 'বিস্ময়ঘন পৃথিবীর প্রিয় দেহ ঘিরে' বাংলার বাঙ্ময় মহিমা। একে একাত্মতা বলবো না নসটালজিয়া বলবো জানি না। কিন্তু কি শান্ত এই অলসতা, কি তার মিশ্রিত ব্যঞ্জনা, সেখানে রূপকথার রাজ্যে ইতিহাস ক্ষণকালের জন্য হলেও পরাজিত (না, অনুপস্থিত?):

বাংলার আকাশ নীল। শরতের নির্মলতা নীল।
উৎসারিত অমলতা, গঙ্গার তরঙ্গে তীরে তীরে
উজ্জ্বল সবুজ গাছে, সকালের ঘাসের শিশিরে
সদ্যস্নাত বাতাসের স্পর্শমুখী রৌদ্রে অনাবিল
চেয়ে চেয়ে স্মৃতি আসে শঙ্খমালা রাজকুমারীর।
এখানে পলির বুকে সঞ্চিত রেখেছ তুমি সব।
অবিরাম জলশব্দ, তন্ময় আলোর অনুভব
নেমে আসা পল্লবেরা প্রসারিত জলের শরীরে।
ঘাসের বিস্ময়ঘন পৃথিবীর প্রিয় দেহ ঘিরে
মেঘমালা কে পরায়? প্রতিদিন কাহার উৎসব?

ধ্যাননেত্রে না, খোলা চোখেই যিনি দেখেছেন প্রকৃতির নিত্যকালের উৎসবশোভা তিনিই আবার, বেদনায় নীল, অসহায় চোখে দেখেছেন দেশ, ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থার আর-এক দৃশ্য, অন্যায়ের বিষ :

শীর্ণ দু' গালে অশ্রু গড়ায়। শূন্যে চেয়ে
এ-দেশ আমার পথের প্রান্তে ভিখারী মেয়ে।
টা টা করে রোদ। বেলা টান টান। গাছের তলে
ছায়া সরে যায়। পথ নেই, তবু পথেই চলে।
ছেঁড়া মাদুরের বোঝা টেনে টেনে হাঁপায় একা,
কোনো ভাঙা চাল, একটু আড়াল যাবে কি দেখা?
অথচ এ-দেশে না-খেয়ে না-পরে শুকনো মাঠে
কোটি কোটি লোক উদয়-অস্ত দু' হাতে খাটে।
জাগায় শহর, সেতু বন্দর। তাকাত যদি-
গড়ে তোলে বাঁধ, ঘিরে ফেলে মরু, ঘোরায় নদী।
প্রাণের অন্ন করেছ পণ্য : তোমরা কারা?
সব কেড়ে নিয়ে সবাইকে করে সর্বহারা
শিশুর শরীরে বিষ ঢেলে যাও। ব্যাধির বীজে
দেশ ভরে দাও। তোমরা অবাক। তোমরা কি যে!
রক্ত-মাংসে এ কোন প্রাসাদ আকাশ ঢেকে?
মৃত্যুজীবীর এ সাম্রাজ্যে বাঁচবে সে কে?
শীর্ণ দু' গালে অশ্রু গড়ায়। সামনে চেয়ে—

দেখছে অবাক এ-দেশ আমার ভিখারী মেয়ে।

নিসর্গচেতনা ও সমাজচেতনা, এই দুয়ের সমীকরণ তখনও কবির ভাগ্যে জোটে নি। এ-যুগের কোনো কবির ভাগ্যেই হয়তো নয়। সে যে কি মন্ত্রে হবে বাঁধা আমরা কেউই জানি না, সে-বিপ্লব ভিতরে না বাইরে, ecological না economic কে বলবে?

শুধু জেগে থাকে অলোকসামান্যার স্বপ্ন। "বিয়াত্রিচে"র প্রজ্ঞা বন্দনায় তারই স্বীকৃতি :

হে দেবী, হে প্রজ্ঞার আধার
অপরোক্ষ করুণার মণি।
ক্রীতদাস অসহ্য ক্ষুধার,
যন্ত্রণার পল গনি গনি,
জাগি আমি। তোমার সুধার
স্পর্শ দাও। গায় শীতলতা
হৃদয়ে ভরুক, নীরবতা
হাওয়ায় হাওয়ায় আগমনী।
হে দেবী, হে প্রজ্ঞায় গভীর,
খর-অগ্নি দারুণ বৈশাখে
ঠেলে ফেলে যেও না আমাকে।

শেষ নিরিখে কবিতা প্রার্থনা-ই, তবে কি ও কাকে নিয়ে এবং কিভাবে লেখা তারই উপর তারতম্যের বিচার। মনে হয় বিচিত্র ভাবী কবির অর্জিত বীর্যে একদিন রচিত হবে নূতন প্রত্যয়ের ভাষা ও ভাষ্য। অতীত, কল্পলোক ও বাস্তবের সমাহারে, শোধন ও উত্তরণের পথে আসবে আত্মসমীক্ষার দুঃসাহসী দীক্ষা, বাজবে অন্য, নিবিড়তর সুর, প্রজ্ঞা ও করুণার পথে আর এক পথরেখা।

পরিবেশের পীড়নে জর্জরিত কবি 'পঁচিশে বৈশাখ : স্বগত' উক্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক যথারীতি 'রাবিশে ভরাট করে পৃথিবীর (রবীন্দ্র) সরোবর' লক্ষ্য করে সখেদে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন :

আমি কি, আমি কি পাবো? শুধু এই আর্তিকে দিলাম।
তুমি নির্বাসিত, তুমি অনাপারে, কুয়াশা ছড়ানো
নিজেকে পুড়িয়ে শেষে, নিরুপায় বৈশাখের আলো
মিশে গেল অন্ধকারে, মিশে গেল, আমিও গেলাম।

এ আর্তি সততার স্বাক্ষর। আশা করবো কবিকণ্ঠে একদিন বাজবে প্রজ্ঞাপারমিতার আগমনী, ঘুচবে স্বর্গ-মর্তের দীর্ঘ বিবাদ, বেদনা উত্তীর্ণ হবে বীর্যে। সেদিন 'নিজেকে পুড়িয়ে শেষে' আমরা সে-দ্বীপে যাবো যেখানে যায় নি ইতিহাস। দূর চেতনার দ্বীপে।

শিশিরকুমার ঘোষ

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী: বৈশাখ থেকে বছর শুরু করে প্রত্যেক তৃতীয় মাসে—অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র মাসে **চতুরঙ্গ** প্রকাশিত হয়। মূল্য বার্ষিক সডাক ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা। বৈদেশিক বার্ষিক দুই ডলার।

চতুরঙ্গ-এ প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হলেও কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ডাকটিকিটসহ ঠিকানা লেখা লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের প্রতি সংখ্যার মূল্য:

সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ২২৫, টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১৩৫, টাকা

বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য

পত্রিকা প্রকাশের অন্তত ১৫ দিন আগে বিজ্ঞাপনের
পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক

রচনা, বিনিময় পত্রিকা, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা:

৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলকাতা, ১৩

Exide
GENUINE HARD RUBBER

দেওয়া ও পাওয়ার উপযুক্ত আদর্শ উপহার

উষা

সেলাই মেশিন

উষা সেলাই মেশিন প্রত্যেক পছন্দের সঙ্গে মানানসই নানা মনোরম রং ও মডেলে পাওয়া যায় — প্রত্যেকটি হাতে, পায়ে অথবা ইলেকট্রিকে চালিত — এবং প্রত্যেকটির সঙ্গেই রয়েছে ভারতের সর্বত্র লক্ষ বিক্রয়োত্তর সার্ভিস-ব্যবস্থা। উষা সেলাই মেশিন খুব সহজে চালানো যায় — এর সাহায্যে আপনি এবং আপনার পরিবারের সকলেই বাড়ীতে সেলাইয়ের আনন্দ ও উপকারিতা আবিষ্কার করতে পারবেন। নগদ অথবা হায়ার-পার্চেজে পাওয়া যায়। আজই একটি কিনে নিন।

কেনা ভাল সবার ভাল

....ডিগ্রি নেবার দিন। মঞ্জুদেবী তাঁর সন্তানের বি. এ.
পাশের খবরে খুব খুশি হয়েছেন।

সব মা ই চান তাঁদের সন্তানরা তার পাশ করুক,
দশের এক হোক।

কিন্তু পরিবার বড় হলে বাপ মায়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও
ছেলে মেয়েদের এই সুযোগ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়না।

ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হলে দুটি বা তিনটি
সন্তানই যথেষ্ট।

লাল ত্রিকোণ চিহ্নিত পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলি আপনাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সমস্ত সুযোগ সুবিধে দেবে—নিখরচায়।

দিনের মত দিন

আয় করুন
7 1/4 %
৫-বছরের
ডাকঘর মেয়াদী জমায় ৭¼%
৩ বছরের জমায় ৭% ১ বছরের জমায় ৬%
বছরে যেসব সিকিউরিটী ও জমার ওপর সুদ পাওয়া
যায় তা নিয়ে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদে
আয়কর দিতে হবে না।
বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার ডাকঘরে খোঁজ নিন।
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
davp 70/661

স্বপ্ন ও সংকল্পের অন্তরায় দূর হোক
আকাশে হালকা মেঘের আমেজ।
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন।
আপনাদের সেই স্বপ্নকে সফল করার সংকল্পে
আমরা রেলের দু লক্ষ মানুষ অটল।
সমস্ত ন্যায় ও নীতির পরিপন্থী
কিছু মানুষ আজ আপনাদের ও
আমাদের অনেক স্বপ্নের অন্তরায়।
ওরা রেলের তার, কামরার আলো পাখা ও অন্যান্য সরঞ্জাম
চুরি করে বারবার বিঘ্নিত করছে
ট্রেনের নিয়মিত চলাচল।
এতে শুধু যাত্রী হিসেবে আপনারাই বিপদাপন্ন নন।
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতিও এর ফলে বিপর্যস্ত।
এরা সমস্ত শুভবুদ্ধি মানুষের শত্রু।
আপনাদের সকলের সহযোগিতায়
এদের হীন চক্রান্ত ব্যর্থ হোক।
পূর্ব রেলওয়ে

Compliments of

PARK HOTEL

SEKAI-APJ 226

HINDUSTHAN BOTTLES

SERVE THEM ALL

THE DOCTOR prescribes medicine. Pharmaceutical companies supply the medicine in the bottles manufactured by us.
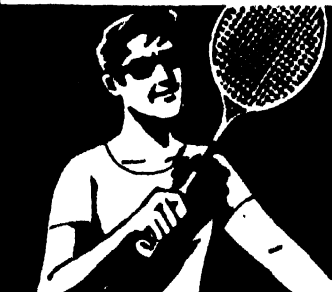
THE SPORTSMAN likes beverages. Manufacturers supply beverages in the bottles manufactured by us.

THE MODERN GIRL likes to buy the best hair oil, best shampoo, best snow and beverage. These are supplied in the bottles manufactured by us.

THE STUDENT prefers the best writing inks and hair oil. These are supplied in the bottles manufactured by us.

THE HOUSEWIFE buys pure Milk, Horlicks, Squash, Dettol and Hair Oil. These are supplied in the bottles manufactured by us.

HINDUSTHAN NATIONAL GLASS MFG. CO. LTD.,

2, WELLESLEY PLACE, CALCUTTA-1.

DUNLOP C49

—the MAXIMUM MILEAGE car tyre

Recommended Dunlop C49 tyre retail prices—Ambassador 5.90-15 WSW 6PR—Rs. 174.99. □ Fiat 5.20-14 WSW 6PR—Rs. 149.99. □ Standard 5.60-13 WSW 6PR—Rs. 164.57. □ Willys Jeep 6.00-16 M&S 6PR BSW—Rs. 221.33 (Sales and local taxes extra).

Unbreakable body
Unbeatable looks
EVEREADY
TRADE MARK
TORCHES
in beautiful colours
NULITE
Takes two 'Eveready' 950 batteries. Comes in many colours. Costs Rs. 8.00. Batteries and local taxes extra.
Get the feel of toughness in 'Eveready' Plastic Torches. Grip the non-slip reeded body. Flick on a powerful beam with the ever dependable switch. Make it yours. Choose from many beautiful colours.

ফ্যাশানের আয়নায়
বাটা
এক্সক্লুসিভ
বিশেষভাবে সেইসব
ফ্যাশনপ্রবণ তরুণদের জন্য
যাঁদের কাম্য শুধু আরামই নয়,
সেই সঙ্গে রুচিসম্মত আধুনিক নকশা।
বাছাই উৎকৃষ্ট চামড়ায় তৈরি এক্সক্লুসিভ জুতো
নির্মাণশৈলীর এক বিশিষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া আশ্চর্য
নমনীয় তাই বলা যায় আরামে
অদ্বিতীয়। আজই আসুন বাটার
দোকানে, একজোড়া কিনে দেখুন।
Bata

বর্ষ ৩৩ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৮

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ৩৩ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৮

জীবনের প্রমাণ

জয়স ক্যারল ওটস্

চরিত্র

শেলি	.	ঊনিশ-কুড়ি বছরের এক তরুণী
পিটার ডি.		একজন মানুষ যার বয়স বোঝা যায় না
শেলির পিতা	. .	চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একজন লোক
মার্টিন রাগভেন	.	তিরিশ-বত্রিশ বছরের একজন লোক

[বেশ উঁচু ঘর। দেখে মনে হয় তৈরি শেষ হয় নি। যেন ইঁটের দেয়াল চুনকাম করা কিন্তু মাঝে-মাঝে চুন খসে গেছে। পুরোদস্তুর অগোছালো ছন্নছাড়া এক ভয়ানক শূন্যতাময়। বাঁদিকে একটা জানালা। ডান পাশে দরজা। কয়েকটা বাক্স-পেঁটরা, এলোমেলো কিছু জিনিস, বাঁ পাশের মেঝেতে একটা তোশক পাতা, একটা ময়লা জল ফেলার পাত্র, রান্নার টেবিল, চুলো। নিচে একটা ছোটো আলমারি।

শেলি তোশকের ওপর নিঃশব্দে শুয়ে আছে। গায়ে একটা খাকি রঙের কম্বল। মঞ্চের আলো মৃদু, নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্নময়। যেমন মঞ্চের আলোর বেলায় তেমনি মঞ্চসজ্জায়ও একটা অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় মানুষ ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছুলে এমনি হয়; মনে হবে এরপর মানুষ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছুবে যেখানে সে আর মানুষ নেই।

শেলি জেগে ওঠে। খুব ধীরে ধীরে সে চৈতন্য পায়। তার পক্ষে উঠে বসা প্রায় অসম্ভব। কারণ সে বেশ মত্ত হ'য়ে আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরটা পরিস্কার করতে চায়। আর মঞ্চের আলো দেখে মনে হয় তা যেন তারই মানসিকতার প্রতিরূপ। প্রথমে প্রায় বোঝাই যাবে না সে নারী না পুরুষ—বছর কুড়ি বয়েস, অত্যন্ত শীর্ণ, খুব ছোটো ক'রে ছাঁটা চুল, নির্বিকার মুখ, নিষ্পাপ, শূন্য, খাঁটি। পোশাক বৈশিষ্ট্যহীন ও বর্ণহীন। সরু প্যান্ট আর কোঁচকানো শার্ট।

শেলি বেশ কষ্ট ক'রে উঠে দাঁড়ায়। মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যায়। যেন কথা বলতে বলতে সে জেগে উঠছে। কিছুক্ষণ পর মনে হবে, সে ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, এমনকি অপ্রকৃতিস্থ ব'লেও মনে হ'তে পারে। তার মনের খানিকটা যেন অস্বচ্ছ, অস্থির ও পারম্পর্যহীন।]

শেলি : খানিকটা পরেই তারা প্রমাণ করবে যে আমি বেঁচে আছি! সেই প্রমাণটা আমাকে দেখানোও হবে! দেখানো হবে এখানে, এই মঞ্চে!...আমাদের প্রতি মুহূর্তেই কোনো-না-কোনো কিছুর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। পত্রিকাগুলো ছবিতে, তালিকায় আর রেখায় ভরা থাকে, যা থেকে অনেক কিছু প্রমাণ হয়। টেলিভিশন তো সব সময়ই মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। প্রমাণ করছে, তারা তাদের মুখহাত নাড়াতে পারে, কথা বলতে পারে, তারা জীবন্ত ঘুরে বেড়ায়, তাদের নানা নামকরণ হয়েছে, তারা বেঁচে আছে। বিজ্ঞানীরা যে কতো কিছু প্রমাণ করেছে। কতো কিছুর অস্তিত্ব দেখিয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্য টেস্ট-টিউবে নাড়ানো হয়, অণু ফেটে যায়, রঞ্জনরশ্মিতে আমাদের মগজের সবরকম বৃদ্ধি, জটিলতা স্পষ্ট হয় জটিল তুষারকণিকার মতো। এগুলো সবই খুব মজার। শিক্ষণীয়। সৌরমণ্ডল, তোমার কড়ে আঙুলের নখের মতো, বাতাসে চারপাশে ভেসে বেড়ায়। এই ভূমণ্ডলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। তোমার গালে এক চপেটাঘাত প্রমাণ করবে আরো অনেকের অস্তিত্ব। আমার মাথাটা এইখানে মেঝেতে ঠুকে গিয়েছিলো (মঞ্চের একটা কোনা দেখিয়ে) আর তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মেঝেটা আছে। একদিন আমি খুব লম্বা হ'য়ে গেলাম আর ওপরে ওই যে সীলিং (সীলিংটা দেখিয়ে) আমার মাথায় লেগে গেলো, তাতেই বুঝতে পারলাম সীলিংটাও বাস্তব। খিদে পেয়েছে।

শেলি খুব ধীরে মঞ্চে ঘুরে বেড়ায়, যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন, খুঁজে বেড়ায় কোনোরকম খাবার কিছু।

শেলি : এখানে কোথাও খাবার আছে। কোথায় ও রাখলো? মনে হচ্ছে যেন খাবারের গন্ধ পাচ্ছি। এর নিচে আছে নাকি? (একটা কিছু তুলে দেখে) মাথাটা ব্যথা করছে। মনে হয় কিছু খাইনি ব'লে। আমি গত পরশু খেয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল কী হ'লো? আমার স্বামী, মার্টিনের জন্য গতকাল আমি কিছু খাবার বানিয়েছিলাম। নাকি সেটা আসলে পরশু। ও কি তার সবটাই খেয়ে গেছে, নাকি কিছু এখনো আছে? কোথায় হতে পারে? এখানেই খাবারের গন্ধ পাচ্ছি...এখানে একটা কিছুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কে জানে হয়তো কয়েক বছর আগের তৈরি কোনো খাবার হবে। মাথাটায় যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু আমি তো আর সত্যি-সত্যিই ক্ষুধার্ত নই। আমার পেটটা তো শক্ত হ'য়ে আছে। হয়তো কোনো খাবার এর ভেতর ঢোকানো সহজ হবে না। এখানকার এই গন্ধটা ভালো লাগছে না। কতো লোকই না এখানে বাস করেছে। বাড়িটা এখন নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি শুনেছিলাম পিটার মার্টিনকে বলছে, মনে হয় আমি তাকে বলতে শুনেছিলাম যে...এই বাড়িটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো খাবারের গন্ধ পাচ্ছি, বাসি খাবারের! বহু বছরের পুরনো! এই গন্ধটাই প্রমাণ করছে, একদিন এখানে মানুষ বাস করতো। আমি যেন প্রায় সেইসব মানুষদের চারপাশের বাতাসে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের চেহারা, অথচ কেমন অচেনা...(সে স্বপ্নের মতো চারপাশে তাকায়, তাকায় কেমন ভয়ে ভয়ে) তারা বাতাস থেকেই প্রায় একটা চেহারা নিচ্ছে। পৃথিবীতে কতো, কতো অদৃশ্য মানুষ রয়েছে। তারা প্রতিমুহূর্তে আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে, আমাকে যেন ঠেলছে...তাদের কনুই, তাদের পা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমার মুখের উপর...দৃশ্য অথবা অদৃশ্য, তারা সব সময় আমার চারপাশ ঘিরে আছে। আমাদের সবাইকে তারা ঘিরে ধরতে চায়, চায় পৃথিবীর শেষ সীমানায় ঠেলে দিতে. পিটার কোথায়? গত তিনদিন তো সে এখানে আসে নি। পিটারকে আমার খুবই প্রয়োজন। এখনি তার ফেরা দরকার। পিটার পারে এই ভিড় সামলাতে, এই জনতাকে আটকাতে। ব্যাপারটা সেই বোঝে। তাকে খুব দরকার, তার কাছ থেকে আমাকে ওষুধ নিতে হবে,

সাহায্য নিতে হবে। আমি তাকে ভালোবাসি, সে-ও আমাকে ভালোবাসে। কখনো কখনো সে তো আমাকে মেঝেতে চেপে ধরে, চিৎ করে, একেবারে মেঝেতে, যেন আমি নড়াচড়া করতে না পারি। তারপর সে আমার ভেতরে হাঁপায়...আমার মাথাটায় খুব যন্ত্রণা হয়। আমি স্পষ্ট কিছু দেখতে পাই না। এই ঘরটার কোনাগুলো কি যথারীতি ওখানেই আছে? আজ যারা এই ঘরে আসবে তারা হচ্ছে: পিটার ভি, আমার প্রেমিক; আমার বাবা, যে এখন এদিকেই আসছে; আর একজন মানুষ, যাকে আমার রহস্যময় ব'লে মনে হয়, মার্টিন ব্যাভেন, আমার নুতন স্বামী। (সে চটুলভাবে দ্রুত হাত দিয়ে চুল ঠিক করে) আমি কি এখনও তেমনি সুন্দরী? একটা আয়না আনার কথা পিটার ভুলে গেছে। বলেছিলো আনবে, তারপর ভুলে গেছে। আমি তো অনেকদিন ধ'রে এই ঘরেই আছি। কখনো বেরোই না। ওরা আমাকে কখনো যেতেও দেয় না। যেন বাইরের রাস্তায় বেরুলেই আমি ব্যথা পাবো, হয়তো বা......বাইরে যে খুব ভিড়। যেন একদল সৈন্য রাস্তা জুড়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। কেউ হয়তো আমাকে ফেলেও দিতে পারে। যদিও মনে হয় না ওই দরোজাটায় তালা দেওয়া, তবু যেহেতু পিটার ভি ঘর ছেড়ে বেরুতে না করেছিলো তাই আমিও বেরোই না। দিন দশেক কিংবা মাসখানেক আগেই সে আমাকে পইপই ক'রে সব বুঝিয়েছিলো। আমার কিছু মনে নেই। যদি সে আমাকে বাইরে যেতে বারণ না করতো, তবে আমি বেরোতাম......আমার খিদে পেয়েছে, মনে হয় আমার বেরনোই উচিত......আমি হেঁটে দরোজার কাছে যাবো (হেঁটে দরোজা পর্যন্ত যায়), দেখছি যদি খুলতে পারি......(দরোজাটা খুলে ফেলে, কারণ তাতে কোনো তালা ছিলো না)......যদি তালা না থাকতো তবে বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু এতে যে তালা লাগানো রয়েছে। প্রায় একমাস ধরেই তালা দেওয়া। বাইরে যাওয়া অসম্ভব।

শেলি দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইরে তাকায়। কথা বলে গানের মতো, একঘেয়ে কণ্ঠস্বরে, যা ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, ক্রমশ উত্তেজিত শোনায়।

শেলি। এই দরোজার বাইরেই একটা টানা বারান্দা। দেয়ালের চুনকালি খ'সে পড়ছে। একটা সিঁড়ির ওপরের অংশ আমি দেখতে পাচ্ছি। বারান্দায় অনেকগুলো দরোজাও আছে—কয়েকটা আবার খোলা। কয়েকটা বন্ধ। শোনো!—কেউ কাঁদছে না? (শুনছে। কোনো শব্দ নেই।) আমার বিশ্বাস আমি ছাড়াও এই বাড়িটাতে আরো অনেক লোক থাকে। কাল রাতে যেন কয়েকটা মেয়েগলার হাসি শুনেছি। ছোটো ছোটো মেয়েদের। ধুপধাপ শব্দ, আর্তনাদ, একঘেয়ে দীর্ঘ তর্ক, রেডিও, টেলিভিশন, পায়ের শব্দ শোনা যায়...... এটা পিটারের বাড়ি তাই পিটার তার খুশিমতো লোকজন রাখতে পারে। সে অনেক অনেক মেয়ে ভালোবাসে, কেবল তো আমাকেই নয়। আমি তা জানি। আমার ঈর্ষা হয় না। আমি নিজের শরীর বিষয়ে কি স্থিরনিশ্চিত (সে নিজের শরীরের এখানে ওখানে ছুঁয়ে দেখে) যে আমার হিংসে হবে? এই বাড়িতে অন্যান্য যারা থাকে তাদের শরীর নিয়ে পিটার যা করে তাতে আমার হিংসে হবে কেন? যদি পিটার ফিরে আসে তবে খুশি হই। ওকে আমার দরকার। এবং আমার বাবা, জানি বাবা আসছে। হাঁ, আসছে। আর আসছে আমার নুতন স্বামী, মার্টিন। তারা সবাই একসঙ্গে আসছে। এই ঘরেই আসছে একসঙ্গে। আমার মধ্যে। আমার ভেতরে আসছে এই একদল মানুষ...ভালো হয় যদি পিটার সবার আগে আসে! মনে হয় সবকিছু যদি দ্রুত হ'তো, আমার জীবনও যদি দ্রুত হ'তো। আমার মাথার দবদবানিটা দ্রুত হচ্ছে, দ্রুততর, যাতে আমাকে দেখানো যেতে পারে আমি কেমন

ক'রে বেঁচে আছি।-যেমনভাবে তোমরা নিশ্চিত হও, তোমরা বেঁচে আছো...

শেলি ধীরে মঞ্চের বাঁদিকে হেঁটে যায়। পিটার ডি. নিঃশব্দে দরোজায় একটু দাঁড়ায় এবং প্রবেশ করে। পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে কোনো বয়স তার হ'তে পারে। ওর পোশাক কেমন যেন অশালীন ও বাউণ্ডুলে। ভাবটা যেন পরিপাটি, অথচ খেয়ালী। কিন্তু পোশাক খুব একটা আধুনিক নয়। গলায় জড়ানো একটা জ্বলজ্বলে সবুজ রুমাল এবং হালকা রঙের ট্রাউজার্সটা তার পক্ষে একটু বেশি চাপা। জুতোজোড়াও ফিকে রঙের। পায়ে-পড়া, বেহায়া-গোছের। সে শেলির চেয়ে অনেক সুচারুভাবে এবং দ্রুত দর্শকদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

শেলি (জানালার কাছে) : ভালো লাগতো যদি তুমি এই জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পারতে। ওখানে একটা রাস্তা আছে যেটা একটা ঢাকা বারান্দা ব'লে মনে হবে। কিন্তু বারান্দাটা লোকে গিজগিজ করছে। ওই লোকজনের শব্দ শোনো! অজস্র লোক একসঙ্গে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ বা রাস্তা পার হচ্ছে গাড়িঘোড়ার পথ আটকিয়ে...ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা সাইকেলে, .এক বুড়োও সাইকেল চড়েছে...লোকেরা বাসে উঠছে...রাস্তার ঠিক ওপারে এই বাড়িটার মতোই একটা বাড়ি। বাড়িটা খালি। অনেক জানালার খড়খড়ি বন্ধ। কিন্তু কোনো কোনো জানালায় কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে ওরা সব অল্প বয়েসী মেয়ে কিনা, নাকি ছোট্টো ছোট্টো মেয়ে...? ওরা জানালায় ঠিক আমার মতোই দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলাম একজন রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল...আমরা এমনি করে আমাদের দুহাত বার ক'রে দিই, জানালার পাল্লাদুটো ঠেলে দিই। কিন্তু কিছুই ঘটে না।

পিটার : যেদিন প্রথম ওকে এখানে নিয়ে আসি সেদিনও ঠিক এমনিই করেছিলো! সবসময়ই একটা ভান করছে। দেখাচ্ছে। যেমন অন্যান্য মেয়েরা করে তেমনি এ-ও আমার সামনে নানা ছলাকলা ঢংঢাঙ করে। ও এমন চালাক! এই সব চালাকি, কী ঘৃণা! তাদের তুমি যথেচ্ছ ঠুকতে পারো, আঘাত করতে পারো। একটা একটা ক'রে দাঁত ফেলে দিতে পারো তবুও তারা তোমার কাছে ভান করবে। তবু তোমাকে খেলাবে। মেয়েগুলো সবাই এমনি। ওকে দেখুন—পঁয়তাল্লিশ দিন পরেও, না কি ষাট দিন হ'লো—এখনো ও যেন আহ্লাদে ফেটে পড়বে। আহ্লাদে যেন লাফিয়ে উঠবে, শিড়দাঁড়া সোজা ক'রে, দুহাত তুলে ধরবে, যেন ওর ছোট্টো সুগঠিত শরীরটা দেখাতে কতোই না ব্যস্ত, যেন এক বিজয়ী দলের পরিচালক

পিটার গতিময় ভাষায় ব'লে চলেছে; যেন কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। শেলি কিন্তু স্থির তার কাঁধ দুটো নিচু হ'য়ে যাচ্ছে, কেমন যেন নিদ্রাতুর, ক্লান্ত ভঙ্গি।

শেলি : প্রথম যেদিন ও আমাকে এখানে নিয়ে এলো, আমি ছুটে গিয়েছিলাম ঐ জানালার ধারে। এমনি করেই জানালা দিয়ে ঝুঁকেছিলাম। কে জানে ও কী ভেবেছিলো! জানি না, আমি কি সত্যিই জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলাম অথবা কেবল ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। কে জানে, তখন দেখতে কেমন ছিলাম। আমার চুলগুলো তখন লম্বা ছিলো। জানি, আমি দেখতে সুন্দরীই ছিলাম। আসলে আমার বয়সের সব মেয়েরাই দেখতে সুন্দরী। এটা আমাদের হাতের বাইরে। বেশ মনে আছে সেই জানালায় ঝুঁকে পড়া...এখানে দাঁড়িয়ে...আমার দীর্ঘ চুল...মানুষজন সব রাস্তায় বেরিয়েছে...শনিবারের পড়ন্ত বিকেল আর অগুনতি মানুষ...রাস্তা থেকে খাবারের গন্ধ...আমি জানালাটা ভালো ক'রে খুলতে চেয়েছিলাম যাতে সবাই নিচ থেকে আমাকে দেখতে পায়। আমি ভেবেছিলাম চিৎকার ক'রে বলবো, 'দেখো, এই তো আমি, শেলি, আমি এখানে এসেছি তোমাদের সঙ্গে

থাকবো ব'লে। আমি তোমাদেরই একজন হ'তে চাই! আমি প্রেমে পড়েছি!' পিটার ডি, আমার পেছনেই উঠে এলো। এসেই আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। ওঃ, তারপরই সে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করলো, প্রেম করলো এক সপ্তাহ, কি তারও বেশি দিন ধ'রে আমাকে বলেও ছিলো, এটাই তার সবচেয়ে বেশিদিন ধ'রে একজনকে প্রেম করা..."

পিটার : এই মেয়েটির মতো আঠারো-উনিশ বছরের সব মেয়েই দুর্নিবার হয়। এমনকি যদি তুমি কোনো কাজে দিন তিনেকের জন্যও বাইরে যাও, যেমন আমি যাই...তিনদিনে মাত্র কয়েক ঘন্টার ঘুম, দক্ষিণা আদায়, টাকা দেওয়া, টেলিফোন করা, ট্যাক্সিতে ওঠা-নামা, অনেক বড় বড় বাড়িতে প্রবেশ-নির্গমন—কী জীবন! কতো মানুষকেই না চিনি। অনেক মেয়েকে জানি, এই মেয়েটির মতোই। তবুও, ও দুর্নিবার, নয় কি? দেখুন, ওর ঝক-ঝকে ঘন চুল, লক্ষ্য করুন ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর! আমি হলপ ক'রে বলতে পারি ওর পাঁজরের মাঝখানেই আমেরিকার আত্মা বিরাজ করছে। ওর দু' পা যেমন মুক্তোর মতো শুভ্র তেমনি দীর্ঘ আর মনোহর। এও আমি হলপ ক'রে বলতে পারি ওর শরীরে কেবল ট্যালকম পাউডারের আর সজিনর গন্ধই পাবেন- অন্য কোনো গন্ধ নেই! মেয়ে-স্কাউটদের চিহ্ন ওর বুকে উল্কিতে আঁকা। এ-সবই আমিই হলপ ক'রে বলতে পারি।

শেলি : মনে হয় আমি নিচের ওই সব লোকদের ডাকছিলাম যাতে তারা আমাকে দেখে ঈর্ষা-বোধ করে। যা হোক, পিটার তো আমাকেই বেছে নিয়েছে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি বুঝি বা ওদের সাহায্য চাইছিলাম। ও তো দরোজাটা বন্ধ ক'রেই দিয়েছে। আমি বেরোতে পারি নি। প্রথমে ও দরোজাটা বন্ধ করেছিলো, তারপর আমাকে মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিলো—তোশকের উপর নয়, কারণ তখনো তোশকটা এখানে আসে নি। ও ক্রমাগত আমার মাথাটা মেঝেতে ঠুকেছে, আর এমনি করে আমাকে ভালোবেসেছে। সেই তো আমাকে বুঝিয়েছে, আমার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। ওর হাতে আমার শরীরটা যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে গিয়েছিলো। এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন টুকরো।

পিটার (উল্লসিত ভাবে) : মেয়েটা কি জানালাটা ভাঙতে চাইছে? লাফিয়ে পড়তে চাইছে নাকি? আমি এখনই তা হ'তে দেবো না। দেখেছো ওর কী প্রাণশক্তি! কী শক্তিশালী পেশী! কেমন সুন্দর মেয়েটি না? তোমার কাছে ওর মূল্য কতোখানি? কত ভালোভাবে ধ'রে রেখেছে; কারণটা হচ্ছে ওর চমৎকার পারিবারিক জীবন, নিয়মিত দন্তমার্জনা, পুষ্টি-কর খাদ্য আর বুটিদার বুটজুতো। মিচিগানের ডেট্রয়েটের মফঃস্বল থেকে ও এসেছে। ওর এই শরীরের জন্য কতো যত্নই না করতে হয়েছে, শতাব্দীব্যাপী যত্ন। ও তো মধ্য-পশ্চিম প্রান্তের সুন্দরী। দেখো, কেমন নিজেকে ঝেড়েপুঁছে নিচ্ছে! আমাদের দেখিয়ে কেমন নানা ভঙ্গি করছে যেন টগবগ ক'রে উপচে পড়বে এখনি! (শেলি স্থিরভাবে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

শেলি (অন্ধের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, পিটারকে না দেখে) : সে আমার দেহটা টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছে। আমার অবস্থা এখন অনেকটা কলের পুতুলের মতো। এখানেই তো পড়ে ছিলো, এই মেঝেতে...ঠিক এইখানে...কিন্তু এখানে তার কোনো চিহ্ন নেই। কোনো রক্ত পর্যন্ত লেগে নেই। মানুষকে মেঝেতে পেরেক ঠুকে রাখা হ'লো, রক্তমোক্ষণ হ'য়েই তার মৃত্যু হলো কিন্তু সেখানে কোনো চিহ্নই রইল না যাতে দেখানো যায় তাদের কী হয়েছিলো। কোনো প্রমাণ নেই, কোনো চিহ্ন নেই তাদের অস্তিত্বের...পৃথিবীটা ভ'রে আছে সব অদৃশ্য মানুষ, যারা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে তারা আসলে জীবিত। (মৃদু গলায় কাবোর

মতো) তব্ও সে আমাকে ভালোবেসেছিলো! হয়তো আবার আমাকে ভালোবাসবে! পিটার, তুমি আমাকে ভালোবাসতে! (সে দৌড়ে পিটারের কাছে যায়, দ্'হাত বাড়িয়ে দেয়, তব্ যেন তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখে নি। পিটার নাচের ভঙ্গিতে তাকে এড়িয়ে যায়। ম্দ্ হেসে দর্শকদের দিকে তাকায়। যেন তার অধিকারভুক্ত এই মেয়েটিকে সে দর্শকদের দেখাচ্ছে।) আমি একটা বাসে উঠলাম, নামলাম, এইতো কয়েক হাত দ্রে, এই বাড়িটার বাইরে কোনো একটা শনিবারের বিকেলে। কী ভিড়! এই সব স্খী মান্ষেরা! কতো রকম খাবারের গন্ধ পাচ্ছিলাম—হজ্ডগ, কাস্ন্দি, পিৎজা—আমি পাশের পথ দিয়ে দৌড়্তে লাগলাম, গায়ের চারপাশে কোটটা উড়িয়ে। আমার স্কার্টটা বেশ খাটো, পা দ্টো স্ন্দর লাগছিলো ঝক-ঝকে নীল মোজায়। যেমন জলের তলায় পা ডুবালে দেখায়—আর তুমি, পিটার তুমি পিছনে পিছনে এলে, আর তোমার দ্ই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে—

পিটার : আমি তো ওই পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম তুমি ছ্টে আমার দিকেই আসছো। কী স্ন্দর ছোটোখাটো মেয়েটি! যদি আমি ম্হ্র্তের জন্য চোখটা বন্ধ করি তবে তুমি একদল ছোটো ছোটো মেয়ে হ'য়ে যাও—একদল আর তারা প্রত্যেকেই আমাদের বাঞ্ছিতা! তোমার চুলগ্লো তখন দীর্ঘ ছিলো, ঠিক যেমনটি তোমাদের দেশে প্রচল। পাটপাট ক'রে আঁচড়ানো, সতেজ, সোনালি-বাদামী। তোমার হল্দ কোট পৎপৎ ক'রে উড়ে প্রকাশ করেছিলো তোমার এই বাঞ্ছিত স্গঠিত দেহ আর নীল মোজায় ঢাকা তোমার চঞ্চল দ্'টি পা। আমি যেন একটা বাতিঘর। আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম আর তুমি আমাকে দেখতে পেলে।

শেলি : তুমি একটা গলি থেকে বেরিয়ে এলে আর এসেই আমার ব্কে কন্ই দিয়ে গ্তো দিলে!

পিটার : আমি লক্ষ্য করেছিলাম তুমি একজনের সংগে ধাক্কা খেলে। আমাদেরই পাড়ার বাসিন্দে, এক অন্ধ। সোজা তুমি ওর ওপর দৌড়ে গিয়ে পড়লে, কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলে, আর সে তার কন্ই দিয়ে তোমাকে ধাক্কা দিলো। নিজের সাফাই গেয়ে তৎক্ষণাৎ সে যেন চিৎকার ক'রে তোমাকে কী বললো—

শেলি : বলছিলো, 'দ্র হ মাগী! আবার গায়ে গন্ধ মেখেছে!'

পিটার : তাই আমি তোমার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?'

শেলি : তুমি তারপর আমার হাত ধরলে...

পিটার : তুমিই আমার হাত ধরেছিলে।

শেলি : আসলে আমার আঙ্লগ্লো আপনিই তোমার হাতটা চেপে ধরেছিলো...আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, আমি প'ড়ে যাচ্ছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম, নিজের ভার আর বইতে পারছিলাম না...ওই ব্ড়োটা কেন আমাকে গালাগাল দিলো? আমি ওর কণ্ঠস্বরে ঘৃণা শ্নেছিলাম। কিন্তু কেউ তো আমাকে ঘৃণা করে না—কখনোই না—প্রত্যেকেই পছন্দ করে আমাকে। আমি তো জনপ্রিয়! তাই ওই নোংরা ব্ড়োটার গলায় স্পষ্ট ঘৃণার আভাস পেয়েও আমি বিশ্বাস করতে পারি নি...আমি তোমার হাত চেপে ধরলাম আর তৎক্ষণাৎ মনে হ'লো সবকিছ্ তোমার উপর ভেঙে পড়ছে। পাশের পথটাও তোমার দিকেই কাৎ হ'য়ে আছে। মাধ্যাকর্ষণের টান বোঝা গেল। (স্ন্দর একটা ভঙ্গি করে) আমি বাস থেকে নামলাম আর সেখানেই তুমি ছিলে! তোমার বিষয়ে আমি যা জানতাম তুমি ঠিক তাই।

তুমি অথবা তোমার মতো কাউকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এর আগে দুবার আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে তো কখনো দেখি নি...কখনো না। দেখা হয়েছে মেয়েপুলিশের সঙ্গে যাদের গায়ের চামড়া পর্যন্ত খসখসে হ'য়ে গেছে রাতভর এইরকম মেয়েদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে...

পিটার : আমার জামাকাপড়ের কথা কিছু মনে আছে?

শেলি : একটু শাদাটে—সবুজ ডুরে- সবুজ গলাবন্ধ মাথায় শোলার টুপি—কালো চশমা চোখে—শাদা জুতো—তোমাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল! শাদা ঝকঝকে দাঁত! কোঁকড়া চুল দেখে ঢেউখেলানো বনের কথা মনে হতো। টুপির পাশ দিয়ে বেরিয়ে ছিলো সতেজ কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ! আমার দুহাত তোমার দিকে এমনি এগিয়ে গেল আর তোমার হাত জড়িয়ে ধরলো আমার স্বাধীন আঙুল—

পিটার : মনে আছে তুমি ছিলে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, ওজন ১১৫ পাউন্ড, আঠারো বছর বয়স, ছুটি কাটাতে বেরিয়েছ আর চাইছ কেউ তোমাকে রক্ষা করুক। তখনো তোমার চোখে একটা আবেশ—সুন্দর নীল দুচোখ!- চোখের খুদে মণিদুটো যেন পাশের জলীয় অংশের মতোই প্রভাহীন, প্রায় অন্ধের মতো, এতো নির্ভরশীল, এতো প্রেমময়। তুমিই চেয়েছিলে, তোমার অস্তিত্ব নেই, এই কথাটা আমি তোমাকে বোঝাই। অবশ্য তার জন্য তুমি দায়ী নও, কেউ তোমাকে শাস্তি দেবে না, আর তাই তোমাকে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম।

শেলি (হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে) : তুমিই আমার মাথাটা মেঝেতে ঠুকছিলে। ওটাই ছিলো আমার জীবনে প্রথম। তুমি কান দাও নি। বাড়ি থেকে পালাবো ব'লে আমাকে কতো মাইল বাসে চ'ড়ে আসতে হয়েছে, আসতে হয়েছে খুঁজে পাবো ব'লে এমন একজনকে যে আমাকে ভালোবাসবে। তাই ওটাই ছিলো আমার জীবনে প্রথম ভালোবাসা কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো নি। সব কিছুই যেন আমার ভেতরে ঢুকে গেছে! আমার অন্তর্লোকে! বাইরের এই পা-পথ জনতা—যানবাহন—বাড়িঘরদোর জানালা দরোজা—ছাদ—সবকিছু আমার শরীরে প্রবেশ করেছে; আমার ভেতরে এক প্লাবন ঘটিয়েছে। তুমি যেন বাতিঘর - বাতিঘরের আলোকসংকেত! সেই আলো! সেই আলোর রশ্মি! আমার শরীরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। ভেসে গেল ওই শহরময়। টুকরো টুকরো হয়েই ফিরে এলো। (নিজের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, যেন ঘুমঘোরে; নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে) এই তো এখানে একটা শরীর আছে। জানি। এই তো আমি নানা কিছু ভাবছি, কথা বলছি, এই দেহের উপর দিকে আছে একটা খুলি, মাংসে ঢাকা, একটা জীবন্ত খুলি, হাড়গুলো চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছে। এটাও জানি। কিন্তু এই দেহের সঙ্গে আসলে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কথা বলবো, কেবল কথা বলবো আর আমার কণ্ঠস্বর ভেসে যাবে এদিক ওদিক, মেঘে মেঘে...আমাকে দেখতে ঠিক একটা পরীর মতো লম্বা, আঙুলের নখের মতো দীর্ঘ...একটুকরো পোড়াকাঠে চ'ড়ে আমি আকাশে ভেসে যেতে পারি, এক-টুকরো দগ্ধ কাগজ শূন্যে উড়ছে...(হঠাৎ ত্রস্ত) পিটার আসছে! তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

শেলি বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিটার দরোজা থেকে এগিয়ে আসে। আবার ফিরে যায় মেঝেতে পায়ের শব্দ ক'রে। দু' হাতে তালি বাজায়। এবার তার কণ্ঠস্বর আরো উঁচু, আরো একটু সজল যদিও ভর্ৎসনার ক্ষীণ চিহ্ন তাতে বর্তমান।

পিটার : কী, ব্যাপারটা কী? ছোট মেয়ের কি ঘুম ভাঙলো! এবার একটু জাগো! এখন যে

বিকেল পাঁচটা বাজে, জানো তা! এখন তো তোমার উচিত ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া, একটু ঝাড়পোঁছ, মাজাঘসা তারপর রান্না। তুমি তো জানো তোমার পতিদেবতাটি আর আধাঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরবে!

শেলি (জেগে ওঠার ভান ক'রে) : মাথাটা খুব ব্যথা করছে...শরীরটা ভাল লাগছে না...

পিটার : আমি তিনদিন আগে তোমাকে যে-ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে গিয়েছিলাম এখনো তেমনি আছো! উঃ তুমি কী ভীষণ কুঁড়ে, তোমার লজ্জা করে না! বেহায়া! তোমার স্বামী কী বলবেন? তুমি কি চাও, তাঁর মেজাজ আবার সপ্তমে উঠুক? এখনো কেন রাতের রান্না চড়াও নি?

শেলি : আমি যে উঠে বসতেই পারছি না...মাথায় খুব যন্ত্রণা...কেমন যেন অসুখ-অসুখ লাগছে...

পিটার : ওঠো, ওঠো! (হাততালি দিয়ে) তোমার কাছে ওই ছোটো ছোটো বড়ি অনেক আছে নাকি? দরোজার ফাঁক দিয়ে কেউ তোমাকে নিয়মিত ওই বড়ি দিয়ে যায় নাকি? আর কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে বুঝি? নাকি দেয়ালে টোকা দিয়ে দিয়ে তুমি কোনো গোপন সংকেত পাঠাও? তুমি তো ভালো ক'রেই জানো কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে তোমাকে বারণ করা হয়েছে।

শেলি : হ্যাঁ...

পিটার : তবে, উঠে পড়ো, কাজ-কর্ম শুরু করো! (ওকে ধীরে তুলে ওর পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। দেখে মনে হয় যেন নৃত্যচর্চার ব্যর্থ অনুকরণ চলছে) প্রথমে বিছানাটা ঠিক ক'রে পেতে ফেলো। হ্যাঁ, এমনি ক'রে, ঠিক। ঘরটাকে গুছিয়ে নাও। হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে, ঠিক আছে। চমৎকার। (ছড়ানো জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে) এর জন্য সে টাকা খরচ করছে। পারিবারিক জীবন। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার এখুনি রান্না চড়ানো উচিত যাতে ক'রে, যখন সে সিঁড়ি ভেঙে উঠবে তখন যেন গন্ধ পায়। এটা খুবই দরকারি। সারা দিনের পর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার এই রান্নার গন্ধটা পেতে ভালো লাগবে। সমস্ত দিন সে কাজ করে এবং এই ঘরে ফেরার সময়টার কথাই ভাবে—সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে খাবারের গন্ধ, তোমার স্বপ্ন, মাথাভর্তি তোমার ভাবনা—(ওকে ধ'রে ফের হাঁটিয়ে নিয়ে যায় খাবার রাখার জায়গা ও জলের কলের কাছে, রান্নার জায়গায় আর চিৎকার ক'রে ক'রে নির্দেশ দেয়) দেরাজটা খোলো! স্যুপের টিনটা নাও। ওঃ, মুরগির স্যুপ, চমৎকার! খোলো, খোলো, তাড়াতাড়ি খোলো!

শেলি : কেমন ক'রে, খুলি...

পিটার : টিন কাটার যন্তরটা কৈ? ওটা তো লাগবে।

শেলি (হাতের মধ্যে টিনটা অসহায়ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) : এমন একটা জায়গা নেই যেখানে ফুটো করা যায়, ফুটো করার জন্য কোনো জায়গাই করে নি...আমার নখটা ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে...

পিটার : না—না, একটা কৌটো কাটার যন্ত্র দরকার। সেটা তুমি কোথায় রেখেছো?

শেলি (উদ্‌ভ্রান্তের মতো খোঁজে) : টিন কাটার যন্তর......

পিটার : নিশ্চয় এখানেই কোথাও আছে। কোথায় রেখেছিলে? কেমন ক'রে যে তুমি ওটা হারালে? তোমার মাথার ঘিলু আসলে ঘুঁটে হ'য়ে গেছে! যখন আমি তোমার কাছে থাকি না তখন যে তুমি কী ভাবো, সেটাই আশ্চর্য। বাস্তবিক কি তুমি কিছু ভাবো? তুমি কি

ভেবেছ কৌটো খোলার যন্ত্র দিয়ে নিজেকে খুলবে আর আমার হাত থেকে পালাবে?

শেলি : না—নাঃ, আমি তোমাকে ভালোবাসি...

পিটার : কী?

শেলি : আমি তোমাকে ভালোবাসি, কেবল তোমাকে...

পিটার (মেঝেতে কৌটো খোলার যন্ত্রটা খুঁজে পেয়ে সেটা লাথি দিয়ে ওর কাছে পাঠায়) : এই যে ওটা! এই তো তোমার রহস্যময় যন্ত্রটি!

শেলি ওটা কুড়িয়ে নেয়। স্বপ্নের মতো সে কৌটোটা খুলে ফেলে। তারপর খুলে দেয় হট-প্লেটের স্যুইচ, ইত্যাদি, মন্থরভাবে ঘোরাফেরা করে।

পিটার : ও-কী, কী ঝরছে নল থেকে? ঝরছে কোথায়, এ তো ক্রমাগত চুঁইয়ে পড়ছে। এতে আর আশ্চর্য কি যে তুমি ঘুম থেকে উঠতে পারো না। তুমি তো ওই শব্দের জাদুতে বশীভূত হ'য়ে আছো। বেশ। জল—ঢেউ—সমুদ্র। এ আমাদের প্রথম বাসস্থান যে সমুদ্র—সে-কথাই মনে করিয়ে দেয়। ওই শব্দের দোলায় দুলতে দুলতে আমরা আরো বেশি গভীরভাবে ঘুমুতে পারি। আমাদের পক্ষে তা স্বাস্থ্যকর। তাতে আমাদের শিরাগুলো শান্ত হয়। (চিৎকার ক'রে) আমার দিকে তাকিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না! কাজ করো! কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরবে। চেহারাটা এমন করো যাতে ওর দেখতে ভালো লাগে—আমাকে অপদস্থ করার জন্য এতো চেষ্টা করো কেন?

শেলি (দু হাত বুকের উপর চেপে ধরে যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেন পরিশ্রান্ত) : তার নামটা যেন কি বলেছিলে...? গর্ডন?

পিটার : না।

শেলি : তবে কি আর্থার?

পিটার : আর্থার তো অনেকদিনের পুরোনো ব্যাপার। একটা অদ্ভুত চরিত্র, অবশ্য ভালোই লাগে সে তোমাকে নিয়ে যা করেছিলো তার জন্য অবশ্য আমি তাকে দোষ দেবো না। তার ওরকম করার সম্পূর্ণ অধিকার ছিলো। আমি একজন পুরুষ মানুষ ব'লেই যে অন্য একজন পুরুষ মানুষকে সমর্থন করছি, তা ঠিক নয়। তাকে সমর্থন করার কারণ আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ওর রুচি অনেক উঁচু ব'লে। যা হোক, আর্থার তো শেষ।

শেলি : তাহ'লে এ...ব্রোকউড? ব্রোকওয়ে? তার নামটা যে কী বলেছিলে...?

পিটার : ব্রোকওয়ে তো পালিয়েছে, একটা বেজন্মা। ওর কথা ভুলে যাও। তোমার নূতন স্বামী, মার্টিনের কথা ভাবো। মার্টিন র্যাভেন। এখন কি মনে পড়ছে?

শেলি (ধীরে) : তার কথা মনে আছে। মনে হয় ওর কথাও আমার স্মরণ আছে। তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলে, আর সেখানকার বাথরুমে...তুমি গরম জলের কলটা খুলে দিলে...আমার চুল ধুইয়ে দিলে...তুমি এতো ভালো ছিলে, তোমার হাত, শ্যাম্পুর গন্ধ...তুমি কি তখনও আমাকে ভালোবাসতে? (পিটার পকেট থেকে একটা ছোটো নোটবই বের ক'রে দেখছিল; শেলির কথায় কান দিলো না।) হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি আমাকে নিশ্চয় ভালোবাসতে। আমার হাঁটু দুটো মুড়ে আসছিলো আর তুমি আমাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখছিলে তোমার হাঁটু দিয়ে, তোমার পা দিয়ে, উরু দিয়ে...তুমি আমাকে ভালোবাসতে... আমার চুল ধুইয়ে দিলে, সবুজ রঙের শ্যাম্পু দিয়ে যা থেকে শাদা শাদা ফেনা বেরোচ্ছিলো, গালে গালে পড়ছিলো তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে, যেন থোকা থোকা ফুল...তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল জোরে...সাবান আমার চোখে গেল, ভীষণ জ্বলছিলো ব'লে

চিৎকার ক'রে উঠলাম। তোমার পক্ষে আমাকে চেপে ধরা ভিন্ন উপায় ছিলো না। সেদিন যেন আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, উত্তেজিত ছিলাম...তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না আমার চিৎকার বন্ধ করার জন্যই আমার মুখ জলে চুবিয়ে ধরা ছাড়া তোমার অন্য উপায় ছিলো না...আর তারপর তুমি আমার চুল মুছিয়ে দিলে একটা মস্ত শাদা তোয়ালে দিয়ে। তুমি, তুমি নিজেই আমার চুল মুছিয়ে দিয়েছিলে! পিটার নিজে! তোমার চারপাশে এতো লোক, তোমাকে তাদের প্রয়োজন, তোমার উপর তারা নির্ভর করে...তুমি তবু আমার চুল ধোবার জন্য সময় নষ্ট করলে, নিজে হাতে মুছলে আর আমাকে পোশাক পরিয়ে দিলে, বোতাম লাগালে আর সাহায্য করলে আমাকে হাঁটতে...এবং তারপর আমরা এই লোকটিকে দেখলাম, এই নূতন লোকটি...তার নামটা যেন কী বললে?

পিটার : তুমি যতোটা ভান করো ততোটা বোকা তুমি নও! এখন ঘুমটা গেলে হতো না।

শেলি : আমি প্রায় তার সব কিছুই মনে করতে পারছি...আমরা একটা থেমে থাকা মোটরে ব'সে ছিলাম, না? তাই তো?

পিটার (তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে) : মার্টিন র‍্যাভেন তার নাম!

শেলি : মার্টিন র‍্যাভেন। মার্টিন। হ্যাঁ। মার্টিন র‍্যাভেন। মার্টিন র‍্যাভেন। মার্টিন র‍্যাভেন।

পিটার : তোমার নিজের সম্পর্কে একটু কিছু করো। কানের পেছনে একটু সেন্ট লাগাও আর একটু চঞ্চল-পা ফেলো, চুলগুলো ফাঁপিয়ে তোলো—বুঝেছ, তুমি এখনি অতোটা বুড়িয়ে যাও নি। এখনো তোমার অনেক সময় আছে। এসো, আমি তোমার ভ্রু দুটো একটু সোজা ক'রে দি। (আঙুলে একটু থুতু লাগিয়ে ঠিক করে দেয়, ইত্যাদি) দেখে মনে হচ্ছে, গত তিনদিন ধ'রে তুমি বুঝি উপুড় হ'য়ে ঘুমিয়েছো! দেখি-দেখি। তোমার গায়ের চামড়া এখনো বেশ আছে। শুধু কপালের ওপর কয়েকটা ফুসকুড়ি হয়েছে, তা ঠিক ক'রে দেওয়া যায়—কপালের চুলগুলো দিয়ে ঢেকে দাও না। এমনি করে। বাঃ আহ্লাদী। তোমার নিঃশ্বাস কেমন? নাঃ, তেমন ভালো নয়! কেমন একটা শুকনো, কাঠকাঠ, বিচ্ছিরি গন্ধ ঠিক এই ঘরের গন্ধের মতোই—আর এটা কী, তোমার দাঁতে শ্যাতলা পড়েছে? একটা পাতলা হলদে আস্তরণ? (প্রথমা আঙুল দিয়ে সে ওর দাঁত ঘষে দেয়) কার তোমাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করবে বলো যদি তোমার মুখে গন্ধ হয় আর দাঁতে হলদে আস্তরণ থাকে? এখনও সাবধান না হ'লে তুমি তোমার আকর্ষণ হারাবে ব'লে দিচ্ছি! (শেলি ওকে জড়িয়ে ধরে। পিটার মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় কিন্তু প্রকাশ করে না) আবার কী হ'লো? নাক টানছো? তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে?

শেলি : আমাকে ক্ষমা করো।

পিটার : তুমি নিশ্চয়ই আমার জামায় নাক মুছছো না? তোমার কি অসুখ করেছে?

শেলি : আমার মনটা ঠিক নেই। আমি যেন কেমন জাগতে পারছি না। ঘরের কোণগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

পিটার : আমি জিগগেস করেছি, তোমার ঠান্ডা লেগেছে।

শেলি : জানি না।

পিটার : একটি ছোটো মেয়ে এইরকম নাক টানতে শুরু করেছিলো—তারপর তার গলায় ঘা হ'য়ে গেল। আমি ওর গলার ভেতরটা দেখেছিলাম, ভেতরটা কেবল শাদা আর তাতে লাল-লাল ফুসকুড়ি। ও কাশতে শুরু করলো, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হ'তো, আর কফ উঠতো থুতুর সঙ্গে। কফ তো আর ভালো কিছু নয়! ফলে তার সব সৌন্দর্যই নষ্ট হ'য়ে

গেল। আমি ওকে বিদায় করে দিলাম এবং একদিন হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম যেখানে সাধারণত পুলিশের গাড়িগুলো এসে দাঁড়ায়। এখানেই ব্যাপারটা শেষ হ'লো। তোমারও তাই হোক, এ-আমি চাই না। প্রথমে নাকটানা—তারপর গলায় ঘা—তারপর সান্নিপাতিক অথবা তেমনি একটা কিছু—শেষে চির বিদায়। তোমারও এটা হোক, তা আমি চাই না।

শেলি : না—প্লিজ—

পিটার : তোমাকে দেখতে যাতে সুন্দর লাগে তার ব্যবস্থা করো। জল্‌দি। তোমার তো এতো সময় লাগার কথা নয়। একটু হাসো। কই, হাসো।

শেলি : ঐ শাদা জিনিসগুলোর আমার দরকার—

পিটার : প্রথমে হাসি।

শেলি (বিভ্রান্ত হ'য়ে) : হাসি। কেমন ক'রে হাসবো? কেমন ক'রে এটা যাবে...?

পিটার (দু' হাতে ওর মাথাটা ধ'রে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে) : তোমার মাথার ঘিলু কি কফ হ'য়ে গেছে? তুমি কি গলে যাচ্ছো? জাগো!

শেলি : কী করতে হবে ব'লে দাও—

পিটার : হাসি! এমনি করে। (আঙুল মুখে দিয়ে ওর মুখটা হাঁ করিয়ে। ওর মুখটা তেমনি হাঁ-করেই রাখে, নড়াচড়া করে না) এ-ও ভালো।

শেলি : বলো, আর কী কী করতে হবে। আমার ঠিক মনে থাকে না। যখন কথা বলি তখন কি হাত দুটো নাড়াবো? নাকি মাথার চুল নিয়ে খেলা করবো? সীলিংটা কোথায়? আচ্ছা এই ঘরের সীলিংটা কি উঁচু বা নিচু? আসলে আমার ভয় হয় পাছে আমার মাথা ঠেকে যায়, আচ্ছা মাথা থেকে আমার পা দুটো কতো নিচুতে? ভয় হয়, হঠাৎ যদি থুতনিটা আমার হাঁটুতে গুঁতো খায়। বলো না, আমি কী কী করবো।

পিটার : স্টোভের কাছে যাও। দেখ রাতের খাবারটা কতদূর হ'লো। তাড়াতাড়ি। (হাততালি দিয়ে) তুমি মহানগরীর ঠিক মাধখানে, আমেরিকার মাঝখানে আছো। তোমার দুই পায়ের মাঝখানে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। সব কিছু তোমার অধিকৃত। তুমি বুদ্ধের সমবয়েসী। তুমি অমর কারণ তুমি রমণী। তুমি নিশ্চয়ই পিটার ভি-র সর্বনাশ করবে না। তাকে তোমার সঙ্গে টেনে নিচে নামাবে না।

শেলি (পুতুলের মতো) : যদি আমি হাত প্রসারিত করি তবে সব ছুঁতে পারি। এই হাত দেখছি। দেখছি এটা প্রসারিত হচ্ছে। এ তো আমারই হাত। এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু এই যে-এটা, এ-কিছুতেই আমার হাত নয় (একটা ছুরি তুলে নেয়, বাতাসে ঘোরায় ফেরায়) এইটা এক মুহূর্ত আগেও আমার হাতে ছিলো না। আমার থেকে এটা আলাদা.. চকচক করছে। এর আলো আমার চোখে লাগে। আমার মস্তিষ্কের সঙ্গে এর একটা কিছু যোগ আছে। সব সময়ই কেমন যেন বাতির মতো জ্বলছে নিবছে, আছে—নেই। এখন আবার জ্বলে উঠছে। হঠাৎ একটা স্ফুলিঙ্গের মতো, যেমন আমার মাথার ভিতরে হয়! (ঘুরে-ফিরে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে; পিটার আবার তার নোটবুকটা সামনে খুলে নিয়ে দেখছে) যেন তড়িৎ প্রবাহ, অথবা সোডার জলের বুদ্বুদ...পিটার তো আমাকে সবিস্তারেই বলেছে যে ও আমাকে ভালোবাসে। সে-ই বলেছে, এটা ভবিতব্য। ও-আমাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসে। আরো বলেছে, আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ভাবতে বারণ করেছে। ও ই বলেছে, সে আমার দেখাশোনা করবে। ও আরো বলেছে, আমি ধোঁয়ার মতো হালকা, তার বাহুপাশে মনোরম, সে আমার ভেতর প্রবেশ করেছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত

পৃথিবীটাও আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে, আমার শিরায় শিরায় ব'য়ে যাচ্ছে, ফলে শিরা-গুলো এমন ফুলে উঠেছে যে আমি ভাববো এগুলো ফেটে যাবে...এবং, পিটার এটা কি সত্যি যে আমি আসলে অস্তিত্বহীন?

পিটার (অন্যমনস্কভাবে) : নিশ্চয়ই। তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই।

শেলি : অর্থাৎ আমার কোনো নাম-ও নেই?

পিটার : তুমি যে বিন্দুটা অধিকার ক'রে আছো তাকে আমি 'শেলি' শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছি। আসলে তোমার কাছেই আমরা ঐ নামটা পেয়েছিলাম। তাছাড়া এই শব্দটা উচ্চারণেও সুবিধা। যাকে 'পরিচয়পত্র' বলা হয় তোমার সেই কার্ডে উজ্জ্বল নীল কালিতে নিজেকে চিহ্নিত করেছো 'শেলি' ব'লে। আর তোমার গাড়ি চালানোর লাইসেন্সে আছে আরো একটা নাম, 'মিসেল'। তাই আমি তোমাকে যে-কোনো একটা নামে ডাকতে পারি। ডাকতে পারি 'শে' অথবা 'মি' ব'লে। এমন কী 'শেল' অথবা 'মাইকেল', অথবা 'মিচ' অথবা 'মিটিয়া'। কিংবা 'এক্স'। তুমি উত্তর দিতে বাধ্য। অথবা এই একঝাঁড় নামের মধ্যে থেকে যে-কোনো একটা তুলে নাও তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য। এরমধ্যে কোনো কোনো নাম সত্যিই সুন্দর! (নোটবুকের পাতাটা উলটিয়ে যায়; দর্শকদের উদ্দেশ্য ক'রে সে যখন কথা বলছে শেলি তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে উদ্যত ছুরি হাতে এগিয়ে যায়।) শোন—কী সুন্দর সব নাম, চমৎকার সব আমেরিকান ধ্বনি—ডেবি, বোক্ত অ্যান, রুথি, ডোরা লি, সান্ধি, বিৎসি, ডোলি, ব্লন্ডি, অ্যানি, কিট্সি, কিটি—

শেলি : তুমি ওদেরই ভালোবাসো, আমাকে নয়...

পিটার : ফ্র্যানি, বার্বি, সিল্ভি, লরি, ট্রিক্সি, শেলি, ন্যান্সি, ক্যাথি...

শেলি (কান্নাভেজা গলায়) : তুমি ওদেরই ভালোবাসো, আমাকে নয়।

শেলি ছুরি নিয়ে তার দিকে দৌড়ে যায়। পিটার ঘুরে দাঁড়ায়, ভয় পায়।

পিটার : সত্যিই আমি তোমাকে ভালোবাসি! আমি ওদের সবাই-কে ভালোবাসি, তোমাকে-ও ভালোবাসি। এরা সবাই তোমার বোন। তোমার-ও ওদের ভালোবাসা উচিত!

শেলি : তুমি ওদেরই ভালোবাসো, আমাকে নয়!

পিটার : আমার বইয়ে তুমি তো কেবল একটা নাম, তবে এতোটা বিগড়ে যাচ্ছো কেন? তুমি জান এদের মধ্যে তোমার স্থান কোথায়! তোমরা সবাই মিষ্টি ছোটো মেয়ে, তোমরা সবাই মিষ্টি ছোটো নাম। তোমাদের মধ্যে কারো অস্তিত্ব নেই। আমার বইয়ে তোমরা কেবল নাম। ভেবো না, তোমাদের প্রত্যেক-কে আমি সমান ভালোবাসি। আমি তোমার সব ভার নেবো। তোমরা সকলেই অনেক বছর আগে মরে যেতে যদি না আমার মতো তোমাদের সব প্রেমিকরা থাকতো—

শেলি (মাথা ঝাঁকিয়ে) : তুমি ওদের-ই ভালোবাসো, আমাকে নয়।

পিটার : আমি ওদের ভালোবাসি এবং তোমাকেও ভালোবাসি। আমি তোমাদের সকলকেই ভালোবাসি। সবাই আসলে একটি মেয়ে। আমাকে ছাড়া তুমি কী করতে? আমি তোমার মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটেছি, তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছি, মুক্তি দিয়েছি। আমি খুব আস্তে আস্তে তোমার টুকরোগুলো হাতে তুলে নিয়েছি, আবার ফিরে একত্রিত করেছি। টুকরো ক'রে নিয়েছি, জোড়া দিয়েছি, বিচ্ছিন্ন করেছি, জোড়া দিয়েছি—

শেলি : আমি চাই তুমি আমাকেই কেবল ভালোবাসবে! কেবল আমাকে!

পিটার : কিন্তু তুমি ব'লে তো কিছু নেই। কী বলতে চাও?

শেলি (তার দিকে দৌড়ে যাবার উপক্রম করে) : আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে আমি চিনি। আমি আমার হাত-ও দেখতে পাচ্ছি। এই ছুরিটাও বেশ দেখছি। এখনি তোমাকে খুন করতে যাবো। আমি এখনি তোমাকে খুন করবো...আমি এখনি তোমাকে খুন করবো...আমি এখনি তোমাকে খুন করবো...আমি জানি এতোগুলো সপ্তাহ পরে আমি একটা কিছু করতে যাচ্ছি। আমিই এটা করবো, আমি-ই এটা করতে যাচ্ছি।

পিটার (দু' হাত প্রসারিত ক'রে, মুখে হাসি) : হ্যাঁ--হ্যাঁ, কিন্তু কেন?

শেলি : কেন...?

পিটার : কেন তুমি এটা করবে?

শেলি (বিভ্রান্ত হ'য়ে) : কেন...? আমি জানি না।

পিটার : এ-তো তুমি নও, তোমার মধ্যেকার কোনো একটা অশুভ শক্তি। কে এটা? কে তোমাকে আমার বিরুদ্ধে বিষাক্ত ক'রে তুলছে?

শেলি : আমি বুঝতে পারছি না...

পিটার : এ কি অন্য কোনো লোক? তোমার বাবা, হ'তে পারে! তুমি তোমার বাবার কথা বলেছিলে...তুমি ভেবেছিলে সে তোমার পিছনে আসছে? সে কি তোমার পিছু নিয়েছে? তার আত্মা কি এই মুহূর্তে তোমার ভেতরে আছে?

শেলি : আমি জানি না...মনে করতে পারছি না...এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছি, আমি কী করতে যাচ্ছিলাম?

পিটার : ওই নল-চুঁইয়ে-পড়া জলের শব্দ তুমি এখন শুনবে! শোনো আর আরাম করো। তোমার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, দেখতে কুৎসিত লাগে, তোমার মুখে বলিরেখা উঠছে, তুমি তোমার চেহারাটা নষ্ট করবে! আমাকে ভালোবাসো। বিশ্রাম করো। তোমার বাবার কথা ভুলে যাও। সে তোমাকে খুঁজে পাবে না। সে-একটা অশুভ আত্মা, তাকে ভুলে যাও। যদি আমাকে ভালোই বাসো তবে কেন আমাকে খুন করতে চাও!

শেলি : আমি তো কিছু একটা করতে যাচ্ছিলাম...

পিটার : তুমি জানো, তুমি আমাকে কতো ভালোবাসো।

শেলি : হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি...

পিটার : ঠিকই তো; এসো এখন রাতের খাবারটা তৈরি করো।

শেলি (ঘুরে দাঁড়িয়ে, বিমূঢ়ভাবে) : এ নিশ্চয়ই আমার বাবার কাজ। তুমি ঠিকই বলেছো। তারই আত্মা আমার ভেতরে আছে আর আমাকে বিষাক্ত ক'রে তুলছে। আমি জানি সে আমাকে খুঁজে বের করবেই। যতোদিন না আমাকে খুঁজে পায় ততোদিন সে ছাড়বার পাত্র নয়। (হাত থেকে ছুরিটা খসে পড়ে মেঝেতে) আগেরবার যখন আমি পালিয়েছিলাম সে আমাকে তিন দিনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলো। দেশময় সর্বত্র পুলিশকে সে জানিয়েছিলো। প্রত্যেকে আমার সম্পর্কে জানতো। আমি গা-ঢাকা দিতে পারি নি। 'ঘর পালানো' ব'লে সবাই আমাকে ডাকতো। এই কথাই আমার সম্পর্কে লিখেছিলো। কিন্তু আমার প্রতি ব্যবহারটা ভালো করেছিলো। তাও বেশ কয়েক বছর হ'লো, তখন আমি প্রায় শিশু... আমার বাবা এলো, আমাকে দু' হাতে তুলে নিলো আর আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাঁদলাম গত বছরও আমি পালিয়েছিলাম কিন্তু অসুখ বাঁধিয়ে বসলাম। আমার শরীরের ভেতরে একটা ব্যথা। বাসগুমটির রেস্তঁরার কোনো খাবার থেকে ফ্লু ধরেছিলো...খুবই অসুস্থ হলাম...নিজেই গেলাম পুলিশের কাছে, ধরা দিলাম। আমার বাবা মাত্র কয়েক

ঘণ্টার পিছনে ছিলো। গাড়ি চালিয়ে এলো আর আমাকে তুলে নিলো। এবার আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে বাড়ি ছেড়েছি। এর মধ্যে বাড়ির কথা মনে করাই প্রায় অসাধ্য হয়েছে। মনে হয় যেন বহু বছর হ'লো আমি বাইরে। আমি আসলে অন্য কেউ। সব কিছু পাল্‌টে গেছে...যখন ভাবি (বেদনাময় কোনো ভাবনার মতো ক'রে) আমি সত্যিই সেই বাড়ির কথা মনে করতে পারি না...যেন একটা তুষারস্রোত সেখানে ব'য়ে গেছে...সব কিছু যেন বরফ হ'য়ে গেছে, লোকজন যেন বরফের পুতুল; সেখানে একটা মেয়ে আছে, সে আসলে আমি, সে-ও বরফের পুত্‌লি, একটি শিশু...যদি আমার বাবা এখানেও আমাকে খুঁজে পায়?

পিটার : ভেবো না, সে তোমাকে খুঁজে পাবে না।

শেলি : সে আমাকে নিশ্চিত খুঁজে পাবে, সে আমাকে তার সঙ্গেই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে...

পিটার : সে তোমাকে জোর ক'রে কিছু করতে পারে না। আমি তোমাকে রক্ষা করবো।

শেলি : আমি আবার সেই মেয়েটি হ'তে চাই না। আমি শেলিও হ'তে চাই না। সে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে, নিজে কাঁদবে আমাকেও কাঁদাবার চেষ্টা করবে...আমি তাকে ভুলে যেতে চাই, আমি শেলিকেও ভুলতে চাই...তাকে ঘৃণা করি ব'লে তার চুল কেটে ফেলেছি, তাকে ঘৃণা করি ব'লে না খেয়ে কাটিয়েছি, যাতে সে ক্ষীণকায় হয়, অত্যন্ত ক্ষীণ, না খেয়ে না খেয়ে যাতে সে ঝিমিয়ে পড়ে, যাতে তার মৃত্যু হয়।

পিটার : তুমি ঠিকই করেছ। তুমি তার ওজন পঁচানব্বুই পাউন্ডে আনতে পেরেছো; তুমি এখন যথার্থ তন্বী, যেমন ছবির মডেলেরা হয়। ক্ষীণকায়দেরই আমার পছন্দ বেশি, এমন শীর্ণ যে আমি যেন দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে তাদের কব্জি ধরতে পারি। আমার পছন্দ তোমার মতোই স্বচ্ছ গায়ের চামড়া, এটাই হাল ফ্যাশান! তোমার চুল অবশ্যই সে তুলনায় একটু বেশি দীর্ঘ। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি একটা ক্ষুর দিয়ে ছোটো ক'রে দেবো। কেউ কেউ অবশ্য সেইসব মেয়েদের পছন্দ করে যারা আসলে ছেলে, আবার কেউ কেউ এমন সব ছেলেদের পছন্দ করে যারা আসলে মেয়ে। নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকা চাই। কাউকে যদি মেনে না নেওয়া যায় তবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে কী করে...? আমাদের দেহের প্রয়োজন এই সংযোগের জন্য। অন্যের শরীরের সঙ্গে সংযোগ হবে ব'লেই আমাদের দেহ। বয়সও এই মিলনাকাঙ্ক্ষী! আমরা আমাদের গভীরতম আবেগ তো আর অস্বীকার করতে পারি না! আমরা চাই স্বাধিকার, প্রেম ও একে-অন্যের সঙ্গে উৎপাদনধর্মী যৌন সম্ভোগ—আমরা কতোই না ঘৃণা করি এই যান্ত্রিক পৃথিবী, কারিগরি শিল্পের যুগ, মিথ্যের যুগ, পরিচিতি এবং পূর্ণতার যুগ! কেন তুমি শেলি হ'তে চাও, আবার কেনই বা তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও? তবে কি তুমি ফিরে যেতে চাও তোমার পুরোনো সত্তায়, সেই বিশেষ চেহারায়, বিশেষ নামে? তবে কি তুমি আমাকে ভুলে যেতে চাও, হ'তে চাও আবার তোমার পিতার অধিকৃত অথবা সেই স্ত্রীলোকটির, যাকে তুমি মা ব'লে জান? কেন তুমি ফিরে পেতে চাও সেই সব কিছু যা তোমাকে কখনো সুখ দেয় নি...দিয়েছিল কি? তুমি এইসব ঘৃণা করতে!

শেলি : ঠিক বলেছো, আমি ঘৃণাই করতাম ..

পিটার : তুমি ঘৃণা করতে তোমার বাবাকে, তোমার মাকে। বিশেষ ক'রে তোমার বাবাকেই।

শেলি : সত্যিই, আমি ওদের ঘৃণা করতাম! বাবাকেই বিশেষভাবে...কারণ সে আমাকে মারতো

থেকে বেশি ভালোবাসে...সে তার ভালবাসা নিয়ে আমার পিছন পিছন ছোটে, আমাকে অধিকার করতে চায়, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার সঙ্গে...আমার বাবা একজন চিকিৎসক। তার বাসনাই সবাইকে রোগমুক্ত করা। সব কিছু পরিষ্কার করতে, সুস্থ করতে সে চায়। সব কিছুর উপর পটিবাঁধার বীজাণুমুক্ত করার ইচ্ছা তার মধ্যে প্রধান। যতোবার আমি বাথরুমে যেতাম ততোবারই সে আমাকে হাত ধোবার কথা বলতো। সব সময় লক্ষ্য করতো আমার গতিবিধি! আমার কখনো একা থাকাটা তার পছন্দ হ'তো না। বড্ডো বেশি ভালোবাসতো! পছন্দ করতো না, আমার ওই নল থেকে পড়া জলের মতো হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত চুঁইয়ে পড়া আর এমনি ক'রে নিজের ভেতরটাকে শূন্যে ক'রে ফেলা...

পিটার (দর্শকদের প্রতি) : আমার বাবা ছিলো না। নিজেকে আমি নিজেই নামাঙ্কিত করেছি। নিজের জন্ম আমি নিজেই দিয়েছি। আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলাম যার একটা চরিত্র ছিলো, নাম, পিটার ভেরখোভেনস্কি। আমার জন্য নির্দিষ্ট শূন্য স্থানটাতেই সে অধিষ্ঠিত হ'লো এবং আমি আমার নাম দিলাম যখন আমার বয়স বছর পঁচিশ। আমি প্রত্যেক-কে আমার পরিচয় দিলাম পিটার ভি. নামে। কারণ তাতে তারা বুঝতে পারবে না যে আমিই সেই পিটার ভেরখোভেনস্কি, দস্তয়ভস্কির বিখ্যাত উপন্যাস "দি পোজেস্‌ড্"-এ যার কথা আছে। পিটার আমেরিকায় এলো; তার রাজনৈতিক চেতনার উত্তাপ নষ্ট হলো; সে পরিবর্তিত হ'লো একজন আমেরিকানে, একজন ধনতান্ত্রিক-এ। সে হ'য়ে উঠলো আমি। আমি হলাম সে। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না, এমনকি এই সুন্দরী তরুণীটি-ও না, আপনারা-ও না, সত্যিই এমন কেউ নেই যে আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবে আর তাই আমি কখনো নিজের ব্যাপারটা বিস্তারিত করি না। আমার কোনো পিতা ছিলো না। আমি জন্মেছিলাম, ঠিক আমি যখন পঁচিশ বছরের যুবক। সুতরাং আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই আমার পিতার সঙ্গে। আমার কোনো সোচ্চার অহংবোধ নেই; বস্তুত আমার কোনো অবচেতন মন নেই। আমি পুরোপুরি বিশুদ্ধ চেতনা। আমি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অহং।

শেলি : আমার বাবা আমাকে নিতে আসছে। আমার ভয় হচ্ছে।

পিটার : সে তো পুলিশ আনতে পারবে না। পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রয়োজন। তোমার এখন যা বয়েস তাতে তুমি অনায়াসে গৃহত্যাগ করতে পারো। তোমাকে ছোঁবার সাধ্য কারো নেই, এখানে বাস করার তোমার পূর্ণ অধিকার আছে, এখানে, এই ঘরে, তোমার বাকি জীবনটা। তা মনে রেখো!

শেলি : যদি সে এখানেই এসে উপস্থিত হয় আর আমার নাম ধরে ডাকে---

পিটার : আমি তোমাকে রক্ষা করবো।

শেলি : এই চুপ! কে যেন আসছে।

পিটার : নাঃ, ও কিছু না।

তারা কান পেতে শোনে। কোনো শব্দ নেই।

শেলি (ভয় পেয়ে) : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই আসছে! আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! সে সিঁড়ির ওপর...সে নিশ্চয় এই জায়গার খবর পেয়েছে...হয়তো কোনো টিকটিকি রেখেছিলো আমাকে খোঁজার জন্য...এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গিয়ে তার দৃষ্টি এড়াতে পারবো...

পিটার : আমি কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না...

শেলি : শোনো না, সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে!

পিটার : ভয় পেয়ো না, তোমার কী হয়েছে? বলেছি না তোমাকে রক্ষা করবো। এটা নিশ্চয় মার্টিন র‍্যাভেন, বাড়ি আসছে...

শেলি : পায়ের শব্দ...

পিটার (দরোজা লক্ষ্য ক'রে) : মনে রেখো, তুমি আমার। সুস্থির হও। তুমি তো আমার, আমার সঙ্গেই আছো। তোমার কোনো অন্যায় হয় নি। তুমি কেবলি আমার, আর কারো নও, এমনকি তুমি তোমার নিজেরও নও। তুমি প্রেমে পড়েছো। কখনো তুমি ওপরের ছাদের সমান উঁচু, ছাদে মাথা ঠুকে যাচ্ছে, কখনো তুমি মেঝেতে চিৎ হ'য়ে যাও, তোমার নাক মেঝেতে চেপ্টে যায়, তুমি আমার, তোমার কোনো অন্যায় হয় নি, তুমি প্রেমে পড়েছো...

দরোজায় কড়ানাড়ার শব্দ। পিটার আর শেলি কোনো উত্তর দেয় না। দরোজা খুলে শেলির পিতা প্রবেশ করে। সুবেশ, একটু খেপাটে ধরনের, বছর চল্লিশ-প'য়তাল্লিশের উপর বয়স হাতে একটা ছোটো স্যুটকেশ। সে প্রবেশ করে এবং সে ও শেলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পিটার (সহজভাবে) : কেমন আছেন? আমাদের এর আগে কি কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে? আপনি কি কাউকে খুঁজছেন? জিগ্‌গেস করতে পারি কি, দরোজায় টোকা না দিয়ে আপনি আমাদের ঘরে প্রবেশ করলেন কেন? এই শহরে বুঝি আপনি নবাগত? এ বাড়িটা আমার, নিচে কি দেখেন নি লেখা আছে- দমকল বিভাগ কর্তৃক বাড়িটা পরিত্যাজ্য ব'লে ঘোষিত। (একটু হেসে) আপনি নিশ্চয় লুকোবার কোনো জায়গা খুঁজছেন না? মিসেস র‍্যাভেন ও আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজনটা জানতে পারি কি?

পিতা : ......মিসেস র‍্যাভেন ......?

শেলি মাথা নাড়ায়। যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

পিতা (ধীরভাবে) : তোমার কী হয়েছে?

শেলি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, উত্তর দেয় না। পিতা আশ্চর্য, বিমূঢ় হয়। নিজের আঙুলগুলো চুলে বুলোতে থাকে।

পিটার : যদি আপনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তবে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন না কেন? আমার নাম পিটার ডি., এই মহিলাটির বন্ধু, ব্যবসায়ী, একধরণে হরিণ—

পিতা (শেলিকে) : হায় ভগবান, তুমি এতো রোগা হ'য়ে গেছ......তোমার হয়েছে কী? অসুখ? চুলটা এতো ছোটো ক'রে কেটেছো?......

পিটার (তার সঙ্গে করমর্দন করার চেষ্টায়) : আমি বলছিলাম, আমার নাম পিটার ডি, আমি একজন ব্যবসায়ী এবং এই মহিলার বন্ধু। ভালো হয় আপনি যদি আমার সঙ্গে করমর্দন করেন। আমি নচেৎ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব এবং আপনাকে বের করিয়ে দেবে। মনে হয় না আপনি একজন ভদ্রলোক, এমনভাবে এখানে কথা বলছেন... পুলিশমহলে আমার বন্ধুবান্ধব আছে। সব জায়গায়ই আমার বন্ধু আছে। ভালো হয় যদি আপনি সবকিছু খুলে বলেন।

পিতা : আপনি বিলক্ষণ জানেন আমি কে।

পিটার : আমাদের কাছে আপনার প্রয়োজনটা?

পিতা : আমি ওকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে নিতে চাই......

শেলি ঘুরে দাঁড়ায়। মুখে অবজ্ঞার হাসি। পিটারও ওর হাসিতে যোগ দেয় এবং জোর ক'রে বাবার সঙ্গে করমর্দন করে।

পিটার : কিন্তু আপনার জোরটা কোথায়? কে আপনি?

পিতা : আপনি নিশ্চিত জানেন আমি কে, আমি শেলির বাবা......

পিটার : আমাদের সঙ্গে এই ঘরে যে মেয়েটি আছে সে তো শেলি না-ও হ'তে পারে। সে তো আপনার কন্যা না-ও হ'তে পারে। আপনি কী দাবি করছেন?

পিতা : আপনি ওর কী করেছেন? ও-তো অসুস্থ, নয় কি?

পিটার আমি ওর জীবন রক্ষা করেছি।

পিতা : সে কি, ও-কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে? ও-কি বুঝতে পারছে আমরা কী বলছি?

পিতা : শেলি......

পিটার : শেলি, এখানে এসো! ওকে দেখুন! একটা বিড়ালছানার মতো, একটা কুকুরছানার মতো ও প্রাণচঞ্চল! ওর মধ্যে এমন একটা সারল্য আছে......ও একটুকরো মানুষ, যাকে শয়তান ত্যাগ করেছে, ফলে এমন সরল। ওর আত্মাকে শরীরের নানা ফাটল দিয়ে বের ক'রে নেওয়া হয়েছে, বের ক'রে নেওয়া হয়েছে ওর নানা কোমল শারীরিক ফাটল ও গর্ত দিয়ে! ঠিক নয়, শেলি? এসো এখানে, আমার পাশে দাঁড়াও। যদি চাও তবে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পারো। ওকে সুন্দরী মনে হয় না? যতটা রুগ্ন তার চেয়েও বেশি রুগ্নতার ভান ও করে। সব মেয়েরাই করে। ওরা চায় করুণা পেতে, বুকে আঁকড়ে ধরতে এবং তারপর ওরা ওদের মন বদলায়, ভয় পায়, পালায়, আবার তারপরও মন বদলায়, কাঁদে কারণ তাদের বুকে জড়িয়ে ধরার মতো কেউ নেই, তাদের শরীরের ক্ষমতা কতটুকু তাও তারা বুঝতে পারে না যতক্ষণ না কেউ তাদের কাছাকাছি থাকে, বুকে জড়িয়ে রাখে। হ্যাঁ, দিনে অত্যন্ত কুড়িবার এরা ওদের মন বদলায়! মনের ভেতর থেকে তারা বেরোয় আর ঢোকে যেন মনটা পোশাক! এরা প্রত্যেকে পুরুষের আলিঙ্গনে মরতে চায়, বুকে পিষে জীবনটা বের করতে চায়, পছন্দ করে একটা বিশাল ভালুকের আলিঙ্গন, সৌর-মণ্ডলের ভালুকি আলিঙ্গন! দেখুন ওকে। ওর দু'পায়ের মাঝখানে এই ব্রহ্মাণ্ড খুলে যায়—সেই তমসা, সেই মনোহর অন্ধকার যন্ত্র!—কিন্তু ও তা জানে না, ও অনেক দূরে পৌঁছে গেছে।

পিতা : ওর হয়েছেটা কী?

পিটার : আমরা দুজন পুরুষ মানুষ কথা বলছি। অবশ্য আপনি ওর পিতা-ফিতা কিছু নন। আপনি আমাকে খুঁজছিলেন আমার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার জন্য। আপনি এই মেয়েটিকে আপনার জন্য চান। ঠিক?

পিতা : শেলি, তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে রাজি আছ?

শেলি পাগলের মতো হেসে উঠে তার কথা উড়িয়ে দেয়। সে 'ভঙ্গি' করে পিঠটা বাঁকিয়ে, চটুলভাবে শরীর নাড়ায়। পিটার দুহাত ঘষে।

পিটার : যদি আমি সত্যিই ভাবতাম আপনি এই মেয়েটির পিতা, এখানে আবির্ভূত হয়েছেন ওর জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবার জন্য, ওকে সেই কারাগারে ফিরিয়ে নেবেন ব'লে, তবে আমি পুলিশ ডেকে আপনাকে ঠ্যাঙাতাম। কারণ, এই বাড়িটা আমার! আমি যে মাসে দলিল

ক'রে এটা দশ হাজার ডলারে কিনেছি। এবং তিন বছর আগেও এই বাড়ির দাম ছিলো এক লক্ষ দশ হাজার ডলার—ভাবুন একবার! সবকিছুর দাম পড়ে যাচ্ছে—দাম, ট্যাক্স, ফুটপাথ, রাস্তাঘাট, সবকিছু! এখন আমার মতো লোকদের নিচু হ'য়ে দাম বাড়াতে হবে, আমাদের কেবল নিচু হ'তে হবে। এই রকম গন্ডগোলের সময়ই আমাদের বুদ্ধি খোলে। আমরাই সত্যিকারের আমেরিকান, সত্যিকারের প্রতিভা! আপনি কি আমার কথা শুনছেন আমি বিশ্বাস করি না, আপনি এই মহিলার পিতা। ঠিক ক'রে বলুন তো আপনি কে।

পিতা (চোখ রগড়িয়ে খুব বিমূঢ়ভাবে) : আপনি বলছেন কী...? কিছুই তো বুঝতে পারছি না......

পিটার : আপনি আমাকে বেশ বুঝতে পারছেন!

পিতা : গত দু'রাত্রি আমি ঘুমাইনি...বাড়িতে খবর করছিলাম যদি শেলি ফিরে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকবার একই উত্তর পেয়েছি,...তোমার মা বলছেন তুমি মারা গেছো, তোমাকে ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না।

পিটার (খুশি হ'য়ে) : আপনি আমাদের মিথ্যে বলছেন! সবটাই আপনি বানিয়ে বলছেন!

পিতা : একবার টোলেডোর রাস্তায় আমি একটি মেয়েকে দেখলাম আর আমি তার পেছনে দৌড়ালাম তুমি ভেবে......

পিটার : ওই বাক্সে কী আছে?

পিতা : ছবি দেখার যন্ত্র-

পিটার : কী?

পিতা : একটা প্রোজেক্টর—ছবি দেখবার ··

পিটার : বাড়ির সিনেমা?

পিতা : বলছি। আপনি প্রতি কথায় আমাকে বাধা দিচ্ছেন—

পিটার : কিন্তু আমরা তো শুনছি, আমরা বেশ মজাও পাচ্ছি!

পিতা : আমি কিছু জিনিস এনেছি ওকে দেখাবো ব'লে--যদি ওকে পেয়ে যাই তা,—আমি ওর কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম···

পিটার : কিসের ব্যাখ্যা?

পিতা : আমি যুক্তিবাদী হ'তে চাই, হ'তে চাই বাস্তবতানির্ভর। ওকে কিছু করাতে আমি জোর করতে চাই না।

পিটার : বাড়ির সিনেমায় কী আছে?

পিতা : কতগুলো স্লাইড ফটোগ্রাফ থেকে করা হ'য়েছে। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। বাড়ি থেকে বেরবার আগে সব একসঙ্গে গুছিয়ে নিয়েছিলাম......কয়েকটা মাত্র জিনিস ওকে দেখাবো ব'লে......ওর কাছে আমি একটা ব্যাপার প্রমাণ করতে চাই।

শেলি (খুব রেগে) : ও আমার জীবন রক্ষা করেছে, তুমি নও! পিটারই আমার জীবন রক্ষা করেছে!

পিতা : শেলি......

শেলি : ও আমাকে জগতের অন্ধকার দিকটাও দেখিয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশই জল। বাজি রেখে বলতে পারি তুমি তা জানো না! তুমি চিরকালের মতো ওতে ডুবে যেতে পারো, সেই অন্ধকার জল, সবসময় বহমান, কাঁপছে, ফুঁসছে, ভেঙে পড়ছে......চেষ্টা করো তো থামাতে! পারবে না! সেখানেই সে আমাকে বানিয়েছে, সেই পৃথিবীর অন্ধকার অংশে,

আমাকে চুমু খাওয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে চলছিলো, দিনের পর দিন ধ'রে চলছিলো......ও আমার মুখের ভেতর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছে, আমার ভেতরেই ও নিঃশ্বাস নিয়েছে।

পিতা : তুমি সুস্থ নও। তুমি—

শেলি : তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। তোমাকে আমি শোনার চেষ্টাও করছি না। আমি তোমার মেয়ে নই। আমি কারো মেয়ে নই। কোনো কিছুই আমার স্মরণ নেই। আমি বিশ্বাস করি না আমার কিছু হয়েছে। মনে করতে পারছি না। যদি পিটারের অস্তিত্ব থাকে তবে আমারও অস্তিত্ব থাকবে। তবে কেবল যদি সে আমার সঙ্গে এই ঘরে বাস করে। অধিকাংশ সময়ই সে বাইরে থাকে। আমি ওর অপেক্ষা করি এবং যখন ও ফেরে তখনি আমি জীবন ফিরে পাই। এমন কিছু নেই যা অন্য কেউ আমাকে বলতে পারে। (একটা চকিত রাগের ভঙ্গি, থতমত হ'য়ে) উঃ ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা! তোমার ওই প্রোজেক্টরটা! তুমি আমাদের কেবলি অপদস্থ করেছো, সবসময় ছবি তুলে—জন্মদিনে, ক্রিসমাসে, ইস্টার সানডে, ডিগ্রি পেলে!—আমি যে কী ঘৃণা করতাম, চারপাশে লোকজন নিয়ে একটু হেসে, দেখতে সুন্দর হ'য়ে, তুমি তোমার ক্যামেরা নিয়ে আমাদের সবাইকে ফিল্মে ধ'রে রাখতে চাইতে!

পিতা : তুমিই চেয়েছিলে আমি তোমার ছবি তুলি—

শেলি : কখনোই না!

পিতা : এবং তুমি মুভি তোলা দেখতেও ভালোবাসতে—বাড়ির সকলেই করতো!

শেলি : তোমার কাছে মিথ্যে বলতুম।

পিতা : তুমি কী বলতে চাও? তুমি মিথ্যে বলতে না......তোমার গলার স্বরটা এমন অদ্ভুত হয়েছে......যেন অন্য কেউ তোমার মধ্যে থেকে কথা বলছে।

পিতা : শেলি, এই লোকটা কে? ও তোমার কী করেছে?

পিটার (সৌজন্য দেখিয়ে) : আমি তো আগেই আমার পরিচয় দিয়েছি......

শেলি (বাবাকে) : তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলেছি, আমি নিজেই পুরো মিথ্যে ছিলাম—আমার দেহটা মিথ্যেতে প'চে গিয়েছিলো। ওর কাছেই একমাত্র সত্য বলি। আমি পিটারকে সব বলি।

পিতা : ও কে?

শেলি : যে আমার জীবন রক্ষা করেছে!

পিটার (পিতাকে) : আপনি কেন আপনার স্যুটকেশটা খুলছেন না? আমি দেখতে চাই ওতে কী আছে। এটা কি খুব দামী? ভাবছি আমিও একটা মুভি ক্যামেরা কিনবো, কিন্তু আমি জিনিসপত্র কিনতে খুব সাবধানী, ধীরে ভেবেচিন্তে কিনি, আমার বিশ্বাস এই ধরনের একটা জিনিস কেনা মানে তো টাকা বিনিয়োগ করা। মনে হয় জানুয়ারিতে যে 'সেল' দেয় তার জন্যে অপেক্ষা করাই ঠিক।

শেলি (মুখে হাত দিয়ে) : আমি ওর কোনো কিছুই দেখতে চাই না। আমাকে দেখানোর ওর কোনো কিছু নেই।

পিতা (বাক্সটা খুলে, ধীরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে) : শেলি, প্লিজ......আমি কয়েকটা জিনিস এনেছি তোমাকে দেখাবো ব'লে......তোমার কিছুই করতে হবে না। আমি তোমাকে কিছুর জন্যই জোর করবো না।

শেলি : আমি দেখবো না!

পিটার (প্রোজেকটরটা দেখতে দেখতে) : এটা দেখতে একটা ভালো যন্ত্রের মতো। কোথায় এটা পেলেন?

শেলি : ওকে যেতে বলো! আমার জীবনে এমন কিছুই নেই যা আমি দেখতে চাই—সব শেষ হ'য়ে গেছে—

পিটার : ফোটোগ্রাফ আমাদের দেহের সমতলতা দেখায়। আমাদের দেহ, বস্তুত, সত্যিই দুই-তলবিশিষ্ট। যদি সম্ভব হ'তো তবে তা একতলবিশিষ্টই হ'তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যত, একতলবিশিষ্ট বস্তু আমরা দেখতে পাই না। আত্মা একতল, যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে। তাই আমি ফোটোগ্রাফ পছন্দ করি এবং পছন্দ করি সেইসব বস্তু যা ফোটোগ্রাফ তোলা সম্ভব করে। আপনি এই বিকেলে আমাদের এখানে এসেছেন ব'লে আমি কৃতজ্ঞ।

পিতা (হঠাৎ) : ওখান থেকে স'রে দাঁড়াও!

পিটার (বশংবদের মতো, ব্যঙ্গময়) : আপনি কি ভয় পেয়েছেন। ভেবেছেন আমি আপনার যন্ত্রটা দূষিত ক'রে দেব?

পিতা : আমি চাই না যে তুমি ওটা স্পর্শ কর।

পিটার : আমার আঙুলগুলো সম্পূর্ণ পরিষ্কার। আমি ভেতরে-বাইরে নিবীজিত। আপনি একজন চিকিৎসক, তাই ভাবেন, মানুষ বোধহয় জীবাণুমালা, আর কেবল আপনিই পারেন তাদের রক্ষা করতে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

পিতা (বিমূঢ়) : মাফ্ করবেন.....মেজাজ খারাপ করবার জন্য......আমি কয়েকদিন ঘুমুই নি ..... ওটা কী; কিসের শব্দ? আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি . ..

পিটার : একটা জলের নল। আপনি কি ভয় পেলেন?

পিতা : একটা নল......?

শেলি দৌড়ে বেসিনের কাছে যায়। নলের মুখটা চেপে ধ'রে জলপড়া থামাতে চায়।

শেলি (হাসতে হাসতে) : কোন কিছুই এটা থামাতে পারবে না! একটা কলের মিস্ত্রি ডাকতে হবে। সপ্তাহ ধ'রে এখান দিয়ে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, বেসিনটায় মরচে পড়ে গেল, ওতে একটা মরচে রঙের দাগ ধরেছে......আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এটা ফুটো হ'য়ে যাবে আর জল চুঁইয়ে মেঝেতে পড়বে।

পিতা : আমার কেমন যেন ভয় করছে, হাত দু'টো কাঁপছে......

পিটার : না ঘুমানো অন্যায় হয়েছে। আমাদের এই বিছানায় কি একটু ঘুমিয়ে নেবেন? আমরা কোনো শব্দ করবো না—পা টিপেটিপে হাঁটবো এবং কথা বলবো ফিসফিস ক'রে।

পিতা : না......না......আমি চাই......আমি শেলিকে এখুনি দেখাতে চাই, এবং তারপর আমি চ'লে যাবো যদি ও তাই চায়......

পিতা ঘুরে ঘুরে যন্ত্রটা ঠিক করে।

পিটার (দ্রুত ডান দিকে যায় আলোটা নিবিয়ে দিতে, যাতে মঞ্চের আলো ক'মে যায়, অন্ধকার না হ'য়ে; মঞ্চের মাঝখানে চ'লে আসে, হাত কচলায়) : আমি আলোটা নিবিয়ে দেবো! চমৎকার! তাহ'লে আপনি আমাদের আত্মার ব্যাপারেও নাক গলাতে চান, হ্যাঁ? নিজেকে আপনি আমাদের কাছে জাহির করতেই চান? জানেন কী, পুরাকালে দেবতারাও আত্মার ব্যাপারে নাক গলাতেন না; তাঁরা শুধু দেহটা খঞ্জ করেই সুখী হ'তেন। আপনি হয়তো সাধারণ সূর্যালোকে হেঁটে যাচ্ছেন এবং একটা হাত আপনার চুল ধরলো আর আপনাকে তুলে নিলো আকাশে—আশ্চর্য হবার কিছু নেই! এসব সেইদিনে হ'তেই পারতো। অথবা,

যেহেতু দুজন দেবতা আপনাকে ভালোবাসে তাই একটা জন্তু তার অতিকায় দাঁত দিয়ে আপনাকে মেরে ফেললো, হয়তো সেই মুহূর্তেই জন্তুটি সৃষ্টি হয়েছে...কিন্তু আপনারা, পিতারা হ'তে চান অতি আধুনিক দেবতা; আপনারা আমাদের, আপনার সন্তানদের, আমার ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে ছাড়বেন না। কিন্তু আপনারা তো পারবেন না। কারণ আমাদের আর কোনো আত্মাই নেই।

পিতা (প্রথম ছবিটা দেয়ালে ফুটে ওঠে। একজোড়া নারী ও পুরুষের কালো-শাদা ছবি) : শেলি, এ'রা আমার বাবা-মা। এটা ১৯২২ সালের।

শেলি (রেগে) : তোমার বাবা-মা, তাতে আমার কী?

পিতা : তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমা......

শেলি : আমার কোনো ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নেই! যাই হোক, আমি আগেও এই ছবি দেখেছি। আমি এদের চিনি না, আমার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই! ওরা মৃত!

পিটার : এরা আশ্চর্যরকম বিচ্ছিরি, তাই না?

শেলি : ওরা মৃত!

পিতা : এই ছবিটা যখন তোলা হয় তখন আমার বাবার পঁচিশ বছর বয়স। সে খুব পরিশ্রমী, ভালো লোক ছিলো...শিকার করতে ভালোবাসতো...সে একটা পেট্রল স্টেশন কিনেছিলো এবং খুব পরিশ্রম করতো, তাতে সব টাকা নষ্ট হ'লো...সবই নষ্ট হয়েছিলো...তিরিশ দশকেই তার সব যায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও পর্যন্ত নষ্ট হয়।

শেলি (চিৎকার ক'রে) : আমি এ-সব শুনতে চাই না! এসবই মৃত শেষ হ'য়ে গেছে! এ-যেন আমার ভেতরটা খুলেখেলে আমার মধ্যে নিঃশ্বাস দেওয়া, যেমনভাবে পিটার করেছিলো। ওরা তোমার ভিতরে ভালোবাসা পাম্প ক'রে ঢোকাতে চায়। প্রত্যেকেই পাম্প ক'রে ভালোবাসা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করাতে ইচ্ছুক।

পিতা (যখন অন্য একটা ছবি দেখা যায়) : আমার পরিবার। আমার বাবা-মা, দু বোন এবং আমার ভাই...

পিটার : এবং আপনি নিজে। এখানে আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি।

পিতা : এটা ১৯৩৫ সালে তোলা।

পিটার : আপনি একটি রোগা বাচ্চা ছেলে ছিলেন। দেখুন ঐ চোখগুলো! হা ঈশ্বর, আপনি আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন-ঐ চোখের মধ্যে সবকিছু আছে! (দেয়ালের কাছে হেঁটে যায়, ছবিটা দেখে)

পিতা (আর-একটা ছবি) : তোমার মা আর আমি...

শেলি : আমি এটা দেখতে চাই না!

পিতা : ...আমাদের বিবাহের আগে। আমি চব্বিশ বছরের যুবক। তোমার মা সুন্দরী ছিলো, না? সে এতো সুন্দর ছিলো!

পিটার : এখন কি তিনি মারা গেছেন?

পিতা : নিশ্চয়ই নয়। সে বাড়িতে আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষা করছে।

পিটার : আমি ভেবেছিলাম, এরা সবাই মৃত।

পিতা : তারা বেঁচে আছে, মারা যায় নি...(আরো একটা ছবি দেখা যায়) এবং এটা—এটাই শেলি—কয়েক সপ্তাহ মাত্র বয়েস—

সবাই নিশ্চুপ।

পিতা (শেলিকে) : কী ভাবছো ?

শেলি ঘুরে দাঁড়ায়।

পিতা : তুমি কি- তুমি কি বুঝতে পারছো আমি যা দেখাচ্ছি তার মর্ম ?

পিটার : ও জনতাকে ভয় পায়। আপনি একদল লোককে ঘরে ঢুকিয়েছেন।

পিতা : আমি আপনার কথার অর্থ ধরতে পারছি না।

পিটার : ও জনতার মধ্যে থেকে দৌড়ে পালিয়েছে, পালিয়ে এসেছে আমার আলিঙ্গনে। এই মেয়েকে আপনি আপনার কন্যা ব'লে দাবি করছেন। মনে হয়, এই মেয়েটি ও যে-শিশুটি দেয়ালে আছে দুজনেই একই ধাতুতে গড়া, কিন্তু আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন না। আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারেন না। একটা বিচ্ছিন্ন জনতা এবং একজন তরুণী আমার দিকে ছুটে আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সে ভয়ার্ত, তার ভালোবাসার দরকার, তার আমাকেই প্রয়োজন তাকে রূপকথায় পরিবর্তিত করার জন্য। তাই আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। আমিই তাকে জনতার হাত থেকে বাঁচালাম। আপনি আবার সেই জনতাকেই নিয়ে এসেছেন, ওকে বিভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছেন।

পিতা : শেলি ? এখানে আয়।

শেলি যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার দিকে এগোয়। দুহাতে জোরে মুখ ঢেকে।

শেলি : আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

পিতা : শেলির আরো ছবি. .আট মাসের শিশু...এক বছরের...আঠারো মাসের...দু বছরের ...তিন বছরের...এটা ১৯৫৭ সনের ক্রিসমাসে তোলা...

শেলি : চুপ করো!

পিতা : তোর বোন জিনি...

শেলি : আমার কোনো বোন নেই!

পিতা : ১৯৬০ সাল, ইস্টার সানডে। ১৯৬০ সাল কেমন করে অতো পুরোনো হবে ?

পিটার : বোন তো দেখতে বেশ সুন্দরী!

পিতা : শেলি তখন হাই স্কুলে, চোদ্দ বছর বয়স...

শেলি : সে আমি নই! তুমি যাও!

পিতা : শেলির আরো একটা ছবি। ওর মা এটা তুলেছিলো। পেছনে আমি। শেলি, এটা চিনতে পারছো ? চিনতে পারছো ওই স্নানের পোশাক, শেলি ?

শেলি : আমার মাথাটা বেলুনের মতো উড়ে গেছে। তুমি আমাকে খুন করতে চাও। যদি আমার মাথাটা আরো বড়ো হ'য়ে যায় তবে আমি উড়ে সীলিঙে গিয়ে ঠেকবো, তবে তোমাদের আমার পা ধ'রে টেনে নামাতে হবে...

পিতা : এটাও সে-দিনই তোলা। দেখো, ওর সুন্দর দীর্ঘ চুল!

পিটার : আপনি কি ওকে ভালোবাসতেন ?

পিতা : কেন—কেন তুমি ক্রিয়ার অতীতকালের পদ ব্যবহার করছো ?

পিটার : আপনি কি ওকে ভালোবাসেন ?

পিতা : নিশ্চয়, আমি ওকে ভালোবাসি। আমি এখানে ওর অনুসরণ ক'রে এসেছি কেবল ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য। শান্তভাবে। ওকে এগুলো দেখাবো ব'লে। আমি ওর ওপর কোন কিছু জোর ক'রে চাপাতে চাই না, আমি কেবল ওর কাছে একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাই, আমি ওর ওপর কোনো দাবি করবো না...আমি কিছু একটা শুধু প্রমাণ

করতে চাই...

শেলি : সে প্রমাণ করতে চায় যে আমার অস্তিত্ব আছে!

পিটার (ওকে থামিয়ে দিয়ে) : শান্ত হও, প্লিজ। তুমি যখন উত্তেজিত হও তখনি তোমার শরীর থেকে একটা ঘ্রাণ বেরোয়। এটা তেমন ভালো নয়। পুরুষ মানুষদের তেমন নেই।

শেলি : আমি তো পুরুষমানুষ নই, যদিও আমি মেয়েও নই। আমি ছেলেও নই, মেয়েও নই। ঐ কুৎসিত চেহারাটা দেখ ছবিতে। ওই দেখ! স্তন, নিতম্ব, পা আর দীর্ঘ চুল আর ঐ হাসি, ঐ বোকাবোকা হাসি! আমি একটা ছুরি দিয়ে মেয়েটাকে টুকরো টুকরো করতে পারি! দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো করতে পারি!

পিটার : এ ছবিটা তোলা হয়েছিলো হেমন্তে...আলোটা একটু কম ছিলো...

পিটার : আপনার পরিবারে তিনজন স্ত্রীলোক, তাই না? আপনার স্ত্রী এবং দুই কন্যা...... এই ছবিগুলো কেন তুলেছেন বলতে পারেন?

পিতা : কারণ......

পিটার : আমেরিকানরা কেন এতো ছবি তোলে?

পিতা : কারণ......কারণ......

শেলি : তারা প্রমাণ করতে চায় যে তাদের অস্তিত্ব আছে!

পিটার : আমার অতো কাছে দাঁড়িও না। তোমার গন্ধটা ঐ তোশকের মতো, কেমন যেন রক্তের মতো গন্ধ......মেয়েদের গায়ে গন্ধ হয়; তাদের গায়ে এমন রক্তের গন্ধ যে কুকুরগুলো পর্যন্ত তাদের কাছাকাছি চলে আসে।

শেলি : আমার গায়ে রক্তের গন্ধ নেই!

পিটার : যখন প্রথম আমি তোমাকে দেখলুম তখন তোমার অন্তর্বাসে রক্ত লেগে ছিলো।

পিতা (যেন শোনেনি) : আর এই তোমার মা গত বছরের জন্মদিনে। এই ফুলগুলোর কথা মনে পড়ে? তোমার মা বলছিলেন, যখন আমি এই ছবিটা তুলছি, 'এটা উঠবে না, এখানে বড্ডো অন্ধকার'......

শেলি : সে তো সবাই-কে এই ঘরে এনে ফেললো!

পিতা : আর একটা শেলি। ওর হাসিটা দেখো! ও জানে, ও বোনের চেয়ে বেশি সুন্দরী... মনে হয় যেন নিজের মুখটাকে একটা ফুলের মতো, একটা সুন্দর ফুলের মতো ক্যামেরার দিকে তুলে ধরছে......

শেলি : এরা সবাই এই ঘরে এসে ঢুকছে, এরা সবাই......

শেলি দৌড়ে তার বাবার কাছে যায় এবং প্রোজেকটরটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে। তার বাবা তাকে ধ'রে ফেলে আর তারা দুজনে ঝাপটাঝাপটি করতে থাকে।

শেলি : সে আমাকে ছোঁবার চেষ্টা করছে! আমি বুঝতে পারছি সে আমাকে ছুঁয়েছে!

ঝাপটাঝাপটিতে যন্ত্রটা পড়ে যায়। পিটার চেষ্টা করে শেলিকে ছাড়াতে।

শেলি : এটায় কিছুই প্রমাণ হয় না—

পিতা : শেলি, তোমার কী হয়েছে? থামো—

শেলি (চিৎকার ক'রে) : ওখানে কিছুই নেই! ছুরি! আমি ওগুলো দেখি নি—ওগুলো সত্যি নয়—তুমি ব্যর্থ হয়েছো! তুমি আমাকে বোঝাতে পার নি!

পিটার বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়, দ্রুত। তারপর শেলির কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

পিটার : তুমি হঠাৎ ক্ষেপে যাও। শান্ত হও।

পিতা : আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি—

শেলি (চিৎকার ক'রে) : তুমি ব্যর্থ হয়েছো! তুমি হেরে গেছ!

পিটার (প্রোজেকটরটা ঠিক করতে করতে, স্লাইডগুলো কুড়িয়ে একজায়গায় করে) : এটা একটা মজার গর্ভনাটিকা হলো। কিন্তু এখন আমাদের বাস্তবজীবনে ফেরা দরকার। এইসব আবেগই আমাদের অপদস্থ করে। এই মহিলাটির স্বামী যে-কোনো মুহূর্তেই গৃহে ফিরবেন। তার স্বামীর জন্য এর কয়েকটি কর্তব্য আছে, তা সে এখন করবে। অতীতের সবকিছু শেষ হ'য়ে গেছে, কেউ আর অতীত নিয়ে মাথা ঘামায় না, বেলচাভর্তি সময় এদের কবর দিয়েছে। আমাদের এখন রেহাই দিন। আপনি চলে যান।

পিতা : না, ও আমার সঙ্গে ফিরে যাবে—

পিটার : এই রকম একটা মেয়ে নিয়ে আপনি কী করবেন? ও-তো অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, ও-বিশেষ ভালো নয়।

পিতা (পিটারকে ধাক্কা দিয়ে) : আমি তোমাকে খুন করবো—

পিটার লাফিয়ে যায় ও শেলির বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরায়।

পিটার (ব্যঙ্গের সুরে) : বুড়ো দেবতা! প্রাচীন রূপকথা! শেষ হও!

পিতা : আমি পুলিশ ডাকবো—

পিটার : আমি পুলিশদের দিয়ে লাথি লাগিয়ে তোমার দাঁত ভাঙবো, বুড়ো বেজন্মা!

পিতা : আমি—আমি—

শেলি (হাতে চোখ ঢেকে) : ওকে বের ক'রে দাও!

পিটার : এখন তুমি যাবে, সব শেষ। আবার আলো জ্বলছে, এখন ব্যাপারটা বিশ্রী লাগছে।

পিতা : কিন্তু এখনো আরো ছবি আছে......এবং যেগুলো দেখিয়েছি তার ব্যাখ্যা করিনি। আমার আরো কিছু বলার আছে, অনেক কিছু......এতো তাড়াতাড়ি সবটা ঘটলো, এতো গোলমেলে ব্যাপার হলো......আমার আরো বলার আছে। লিখে আনা উচিত ছিলো......

শেলি : যেতে বলো ওকে!

পিটার : এটা আমার বাড়ি এবং তুমি নিশ্চয়ই এখন চ'লে যাবে। আমি তোমার বয়সের ভদ্রলোকের সঙ্গে কড়াভাবে কথা বলতে চাই না, কিন্তু......

হঠাৎ দরোজা খুলে যায় এবং 'মার্টিন র‍্যাভেন' প্রবেশ করে। দেখতে বেশ মোটাসোটা একটি লোক। একটু ফ্যাকাশে। বাবাকে দেখে সে চমকে যায়।

পিটার (আনন্দের সঙ্গে) : হ্যালো, মার্টিন!

মার্টিন : এসব কী?

পিটার : উনি এখনই চ'লে যাবেন।

মার্টিন : ওঁকে দেখতে ভয়ানক। দেখতে ডিটেকটিভদের মতো......

পিটার : না, তেমন কিছু নয়। এ মহিলাটির একজন বন্ধু কিন্তু এখনি চ'লে যাবেন।

পিতা : এ কে?

পিটার : ওর যুবক স্বামী এইমাত্র গৃহে এলো। এদের পারিবারিক জীবন এখন শুরু হওয়া উচিত। এখানে আপনার জন্য কোনো স্থান নেই। ব্যক্তিগত জীবন বড়োই পবিত্র।

পিতা : শেলি—

শেলি : আমাকে তোমার দিকে তাকাতে ব'লো না!

পিতা একটু ভাবে, তারপর তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয় এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেলি দুহাতে মুখ ঢেকে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

পিটার (পিতাকে) : ওর কাছে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি কেবল একটা ঠোঁট ও নখ ওর মাথার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছো; ও সব সময় ওই রকম সব স্বপ্ন দেখছে; সে স্বপ্ন দেখে জনতার। এখানে আমরা ওর দেখাশোনা করি। আমরা ওকে ভালোবাসি।

পিতা : কিন্তু আমি তো ওকে এখানে রেখে যেতে পারি না......

মার্টিন : এই লোকটা কে হে?

পিটার (হালকাভাবে) : বোস, শান্ত হও! তোমাকে সারাদিন ডাকঘরে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাই না? ভদ্রলোক এখনি চ'লে যাবেন।

পিতা . কিন্তু যদি আমি চ'লে যাই......

মার্টিন (ভয় পেয়ে ও আক্রমণাত্মক ভাবে) : দেখো, তুমি, এখান থেকে চ'লে যাও! আমি এ-সব জিনিস একবারে পছন্দ করি না।

পিতা : শেলি .....?

শেলি : আমি কিছুই শুনতে চাই না! আমি আর কোনো কথা বলবো না!

পিতা বাক্সটা তুলে নেয় এবং বেরিয়ে যায়।

মার্টিন : এসব কী হচ্ছে? আমি ভেবেছিলাম ও এখানে আছে একথাটা কেউ জানে না। যদি পুলিশ আসে? কে, খবর দিলো?

পিটার : শান্ত হও, জুতো খোলো। কোট খোলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কি তুমি রাতের খাবারের গন্ধ পাচ্ছিলে?

মার্টিন : চুলোয় যাক রাতের খাবার। আমি এখানে খাবো না।

মার্টিন শেলির দিকে এগিয়ে যায় এবং তার ঘাড় ধ'রে ঝাঁকুনি দেয়।

মার্টিন : তুমি! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না—তুমি শুয়োরের মতো ঘামছো! গায়ে শুয়োরের গন্ধ!

শেলি তার হাতে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকে, ওর হাতে ঝাঁকুনি খেতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

পিটার : আমি শপথ ক'রে বলতে পারি ও বিশ্বাসঘাতিনী নয়। আমি সব সময়ই এখানে ছিলাম।

মার্টিন : আমি আজ সারারাত এখানে থাকতে পারবো না। আমার মা ভীষণ সন্দেহপ্রবণ। সে জিগ্‌গেস করে কেন আমি এতো রাত্রি করেছি—আমাকে নিয়ে তার খুব ভাবনা। আমার মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। সে আমার স্বাস্থ্য নিয়েও ভাবিত। আমি মাকে কি বলবো, যদি এই ব্যাপার কাছ থেকে আমার কোনো রোগ হয়? সেটা এমন লজ্জার ব্যাপার হবে!

পিটার (বেসিনের কাছে গিয়ে মুখ ধুতে ধুতে) : আমি শপথ ক'রে বলতে পারি মেয়েটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

মার্টিন : এই, তুমি পরিষ্কার? তুমি একটা কী? তুমি কি একটা ছোটো ছেলে? তোমার এই পোশাকের তলায় কী আছে?

মার্টিন তার পোশাক ধ'রে টান দেয়। ঠেলে ফেলে দেয় তোশকের উপর, তার সঙ্গে ঝাপটা-ঝাপটি করে। পিটার আলমারি থেকে দাঁড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের ক'রে নেয়।

পিটার : আমি এ-পাড়াতেই ছিলাম, তাই একবার এলাম ওকে দেখে যেতে আর দাড়িটা

কামাতে। আমি এতোক্ষণ থাকবো ভাবিনি। আজকের সন্ধ্যাটা আমি খুব ব্যস্ত থাকবো আর তাই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে......

মার্টিন জাপটাজাপটি করে শেলির সঙ্গে, শেলি চিৎকার করে ওঠে। মার্টিন তার মুখে হাত চাপা দেয়। পিটার বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামায়। আলো তার চারপাশ থেকে কমতে থাকে, যতক্ষণ না কেবল তাকেই দেখা যায়। মঞ্চের সবটা অন্ধকার।

পিটার : আমার অস্তিত্বকে ব্যক্তিগতভাবে আমি মূল্য দি। আমি একজন যুবক, দাঁড়িয়ে আছি একটা বাতিল হ'য়ে যাওয়া বাড়ির একটা বেসিনের পাশে; এই শহরটাও বাতিল হ'য়ে যাওয়া। তবু আমি বেশ গর্ববোধ করছি আমার অস্তিত্বে, তাই ক্ষৌরকার্যে ব্যস্ত। আমার মুখটা খুবই বাস্তব। লোকে বলে আমার মুখটা সুন্দর। কিন্তু যদি এইসব হাসি ফুরিয়ে যায় যেমন করে জল চিনেমাটিও ক্ষয় করে? তবে কি আমরা সব মরে যাবো? তবে কি আমরা সব একটা শেষে পৌঁছবো? তবে কি আমাদের অস্তিত্ব বিষয়েও লোকে এমন নিষ্ঠুরভাবে সন্দিহান হবে?

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

ধারাজলের শব্দ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমার কথার কোনো দামই রইল না। একেবারে বেইজ্জত। তোমার কপালেও দেখি কয়লার টিপ।

হে সন্ধ্যার নারী, চোখে প্রতীক্ষার তরঙ্গ নিয়ে এসেছ এই ধূসর-ধুলো আস্তানায়—তোমায় জানি না সঞ্জীবনীর কোন্ ধুয়ো শোনাতে পারব।

চাও যদি নিজেরই পিঠটা-শরীরটা দেখাই—চাবুকের দাগ, দুঃস্বপ্নের উল্কি। ঠিক যেমন তোমারও শিরায়-শিরায় যে-গতকাল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, তাতে স্বাক্ষর অসংখ্য বলাৎকারের বজ্রের।

যেমন তোমার, আমারও নিশ্বাসে সেই কিছু গন্ধ ঝটিকার, গন্ধকের, দাউ-দাউ জ্বলন্ত কত গ্রামের, কত প্রেমের।

তোমার-আমার সম্ভাষণের, চোখের চাউনির আর কোনো দামই রইল না।

তবু এলিয়ে পড়া চলবে না। পাগলের প্রলাপ ঠেকে তো ঠেকুক, এ-মুহূর্ত হোক তবু শ্রান্তের শুধু ক্ষণেক দাঁড়ানোর, ফিরে দম নেওয়ার, তৃষ্ণার পানীয়ের···ধারাজলের শব্দ শুনে এগোনো, পরে যথাসময়

নিচু হয়ে ধ্যানী দুটি করপুট যোগ করা মুখের খালের সঙ্গে।

বেচু এসেছিল

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

আজ বেচু এসেছিল। বলল, 'মায়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'
'মায়াকে তোর কথা বললুম,' ক্ষণকাল ধ'রে চুপ ক'রে থেকে সে
আরো জানায়।

সঙ্গে সঙ্গে শর্ট-সার্কিট; শরীরভর্তি অন্ধকারে ঐ ক্ষণকাল জুড়ে
আমি হতমান ব'সে রইলুম। তারপর বললুম, 'কেন বললি? যাক, আমি আর-শুনতে
চাই না।'

তবু সে থামে না। সে আরো বলে। অফিসের প্রকাণ্ড টেবিল
পেরিয়ে, ঝুঁকে, আপাদলম্বিত হাতে ১০-টির মধ্যে একবারে তার ২-টির
বেশি মুখ আমি চেপে ধরতে পারি না। বাকি ৮-মুখে সে
কথা কয়।

অ্যায়সা মুটিয়েছে না।

টেলিফোন-ভবনের বিশাল কাচের
দরজার ওপারে ১৩-বছর পরে তাকে হঠাৎ দেখে বেচু
এলিভেটর ছেড়ে দেয়। একবার পরিচিত হ'লে বেচু
মেয়েছেলেকে এমনিতে সহজে ভোলে না।

অবশ্য, এক্ষেত্রে ওর চোখ আটকে গিয়েছিল- তৎক্ষণাৎ
নামও মনে পড়ে—সে আমারই কারণে; নইলে হয়ত লিফ্‌ট
ধরে উঠেই যেত। 'আপনি মায়া না?' পাল্লা ঠেলে ভেতরে
ঢুকে নড়ে-চড়ে সে জানতে চেয়েছিল। মায়া অস্বীকার করেনি।
এত ব'লে সে চুপ করে।

তারপর ১৩-বছর আগের সমুদ্রতীরের কথা তোলে। যেখানে,
যখন, সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষমান ভোরের গর্জনের ভিতর ও প্রবাস-থেকে-
উড়ে-আসা হাওয়ায়, ফেনাভর্তি মুখের মধ্যে ব্রাশের
চলাচল দ্রুততর ক'রে, কখনো থামিয়ে, ডোরাকাটা
নিশিপোশাকে ভোরবেলার বালির ওপর দু'পা বিস্তৃত
ক'রে দাঁড়িয়ে সে, বেচু, আমাদের দুজনকে পাশাপাশি প্রথম আবিষ্কার করে।

আমার নাম বলা মাত্র মায়া চিনেছিল
কিনা জানতে চাওয়ার সাহস আজো হয়নি দেখলুম। এটাই
ভাবছি। যে, আজো হয়নি? চিতা থেকে নিক্ষিপ্ত একখণ্ড হাড়ের
মত, সমস্ত শিকল ছিঁড়ে, ভোরের বালুবেলায় আজ একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন ছাড়া
কিছু আর পড়ে নেই দেখি।

প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

আল মাহমুদ

শেষ ট্রেন ধরবো বলে একরকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পৌঁছে দেখি
নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতন হঠাৎ
দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।
যাদের সাথে শহরে যাওয়ার কথা ছিল তাদের উৎকণ্ঠিত মুখ
জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আব্বা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই
তোর সময় বয়ে যাবে। তুই আবার গাড়ি পাবি!
আম্মা বলছিলেন, আজ রাত না হয় বই নিয়েই বসে থাক
কত রাত তো অমনি থাকিস।
আমার ঘুম পেলো। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি
নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনদিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ
আধ ঘন্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলী
মালপত্র মাথায় তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকেট কিনতে পাঠায়। নাহার
কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।
আর আমি এদের ভাই
মাইল মাইল হেঁটে এসে শেষরাতের গাড়ি হারিয়ে
এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।
শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতন হঠাৎ
লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের ওপর রোদ নামলে
সামনে দেখবো পরিচিত নদী। ছড়ানো ছিটানো ঘরবাড়ি,
গ্রাম।

জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর
দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা
কলার ছোটো বাগান।
দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আব্বা

একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন
ফাবিআইয়ে আলা ইরাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান...

বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন
ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে
ঘরবাড়ি কেমন শূন্য হয়ে যায়। হাতমুখ ধুয়ে আর
নাস্তা পাঠাই।
আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘসে ঘসে
তুলে ফেলবো।

কৌতুক

আলোক সরকার

কথোপকথন ছিলো হাত মুখ সঞ্চালন। বৈশাখের প্রাতঃকালে
আমাদের দেখা হলো ডুমুরগাছটার নিচে।
তোমার মুখের রেখা ভালো ছিলো। হেলে সাপ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলো
তাও ভালো ছিলো, সবুজ শ্যাওলা কুয়োতলা অনতিদূরের বাবলাবন।
আমার মুখের রেখা ভালো ছিলো কতো সহজেই বুঝি। কথোপকথন
ক্রমপরিণত, হাত মুখ সঞ্চালন।
সবই তো পশ্চাদ্‌ভূমির চতুরালি, স্বীকার্য যা অস্বীকার্যের বধির নির্দেশ।
কৌতুক অত্যন্ত বেশি। বৈশাখরাত্রির দাহ বৃষ্টিহীন অস্পন্দিত গাছ
আর প্রাতঃকাল আর দক্ষিণের থেকে কিছু হাওয়া।
কথোপকথন হলো হাত মুখ সঞ্চালন। কৌতুক অত্যন্ত বেশি
প্রতিটি আবেগ মত্ত কৌতুকের, সব নিরাবেগ, সব অন্ধকার,
ব্যবধানে এলে কতো স্পষ্ট হয়! ব্যবধান নির্মোহ নিষ্ঠায়
দেখায় নিহিত শ্রম হাতমুখ সঞ্চালন তার অন্তরালে
আমাদের উভয়ের বাড়ি শাশ্বতকালের বাড়ি অন্তহীন প্রবাহিত ধারা
সম্প্রতিষ্ঠ মৌলিক বিকাশ নিস্তব্ধ চেতনাময় দ্যুতি।

জনৈক নবাগত শরণার্থীর চিন্তা

কামাল মাহবুব

বর্তমানে আমি একজন বন্ধুর প্রত্যাশায় আছি
যে আমাকে নিদেনপক্ষে একটি টাকা দিয়ে সাহায্য করবে,
বর্তমানে আমি একজন বান্ধবীর প্রত্যাশায় আছি
যার ভালোবাসায় অতীতের ছিন্নভিন্ন স্মৃতি হৃদয়পট থেকে ঘষে তুলে নেব,
বর্তমানে আমি একজন আত্মীয়ের প্রত্যাশায় আছি
যার কাছে আমার জীবনের ছিন্নমূল অস্তিত্বকে জমা রাখা যায়,
বর্তমানে আমি একজন সৈনিকের প্রত্যাশায় আছি
যে আমাকে অতি শীঘ্র তার রাইফেল থেকে গুলি চালনা শেখাবে।

বাংলাদেশ চিত্রশিল্প ও তার সামাজিক পটভূমি

বুলবন ওসমান

বাংলাদেশ[1] চিত্রশিল্পের বিকাশ ও ক্রমোন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তার সামাজিক প্রেক্ষিত আসে স্বাভাবিক সহগ হিসেবে। এই শেষোক্ত দিকটিকে অবহেলা করলে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের সুষ্ঠু মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ভারতবিভাগের ফল হিসেবে বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়। ১৯৪৭-এর ১৪ই।১৫ই আগস্ট বাংলার উপর অভিশাপ-অশনি বর্ষিত হয়ে নিদারুণ আঘাত হানে। চলতে থাকে ভাগাভাগির পালা। যৌথ পরিবার যখন ভাঙে তার যেমন হাঁড়ি-কলসী পর্যন্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়, তেমনি বাংলার সম্পত্তিরও ভাগাভাগি চলে। মুসলিম-অধ্যুষিত বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী সুকুমার-কলা বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের চেয়ে নজর দেয় চেয়ার-টেবিলের দিকে। কলকাতা আর্ট কলেজের সমস্ত জিনিসের বিভাগেরও তালিকা তৈরী হয়। শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এক ফর্দ তৈরী করেন। সব কিছু ঠিক, এমন সময় নির্দেশ আসে, বলাবাহুল্য তৎকালীন শাসক-গোষ্ঠীর কাছ থেকে, ও-সব মাটির ঢেলা নিয়ে কি হবে, তার চেয়ে কিছু কাঁচা টাকা নিয়ে নেওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।[2] শিল্পীরা শাসকগোষ্ঠীর কাজে সায় দিতে পারে না। আর বুঝতে পারে আর্ট স্কুল করাও সহজ কাজ হবে না।

জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমিন, আনোয়ারুল হক ও সফিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ তৎকালীন কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষকগণ সবাই বাংলাদেশে যান। জয়নুল আবেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার বিভাগে যোগ দেন, বাকীরা নানা শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতে থাকেন।

বয়সে নবীন, সদ্য কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে পাস করে শিল্পী কামরুল হাসান বাংলাদেশে গিয়ে আর্ট স্কুল স্থাপনের জন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন। শুরু করেন পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং বিভিন্ন আলোচনাসভায় এর প্রস্তাব আনা। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন (স্বর্গীয়) অজিত গুহ, আবদুল গণি হাজারী ও সরদার জয়েনউদ্দিন। আর বয়স্কদের মধ্যে উৎসাহ যোগান ও নিজেদের প্রভাব খাটান সলিমুল্লাহ ফাহমি, ডঃ কুদরৎ-এ-খোদা, ডঃ হাবিবুল্লাহ প্রমুখ শিক্ষাবিদ। সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে পাবলিক হেলথের ডেপুটি সেক্রেটারি জনাব আবুল কাসেম যথেষ্ট সাহায্য করেন। যখন আর্ট স্কুল স্থাপনের তোড়জোড় চলতে থাকে, জনৈক মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানে ও-সব আর্টফার্ট চলবে না। তবু সব বাধা কাটিয়ে ১৯৪৮-এ আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের দুটি কামরায় সাতজন ছাত্র নিয়ে শুরু ঢাকা গভর্নমেন্ট ইন্সটিটিউট অব আর্ট-এর। শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন, সফিউদ্দিন আহমদ ও কামরুল হাসান এবং অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন। আর্ট স্কুলের উন্নয়ন ও নিজস্ব

---

[1] বাংলাদেশ অর্থে পূর্ববঙ্গ বোঝান হয়েছে। পূর্ববঙ্গ এক সময় পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হত। বর্তমানে তা বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এক শব্দ হিসেবে পূর্ববঙ্গ এবং বাংলা দেশ পৃথক পৃথক শব্দে প্রকাশিত হলে যুক্তবাংলা বুঝতে হবে। একক শব্দ বাংলাও যুক্তবাংলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

[2] পরে অবশ্য টাকাও আর নেওয়া হয়নি।

ভবন নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগে সাহায্য করেন নুরুল আমিন ও জোড়ি ডিকারুন-নেসা নূন।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলাদেশ চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই শিবের গীত কেন; যাঁরা মুক্তবুদ্ধি সমাজে মানুষ হয়েছেন, যাঁদের জীবন শিল্পকলার মধ্যে বেড়ে উঠেছে, তাঁরা ঠিক বুঝতে পারবেন না বাংলাদেশের শিল্পীদের কি বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সেই পরিচয়টা দেবার জন্যেই ঢাকা আর্ট স্কুলের জন্ম-ইতিহাস টেনে আনা। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের চিত্রশিল্প তার পায়ের নিচে মাটি লাভ করে। তাই বাংলাদেশের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা, এই প্রেক্ষিতটুকু ছাড়া কবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে। চিত্র শিল্পের যাত্রার প্রতিবন্ধকতা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশে রং-তুলি-কাগজ ও অন্যান্য শিল্প-দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আর এ-সব জিনিসকে বিবেচনা করা হয় বিলাস দ্রব্য হিসেবে। করসমেত মূল্য দাঁড়ায় চারগুণ। তাই দারিদ্র্যপীড়িত শিল্পীরা মনের মত করে রঙও ব্যবহার করতে পারে না।

বাংলাদেশ মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল। দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতার জন্যে বাঙ্গালী মুসলমান পৃথিবীর অনুন্নতবাসীদের অন্যতম। শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্যের সাথে জুটেছে ধর্মের গোঁড়ামি ও ঊষরতা। উচ্চবিত্তের আধুনিক শিক্ষা ধর্মকে ব্যক্তিগত আচরণে তাচ্ছিল্য করলেও শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসেবে সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। ঐসলামিক নীতি প্রস্তর-পুত্তলিকাবিরুদ্ধ বলে ভাস্কর্যকে নির্বাসন দিয়েছে। সেই সাথে মানুষ ও প্রাণিচিত্রকেও। এর পেছনে বিশ্বাস রোজ হাসরের দিনে এই সব চিত্র শরীর গ্রহণ করবে এবং যে এঁকেছে তার প্রাণ ওতে সঞ্চারিত হয়ে যাবে, সুতরাং শিল্পী নিজে হবে পরিত্যক্ত। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে শিল্পক্ষেত্রে দুটি প্রধান অংশ ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প কর্তিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের শিল্প-বাসনা তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই মুসলিম শিল্পীর দক্ষতা দেখি স্থাপত্যে, লিপিশিল্পে, মোজাইকের নকশা ও জ্যামিতিক নকশায় এবং পুষ্প-পত্রালির নকশায়। পুষ্প-পত্রকে জীবিত মনে করা হোতো না। কেননা, বৃক্ষ যে জীবন্ত এ-সম্বন্ধে তেমন ভাবনা মানবসমাজে তখনো প্রবলভাবে প্রশ্নায়িত হয়নি।

ইসলামিক নীতির বিরুদ্ধে পারশ্য ঐতিহ্য সব সময় বিদ্রোহ করেছে এবং নিজেদের অতীত সংস্কৃতির প্রভাব তারা কখনো পরিত্যাগ করেনি। তাই ছবি আঁকা বারণ হলেও স্বয়ং হজরত মহম্মদের (দঃ) প্রতিকৃতি[৫] আঁকতেও তারা পিছপা হয়নি। আর হজরত মহম্মদের (দঃ) অবয়ব কোথাও পারশিক, কোথাও মোগল চেহারার। ভারতীয় চিত্রশিল্পের অন্যতম অধ্যায় মোগল চিত্রকলা এই পারশিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নূতন রূপলাভ করে। মোগল সম্রাটগণ মুসলিম হলেও নিজ পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বর্জন করেনি। মোগল চিত্রকলা তাই ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। শুধু পারশি বা চীনা রীতি নয়, মোগলগণ ভারতীয় রীতিকেও জায়গা দেন। আর এই তিন ধারার মিলিত রূপ মোগল চিত্রকলা। অথচ বাংলার মুসলমান হিন্দুধর্ম থেকে রূপান্তরিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও নিজের ঐতিহ্য পুরোপুরি ভুলে যায়। যদিও গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকশিল্পে এর একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যকে বাঙালী মুসলমান একেবারে নির্বাসন দেয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সঙ্গীতসাধক হবার পেছনের ইতিহাসের সামান্যতম অংশ যাঁর জানা, তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে সঙ্গীত ছিল ট্যাবু। সঙ্গীতশিল্পীরা

---

[৫] পার্শিয়ান সার্ভে দ্রষ্টব্য।

হয়তো একঘরে, সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে তাদের উপস্থিতি ছিল অবাঞ্ছিত। এমন কি যে-সমাজে গৌরকেটে চুল আঁচড়ানও ছিল গর্হিত কর্ম, তেমন এক সমাজে আর্ট স্কুল স্থাপিত হল। মরহুম ডঃ শহীদুল্লাহ-র মত জ্ঞানীও পুত্র মুর্তজা বশীরকে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার গোঁ ধরার জন্যে চপেটাঘাত করেন। উদাহরণটি মরহুমকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে দেওয়া হয়নি, এ থেকে পাঠক বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত মান সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন। মোগল আমলে যখন প্রাদেশিক স্কুলের আবির্ভাব হতে থাকে তখনও বাংলার মুসলমানরা এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু ইংরেজ আগমনের পর থেকেই তাদের পশ্চাদপসরণের শুরু। ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত মহরমের মিছিলের এক সিরিজ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলমানের চিত্রকলার সম্ভবত অন্যতম নিদর্শন। শিল্পীদের নাম জানা যায়নি, তবে এতে ইংরেজ আগমনের ফলে বৃটিশ চিত্রকরদের শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। এ-ছাড়া পূর্ণ চিত্রকলার নিদর্শন আর পাওয়া যায়নি। ইংরেজ আগমনের ফলে বাংলায় যদি হিন্দু রেনেসাঁ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, মুসলিম রেনেসাঁ আসে বিংশ শতাব্দীতে। এই একশ' বছরের পশ্চাৎ-পদতার প্রভাব বাংলাদেশে এখনো সুপ্রকট। আর সে পিছুটানকে জোরালো করে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক পরিবেশ। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তা ও শিল্পকলা চর্চার বিরুদ্ধে সব সময় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, বলাবাহুল্য রাজনীতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এখানেই পার্থক্য। ইংরেজরা অর্থনৈতিক শোষণ করলেও ভারতকে বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। সে তুলনায় পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশকে ক্রমশ টেনে নিয়ে গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে।

আগেই উল্লেখ করেছি লোকজীবনে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হিন্দু বা ভারতের বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাবের ধারা সচল ও জোরালো ছিল। যেমন ভাস্কর্যশিল্প মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধ হলেও বাংলার গণজীবনে টেরাকোটার প্রভাব উল্লেখ্য এবং বিশিষ্ট। পীরের দরগায় মাটির ঘোড়া দিয়ে মানতের চল বহু যুগ ধরে। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বিবাহ উৎসবে কলাগাছ ও মঙ্গলঘটের ব্যবহার প্রচলিত। রাঙানো কুলোয় রীতিমত আলপনার নকশা। কনের মুখে চন্দনের ফোঁটাকাটা। এ-ছাড়া চিত্রকলায় প্রাণীর অবয়ব নিষিদ্ধ হলেও নকশী-কাঁথায় মাছ, পাখি, নারী-পুরুষ অহরহ জায়গা পায়। সুতরাং লোকজীবনে জিনিসটা সহজে জায়গা করে নিয়েছিল, কোরান বা রাজনীতিক প্রভাব তাকে তেমন টলাতে পারেনি। কিন্তু নাগরিক সংস্কৃতিতে এর প্রভাব ছিল প্রকট। তাই বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় রাজ-নীতিক কারণে ইংরেজকে বয়কট করতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শিল্পগতভাবে তো বটেই রাজনীতিক দিক থেকেও। যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলো তখন প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় অনেক এগিয়ে গেছে। তাই যে-ইংরেজকে মুসলমানরা ঘৃণা করত তারই পদলেহন করে সুবিধা আদায়ের জন্য নিজেদের ভারতীয় না ভেবে মুসলমান হিসাবে ভাবতে শুরু করল এবং গোটা উপমহাদেশে একটা বিষবৃক্ষ রোপণ করল। যার কুফল ভারত ও পাকিস্তানবাসী সবাই ভোগ করছে এবং বর্তমানে গোটা বিশ্ব এই বিষে আক্রান্ত। বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিশ্বকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের মুখে এনে ফেলেছে এবং তার জন্যে মুসলিম নেতাদের অদূরদর্শিতা মূলত দায়ী। উপরোক্ত পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রেখে বাংলাদেশের চিত্রশিল্প-চর্চার দিকে নজর রেখে এর কৃতিত্ব ও অকৃতকার্যতার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। এ-গেল প্রথম দিক। দ্বিতীয় দিক, বাংলাদেশ ১৯৪৭-এর পর থেকে সমাজগতভাবে যেভাবে এগিয়ে গেছে

তার হিসাব নেওয়া এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পসৃষ্টি ও তার চরিত্র। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক জগতের সাথে এর যুক্ততা ও আন্তর্জাতিক স্রোতকে কতটা আপন করে নিয়েছে তার অঙ্ক এবং বিশ্বশিল্পের অঙ্গনে এর নিজস্ব স্থান ও অবদান।

বাংলা বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হলেও তার মূল ঐতিহ্য ভারতীয়। তাই বাংলাদেশ চিত্রশিল্প শিক্ষালয়ে কোন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষকগণ ঢাকা আর্ট ইন্সটিটিউটের সর্বময় কর্তা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের চিত্রে প্রশিক্ষণধারায় কোন পার্থক্য নেই। ইদানীং বাংলাদেশ চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে শিল্পের ইতিহাস ও শিল্পের সমাজতত্ত্ব এই দুটি থিওরেটিক্যাল বিষয় যুক্ত হয়েছে এবং এইখানে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে বাংলাদেশ চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের পার্থক্য। ব্যবহারিক দিক সম্পূর্ণ এক। এ-ছাড়া পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় প্রথম দুই বছর ফাংশানাল ইংলিশ ও সভ্যতার ইতিহাসও পাঠক্রমে যোগ করেছে। শিল্পের ইতিহাস ও শিল্পের সমাজতত্ত্ব পরের তিন বছর পাঠ্য। শিল্পীর সৃষ্টিক্ষমতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাড়িয়ে তোলা যার পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

শাসকশ্রেণীর অবজ্ঞা-অবহেলা এবং শিল্পবিমুখ সমাজ প্রত্যক্ষভাবে চিত্রশিল্প ও শিল্পীদের তেমন দমিয়ে রাখতে পারেনি, যতটা করেছে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে। শিল্পী আবদুর রাজ্জাক চারু কলেজের ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পের এম.এ.; বাংলাদেশের শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র এম.এ. ডিগ্রীধারী। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় এই বিভাগটি অল্পদিনেই বেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু পাথর খোদাই এর কাজ এখনো অনুপস্থিত। প্রথমত বাংলাদেশে পাথরের অনুপস্থিতি, দ্বিতীয়ত পাথর আমদানির জন্যে খরচ করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নারাজ। তাই একদিকে প্লাস্টারে মডেলিং, অন্যদিকে কাঠখোদাইকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে শিল্প কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অন্যদিকে রাজ্জাক সাহেব ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে ভাস্কর্য সৃষ্টির কৌশল জানলেও সরঞ্জামের অভাবে তাও বাস্তবায়িত করতে পারেন নি এবং পারেন নি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে। তাই শিল্পক্ষেত্রে ভাস্কর্যের দীন অবস্থা। অনেক তরুণই এদিকে আগ্রহ দেখায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকে না। এ-ক্ষেত্রে মাত্র দুজন এখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নাম করতে হয় আনোয়ার জাহানের, তার দুটি প্রদর্শনীও হয়েছে। এর পর আসে আনোয়ারুল হকের নাম। বাংলাদেশের একমাত্র খ্যাতনামা মহিলা ভাস্কর্য শিল্পী নওবেরা আহমদ। তাঁর শিক্ষা ইউরোপে। মাঝে কয়েক বছর ছিলেন দেশে, প্রদর্শনীও করেন। যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করলেও তাঁর কাজে হেনরী মুর এবং বারবারার কাজের প্রভাব প্রকট। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে।

আবদুর রাজ্জাকও উপকরণের অভাবে খুব বেশী একটা কাজ করতে পারেন নি। কিছু ধাতব, কিছু কাঠখোদাই ও প্লাস্টারে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি গ্যালভানাইজড তার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত। কনস্ট্রাক্টিভিজম-এর প্রভাব তাঁর কাজে যথেষ্ট। যেমন চিত্রে তেমনি স্থাপত্যে।

বাংলাদেশের ভাস্কর্য ও টেরাকোটার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। রাজশাহীর পাহাড়পুর, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও কুমিল্লার ময়নামতী এ-সব নিদর্শনে সমৃদ্ধ। ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন কাজের নমুনাও এখানে মেলে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব নেই।

গত বছর বিমানবাহিনী দিবসে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতীকচিহ্নরূপে ঈগলের প্রতিকৃতি করাতে চান। ভার পড়ে রাজ্জাক সাহেবের ওপর। আমরা একটু অবাক হই। একে ভাস্কর্য, তা-ও পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এবং খোদ সমর-কর্তৃপক্ষ থেকে আবেদন, সত্যি অবাক হবার মত ঘটনা। হাজার আটেক টাকা খরচ করে প্রায় ছ'ফুট উঁচু ডানামেলা ঈগল তৈরী হয়। সাদা সিমেন্ট ও মোজাইক পাথর যোগে। সরলীকৃত ফর্মে দাঁড় করান হয় ঈগলকে। ক্যান্টনমেন্টে স্থাপন করা হয়। আমরা ভাবি পাকিস্তান কি মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে সভ্য হতে যাচ্ছে? তখন উত্তরটা সদর্থক মনে হয়েছিল। কিন্তু এ-বছর পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে যখন আর্ট কলেজের দরোয়ান নোনামিয়া নিহত হয়, নিহত হয় শেষ বর্ষের ছাত্র শাহ নওয়াজ, আহত হয় আরো তিনজন ছাত্র এবং ভাস্কর্য বিভাগের প্রতিটি শিল্পকর্ম মেশিনগানের গুলিতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, বুঝতে পারি শ্বেত সিমেন্টের সেই ঈগলটার ধারালো নখ বেরিয়ে পড়েছে, আঁচড়ে-খাবলে বাঙালী হৃদয় ও তার সুকুমার শিল্পকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। বাংলাদেশে আবার মধ্যযুগের শাসন। নাদিরশাহ-এর প্রেতাত্মা-মুক্ত হতে না পারলে বাংলাদেশে আর স্থাপত্যশিল্প হবে না।

চিত্রশিল্পের মাধ্যমের হেরফেরে আমরা একে তিন ধারায় ভাগ করে নিতে পারি, তৈল-চিত্র, জলরঙ ও গ্রাফিকচিত্র। এ-সম্বন্ধে আলোচনায় অবশ্য পৃথক পৃথক ভাগ না করলেও চলে, কেন না, একই শিল্পী তৈলচিত্র, জলরঙ এবং গ্রাফিকচিত্র করছেন। এখনো শিল্পীদের বিশেষ বিশেষীকরণ ঘটেনি। তাই কোন ব্যক্তিশিল্পীর সমালোচনায় তাঁর সব রকম শিল্প-কর্মের উল্লেখ এসে যাচ্ছে। ব্যক্তিশিল্পীর আলোচনায় না গিয়ে আমরা প্রথম বাংলাদেশের সমাজ-প্রগতির সাথে শিল্প-প্রগতির অগ্রগতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষের স্কেচ এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এ বিষয়ে প্রায় শ' পাঁচেক স্কেচ করেন। সফিউদ্দিন আহমদও সর্বভারতীয় শিল্পরসিক মহলে নিজেকে আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। আনোয়ারুল হকও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তরুণ শিল্পী কামরুল হাসান কলকাতার চিত্র-দর্শক মহলে নিজের ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন। বাংলাদেশে গিয়ে এঁরা নূতন উৎসাহে কাজ করতে শুরু করেন তাঁদের নিজস্ব ধারায় বাস্তব ও প্রায়-বাস্তববাদী শৈলীতে।

১৯৫৩ থেকে '৫৬-র মধ্যে নূতন চারু বিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকজন ক্ষমতাবান শিল্পী বেরিয়ে আসেন। এঁরাই এখন বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রদূত। এঁদের মধ্যে আছেন হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুর রউফ, আবদুল বাসেত, রশীদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী ও মীর মোস্তফা আলী। মীর মোস্তফা আলী অঙ্কন ও চিত্র বিভাগের ছাত্র ছিলেন না। তিনি বর্তমানে চারু মহাবিদ্যালয়ের সিরামিক বিভাগের অধ্যক্ষ। লন্ডনে সুদীর্ঘকাল থেকে সিরামিকস-এ সর্বোচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে সিরামিক শিল্পের নূতন ধারা প্রবর্তনায় তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত শিল্পীদের সাথে যোগ দেন কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী মোহম্মদ কিবরিয়া।

বাংলাদেশের শিল্পীদের শ্রেণীচরিত্র যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে সহজেই এঁদের সাধারণ মধ্যবিত্ত চরিত্র চোখে পড়বে। প্রতিষ্ঠালাভের পর অনেকে হয়ত এখন উচ্চ মধ্যবিত্তে স্থান পেয়েছেন, কিন্তু প্রথমে সবাই প্রায় ছিলেন নিম্ন বা মধ্য-মধ্যবিত্তে। এখানে মধ্যবিত্ত চরিত্র বিত্ত দিয়ে মাপা হয়নি, ধরা হয়েছে তাঁদের পারিবারিক মর্যাদা ও শিক্ষার মাপকাঠিতে;

যা পাক-ভারতীয় সমাজের জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে যেমন চলেছে শ্রেণী-শোষণ, তার সাথে সমান্তরাল ভাবে যুক্ত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। তাই সচেতন শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্ত জ্ঞানী-গুণী ও শিল্পীরা এর প্রতিবাদে মুখর হন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তাই এইসব নবীন শিল্পীরা দেশের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হন। দিন-রাত খেটে পোস্টারের দায়িত্বের ফাঁকে সুকুমার শিল্পেও তাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। সামাজিক ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে তাঁরা কাজ করতে থাকেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুর্তজা বশীরের একটি উডকাট বিখ্যাত। হামিদুর রহমানের শহীদ মিনারের অভ্যন্তরের মুরালটিও তেমনি উল্লেখ্য। পিকাসো যে মানসিকতা নিয়ে গুয়ের্নিকা আঁকেন, হামিদুর রহমান সমমানসিকতা নিয়ে আঁকেন এই মুরালটি। তেমনি ক্ষোভ, যন্ত্রণা, আর উৎক্ষিপ্ত ক্রোধের প্রকাশ।*

১৯৫৮ পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশে একটা প্রগতিপন্থী রাজনীতিক আন্দোলন ছিল। এর আগে বা সামান্য পরে বেশ কিছু শিল্পী বিদেশ যাবার সুযোগ লাভ করেন। হামিদুর রহমান শিক্ষালাভ করেন লন্ডনে, রশীদ চৌধুরী বৃত্তিলাভ করেন ফরাসী সরকারের, আমিনুল ইসলাম বৃত্তিলাভ করেন ইতালী সরকারের, মুর্তজা বশীর যান ইতালী এবং ১৯৬১-র মধ্যে আরো কয়েকজন শিল্পী বিভিন্ন সূত্রে বিদেশ যাবার সুযোগ পান। যেমন, মোহম্মদ কিবরিয়া তিন বছর জাপান থেকে শিক্ষালাভ করেন, বিশেষ করে গ্রাফিক আর্টে। গ্রাফিক আর্টের উচ্চ শিক্ষার জন্যে সফিউদ্দিন আহমদও তিন বছর কাটিয়ে আসেন লন্ডনে। আবদুর রাজ্জাক আর্টে মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে আসেন আমেরিকা থেকে। আবদুল বাসেত ও কাজী আবদুর রউফও আমেরিকা ঘুরে আসেন। আর আবেদিন সাহেব বেশ কয়েকবারই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে আসেন। এ-ভাবে দেখা যাচ্ছে বেশ অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের প্রায় সবাই বিদেশ যাবার সুযোগ পান। এর প্রভাব যে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিকে বিদেশ ভ্রমণের ফলে সবার সামনে তথাকথিত মুক্ত জগতের চিত্রশিল্পের সর্বশেষ উন্নয়নের সাথে পরিচয়; দ্বিতীয়ত, নিজেদের সেই বিশ্বচিত্রস্রোতের সাথে একাত্ম করার প্রয়োজনবোধ; তৃতীয়ত, আয়ুবী সমরতন্ত্র প্রগতিবাদী সমস্ত আন্দোলনের গলা টিপে ধরে, তাই প্রগতিপন্থী চিত্র পরিহার; চতুর্থত, ধানমন্ডি-গুলশান জাতীয় নতুন আবাসিক এলাকার সৃষ্টি অর্থাৎ উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রসারণের ফলে শিল্পের চাহিদা এবং এই চাহিদা মেটানর জন্যে শিল্পীরা বেশ দু' পয়সা পেতে থাকেন, তাই বাংলাদেশের যে চিত্রশিল্প সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তব নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তা ১৯৬১ ও তার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিজমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মানুষ বা কোন বস্তুর আভাসও মেলে না।

...Our Lord made five hundred loaves out of five so that no such necessity would arise. When he told men to love their neighbours, their bellies were full.* এখানে ব্যাপারটা তা দাঁড়ায়নি। যখন শিল্পীদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা এল, সমাজের কিছুটা উন্নয়ন বিশেষ করে মধ্যবিত্তের প্রসার হওয়ায় শিল্পীদের

---

* বর্তমানে শহীদ মিনারের উপরের কাঠামোটি পাকিস্তান সেনাদের ট্যাঙ্কের গুলীতে নিশ্চিহ্ন। বেদীর ভেতরের অফিস ও পাঠাগারে দেওয়া হয়েছে আগুন। ধোঁয়ার কালো হয়ে গেছে সব। এই মুরালটি উদ্ধার করা যাবে কিনা ভবিষ্যৎই জানে। বিশেষ দ্রষ্টব্য: শহীদ মিনার এখন মসজিদের কাজ দিচ্ছে।

* Bertolt Brecht—*Mother Courage & Her Children*, p. 16. কম্যান্ডারের প্রতি বাজকের উক্তি।

'বেলি' কিছুটা পূর্ণ হবার মত সুযোগ এল, তখনি তারা তাদের হতভাগ্য প্রতিবেশীদের ভুলে যেতে লাগল। সমাজ আর নেই, এখন ব্যক্তিশিল্পীর নিজস্ব সংবেদনের প্রকাশ। অবশ্য এর ব্যতিক্রম জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মুর্তজা বশীর ও হামিদুর রহমান (বেশ কিছু ক্ষেত্রে)। এ'রা মানুষবিহীন শিল্পের পক্ষপাতী নন। দেশ-সমাজ ও মানুষ তাঁদেরকে বিশেষ ভাবে চিন্তিত ও পীড়িত করে। অবশ্য ১৯৬৯-এ আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে চিত্রক্ষেত্রের বিমূর্তধারার আবার মোড় ফেরে। আবার মানুষ, দেশ ও সমাজ চিত্রে জায়গা করে নিতে থাকে। অবশ্য পুরোপুরি বাস্তববাদী শৈলীতে নয়।

বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে দুই পুরুষের ভিতরে মনোভাব ও দর্শনগত ভাবে একটা বিবাদ বিদ্যমান। এই পার্থক্যের ফলে দুই পুরুষে বিষয় ও আঙ্গিকেও প্রভেদ ঘটে। হয়ত সেটা স্বাভাবিক। তবু বয়স্ক শিল্পীদের আঙ্গিক ও দর্শনের প্রভাব পরবর্তী বংশধরদের উপর কম নয়। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের পর থেকে তা আরো কাছাকাছি আসে। বাংলার আবহমান সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ও মমত্বের প্রকাশ দেখি ১৯৬৯-এর 'নবান্ন' চিত্রপ্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে দেশের প্রায় সকল শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এখানে বাংলাদেশের নিসর্গচিত্র, তার কর্মময় জীবন ও দুঃখ-দারিদ্র্য সবই প্রকাশ পায় শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গীতে। তাই একেবারে বাস্তববাদী চিত্রের সাথে শুধু আকারনির্ভর বিমূর্ত চিত্রও স্থান পায়, কিন্তু একটি আর-একটির পরিপূরক হিসেবে বিরাজ করে, কোন দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় না। শিল্পীর অনুভূতির গভীরতা ও দক্ষতা তাকে যে-কোন ফর্মে বিকশিত করতে পারে : বস্তুবাদী, বাস্তববাদী বা বিমূর্ত যে ধারায়ই শিল্পী কাজ করুক। তবে চিত্রশিল্প যাতে প্রসাধনে রূপায়িত না হয় সে সম্বন্ধে অনেক চিত্রশিল্পীই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা এ-সম্বন্ধে পুরো ওয়াকিবহাল। 'নবান্ন' প্রদর্শনীর পর আসে 'কালবোশেখী' চিত্রপ্রদর্শনী। একটি প্রদর্শনীতে বাংলার চিরন্তন মন-মানস ও সংস্কৃতিকে ধরবার চেষ্টা, অন্যটিতে এই সমাজের শ্রেণীচরিত্র ভেঙ্গে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য শিল্পীর যে বাসনা তা ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশের শিল্প চিত্রশিল্পে বিশিষ্ট দেশগুলির সমপর্যায়ে বিরাজমান। তবে আধুনিক চিত্রকলায় সে হয়ত নূতন কোন সংযোজন করতে পারেনি। কারণ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির যে সমস্যা সে সমস্যা বাংলাদেশের শিল্পেও উপস্থিত। অনুন্নত দেশগুলো যেমন ইউরোপ মার্কিন সংস্কৃতিকে বহু পরিমাণে নকল করে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। ইউরোপ-আমেরিকায় অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিজম আজ প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন ধারা। আরো কিছু ধারা নিয়ে সেখানে পরীক্ষা চলেছে, যেমন, সাইকিডেলিক আর্ট, পপ ও অপ-আর্ট, এ-সব ধারার প্রভাব কিছুটা পড়লেও মূল অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিজম ধারা আজও প্রধান স্রোত হিসেবে বহমান, আমাদের শিল্পীরা সে ধারা পুরোপুরি আয়ত্তে এনেছেন।

তবু বাংলাদেশ চিত্রশিল্পের কি কিছু বিশিষ্টতা নেই? সবটাই কি বিদেশী প্রভাবান্বিত? এর উত্তর আপাতত না দিয়ে আমরা বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রকরদের ব্যক্তিগত কীর্তির মূল্যায়ন করতে চাই, পরে এই প্রশ্নের উত্তর।

বাংলাদেশের শিল্পীমহলে বয়স্ক ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জয়নুল আবেদিন। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর খ্যাতির বিকাশ। বাংলাদেশে তিনি সফল কর্ণধারের মত আর্ট স্কুল ও পরে কলেজকে পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পুরুষের প্রায় সমস্ত শিল্পীই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদান এবং প্রত্যক্ষভাবে আবেদিন সাহেবের ছাত্র।

পাক-ভারত উপমহাদেশে স্কেচে আবেদিন সাহেবের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর দুর্ভিক্ষের স্কেচ যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তারা অবাক হয়ে যায় এই শিল্পীর অসামান্য পরিমিতি-বোধ ও স্বল্প উপকরণের সাহায্যে সংবেদনকে প্রকাশ করতে দেখে। বৃটিশ শিল্প-সমালোচক গ্রিফিথ বলেন, আবেদিন গোইয়ার মত ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষের এই স্কেচ আঁকেন।

আবেদিন হয়ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে ক্ষিপ্ততার প্রকাশ নেই; বরং দুস্থ মানুষের জন্যে এক সীমাহীন দরদ তাঁকে এই প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত করায়। পুষ্টিহীন মানুষগুলোর কঙ্কালসার দেহ লম্বাটে করে আঁকা। তাতে অসহায় শীর্ণত্ব আরো সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কমদামী কাগজে তুলির সামান্য কয়েকটা কালো আঁচড়। কোথাও মৃত মায়ের বুকে শিশুর স্তন্যপানের দৃশ্য, কোথাও ডাস্টবিন থেকে খুঁটে খাওয়া, দু-একটা কাক এই মৃতপ্রায় বাংলার জীবনের প্রতীক যেন।

আবেদিন ড্রইং-এ সুদক্ষ হলেও এই সব স্কেচে কোথাও প্রকৃতিবাদী ধারাকে স্থান দেওয়া হয়নি। অতিরঞ্জিত প্রকাশ শিল্পের নিজস্ব প্রয়োজনেই জায়গা করে নেয়।

জলরঙ-এও আবেদিনের সমান দক্ষতা। তাঁর স্কেচ ও জলরঙ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিল্পতত্ত্ববিদ এরিক নিউটন বলেন, আবেদিনের দৃষ্টি প্রাচ্যের, কিন্তু তাঁর অঙ্কনরীতি প্রতীচ্যের—এই দুয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ দেখি তাঁর প্রায় প্রতিটি কাজে। স্কেচে সম্মুখভূমিকে প্রায় পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে আবেদিন তাঁর কাজ করেন। জলরঙে তাঁর কাজে প্রাচ্যের সজীবতা সুস্পষ্টভাবে জায়গা নেয়।

জলরঙে তুলির বিস্তারের মাঝে এমন একটা দক্ষতা আছে যা ভূমির শ্বেত অংশকে সংবেদনের কাজে লাগায় এবং একই সাথে আলোছায়ার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলে।

স্কেচ-জলরঙের তুলনায় তৈলচিত্রের সংখ্যা আবেদিনের যথেষ্ট কম। কলেজের কাজ দেখা-শোনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর শিল্পপ্রতিভাকে যথেষ্ট ব্যাহত করেছেন। তাঁর তৈলচিত্রে জ্যামিতিকতা ও ভাস্কর্যের ভার এক সময় বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত 'গুনটানা' চিত্রে রেখার সাবলীল ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। প্রাচ্যরীতির মৌল উপাদান 'ছন্দ'কে আবেদিন সব সময় ব্যবহার করে গেছেন। কালো রঙে পরিলেখ একই সাথে কাঠামো দান করেছে এবং দান করেছে ছন্দ। আবেদিনের কাজে দেশ, মানুষ ও মানুষের কর্মময় জীবনের জয়গান সব সময় উচ্চকিত। গুনটানা, মই দেওয়া, গরুরগাড়ির বসে যাওয়া চাকা-ঠেলারত গাড়োয়ানের বলিষ্ঠ পেশিবহুল দেহ তাঁকে নাড়া দেয়। গৃহাভিমুখতার পরিচয় তাঁর প্রতিটি কাজে। বাংলার প্রান্তিক সীমান্তে অবস্থানকারী সাঁওতাল জীবন ভিত্তি করে তিনি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র আঁকেন। মানুষ ও মানুষকে ভালোবাসার জন্যে তিনি তাঁর শিল্পে কখনো ডিহিউম্যানাইজেশানকে জায়গা দেননি।

বর্তমানেও শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। পারশিক শিল্পরীতি অনুসরণ করে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে স্পেসকে একতলে বিন্যস্ত করায় মনোযোগ দিয়েছেন।

সফিউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশে যাবার আগেই সর্বভারতীয় শিল্পরসিক মহলে নিজের আগমন-বার্তা ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শিল্পী তাঁর গ্রাফিক শিল্পের জন্যে সবিশেষ পরিচিত, যদিও তৈলচিত্রেও তাঁর অবদান সমপরিমাণ। প্রথম দিকের তৈলচিত্রে তিনি ইম্পেস্টোরীতি গ্রহণ করেন। দুমকা অঞ্চলের সাঁওতাল জীবন নিয়ে বেশ কিছু তৈল-চিত্রে অমৃতা শেরগিলের কাজে যে সাবলীলতা ও বেদনার প্রকাশভঙ্গী ছিল, সফিউদ্দিনের কাজে তেমনি সাবলীলতা বিরাজমান, যদিও শেরগিলের মত তিনি পরিলেখ ব্যবহার করেন

নি। মূড হিসেবে তাঁর কাজে একটা নির্জনতা বা উদাসীনতা জায়গা করে নিয়েছিল। এরি সমান্তরাল কাজ তাঁর উডকাট। গাছপালার মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে সাঁওতাল রমণীর মাথাকে চলা, কোথাও মোষের পাল নিয়ে রাখাল বালক—এই সব কাজে আলো-ছায়ার ব্যবহার বিশেষ দক্ষতার সাথে করা হয়েছে। সেই সাথে গাছপালার অভিরঞ্জনপদ্ধতি একটা নতুন রূপের আভাস দেয় যেন।

পরবর্তী পর্যায়ে সফিউদ্দিন পুরু রঙের ব্যবহার করে চিত্র অংকন করতে থাকেন। কনট্যুরের তীক্ষ্ণতা প্রায় তিরোহিত। তখনো তাঁর কাজে জন-জীবন, বিষয় হিসেবে। সম্ভবত ১৯৫৮-র দিকে তিনি লন্ডন যান গ্রাফিক আর্টে উচ্চ-শিক্ষার জন্যে। তিন বছর পর ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে এসে এচিং-এ জ্যামিতিকতার দিকে ঝোঁকেন। 'বন্যা' ও 'মৎস্য' এই দুটি সিরিজের উপর তিনি বেশ কিছু কাজ করেন। তাঁর 'ক্ষুব্ধ মৎস্য' অন্যতম উল্লেখযোগ্য চিত্র। ফর্মের সরলীকরণ এবং কার্ভলাইনের কাটাকাটি বিশেষ সঞ্চারণ ও গতির সৃষ্টি করেছে। নানা রঙে কাজ করার চেয়ে কালোয় কাজ করার দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশী। এচিং-এর সাথে তিনি অ্যাকুয়া-টিন্ট ও লিথোকেও সমান মর্যাদা দেন। তাঁর অ্যাকুয়াটিন্টের কাজের বিশিষ্টতা হোলো ভূমিতে দানার (গ্রেইন) ব্যবহার।

প্রকৃতি ও তার সমতা এই দুই বিষয় তাঁর চিত্রকর্মকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে। বর্তমান কার্যরত তৈলচিত্রেও তাঁর এই বিষয়ের উপস্থিতি বর্তমান। বস্তুক চিত্র থেকে ক্রমশ তিনি নির্বস্তুক চিত্রে যাত্রা করেছেন। রঙের ক্ষেত্রে প্রাথমিক রঙের প্রতি তাঁর বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্ব। ভারি রঙের ব্যবহার ও টেক্সচারের বুনট তাঁর ক্যানভাসকে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

গ্রাফিক বিভাগের অন্যতম প্রবীণ শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রচলিত রীতিতে উডকাটের কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।

আনোয়ারুল হক চারু মহাবিদ্যালয়ের অংকন ও চিত্রণ বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রথম জীবনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন, বিশেষ করে জলরং-এ। ধর্মভীরু ব্যক্তি, ফকির-দরবেশে অগাধ বিশ্বাস। তাই প্রথম থেকেই তাঁর চিত্রে একটা মিস্টিক আবহাওয়া বিরাজমান। কোথাও, সুররিয়েলিস্টিক ট্রিটমেন্ট। নিছক ফর্মকে কেন্দ্র করেও তিনি চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং তাঁর চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূঢ়তা। তাছাড়া তিনি বিশেষ করে ব্যাকরণনির্ভর। অবশ্য কিছু কিছু চিত্রে আবার রঙের সূক্ষ্ম সংবেদনতাও লক্ষ্যণীয়। সবচেয়ে বড় কথা হোলো তাঁর চিত্রের কোন ধারাবাহিক ক্রমোন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় না। একটি চিত্রের সাথে আর একটি চিত্রের মিল থাকে না। শুধু বেশীর ভাগ মিল যেটুকু তা হোলো এর রূঢ় গুণ।

খাজা শফিক আহম্মদ দেশবিভাগের পর কলকাতা থেকে পাশ করে বাংলাদেশে চারু মহাবিদ্যালয়ে যোগ দেন। বর্তমানে ব্যবহারিক শিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ। সমাজজীবনের বিভিন্ন উৎসব ভিত্তিক জলরঙ-চিত্র তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

কামরুল হাসান কলকাতাতেই সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অন্বেষা বাংলার লোকশিল্প থেকে রস আহরণ। যামিনী রায় যে ধারার মূল প্রবর্তক, সেই ধারাকে কামরুল হাসান নিজস্ব মনন ও শৈলীর দ্বারা আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বর্তমানে বাংলা-দেশের শিল্পীমহলে কামরুল হাসান নিজেই একটি ধারা।

বাংলার লোকশিল্পের নিজস্ব একটা ঢং আছে এবং তা ভারতের অন্য যে কোন অংশের তুলনায় পৃথক ও বলিষ্ঠ। স্বদেশী আন্দোলন ও গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন বাংলার

লোকশিল্পকে জানার যে আগ্রহ সৃষ্টি করে সম্ভবত সেখান থেকেই শিল্পী এর প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজেও ব্রতচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকায় এ-ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। লোকশিল্পের কাঠের পুতুলের ফর্মকে ভেঙ্গে কামরুল নিজস্ব শৈলী তৈরী করেছেন। পিকাসো এবং পিকাসোরও আগে শিল্পী মোডিগ্লিয়ানি আফ্রিকান আদিবাসীদের ভাস্কর্য, বিশেষ করে কাঠের ভাস্কর্যের সরলীকৃত রূপ দেখে আকৃষ্ট হন। তেমনি কামরুল হাসান তাঁর চিত্রে মানবমূর্তি চিত্রণে বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান কাঠের পুতুলকে মডেল হিসেবে দাঁড় করান। কিন্তু হুবহু নকল নয়। নিজের শিল্পতাত্ত্বিক প্রয়োজনে মোচড় দিয়ে নেন। তাঁর এই ধারার সাথে সিনথেটিক কিউবিজমের কিছুটা অন্বয় আছে।

লোকশিল্পের অন্যতম উপাদান পট ও লক্ষ্মীর সরা অঙ্কনের যে রীতি, সেখানে রেখার বলিষ্ঠতা ও রেখা যেখানে কথা বলে, অঙ্কন ও প্রথমদিকের চিত্রে কামরুল সেই পরিলেখকে গ্রহণ করেন। এই সব লোকচিত্রে ভল্যুমের অনুপস্থিতি এবং দ্বিমাত্রিকতা কামরুল হাসানের চিত্রেরও লক্ষণ।

বাংলার লোকশিল্পের বা লোকশিল্প মাত্রেরই সাধারণ লক্ষণ প্রাথমিক রঙের প্রাধান্য। কামরুল হাসানের রঙের পরিকল্পনা এই ধারাতেই অনুসারিত। নীল-লাল-হলুদের সাথে বাংলার লোকশিল্পে সবুজেরও প্রাধান্য। হয়ত এ দেশের সবুজের সমারোহ লোকশিল্পীকে প্রভাবিত করেছে, কামরুলও তাই সবুজকেও গ্রহণ করেন। তাঁর কাজে কাঁচা হলুদের ব্যবহার এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার বহু শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু।

তৈলচিত্রের সাথে স্কেচ, অঙ্কন ও জলরঙেও শিল্পী সমান আগ্রহী। বিশেষ করে জলরঙে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। বাংলাদেশের কৃষ্ণচূড়া, কাশবন, নৌকো তাঁর চিত্রে বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়। এক সময় গোয়াশে তিনি প্রচুর কাজ করেন এবং তৎকালীন কাজে যে বলিষ্ঠতা ছিল আজকের অনেক কাজ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বিশেষ করে 'স্নানরতা' চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বলতে গেলে শুধু কালোয় আঁকা একমাত্র টোনাল পার্থক্যে এই চিত্রের আবহাওয়া তৈরী করা হয়েছে। চিত্রে বাঁকের পৌনঃপুনিকতা ন্যূনে জগতের সৃষ্টি করে।

লোকজীবন ও বিশেষ করে গৃহী ও ঘরোয়া জীবন তাঁর চিত্রের অন্যতম প্রধান বিষয়। বৃহত্তর জীবন বহির্ভূত নির্বস্তুক চিত্র তাঁর তেমন দেখা যায় না। লোকশিল্প যাঁর অনুপ্রেরণা তাঁর কাছে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক চিত্রে বস্তুর বাহ্য চরিত্রের প্রতিফলনের চেয়ে তার অভ্যন্তরের প্রতিচিত্রের ঝোঁক বেশী, কামরুল এই রীতিকে শ্রদ্ধা করেন এবং বিমূর্ত চিত্র অংকন করলেও প্রদর্শনী করেন নি।

সৈয়দ সফিকুল হোসেন, বাংলাদেশ চারু কলেজের অধ্যক্ষ, এক সময় প্রচুর ছবি এঁকেছেন, বর্তমানে সে স্রোতে ভাটা পড়েছে। তাঁর কাজের নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। বিশেষ করে বাঁকের ব্যবহার। তাঁর চিত্রে এই বাঁকের পৌনঃপুনিকতা একটা জ্যামিতিক চারিত্র দিয়েছে। এই বিশেষ চারিত্রটি প্রায় প্রতিটি কাজে পরিলক্ষিত। রঙের ব্যবহারে সবুজ, নীল ও লালের প্রাধান্য। পটভূমিতে কালচে সবুজকে বিশেষভাবে জায়গা দিয়েছেন। বৃত্তাকার ও অর্ধবৃত্তাকার রেখা ও বাঁকের সৃষ্টির ফলে তাঁর কাজে একটা বেগ অনুভূত হয়।

মোহম্মদ কিবরিয়া দ্বিতীয় পুরুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। নির্জনতাপ্রিয় এই শিল্পী মানবসংবেদনের সূক্ষ্মবোধকে রঙে রঙে ফুটিয়ে তুলতে চান। প্রথম দিকের কাজে মানুষের হতাশা ও বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন অতিরঞ্জিত আকারে। এই অতিরঞ্জন এক সময় মানুষের

অঙ্কনকে পুরো পরিত্যাগ করে জ্যামিতিক আকারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাঁর 'ত্রিমূর্তি' এই বক্তব্যের অন্যতম সাক্ষ্য। রঙের টোনাল পার্থক্য, আঁচড় ও টেক্সচারের সাহায্যে কিবরিয়া চিত্রে সঞ্চারণ সৃষ্টিতে সুদক্ষ। তাঁর কাজে রঙের বাহুল্য সব সময় কম। মনোক্রোমেটিক প্রভাব তাঁর চিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ। মার্ক রথকো ও মাক্স বিল সুলভ একই রঙে রঙের সঞ্চারণ-সৃষ্টিমূলক কাজে কিবরিয়া অদ্বিতীয়।

গ্রাফিক আর্টের অধ্যাপক কিবরিয়া, জাপান থেকে তিন বছর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। লিথোগ্রাফ তাঁর প্রিয় মাধ্যম। লিথোতেও শিল্পী চাপা রঙের ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। সোলাজ-এর কাজের ধারার সাথে তাঁর কিছু কাজের মিল দেখা যায়। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার দিকেই কিবরিয়ার শিল্পকর্ম ব্যাপৃত।

হামিদুর রহমান চরিত্রগতভাবে বিদ্রোহী। সব কিছুর বিরুদ্ধে, সমাজ ও শিল্প কোন কিছুই তাঁর এই বিদ্রোহ থেকে মুক্ত নয়। এই বিদ্রোহ সমাজের অচলায়তন ভেঙে নতুন বিন্যাসের জন্যে। এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ দেখি তাঁর প্রথম প্রদর্শনীতে। বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় চিত্রের ক্ষেত্রে যে সাবলীল সার্বজনীন ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্যতাত্ত্বিক আবহাওয়া ছিল হামিদুর রহমান তাকে ভেঙে খান খান করার চেষ্টা করেন। ক্যানভাসে বালি আর কাঠের গুঁড়ো ছিটিয়ে শিল্পের পবিত্র প্রাসাদে গোচনা ছিটিয়ে দেন। দীর্ঘদিন ইউরোপ-আমেরিকায় প্রবাসের ফলে যেসব শিক্ষা পেয়েছেন তার আরোপ করতে থাকেন। তৈরী করেন নতুন পথ। নির্বস্তুক চিত্র ঢাকার জগতে এই প্রথম। এই প্রথম প্রদর্শনীর পর থেকে হামিদুর অবশ্য নিজেকে সংযত করে নেন, আঙ্গিকগত ভাবে নয়, ক্যানভাসে রঙের বদলে অন্যান্য উপাদান সংযোজনের ক্ষেত্রে।

হামিদুর মানুষের বাহ্যিক অবয়বের দিকে নজর দেবার চেয়ে মানসজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ক্যানভাসে ধরতে চান। এরপর হামিদুর বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে কাজ শুরু করেন। মাঝে রঙের সংবেদনের সাহায্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিজমে কাজ করার পর বর্তমানে আধা-বিমূর্ত ভঙ্গীতে ক্যানভাসে আবার মানুষকে টেনে এনেছেন। রঙের পূর্ব-উজ্জ্বলতার বদলে এখন ধূসরের প্রাধান্য।

হামিদুরের অন্যতম বিখ্যাত চিত্র 'বিশ্রামরত নৌকো', দ্বিতীয়ার চাঁদের আকারে নীল পটভূমিতে অনুভূমিক কালো নৌকোর অধ্যাস এবং উল্লম্ব লগি বাংলাদেশের প্রতীকের নির্যাস যেন। শিল্পী বেশ কিছু ম্যুরালের কাজও করেছেন।

আমিনুল ইসলাম তাঁর চিত্রে সব সময় একটা কাঠামোকে ধরতে চান। ইটালীতে থাকা-কালীন কাজে কাঠামো, আকারের সরলীকরণ ও আলোছায়ার সৃষ্টি প্রধান চরিত্র নিয়ে ফুটে ওঠে। কালোর প্রতি এই সময় আমিনুলের ছিল প্রবল আগ্রহ এবং জগত সব সমাগের পক্ষ-পাতিত্ব। প্রথম দিকের সমাজবাস্তব নিয়ে কাজ করতে করতে আমিনুল ক্রমশ ফর্ম ও বাস্তিক সংবেদনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরে গোয়াল সিরিজের কাজে পূর্বরূপ পাল্টে যায়। কাঠামো বা গঠনের চাইতে ফোর্ম-এর অভিব্যক্তি প্রবল। এখানে আমিনুলের রঙের ব্যবহারে কার্পণ্য নেই। প্রাথমিক রঙের সাথে গোলাপী, সবুজ ও কমলার জায়গা। ভূমির সাদা সঞ্চারণ সৃষ্টি করে। কান্ডিনস্কির ফোর্মের সাথে এই সিরিজের সাযুজ্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া, ঋতুপরিক্রমা ও বিশেষ করে বর্ষার মেদুর পরিবেশ তাঁর চিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। ইদানীং তাঁর এ-ধরনের কাজে শক্ত কাঠামোর চেয়ে কনট্যুরের ভাসমানতা বিষয়কে আরো সংবেদনশীল করে তোলে। সাইকিডেলিক আর্ট নিয়ে আমিনুল ইদানীং পরীক্ষা-

নিরীক্ষায় রত।

আবদুর রাজ্জাক একটি বিশেষ দর্শনকে কেন্দ্র করে তাঁর চিত্রজগৎকে ধরতে চান। গ্যাবো ও পেভসনার সৃষ্ট কন্সট্রাক্টিভিজম তাঁকে প্রচুরভাবে প্রভাবিত করে। স্থানের মধ্যে বস্তুর বেড়ে ওঠা, একই সাথে বস্তুর সব দিক দেখা না যাওয়া, এই দুই দর্শনগত প্রতিপাদ্য কেন্দ্রিক তাঁর শিল্পযাত্রা। তাঁর বাস্তববাদী চিত্রেও এর প্রভাব সুপরিলক্ষিত। স্পেস ও বস্তু এ-দুয়ের অবস্থান ও সম্পর্ককে তিনি ধরতে চান, ফলে নূতন একটা শৈলীর জন্ম দেখা যেছে। এমন কি রাজ্জাক ড্রইং-এর ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করেন। তাই পরিলেখ কখনো একটি মোটা রেখায় না এঁকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু রেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। বিশেষ করে তাঁর এচিং-এ এটা সুস্পষ্ট। এর সাহায্যে তিনি স্পেস ও বস্তুর সম্পৃক্ততাকে বোঝাতে চান: বস্তু আছে স্পেসের মধ্যে, আবার স্পেসও রয়েছে বস্তুর মধ্যে। এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বস্তু থেকে তিনি নির্বস্তুকতায় যাত্রা করেন।

তাঁর বিমূর্ত চিত্রে তাই উজ্জ্বল রঙের প্রাধান্য ও রঙের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। ফলে স্পর্শ ও সম্প্রসারণের প্রাবল্য। ইদানীংকার কাজে অবশ্য রঙের এই বৈপরীত্য যথেষ্ট সংযত।

মুর্তজা বশীর সামাজিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবেও আস্থাবান। লোকজীবনের বিভিন্ন ছবি ও প্রতীককে কাজে লাগিয়ে তিনি মানুষের বন্দী অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলেন। খাঁচা, পাখি ও বালক এই সিরিজের কাজে সেই প্রতীকবাদকে কাজে লাগান হয়েছে। তাঁর টিকটিকি সিরিজের কাজে তেমনি মানুষের জীবনের জীবাশ্মে পরিণত হবার প্রতীক। কিছু কিছু দৃশ্যে বশীর জীবনের আনন্দময়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশেষ করে সোনালী রঙ ব্যবহার করে এই ভাবকে আরো উজ্জ্বল করেছেন, তার সাথে লাল রঙ জীবনের বাঁচার আনন্দ ও প্রেমকে করেছে গাঢ়। এই পর্বে আমরা তাঁর কাজে মোটা পরিলেখের অবস্থান দেখতে পাই। তাছাড়া স্পেসকে এখানে দ্বিমাত্রিকতায় সাজান হয়েছে, অনেকটা পারশিক রীতির মত। তাঁর বহু বিতর্কিত সিরিজের নাম 'দেয়াল'। আপাতদৃষ্টিতে পুরো বিমূর্ত চিত্র হলেও আইয়ুবি আমলের একনায়কত্বের ফলে সমাজজীবনে যে প্রগতিপরিপন্থী পরিবেশ তৈরী হয়েছিল, যেন তারই প্রকাশ। যেদিকেই তাকাও দেয়াল আর দেয়াল।

ড্রইং-এ মুর্তজা বশীর সুদক্ষ। এট্রুস্কান অঙ্কনের রীতিতে তার কাজ বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন। ইদানীং শিল্পী পারশিক, মোগল, রাজপুত ও অন্যান্য পাহাড়ীরীতির ব্যাকরণ ও রঙের ঐশ্বর্যকে ব্যবহার করে দ্বিমাত্রিক চিত্র নির্মাণে ব্যস্ত। এমন কি মিশরিয় রীতিকেও নিজের শিল্পতাত্ত্বিক অন্বেষায় টেনে এনেছেন।

রশীদ চৌধুরী প্রথম দিকে মার্ক সাগাল-এর রীতিতে কাজ করতেন। ক্রমশ নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বধারা উঁকি দিলেও সুররিয়েলিস্টিক ভাবনার জায়গায় বাংলার জীবন এখন পুরো স্থান করে নিয়েছে। কাংড়া ও বাশোলীরীতিকে ভেঙে গোয়াশে যথেষ্ট কাজ করেছেন। তাঁর চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রবল শক্তি। বিষয় হিসেবে বাংলা ও শাশ্বত বাংলা। এমন কি চিত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর অবয়বকে আনতেও রশীদ চৌধুরী কুণ্ঠিত নন, বিশেষ করে শক্তির দেবতা কালী। রশীদকে অবহেলিত বাঙালীর উজ্জীবনের কারণে কালীমূর্তি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। প্রাচ্য শিল্পরীতির প্রতিও তার ঝোঁক। ট্যাপেস্ট্রি শিল্পে শিল্পীর অবদান যথেষ্ট।

কাইয়ুম চৌধুরী বাংলার লোকশিল্পের বিভিন্ন মোটিফ ও নক্সাকে কেন্দ্র করে তাঁর ক্যানভাসকে সজ্জিত করেন। শুধু অনুসরণ নয়, কখনো কখনো তিনি নূতন মোটিফের

স্পষ্টও। লিরিক্যালগুণ তাঁর চিত্রের অন্যতম গুণ। এছাড়া সঙ্গীতের প্রভাব তাঁর চিত্রে যথেষ্ট। সঙ্গীতের গুণকে কাইয়ুম দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থাপিত করতে চান। তালপাতার পাখা, কুলো, শীতলপাটির বুনট ইত্যাদি বাংলার লোকশিল্পীদের হস্তশিল্পের জ্যামিতিকতাকে ক্যানভাস সজ্জার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। দৃষ্টিকে স্নিগ্ধতা দেয় এমন রঙ - বিশেষ করে গোলাপী, নীল, সবুজের ব্যবহার তাঁর চিত্রের বড় গুণ।

কাজী আবদুর রউফ তাঁর শিল্পীজীবনের স্বল্প সময়ে যথেষ্ট ক্ষমতা দেখিয়েছেন। লোকজীবনের বিভিন্ন কর্মকে ফর্মের সরলীকৃত প্রকাশে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পীর অকাল-মৃত্যু তাঁকে সাফল্যের চরম শিখরে আর পৌঁছতে দিল না।

দেবদাস চক্রবর্তী লোকজীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি নিয়ে তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেন। এই কাজ করতে গিয়ে মনুষ্যমূর্তিকে একটা প্রতিরোধের আকর হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের চারিত্র দিয়েছে। ভূমিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত করে শিল্পী সব সময় একটা বুনটের ভাব গড়ে তোলেন। শহরজীবনে স্থাপত্যের প্রভাব, তাঁর ক্যানভাস তাই বাড়ির সারের উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখার সরল গতিকে ধরে রাখে। উষ্ণ রঙের দিকে শিল্পীর পক্ষপাতিত্ব। এরি মাঝে কালোকে স্পেস বিভাজনের কাজে ব্যবহার করেন। বর্তমানে সং-বেদন প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্বস্তুক রীতিতে কাজ করছেন।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রথম জীবনে প্রচুর জলরঙে কাজ করেন। ভূদৃশ্যের প্রেক্ষিতকে ইম্প্রেশানিস্ট ধারা ছাড়াও কোথাও কোথাও ফর্মকে সরল করে নূতন চারিত্র দেবার চেষ্টা করেছেন। জলরঙ নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালান এবং ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট সাফল্য আসে। তৈলচিত্রে জাহাঙ্গীর মুহূর্তকে ধরার চেষ্টা করেন। তাই নুড়ি ও বরফি আকৃতির গুণকে কেন্দ্র করে ক্যানভাসের সজ্জায় নিয়োজিত হন। সময় যেন এই নুড়ি বা বরফি আকৃতির মতই আমাদের জীবনকে ক্ষণে ক্ষণে নব নব সাজে সাজিয়ে চলেছে। সুখ-দুঃখ, বেদনা সবই মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের আক্রান্ত করে চলেছে। সুখ-দুঃখের এই বিশিষ্ট মুহূর্তগুলোই তাঁর চিত্রে জায়গা করে নিতে চায়।

আবদুল বাসেতের চিত্রের তিনটি গুণ : জ্যামিতিকতা, প্রথম দিকের কাজে প্লাস্টিসিটি ও শীতল আবহ। বাসেতও লোকশিল্পের কাঠের পুতুলকে তাঁর মূর্তিনির্ভর চিত্রে প্রথম দিকে ব্যবহার করেন। রেখার প্রাধান্য না থাকলেও ভাঙা ভাঙা রেখার উপস্থিতি ছিল। ত্রি-মাত্রিক পুতুলের প্রভাবে কিছুটা জ্যামিতিক গুণ গ্রহণ করতে হয়েছে বিন্যাসে। পরে অবশ্য ভাস্কর্য চরিত্র কাটিয়ে দ্বিমাত্রিকতায় স্থান দিয়েছেন বস্তুকে। রঙের ব্যবহারে বাসেত কখনো বিরোধিতাকে জায়গা দেননি। স্নিগ্ধতা তাঁর চিত্রের অন্যতম গুণ। পুরো বিমূর্ত চিত্রের মাঝে অর্ধবিমূর্ত চিত্রও বাসেত অঙ্কন করেন।

নিতুন কুণ্ডু প্রথম থেকেই ফর্মের দিকে ঝোঁকেন। প্রথমে মোটা আউটলাইনে বা কোথাও সিলহয়েটের আকারে মনুষ্যমূর্তিকে ক্যানভাসে আনেন। পরে বিমূর্ত চিত্রে ভূমিকে বিভক্ত করে সংবেদনের দিকে ঝোঁকেন। রঙের সমতা রক্ষার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সেরিগ্রাফে শিল্পী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখানেও ফর্মের জাল বোনা। ভূমির সাদা, সঞ্চারণের কাজে ব্যবহৃত। সিল্কস্ক্রিনেও শিল্পী কাজ করে চলেছেন।

আবু তাহের তাঁর কাজে সুধীমহলে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কাজে বাটিক ফেশান রিলিফ ঢঙ যথেষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব সময় বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বাদে যাঁদের কাজে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা গেছে তাঁরা

হলেন: মহম্মদ মহসীন, মোস্তফা মনোয়ার, গোলাম সরোয়ার, আমিরুল ইসলাম, মুনশী মহিউদ্দিন, আহসানুল আমিন, সমরজিৎ রায়চৌধুরী, এমদাদ হোসেন, আনোয়ারুল হক, নিযামী প্রমুখ শিল্পীগণ।

জলরঙ চিত্র আজকের দিনে অনেকটা মৃত মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে এর যথেষ্ট চর্চা ও চল। বাংলাদেশের সজীব প্রকৃতি, এর প্রবল ও দীর্ঘ বর্ষার সজল রূপ, জলরঙের স্বচ্ছ চরিত্রে যেভাবে ধরা যায় তৈলচিত্রের ভারি ও অস্বচ্ছ চরিত্রে তেমন জমে না। তাই এই চিত্র-মাধ্যমকে কেন্দ্র করে অনেকে সুনাম অর্জন করেছেন এবং দক্ষতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রাণেশ মণ্ডল, হাশেম খান ও রফিকুন নবী বিশিষ্ট। প্রাণেশ মণ্ডল তাঁর কাজে বাংলার সজীব সরস দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিছুটা ইম্প্রেশনিস্ট চরিত্র, কিছুটা ইলাসট্রেটিভ চরিত্র তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য।

হাশেম খান সবুজকে তাঁর চিত্রে বিশেষভাবে জায়গা দেন। নদী, বন-জঙ্গল, বাবলার সার তাঁর চিত্রের প্রধান বিষয়। বাংলাদেশের নৌকো ও তার বিভিন্ন আকারকে ভিত্তি করে প্রচুর চিত্র করেছেন শিল্পী এবং দর্শককে দিয়েছেন আনন্দ। তাছাড়া চাকমা মগ ইত্যাদি আদিবাসীদের জীবন ভিত্তিক চিত্রে যথেষ্ট সুনাম লাভ করেন।

রফিকুন নবী রঙে তেমন প্রবল নন। গীতিকবিতার মত ম্রিয়মাণ বিষণ্ণতা তাঁর চিত্রের অন্যতম চরিত্র। স্বচ্ছতার চেয়ে ওপেক করার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এঁদের পরে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন: মনিরুল ইসলাম, হামিদুজ্জামান, মাহমুদুল হক প্রমুখ শিল্পী।

বাংলাদেশ তার চিত্রকলায় বিশ্বের সর্বশেষ অঙ্গিককে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশ্বকে দেবার মত তার নিজস্ব কিছু আছে কিনা তা জানতে হলে দেখতে হবে বাংলার নিজস্ব যে ঐতিহ্য ছিল তাকে কেউ আজকের বিংশ শতাব্দীতে টেনে আনতে পেরেছে কিনা, সেটাই হবে বাংলাদেশের নিজস্ব অবদান। মেক্সিকোয় অরসকো, রিভিয়েরা, সিকুয়াইরস ও তামায়ো মেক্সিকোর প্রাচীন শিল্পকে যেভাবে বিংশ শতাব্দীর অঙ্গনে টেনে এনেছেন তা অনবদ্য। আমাদের ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে মোগলদের শেষ আমলে যেমন কাংড়া, বাশোলী ও অন্যান্য পাহাড়ী ঘরানার সৃষ্টি হয় তা ঠিক মোগল চিত্রের কপি ছিল না, ছিল তৎকালীন যুগের আধুনিক শিল্প। এরপর ইংরেজ আমলে একদিকে বিদেশী ধারার আমদানি, বিশেষ করে চিত্রশিক্ষাক্রমে, একটা দূরত্বের সৃষ্টি করে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায় এই দূরত্ব ঘোচানর কাজে লাগেন এবং ভারতীয় চিত্রধারা পুনর্জীবন লাভ করে। আর এখানেই বিশ্বকে দেবার মত সৃষ্টি হোলো ভারতের নিজস্ব সম্পদ। বাংলাদেশে তেমনি জয়নুল আবেদিনের বৃটিশ ও ভারতীয় ধারার মিশ্রণ, কামরুল হাসানের বাংলার লোকশিল্পীদের কাজের নবায়ন কাইয়ুম চোধুরী এই রূপকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং হয়েছেন নিবিড়। রশীদ চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর, ভারতীয় চিত্রকলা কেন্দ্র করে নূতন পথে যাত্রা শুরু করেছেন। এ-সব অবদান পৃথিবীকে দেবার মত বাংলাদেশের নিজস্ব উপাদান।

অপরাধিনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেশ ছিলাম আমরা দু'টি ভাইবোন। সেজদি আর আমি। সেজদি আমার আপন বোন নয়, মাসতুতো বোন। কিন্তু সংসারে আপনপর তো শুধু বংশতালিকা মেনে চলে না। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছি। মনেই পড়ে না তাঁর মুখ। বাবাও বেশিদিন বাঁচেন নি। মাসীমা-মেসোমশাইর সংসারে বড় হয়েছি। যদিও জ্যাঠা-কাকারা আছেন কিন্তু তাঁরা ঠিক যেন প্রসন্ন মনে আমার দায়িত্ব নিতে চাননি। আমিও দু-চার দিন থেকে তাঁদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। তারপর মেসোমশাইও গত হলেন। মাসতুতো ভাইরা এখানে-ওখানে চাকরিবাকরি নিয়ে ছিটকে পড়ল। মাসীমা কখনো বড় ছেলের কাছে থাকেন কখনো মেজো-ছোটর কাছে। সেজদির বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দিও কলেজে পড়তে পড়তে ভালোবেসে নিজের এক সহপাঠীকে বিয়ে করে ফেলল।

দাদাদের সংসারে আমি যেন বেমানান। কিছুতেই খাপ খাইয়ে চলতে পারিনে। শেষ পর্যন্ত সেজদিই আমাকে ডেকে নিল। আয় তুই আমার কাছে। স্কুলের কাছাকাছি একটি বাসা পেয়েছি। একা তো থাকা যায় না। তুই চলে আয় আমার এখানে।

মাসীমাও বললেন, তাই যা। কী দরকার হোটেল মেসে খেয়ে। অনর্থক পয়সাও বেশি লাগবে। শরীরও নষ্ট হবে। তার চেয়ে পর্ণার কাছেই থাক গিয়ে। শিবুও তো আছে ওখানে।

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে সেজদির বাসা। শহর তাকে বলা যায় না। খাতির করে শহরতলী বলতে হয়। শিবু আমার সমবয়সী। মাসতুতো ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সেও সেজদির আশ্রয়ে আছে। কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই। চাকরিবাকরি পেলে এক্ষুনি পড়া ছেড়ে দেয়। আমি সেজদির বাসায় আসবার পর সে বেশিদিন রইলও না। ইছাপুর গানশেল ফ্যাক্টরিতে তার চাকরি জুটে গেল। অফিসের কাছাকাছি একটা মেসে গিয়ে উঠল শিবু। রইলাম সেজদি আর আমি। সেজদি স্কুলে যাওয়ার আগে রান্নাবান্না সেরে যায়। আমি তার কাজের জোগান দিই। বাজার করি, রেশন ধরি। ছাত্রছাত্রী যখন থাকে পড়াই। যখন থাকে না অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি করে পায়ের জুতো ক্ষয় করি।

ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে বলি,—সেজদি, আমার বোধহয় জীবনেও কাজকর্ম হবে না।

সেজদি আমাকে আশ্বাস দেয়,—জীবন কি এখনই ফুরিয়ে গেল নাকি রে? যখন হবার ঠিক হবে।

সেজদির দিকে তাকালে আমার বড় কষ্ট হয়। রোগা শরীর নিয়েও সেজদি দারুণ পরিশ্রম করে। স্কুলে খুব খেটে পড়ায়। ছাত্রীদের টাস্কের খাতা একদিনও ফেলে রাখে না। হীন স্বাস্থ্য নিয়েও সংসারের সব কাজ করে। তাছাড়া পরীক্ষার মরশুম এলে সেজদি অনেক টুইশান পায়। খুব দূরের পাল্লা না হলে সে একটিও হাতছাড়া করে না। টাকার দরকার সংসারে সবারই।

আমি বলি,—সেজদি, খেটে খেটে শরীরটাকে তুমি যে শেষ করে ফেললে। এত যদি পরিশ্রম করো তোমার অসুখ সারবে কী করে।

সেজদি বলে,—দূর পাগল। বসে থাকলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে! যত রাজ্যের

চিন্তাভাবনা এসে মাথা খারাপ করে দেয়। আমি কাজ নিয়ে থাকলেই সবচেয়ে ভালো থাকি রাজু।

সেজদির কাজের অভাব হয় না। যখন কোন কাজ না থাকে তখনো তার সেলাই আছে বোনা আছে। আমাদের বাড়ি আর বাউন্ডারি ওয়ালের মাঝখানে যে সরু প্যাসেজটুকু আছে সেখানে সারি সারি ফুলের টব বসিয়েছে সেজদি। সেই গাছগুলির পরিচর্যা আছে। বিদেশী মরশুমি ফলের চেয়ে দেশী ফুলের দিকেই সেজদির ঝোঁক। সেজদি বেশি ভালোবাসে সাদা ফুল। যুঁই বেল গন্ধরাজ টগর। সেই ফুলের শোভা দেখে পাশের ঘরের রমা বউদি বলেন, —হাতের গুণ আছে পর্ণার। কী ফুলই না ফুটিয়েছে। এমনি করে করেই ওর বিয়ের ফুল ফুটবে।

সেজদি হেসে বলে,—বিয়ের ফুল কি আর টবে ফোটানো যায় বউদি? সে ফুল কোন দিনই ফুটবে না।

সেজদির কথাকটির মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্য ফুটে ওঠে। হাসিতে তা কিছুতেই চাপা পড়ে না। আমি জানি সেজদির ভিতরে ভিতরে বিয়ে করার খুব ইচ্ছা। মেসোমশাই থাকতেই সে চেষ্টা হয়েছিল। দাদারাও মাঝে মাঝে চেষ্টাচরিত্র করে দেখেছেন। কিন্তু কারো চেষ্টাই সফল হয়নি। পাত্রপক্ষ এসে দেখে যায়। ঠেসে প্লেট-ভরতি জলখাবার খায়। তারপর তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অবশ্য ভদ্রতা করে দুঃখ জানিয়ে কি মিথ্যা কোন অজুহাত দিয়ে এক-আধখানা পোস্টকার্ড ছাড়ে। দেখেশুনে সেজদি মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছে নিজেকে সরিয়ে এনেছে মূল পরিবার থেকে। শহরতলীর এই ছোট্ট বাসাটুকু যেন তার অজ্ঞাতবাস। কৃতবিদ্য উপার্জনক্ষম যুবকদের ওপর মাঝে মাঝে আমার ভারি রাগ হয়। তারা কি দুচোখ মেলে শুধু রূপই দেখে? গুণ যোগ্যতা দেখতে পায় না? যদি পেত আমার সেজদির মধ্যে তারা কেউ না কেউ নারীরত্নকে আবিষ্কার করত।

সেজদি আমাকে একদিন বলল,—এই রাজু, তোর তো বোধহয় এখন হাত খালি। মানে টিউশানি ঠিউশানি কিছু নেই। করবি একটা টিউশানি?

আমি লুব্ধ হয়ে বললাম,—তোমার হাত বুঝি উপচে পড়ছে? দাও না একটি টিউশানি আমাকে।

সেজদি বলল,—দিতে পারি। কিন্তু বড় দুষ্টু আর দুরন্ত মেয়ে। তুই সামলাতে পারবি কিনা তাই ভাবছি।

আমি বললাম,—দিয়েই দেখ না। আমি নরম হতেও জানি গরম হতেও জানি। এমন কড়া ধমক লাগাব, তোমার ছাত্রী ভয়ে কাঠ হয়ে থাকবে।

সেজদি বলল,—ওদের অবস্থা তেমন ভালো নয়, বেশি কিছু দিতে পারবে না। তবে ওরা পাড়ার মধ্যেই থাকে। তোর ট্রামবাসের খরচা লাগবে না।

হেসে বললাম,—ঠিক আছে। আমার যদি পাঁচ টাকা বেশি রোজগার হয় তোমার কাছে পাঁচ টাকা বাড়বে না হলে পাঁচ টাকা ঘাটতি পড়বে।

যেখান থেকে যা পাই হাতখরচা রেখে সব আমি সেজদির হাতে দিয়ে দিই। জানি সব মাসে হয়তো তাতেও নিজের থাকাখাওয়ার খরচ কুলিয়ে ওঠে না। সেজদি আমাকে খুবই ভালোবাসে তবু আমি তার রোজগারে ভাগ বসাচ্ছি—একথা ভাবতে খারাপ লাগে। সেজদি সে কথা বুঝতে পেরে কখনো বকে কখনো বলে,—তোর দারুণ সেল্‌ফ-রেসপেক্ট হয়েছে, তাই না রাজু?

তারপর সেজদি একদিন তার ছাত্রীকে এনে আমার সামনে হাজির করে দিল। ছুকপরা বোল সতের বছরের একটি মেয়ে। পিঠের ওপর বিনুনি দুলছে। চোখ দুটি দেখলেই মনে হয় চঞ্চল অস্থির। লম্বাটে গড়ন, ফর্সা রং। সুন্দরী বলা যায় না কিন্তু কেমন একটা আলগা আলগা লাবণ্যে যেন ওর সমস্ত দেহ মাখা হয়ে রয়েছে। দেখেই আমি ওকে চিনে ফেললাম। শুধু পাড়ার মধ্যেই নয়, আমাদের বাড়ির খুব কাছেই ওদের বাড়ি। দুটো জোড়া নিমগাছের পিছনে যে নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটা উঠেছে তারই দোতলায় ওরা থাকে। ওদের বাড়ির সামনেই বাস-স্টপ। সেখান থেকে আমরা বাসে উঠি। ওকেও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি স্টপে। সঙ্গে অবশ্য আরো দু-একটি মেয়ে থাকে। তাছাড়া পাড়ার স্টেশনারি দোকানে, রেশনের দোকানে, ডঃ চৌধুরীর ডিসপেনসারিতে কোথায় ওর গতিবিধি না আছে?

আমার ভাব দেখে সেজদি মুখটিপে হাসছিল। আমার দিকে চেয়ে বলল,—কী ব্যাপার? আমাদের বুলাকে খুব চেনা চেনা লাগছে নাকি রে?

আমি বললাম,—তোমার এই স্বনামধন্যাকে পাড়ায় না চেনে কে?

সেজদি এবার বুলাকে বলল,—এর কথাই বলছিলাম। এখন থেকে রাজুই তোকে পড়াবে। মাস্টারমশাইকে খুব ভক্তি করবি, শ্রদ্ধা করবি, যা বলে মন দিয়ে শুনবি, নইলে কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি কিছুই হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বুলা নিচু হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিল। সেইসঙ্গে অবশ্য সেজদিকেও একটা প্রণাম করল। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা শক্ত ও কি সত্যিই শ্রদ্ধা করছে না ঠাট্টা করছে। কিন্তু যাই করুক না কেন, আমি ওর ওপর রাগ করতে পারলাম না।

সেজদি বলল,—থাক থাক, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। রাজু, আগাম গুরুদক্ষিণা তো পেয়ে গেলি। আর কি, এবার বিদ্যাদান শুরু করে দে।

বুলা শান্ত গম্ভীর ভাবে বলল,—সেজদি, আমি ওঁকে কী বলে ডাকব? তোমাকে তো তুমি বলি আর সেজদি বলি।

সেজদি হেসে বলল,—সে ভাই তুমি তোমার নতুন মাস্টারমশাইর সঙ্গে ঠিক করে নিয়ো। ডাকাডাকির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

কিন্তু কাউকে কিছু বলে দিতে হলো না। সম্বোধনের সমস্যাটা বুলা নিজেই মিটিয়ে নিল। ও প্রথম দু-একদিন কিছু বলল না। তারপর মীমাংসার ভঙ্গিতে বলল,—আপনাকে তাহলে রাঙ্গাদা বলেই ডাকব। স্যার কি মাস্টারমশাই বলতে আমার হাসি পেয়ে যায়। চেষ্টা করে দেখেছি কিছুতেই পারি না।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম,—তোমার যা ভালো লাগে তাই বলে ডাকবে। সেটা তো আসল কথা নয়। পড়াশোনার ব্যাপারে তোমার আরো সিরিয়াস হওয়া দরকার। ক্লাস টেনে পড়ছ, এখন থেকে যদি খুব খেটে পড়াশোনা না কর রেজাল্ট কিছুতেই ভালো হবে না।

বুলা প্রতিবাদ করল না। শান্ত নম্রভাবে বলল,—নিশ্চয়ই। পড়তে তো হবেই। সেজদিও সেই কথা বলে।

কিন্তু আমার এই নতুন ছাত্রীটির পড়াশোনায় মনোযোগ খুব কম। বরং পড়াশোনা ছাড়া আর সব কিছুতেই ওর উৎসাহ আছে। ও আবৃত্তি করতে পারে, গাইতে পারে, ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে দল বাঁধতে পারে। তাদের নিয়ে ফাংশন করে। স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলে সেখানে ওর ডাক পড়ে। পাড়ার ফাংশনগুলিতেও ওর সক্রিয় ভূমিকা। ও পড়বে কখন?

প্রথম প্রথম আমি ওকে ওদের বাড়িতে গিয়েই পড়াতাম। কিন্তু ওর বাবা খুব অসুস্থ

হয়ে পড়লেন বলে তাঁর জন্যেই আলাদা একখানা ঘরের দরকার হল। ভদ্রলোক হার্টডিজিজের রোগী। ব্লাডপ্রেসার আছে। আরো কী সব উপসর্গ রয়েছে। গোলমাল সহ্য করতে পারেন না। তাই বুলা আমাদের বাড়িতেই পড়তে আসে। আমাদেরও ঘরের প্রাচুর্য নেই। নামে মাত্র দুখানা ঘর। আসলে দেড়খানা। আমি ছোট ঘরে যতদূর পারি বড় মন লয়ে থাকবার চেষ্টা করি। কর্মহীন বেকারজীবনে নানারকম সুখস্বপ্ন দেখি। সরু অন্ধকার পথটুকু পার হলে অনতিদূরে একটি উজ্জ্বল ল্যাম্পপোস্ট আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে কল্পনা করে নিই।

সন্ধ্যাবেলায় বুলার আসার কথা। কিন্তু ও আসে বিকালের দিকে। বইপত্র হাতে নিয়ে এলেও ঠিক যেন পড়তে আসে না। সেজদির হাতের কাজ কেড়ে নেয়। ঘরদোর গুছিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় সেজদিরও আলাদা টিউশনি আছে। সেখানে ওকে বেরোতে হয়। তার উদ্যোগ আয়োজনে সাহায্য করে। যখন কোন কাজ থাকে না তখন আমাদের পোষা বিড়ালটাকে নিয়ে ও খেলা করে।

আমার নিজের কাজকর্ম পড়াশোনা পড়ে থাকে। আমি মাঝে মাঝে ওর খেলা দেখি। কখনো কখনো ওর খেলার সঙ্গীও হই। সেজদি আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় ওর যেন বয়সের সীমাসংখ্যা নেই। ভারি গুরুগম্ভীর স্বভাব সেজদির। হয়তো এই অসুস্থতার জন্যে, হয়তো কঠিন পরিশ্রমের জন্যে, না কি ওর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে কে জানে? সেজদি বড় বিষণ্ণ বিমর্ষ, বড় গম্ভীর। আর বুলা ওর স্বভাবের ঠিক বিপরীত। ও যখন আমাদের বাড়িতে আসে ঠিক যেন একটি চঞ্চল ঝরনা আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সেজদিও মাঝে মাঝে বুলার উচ্ছলতা প্রাণচাঞ্চল্য চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন কোন দিন বলে,--বেশ আছে মেয়েটি। সারাজীবন অমন খেলা নিয়ে ভুলে থাকতে পারলে বেশ হয়।

তারপর একটু হেসে বলে,--তুই ওকে খুব ভালোবাসিস, তাই না?

লজ্জা পাওয়া আমার উচিত নয়। তবু কেন যেন আমি লজ্জিত বোধ করি। যেন আমার একটা গোপন অপরাধ সেজদি ধরে ফেলেছে।

কিন্তু মুখে আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বলি,--কী যে বল। ওই একফোঁটা মেয়ে—

সেজদি বলে,—আহাহা, তুইই বা কোন্ পাকা চুলদাড়িওয়ালা দাদামশাই এসেছিস? তুইও তো একফোঁটা ছেলে। একুশ উৎরে সবে বাইশে পড়েছিস। ওরও যেমন ফুটফুটে রং, তেমনি টুকটুকে চেহারা। বেশ মানায় দুটিতে।

আমি প্রতিবাদ করি,—কী যে বল সেজদি। তুমি যদি ওইসব কথা বল, আমি তোমার ছাত্রীকে আর পড়াব না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।

সেজদি বলে,—এখন বুঝি আমার ছাত্রী? ছাত্রী তো তোর। কিন্তু তাই বলে ভাই এখনই কিন্তু ওসব হচ্ছে না। এখন যদি ওসব হয় সে হবে বাল্যবিবাহ। তোর চাকরিবাকরি হোক, বুলাও পাশটাশ করুক, অন্তত গ্রাজুয়েট তো ওকে হতেই হবে নইলে কেউ শিক্ষিতা বলবে না।

সেজদির কাছে প্রশ্রয় পেতে পেতে আমারও এবার মুখ খুলে যায়। আমি বলি, শিক্ষিতা হোক আর না হোক, আমার চাকরিবাকরি জুটুক আর না জুটুক আমি কিন্তু এখনই একটি বালিকাকে বিয়ে করে ফেলব। তারপর তোমার ঘাড়ে বসে দুজনে মিলে খাব। তখন বুঝবে মজা। টের পাবে ঠাট্টাতামাশার বিষময় পরিণাম।

কথায় কথায় আমি একদিন বুলাকেও বললাম,—সেজদি কী সব বলে শুনেছ?

বুলা বলল,—শুনেছি। কিন্তু সেজদি বললেই হল? আমার বুঝি কোন পছন্দ অপছন্দ নেই?

—সেজদির পছন্দ বুঝি তোমার পছন্দ নয়?

বুলা আমাকে একটা ভেংচি কেটে বলল,—মোটেই না। আমার বর হবে একজন পীর পয়গম্বর। আর না হয় একজন বীর যোদ্ধা। ক্ষুদে এক প্রাইভেট টিউটরকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।

তারপর হেসে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার গায়ে গা মিশিয়ে বলল,—আমারও একটা প্ল্যান আছে জানো?

দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই বুলা আমাকে তুমি বলতে শুরু করেছে। আমি মৃদু আপত্তি করেছিলাম কিন্তু তা টেকেনি। আপনি বলতে নাকি ওর হাসি পায়। ওর যুক্তি, আমি আর কত বড় ওর চেয়ে? বড়জোর ইঞ্চি তিন-চারেকের। দু-তিন বছরের মধ্যেই ও মাথায় আমার সমান সমান হবে।

আমি বলি,—আর বিদ্যায়?

খুব যে বিদ্যার বড়াই হচ্ছে। আজকাল গ্রাজুয়েট অলিতে গলিতে ডজনে ডজনে মেলে। বুঝতাম যদি ডক্টরেট হতে, কি বিলিতী ডিগ্রীটিগ্রী নিয়ে আসতে পারতে।

আমি বলি,—সবই আনব। দুটো দিন সবুর করো।

সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে যায় বুলার,—জানি ইচ্ছা করলে তুমি সবই পার। সবই পারবে। জানো আমারও একটা প্ল্যান আছে। আমার মেজদাকে দেখেছ?

বললাম,—দেখেছি। খুব গুরুগম্ভীর। মেজাজটা বোধহয় একটু কড়া।

বুলা বলল,—ওসব ওপর ওপর। ভিতরটা খুব নরম। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। বাড়িতে থাকতেই পারে না। ঘোরাঘুরির চাকরি। এখন সার্কেলটা হয়েছে উড়িষ্যায়। কত জায়গায় যে যায় তার ঠিক নেই। ময়ূরভঞ্জ। নামটা কী সুন্দর তাই না? শুনেই যেতে ইচ্ছে করে। আমি এত করে বলি মেজদা, আমাকে সঙ্গে নাও। কিছুতেই নেয় না, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে ঘুরব। দেশ-বিদেশ বেড়াব।

আমি বললাম,—তাহলে আমি পীরও হব না, বীরও হব না। হব একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ।

বুলা বলল,—আহাহা, ঘোরাঘুরির জন্যে আর বুঝি কোন চাকরি নেই? যাক গে। ওসব বাজে কথা রাখো। একটা কাজের কথা বলি। আমার মেজদার সঙ্গে তোমার সেজদিকে খুব মানায়, তাই না?

আমি বললাম,—মানায় তো, জাতে তোমরাও কায়স্থ, আমরাও কায়স্থ।

বুলা বলল,—আমরা কিন্তু কুলীন। আমরা বসুমল্লিক। আর তোমরা শুধু মল্লিক। একজন দে আর একজন সরকার।

আমি আমার ছাত্রীর ভুল শুধরে দিয়ে বলি,—কথাটা কিন্তু মল্লিক নয়, মৌলিক। মূল থেকে এসেছে।

বুলা বলল,—জানি গো জানি। কথায় তো মল্লিকই বলে। মায়ের কিন্তু কুলীন-মৌলিকে বাছাবাছি নেই, জাতবিচারও নেই। মেজদাকে প্রায়ই বলেন, তুই বামুন হোক কায়েত হোক মেথর হোক মুদ্দফরাশ হোক যে কোন জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে চাস কর। আমি বউ বরণ করে নেব।

—মেজদা কী বলেন?

—মেজদা বলেন ভেবে দেখি। কত মেয়েকে দেখানো হল। বেশ সুন্দর সুন্দর সব মেয়ে। কিন্তু মেজদা রূপের ভক্ত নয়।

আমি আশান্বিত হয়ে বলি,—তবে কিসের ভক্ত?

বুলা বলে,—গুণের। মেজদা বলে রূপ দিয়ে কি ধুয়ে খাব? রূপ তো দুদিনের, গুণ চিরদিনের। জানো সেজদির গুণের কিন্তু খুব প্রশংসা করে মেজদা। বলে মেয়েটি খুব রিজার্ভ। স্কুলেও খুব সুনাম। খেটে পড়ায়। আমার খুব ভালো লাগে।

আমি উল্লসিত হয়ে উঠি,—বলেন নাকি? তাহলে দাও না সেজদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে।

বুলা বলে,—আলাপ করতে হবে কেন? আলাপ ওদের আছে।

—আছে আলাপ?

—থাকবে না? একই বাসস্টপ, একই পোস্ট অফিস, একই স্টেশনারি দোকান। তাছাড়া আমার বিষয় নিয়েও তো আমার মেজদাকে তোমার সেজদির সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তোমার ছাত্রী হবার আগে আমার সঙ্গে বুঝি তোমার আলাপ ছিল না?

আমি অবাক হয়ে বললাম,—কই না তো।

বুলা বলল,—এখন বলছ না তো। লুকিয়ে লুকিয়ে তো প্রায় রোজ দেখতে। সাধুরাই সবচেয়ে চোর হয় বেশি।

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম।

মাসের পর মাস কাটতে লাগল। কীভাবে যে কাটে আমি টেরই পাইনে। আমার অবস্থার যে কোন পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। আগের মতই ছাত্র পড়াই, ছাত্রী পড়াই। কখনো মাইনে আদায় হয়, কখনো হয় না। মিশন রোডে এক পার্বলিসিটি অফিসে একটি শিক্ষানবিশের কাজ জুটেছে। সেখানেও মাইনেটাইনে কিছু নেই। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আমার কাজ কর্তাদের পছন্দ হলে তবে চাকরি, তবে বেতন। তার আগে যা পাই তাতে ট্রামবাসের খরচ আর টিফিন খরচটা হয়। কিন্তু নিজেকে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন এক রাজাধিরাজ সম্রাট। সম্রাজ্ঞীর জন্যে আমি মাঝে মাঝে ভাবি একখানা শাড়ি কিনব। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। কে জানে কে কী মনে করবে। সেজদিও হয়তো অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করবে না। শাড়ি দিতে না পারলেও আমি আকাশনীল রঙের ব্লাউস পীস ওকে কিনে দিয়েছি। রুমাল আর ভ্যানিটি ব্যাগ। জন্মদিনে গীতবিতান তিনখণ্ড একসঙ্গে বাঁধাই। সে মাসে আমার হাতখরচে টান পড়ে। চা টোস্টের বেশি টিফিন জোটে না।

বুলাও আমাকে কম দেয় না। আমার গেঞ্জি আর রুমাল কেচে দেয়, আমার পড়ার টেবিল গুছিয়ে দেয়। টুকিটাকি যেখানে আমার যা একটু লেখাটেখা বেরোয় নিয়ে নিয়ে ওর বন্ধুদের শোনায়। তারপর সযত্নে সেগুলি ফাইল করে রাখে।

সেজদিকে সুবীরদার যে বেশ পছন্দ, সে কথাও সেজদিকে বুলা জানিয়ে দিয়েছে। সুবীরদার নাম লেখা বইটই সেজদির টেবিলে এখন দেখতে পাই। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিভের কাছ থেকে কিছু কিছু ওষুধ আর ফুডটুডও আসে। বুলাই সব এনে দেয়। সুবীরদা নাকি বলেন,—দিস তোর সেজদিকে। নিয়মিত ইউজ করে যেন। রোগ সেরে যাবে।

আমি মাঝে মাঝে বলি,—আচ্ছা সুবীরদা নিজের হাতে কেন ওসব দেন না? আমি যেমন তোমাকে দিই।

—আহা, তুমিও তো লুকিয়ে লুকিয়ে দাও। তোমার যা সাহস তা আমার জানা আছে।

মেজদা তোমার চেয়েও লাজুক আর ভীরু। নামেই সুবীর। নিজের চাকরিতে চড় চড় করে উন্নতি করতে পারে। তার বাইরে আর কোন ক্ষমতা নেই।

বিনিময়ে সেজদিও নীরবে উপহার দেয়। সুবীরদা যখন দু-চার দিনের জন্যে বাড়িতে আসে সেজদি ডিমের কারি, মাংসের স্টু রান্না করে ও বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। একবার কাগুনের পায়েস পাঠিয়েছিল। আর একবার মোহনভোগ আর পাটিসাপটা পিঠে। সুবীরদা খেয়ে খুব তারিফ করেছেন। দু-একবার চা খেতেও আমরা সুবীরদাকে ডাকি। তিনি এলে সেজদি খুব খুশি হয়। খুব যত্ন করে চা করে, জলখাবার করে। সুবীরদা বেশি কথাটথা বলেন না। বুলার পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেজদির স্বাস্থ্যের কথা শুনতে চান, তারপর,—'যাই কাজ আছে' বলে হঠাৎ উঠে পড়েন।

আমি ভাবি মানুষটি যে লাজুক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন মুখচোরা লোক কী করে ওঁদের কোম্পানির ওষুধের মাহাত্ম্য জাহির করে বেড়ান ভেবে অবাক হতে হয়। তবে আমার বন্ধুদের মধ্যেও এধরনের মানুষ আছে। কাউকে কাউকে এমনও দেখেছি যারা মেয়েদের সামনে খুব শাই। আবার এমনও দেখেছি যারা মেয়েদের সঙ্গেই শুধু কথা বলতে পারে, পুরুষদের কাছে বোবা, না হয় তোৎলা। তেমন ধরনের ছেলেকে আমিও পছন্দ করি না, সেজদিও পছন্দ করে না।

শুনেছি দু-একখানা চিঠিও মাঝে মাঝে সেজদির নামে আসে। বেশির ভাগই হাতচিঠি। সুবীরদা বুলাকে যেসব চিঠিপত্র লেখেন তার মধ্যেই সেজদির চিঠি ভরে দেন। সে চিঠি আমি দেখিনি। তবে শুনেছি সে চিঠি খুব ছোট আর ভদ্রতা সৌজন্যে ভরা। তবু চিঠিই তো। মেয়ের কাছে লেখা পুরুষের চিঠি। সেজদিও জবাব দেয়। বুলা তার দাদার চিঠির জবাব আদায় করে নেয়। শুনে আমার ভালোই লাগে। তাহলে সেজদিরও একজন বন্ধু হয়েছে। যে আগে চিঠিপত্র লেখায় সেজদির ভারি আলস্য ছিল। এখন মাসীমা আর আমার মাসতুতো ভাইদের কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখে। আর অনিয়মিত ভাবে রাখে ডায়েরি। রাত জেগে মাঝে মাঝে কী যে লেখে সেজদি সেই জানে। আমি না জেনেও অনুমান করতে পারি। সেই অনুমান আমাকে আনন্দ দেয়।

সুবীরদার ওষুধের গুণ আছে। সেজদির স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো হতে শুরু করেছে। মুখচোখের রঙ বদলাচ্ছে। সেজদি কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গানও করে। ধরা পড়ে গেলে কমবয়সী মেয়ের মত লজ্জিত হয়। আগে স্কুলের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ সেজদির ভালো লাগত না। এখন তার ভালো লাগার পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। সুবীরদা বাড়িতে এলে সেজদির টবের ফুলগুলি গুচ্ছে বেঁধে ওঠে। তারপর বসুমল্লিকদের বাড়িতে চলে যায়। যায় অবশ্য বুলার হাত দিয়েই। সে সব কাজেই মধ্যবর্তিনী। কোন কোন ব্যাপারে অবশ্য সেজদির চেয়ে অনেক পুরোবর্তিনী।

ও ক্লাস টেন থেকে ইলেভেনে উঠল। ইলেভেন থেকে টেস্ট দিল। তারপর সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিল। রেজাল্ট মোটামুটি ভালো। আমার আশা ফার্স্ট ডিভিশনে যদি নাও যায়, সেকেন্ড ডিভিশনে যাবেই। সেজদি হেসে বলল,—তুই যা খেটেছিস তাতে তো ওর স্কলারশিপ পাওয়া উচিত।

আমি ভাবলাম এবার সেজদিকেও পুরস্কৃত করা আমাদের কর্তব্য। এসব ব্যাপার বেশিদিন ঝুলিয়ে রাখতে নেই। আমি মাসীমার কাছে চিঠি লিখে তাঁর মত আনালাম। এবার ফর্মালি একটা প্রস্তাব আনতে হয়। মাসীমা লিখলেন, 'তোদের নিজেদের ব্যাপার, তোরা

নিজেরাই কথাটা উত্থাপন কর। তারপর আমরা তো আছিই।'

আমি সেজদিকে বললাম,—তুমি সুবীরদাকে তাহলে বল সেজদি।

সেজদি বলল,—দূর, তা কি পারা যায়? আমি কিছুতেই তা পারব না।

– তা হলে আমি বলি।

সেজদির তাতে আপত্তি নেই।

তারপর আমি সময়-সুযোগ বুঝে সুবীরদার কাছে কথাটা পাড়লাম। রাস্তার ওপারে যে বকুলতলার মাঠ আছে সেই মাঠে বেড়াতে বেড়াতে সুকৌশলে সূক্ষ্মভাবে আমাদের আবেদনটি রাখলাম।

—এবার একটা দিনটিন ঠিক করে ফেললেই হয়। মাসীমারও তাই ইচ্ছা। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

শুনে সুবীরদা আকাশ থেকে পড়লেন। খুব রূঢ়ভাবে আমাকে বললেন,—এসব তুমি কী বলছ?

আমি আমার বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে তুললাম—আপনার সঙ্গে সেজদির এতদিনের বন্ধুত্ব। আপনি চিঠিপত্র লিখেছেন—

শুনে সুবীরদা প্রায় রেগে গেলেন, -চিঠিপত্র! আমি কখনো ওকে কোন চিঠি লিখিনি।

প্রমাণ হিসাবে দুখানা চিঠি আমি সুবীরদাকে দেখালাম। তিনি বললেন, -এ আমার হাতের লেখাই নয়। যতদূর মনে হচ্ছে বুলার লেখা। ও আমাদের ভাইদের হাতের লেখা নকল করতে পারে। ওর এসব বিদ্যা আছে। কিন্তু ও যে এমন সর্বনাশ করবে তা ভাবিনি। একটু লক্ষ্য করে যদি দেখতে বুঝতে পারতে এ হাতের লেখা মেয়েলি। ধরে ধরে লিখেছে তাই ছাঁদটা অমন বদলে গেছে।

আমি এবার পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যিই তাই। আমাদের আগেই ধরা উচিত ছিল কিন্তু বুলা আমাদের দুজনের চোখেই ধুলো দিয়েছে।

তারপর খুব একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটল। বুলা কদিন আর ঘর থেকে বেরোল না শুনলাম দারুণ মার খেয়েছে। মুখচোখ ফুলে গেছে। বেরোবার মত অবস্থা ওর আর নেই। শুনে আমার খুব কষ্ট হল। আসামীর জন্যেও কষ্ট, ফরিয়াদির জন্যেও কষ্ট। কিন্তু কাকেই বা সেকথা বলি।

তারপর কদিন বাদে সুবীরদা এলেন আমাদের বাড়িতে। হাতজোড় করে বোনের জন্যে আমাদের দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইলেন। আর বললেন, তাঁরা এখানকার বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন কোম্পানির ভুবনেশ্বর অফিসের চার্জ দেওয়া হয়েছে সুবীরদাকে। কোয়ার্টার্স পেয়েছেন। সপরিবারে সেখানেই থাকবেন।

সুবীরদা ক্ষমা চাইলেন। তা নিতান্তই মৌখিক। তাঁর মেজাজ আর মুখের ভাষা আমার কাছে খুব অকরুণ মনে হল। তিনি সেজদির সঙ্গে ভালো করে একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। যেন এসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমরাও আছি। আমরাই যেন সব ব্যাপারটার জন্যে দায়ী।

আমার ইচ্ছা ছিল বুলাকে জিজ্ঞেস করি কেন সে এমন একটা হীন ছলনার কাজ করতে গেল। কেন এই জাল জুয়োচুরি। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয় না।

ওরা প্রায় নিঃশব্দেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

আমার মনে হয় বুলার মনে খুব যে একটা খারাপ অভিসন্ধি ছিল তা নয়। ওর গল্প বানাবার অভ্যাস ছিল। শেষ পর্যন্ত হাতেকলমে একটা গল্প বানিয়ে গেছে। ওর নায়ক-

নায়িকার মিলন ঘটাতেই ওর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এমন বেয়াড়া পথ ও যে কেন বেছে নিল ওই জানে।

আমার অনেক কথাই মনে হয়। কিন্তু কোন কথাই আমি সেজদিকে বলতে পারি না। বুলোর নাম ওর সামনে উচ্চারণ করতেও আমার ভয় হয়।

আমরা এখন আগের মতই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি। যেন এসব ঘটনা কিছুই ঘটেনি। আমার আর সেজদির মধ্যে বুলোও আসেনি, সুবীরদাও আসেনি।

আমরা আগের মতই একসঙ্গে ঘরসংসারের কাজ করি, হাসি গল্প করি, তারপর বাইরে যে যার কাজে চলে যাই। রাত্রে ফিরে এসে আবার কথাবার্তা বলি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রায় আগের মতই একই রকমে চলে। শুধু ফুলের টবগুলির আর যত্ন করে না সেজদি। গাছগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। আর বিড়ালটারও কোন যত্ন হয় না। সে মিউ মিউ করে একা একা ঘুরে বেড়ায়। আমি বিড়াল পছন্দ করি না। এই জীবটি কোনদিনই আমাকে তেমন আকর্ষণ করত না। কিন্তু এখন করে। সেজদি যখন বাড়িতে থাকে না আমি আস্তে আস্তে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিই। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলাই। কী নরম তুলতুলে ওর গা।

ওর গায়ে যেন আর-একটি কোমল স্পর্শ লেগে আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া : একটি সমীক্ষা

নিরঞ্জন হালদার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে-অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, আজও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। প্রায় তিরিশ বছর আগে এই এলাকার অধিবাসীরা এক অনিশ্চিত জীবনযাত্রার সম্মুখীন হয়, আজও তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই তিরিশ বছরের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের বেশীর ভাগেরই স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি, সশস্ত্র বিদ্রোহী, ডাকাত ও সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গেই তাদের বেশী পরিচয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বিদেশী-শাসনমুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি ভৌগোলিক সত্তা। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনি, ফিলিপিন—এই দেশগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা মিলও দেখা যাবে। শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশে ছোট ছোট ব্যবসা তো মেয়েরাই করে। ব্রহ্মদেশে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সম্পত্তির যুগ্ম মালিক হয়, অনেক সময় পরিবারের কর্ত্রী হয়। মালয় অর্থাৎ পশ্চিম মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় বাড়ির বাইরে মেয়েদের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম। ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকেই প্রধানত এক ইস্কুলে পড়াশুনা করে। ওই এলাকায় বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল, ইসলামও যথেষ্ট সহনশীল। লাওস ছাড়া গোটা এলাকার কোথাও ভারতের মত চরম দারিদ্র্য দেখা যাবে না, ওইসব দেশের অধিবাসীদের কোন না কোন রকম আশ্রয় বা বাসস্থান আছে, একেবারে কেউ না খেয়ে থাকে না, মালয়েশিয়া এবং বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোথাও ভিখিরি বড় একটা দেখা যাবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশেই ভারতীয় ও চীনা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের দেখা যাবে। এই এলাকার কম্বোডিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার মিলন ঘটেছিল, বর্তমানে ওই দুই সভ্যতার মিলন সিঙ্গাপুরে ঘটছে বলে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ দাবি করে থাকেন। ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার একটু বেশী প্রভাব দেখা যাবে, বালি দ্বীপে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রভাবহীনতা ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার প্রভাবের বিরুদ্ধে গোঁড়া মুসলমানদের জেহাদ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। উত্তর ও মধ্য ফিলিপিনের খৃস্টান-অধ্যুষিত এলাকায় স্পেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী দেখা যাবে। এজন্য অনেকে ম্যানিলাকে লাতিন আমেরিকার কোন শহর হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকেন। সিঙ্গাপুর বহু-বর্ণের রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই শহর ও মালয়েশিয়ার পেনাং-কে চীনদেশের কোনও শহর হিসাবে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মদেশ, মালয়, সারাওয়াক, বোর্নিও, ব্রুনি, সিঙ্গাপুর ইংরেজের অধীন ছিল। ইন্দোচীনের লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া ছিল ফরাসীদের অধীন। ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচদের এবং ফিলিপিন আমেরিকার অধীন। ওই এলাকায় একমাত্র স্বাধীন দেশ ছিল শ্যামদেশ। পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে এই এলাকার দেশগুলি এখনও পর্যন্ত কোন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে নি। যুদ্ধের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভ হয়তো প্রতিটি

দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ভিন্ন মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতালাভের পর থেকে ব্রহ্মদেশ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করছে। মালয় প্রথম স্বাধীনতালাভ করে ১৯৫৭ সালে, পরে মালয়, সারওয়াক, বোর্নিও এবং সিঙ্গাপুরকে নিয়ে ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে গেলেও দুটি রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ইংরেজের ওপর এখনও নির্ভরশীল। অভ্যন্তরিক ব্যাপারে কম্যুনিস্ট-বিরোধী হলেও পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপারে এই দুটি রাষ্ট্র মোটামুটি গোষ্ঠীনিরপেক্ষ থাকতে সচেষ্ট। ১৯৪৫ সাল থেকে ক্রমাগত ইংরেজ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শঠতার সঙ্গে লড়াই করার পর ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৭ সালে প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে "গাইডেড ডেমোক্র্যাসি" ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর আমলের শেষ দিকে কয়েক বছর চীন-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করলেও ইন্দোনেশিয়া মোটামুটি গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছে। চল্লিশ দশকের শেষ দিকে এবং পঞ্চম দশকের প্রথমার্ধে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া সারা পৃথিবীর সামনে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি তুলে ধরেছিল। ১৯৫৪ সালে জেনিভা-চুক্তির মাধ্যমে ইন্দোচীনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যুদ্ধের আগে লাওস প্রোটেক্টরেট হিসাবে ফরাসীদের দ্বারা শাসিত হত। ফরাসীরা ১৮৯০ সালে শ্যামদেশ সরকারকে লাওস থেকে বিতাড়িত করে। পরে ১৮৯৩ ও ১৯০৭ সালের শ্যামদেশ-ফরাসী চুক্তি অনুসারে লাওস ফরাসী প্রোটেক্টরেটে পরিণত হয়। কম্বোডিয়া ফরাসী কর্তৃত্বাধীনে আসে ১৮৭০ সালে, ১৮৮৪ সালে ভিয়েতনামের সঙ্গে কম্বোডিয়াতেও ফরাসীদের প্রত্যক্ষ শাসনের ব্যবস্থা পাকা হয়। ১৯৫৪ সালের জেনিভা-চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনামের উত্তরাংশ কম্যুনিস্টদের এবং ১৭ অক্ষাংশের দক্ষিণাংশ কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের হাতে চলে যায়। পরবর্তীকালে গণভোটের মাধ্যমে দুই ভিয়েতনামের একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দিয়েম প্রেসিডেন্ট হয়েই জেনিভা-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে মার্কিন শিবিরে ভিড়ে যান। কম্বোডিয়া ও লাওসের শাসন ভার যাঁদের হাতে যায়, তাঁরা মোটামুটি বিবদমান কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী শিবিরের বাইরে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম শিহানুক পার্লামেন্ট কর্তৃক পদচ্যুত হওয়া পর্যন্ত কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্রনীতি কখনও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ, কখনও চীন-ঘেঁষা হলেও সব সময়েই শ্যামদেশ ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিরোধী ছিল। লাওসের স্বাধীনতা অর্জনের সময় উত্তর ভিয়েতনাম-চীন সীমান্তের দুটি প্রদেশ প্যাথেট লাও-এর অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের দখলে থাকে। লাওসের মধ্য দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও সৈন্যবাহিনী পাঠাবার জন্য কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লাওসের সরকারী বাহিনীর যুদ্ধ আগের মতোই চলতে থাকে। ১৯৫৭ সালে জেনিভা-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে লাওসে তিন-দলের তিন রাজকুমারের সম্মিলিত নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের আবার যুদ্ধ বাধে এবং ১৯৬১ সালে অস্ত্রসংবরণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে লাওস সরকার মাঝে মাঝে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণে সচেষ্ট থাকলেও মার্কিন সরকারের টাকায় লাওসের সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়া নির্ভর করে বলে লাওস সরকার কম্যুনিস্টদের দখলীকৃত এলাকায় মার্কিনদের বোমাবর্ষণ করতে দিয়েছেন, কম্যুনিস্টদের হাত থেকে লাওস রক্ষার জন্য সি-আই-এ ও মার্কিন সৈন্যদেরও প্যাথেট লাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন ১৯৪৬ এবং শ্যামদেশ ১৯৫৪ সাল থেকে পুরোপুরি মার্কিন-সমর্থক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। এই এলাকার একটিমাত্র দেশ অর্থাৎ ব্রুনি এখনও ইংরেজের ছত্রছায়ায় আছে। ব্রুনি তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ। ১৯৬০ সালে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের সময় ব্রুনির সুলতানকে চার বছরের জন্য পালা করে মালয়েশিয়ার রাজা অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দিলে ব্রুনো হয়তো মালয়েশিয়ার সদস্য-রাজ্যে পরিণত হোত। ব্রুনির সুলতান মালয়েশিয়ার রাজা হতে পারবেন না, অথচ তৈল-সম্পদের আয় পশ্চিম মালয়েশিয়া ভোগ করবে, এমন ব্যবস্থায় যেতে ব্রুনির সুলতান অস্বীকার করেছিলেন। এই এলাকার দুটি অঞ্চল এখনও স্বাধীন নয়। পূর্ব নিউগিনিতে অস্ট্রেলিয়ার অছি-শাসন চলছে। পশ্চিম ইরিয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতায় ডাচদের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার হাতে এসেছে। পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার হাত থেকে কখনও মুক্ত হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি, তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র ফিলিপিনেই আছে। সংবিধানে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সর-প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে হুক (কম্যুনিস্ট) বিদ্রোহীরা ম্যানিলার অদূরে সান্তাক্রুজ শহর অতর্কিতে আক্রমণ করলে ফিলিপিনের পুলিস-বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ফিলিপিন সরকার সংবাদপত্রের ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন নি। ফিলিপিনের ঠিক বিপরীত ব্যাপার দেখা যাবে ব্রহ্মদেশ ও উত্তর ভিয়েতনামে। ওই দুটি দেশে সরকার থেকেই সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়। সংবাদপত্র কী ছাপবে, রেডিয়ো কী প্রচার করবে, তা সরকারী দপ্তরই ঠিক করে থাকে। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে সামরিকবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে ব্রহ্মদেশে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। উত্তর ভিয়েতনামে সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি যে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্তও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের কোন ঘটনা ওই দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হয় নি। ১৯৬৮ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কিছুদিনের জন্য সেন্সর-প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রচারমন্ত্রী শ্রীতন থাট থিয়েনের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে আগের মত সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ চালু হয়। প্রেসিডেন্ট দিয়েমের আমলে বিদেশী সাংবাদিকদের তারবার্তাও সেন্সর করা হোত। দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোন কাগজের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না, কাকে সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে, তা পুলিসই ঠিক করে থাকে। মালয়েশিয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশের লাইসেন্স প্রতি বৎসর নতুন করে নিতে হয়। সিঙ্গাপুরে কম্যুনিস্ট-সমর্থক সংবাদপত্রকে অসুবিধায় পড়তে হয়। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বিরোধের ফলে বর্তমানে এক দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্র অন্য দেশে প্রকাশ করা যায় না। ১৯৭০ সালে শ্যামদেশে নতুন আইনের সাহায্যে পুলিস অফিসারই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। আভ্যন্তরিক সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে শ্যামদেশের সংবাদপত্রকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তবে কোন মার্কিন লেখকের বা মার্কিন সংবাদ সংস্থার যে-কোন রিপোর্ট নির্ভয়ে ছাপা যায়। একমাত্র কম্যুনিস্ট দেশের সংবাদপত্র ছাড়া অন্য যে-কোন দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক বা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা শ্যামদেশে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারে, যা ব্রহ্মদেশ ও দুই ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যায় না। ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'গাইডেড ডেমোক্র্যাসি' চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত ওই দেশে সব ধরনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল। প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর গাইডেড ডেমোক্র্যাসিতে সুকার্ণো-বিরোধী ও কম্যুনিস্ট-বিরোধী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়, সাংবাদিক-

দের জেলে পাঠানো হয়। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট ছাড়া অন্যান্য দলের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সামরিক শাসনের বিরোধী ছাত্রগোষ্ঠী পরিচালিত 'হারিয়ানাকামী' প্রকাশের ব্যাপারেও কোন বিধিনিষেধ নেই। ব্যাঙ্ককের মত, কুয়ালা লামপুর, সিঙ্গাপুর ও জাকার্তাতেও বিদেশী সংবাদপত্র ও বই আমদানি করা যায়। কম্বোডিয়ার রাজনীতি ১৯৪১ সাল থেকেই একব্যক্তিভিত্তিক এবং সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন প্রিন্স নরোদম শিহানুক। স্বাধীনতালাভের পর কম্বোডিয়ায় ১৯৫৫ সালে 'জনগণের সমাজতন্ত্রী সমাজ' গঠন করে একটি দুর্বল কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল তুলে দেওয়া হয়। কম্বোডিয়ার সংবাদপত্রে কী ছাপা হবে, তা প্রধানত রাষ্ট্র-প্রধান প্রিন্স শিহানুকই স্থির করতেন।

স্বাধীন সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছাড়া কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এক ফিলিপিন ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর কোন দেশে অবাধ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। তবে ফিলিপিনের পরেই মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কম-বেশী দেখা যাবে। ফিলিপিন ১৯৪৬ সালে স্বাধীন হয় এবং তারপর চার বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া পুরোপুরি স্বাধীন হলেও মাত্র ১৯৫৫ সালে একবার নির্বাচন হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'গাইডেড ডেমোক্রাসি' চালু করে প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো ১৯৫৯ সালে ১৯৫০ সালের সংবিধান বাতিল করেন। ১৯৬০ সালে মাসজুমি ও সোশ্যালিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং প্রাক্তন সোশ্যালিস্ট প্রধানমন্ত্রী শারিয়ার সমেত আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের মার্চ মাসে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো ২৮১ জন সদস্যকে মনোনীত করে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করেন। প্রেসিডেন্টের কাজকর্ম নির্ধারণের ব্যাপারে এই পার্লা-মেন্টের কোন ক্ষমতা ছিল না, তাই প্রেসিডেন্ট পছন্দ করেন এমন আইনই পার্লামেন্ট পাস করত। সুকার্ণোর পতনের পর থেকে সামরিক-বাহিনী বে-সামরিক রাজনৈতিক নেতাদের দিয়েই দেশ শাসন করছে। ১৯৫৫ সালের পর ১৯৭১ সালের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয়বার নির্বাচন হয়। সোশ্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রেখে এমন একটি সংবিধানের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে সংবিধানে ১০০ জন মনোনীত সদস্যের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হাতে রাখতে পারবেন। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সামরিক শাসকেরা বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে নিয়ে "গোলকার" নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। জুন মাসের নির্বাচনে ৩৬০টি আসনের মধ্যে গোলকার ২২৭টি আসনলাভ করে। নাদাতুল উলেমা ৫৮, প্রোগ্রেসিভ মুসলিম ২৪ এবং প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর পুরাতন দল পি-এন-আই ২০টি আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট আসনগুলি কয়েকটি ছোট দল পেয়েছে। নতুন পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের মনোনীত ১০০ জন সদস্য নিয়ে গোলকারের মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৩৩৭। ১৯৬৫ সালে কম্যুনিস্টদের ব্যর্থ বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে সামরিক শাসনে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তুলনামূলকভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িক দলগুলি শক্তিশালী হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই সাম্প্রদায়িক প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায় আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জোটে যোগদান না করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়াকে যে গৌরবজনক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, ভবিষ্যতে সেই ভূমিকায় তাকে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

স্বাধীনতালাভের পর ব্রহ্মদেশে ১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ বছর পরে পরবর্তী নির্বাচনেও শাসক-দলের একাধিপত্য বজায় থাকে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে শাসক-দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে দু বছরের জন্য সামরিক বাহিনীর হাতে দেশের শাসনভার চলে যায়। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে উ নু মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে সামরিক বাহিনী পুনরায় ক্ষমতা দখল করে। সেই থেকে ব্রহ্মদেশে সামরিক শাসন চলছে। ১৯৭০ সালে শিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতি সত্ত্বেও কম্বোডিয়ায় এক-দলীয় শাসনের কোন অবসান হয় নি। শ্যামে ১৯৫৮ সালের পর ১৯৬৯ সালে নির্বাচন হয়। নির্বাচনে সামরিক শাসকদের রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে অসমর্থ হলেও বিশেষ ধরনের সংবিধানের কল্যাণে সামরিক শাসকেরা আগের মতই দেশ শাসন করছেন। পার্লামেন্টের সদস্যেরা নবলব্ধ সুযোগটুকুও হারাবার ভয়ে সামরিক শাসকদের সমর্থন করে থাকেন।

১৯৫৪ সালের পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম একটি গণভোটের মাধ্যমে ডিক্টেটরে পরিণত হন। পরে একটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। স্বাধীনতালাভের পর উত্তর ভিয়েতনাম ও লাওসে এখনও পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয় নি।

এদিক থেকে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের নেতাদের প্রশংসা করতে হয়। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে ভারতীয়, চীনা ও মালয়ীদের তিনটি রাজনৈতিক দলের কোয়ালিশন মালয়েশিয়ায় ক্ষমতালাভ করে। কিন্তু দশ বছর পরে ১৯৬৯ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে চীনা ও ভারতীয়েরা অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এবং মালয়ীদের একটি বড় অংশ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোট দেওয়ায় কোয়ালিশন-দল পশ্চিম মালয়েশিয়ার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মালয়েশিয়ায় চীন ও ভারত বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে কিছুদিনের জন্য সংবিধান বাতিল করা হয়। পূর্ব মালয়েশিয়ায় কোয়ালিশন-দল জয়লাভ করায় এক বৎসর পরে পুনরায় সংবিধান চালু হয়েছে। সিঙ্গাপুরে কার্যত একদলীয় শাসন চলছে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, এমন দলকে সিঙ্গাপুরে কাজ করার আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। কোন বিশেষ দলের হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে দলত্যাগ করলে সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার সদস্য-পদ খারিজ হয়ে যায়।

কম্যুনিস্ট দেশের প্রায় প্রতিবেশী হয়েও শ্যামদেশ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের কথা বলে কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায়ই বলা হয়, ভারতের মত এইসব দেশে কেউ না খেয়ে থাকে না। সম্ভবত জনসংখ্যার কম চাপ এবং এই এলাকার অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস তার কারণ। ব্রহ্মদেশে ধান ও মাছের প্রাচুর্য আজও দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও চীনাদের খাবারের ব্যাপারে কোন বাছবিচার নেই। গত দশ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, উন্নতি হয়েছে জনস্বাস্থ্যব্যবস্থারও। পশ্চিম মালয়েশিয়া, ব্রুনি ও সিঙ্গাপুরে জীবনযাত্রার মান এশিয়ায় কুয়ায়েতের পরেই। জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে ব্রহ্মদেশের অবস্থা শোচনীয় ভারতের থেকেও খারাপ। যুদ্ধরত উত্তর ভিয়েতনাম ও লাওসে জীবনযাত্রার মান এই এলাকায় সবচেয়ে নীচুতে। সামরিক শাসন ও সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প জাতীয়করণ করা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশের কোন অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে না। ব্রহ্ম সরকার ১৯৪৮ সালে তৈল-শিল্প জাতীয়করণ করলেও বর্তমানে জাপান, পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়াকে তৈল-শিল্পের উন্নয়নের জন্য আহ্বান করতে হয়েছে। তবে ব্রহ্মদেশ কোন সামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে না থাকায় এই দেশের

শাসকেরা ইন্দোনেশিয়া, শ্যামদেশ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক শাসকদের চেয়ে কম দুর্নীতিপূর্ণ। অকম্যুনিস্ট এশিয়ায় সবচেয়ে কম দুর্নীতিপূর্ণ দেশ হচ্ছে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের গৃহনির্মাণ প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কাজ গোটা পৃথিবীতে একটি আদর্শ হতে চলেছে।

১৮৭০ সাল থেকেই ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ চাল রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। শ্যামদেশ ধানের সঙ্গে ভুট্টা, পাট, সয়াবিন, আখ প্রভৃতি কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানিও বৃদ্ধি করেছে, নানা ধরনের শিল্প স্থাপনেও উদ্যোগী হয়েছে। মালয়েশিয়ায় আগে রবার ও টিনের উৎপাদন হোত। মালয়ের রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ ছিল রবার। উন্নত জাতের রবার-গাছের প্রবর্তন করে এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপন ও কৃষি-উন্নয়নে উদ্যোগী হয়ে মালয়েশিয়া জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মান বজায় রাখতে উদ্যোগী হয়েছে। সুকার্ণোর আমলে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য শিল্প-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর আমলে সেই ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে শ্যামদেশ, লাওস ও ফিলিপিন।

উত্তর ভিয়েতনাম ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া ভারতীয় ও চীনাদের দেখা যাবে। জমিদারি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেরানীর চাকরিতে ভারতীয়দের প্রাধান্যের জন্য ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ইংরেজ-বিরোধীর সঙ্গে ভারতীয়-বিরোধীও হয়েছিল। তাই বার বার ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতীয়েরা বিতাড়িত হয়েছে। শ্যামদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শিল্পস্থাপন, শিল্পবিস্তার, সমাজসেবামূলক কাজেও তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। শ্যামদেশের সরকার প্রতি বছর মাত্র দু-শ ভারতীয়কে ওই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। তবে মোঙ্গলীয় বলে চীনারা শ্যামদেশের সমাজের মধ্যে মিশে যেতে পারছে, ভারতীয়েরা দক্ষিণের শ্যামদেশীয় মুসলিমদের মতো একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য হতে চলেছে। মালয়েশিয়ার শতকরা ৪২ ভাগ মালয়ী, ৩৮ ভাগ চীনা এবং ১০ ভাগ ভারতীয়। টুঙ্কু আবদুর রহমান তিনটি গোষ্ঠীকে নিয়ে "মাল্টিরেসিয়াল সোসাইটি" গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করায়, কেবল মুসলমান সুলতান রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা) নির্বাচনের অধিকার থাকায় (জোহোরের সুলতানের পূর্বপুরুষ মালয়ী নন) এবং ভূমিপুত্রদের (মালয়ী) জন্য বিশেষ অধিকার থাকায়, জন্মসূত্রে মালয়েশিয়ান হলেও ভারতীয় ও চীনারা মালয়েশিয়ায় স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে অনগ্রসর মালয়ীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরেই নিজেদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে সচেষ্ট। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কয়েক হাজার চীনা মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব হারায়, বহু ভারতীয়কেও মালয়েশিয়া ছাড়তে হয়। চীনারা সংখ্যায় অনেক হলেও তাঁরা ক্যানটনিজ, হোক্কিয়েন, হাক্কা, তেওচিউ, হাইনানিজ প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সক্রিয়। ১৯৫৯ সালে মালয়ে ইংরেজী, চীনা, তামিল ও মালয়ী এই চারটি সরকারী ভাষা চালু হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে মালয়ীই একমাত্র সরকারী ভাষা। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা পূর্ব মালয়েশিয়ায় নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সারাওয়াকের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র মুসলমান, মালয়ীদের সংখ্যা আরও কম।

মালয়েশিয়ার ঠিক উল্টো ধরনের রাজনীতি দেখা যাবে কম্বোডিয়ায়। কম্বোডিয়ার

উত্তরাঞ্চলের রবার বাগানের শ্রমিকেরা ভিয়েতনামী। ফরাসী শাসনকালে কেরানী বললেই ভিয়েতনামী বোঝাত, ১৯৫৪ সালের পরেও তারা কম্বোডিয়ায় থেকে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য চীনাদের হাতে। তাই সরকারী প্রকল্প চালু করেই শিল্প-বাণিজ্যে খ্মেরদের কাজের ব্যবস্থা করতে হয়। মালয়ীদের মতো কম্বোডিয়ার আদি অধিবাসী ও সংস্কৃতিবান খ্মেররা দেশে সবচেয়ে গরিব এবং মালয়ীদের মতোই কৃষি-নির্ভর। কম্বোডিয়ার রাজধানী ফোম নমপেন শহরেই খ্মেররা সংখ্যালঘু, অধিবাসীদের শতকরা ৩০ ভাগ চীনা, শতকরা ২৮ ভাগ ভিয়েতনামী। তা সত্ত্বেও, প্রিন্স শিহানুক কম্বোডিয়াকে 'মালটিরেসিয়াল' দেশ হিসাবে টিঁকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রিন্স শিহানুকের মতোই ওই এলাকায় তাঁর বন্ধু শ্রী লি কুয়ান ইউ সিঙ্গাপুরে 'মালটিরেসিয়াল' সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। সিঙ্গাপুরে ভারতীয়, সিংহলী, চীনা, মালয়ী ও ইউরেশিয়ানদের ভাষা তামিল, চীনা, মালয়ী ও ইংরেজী —চারটিই রাষ্ট্রভাষা এবং চারটি ভাষাতেই পড়াশুনা হয়। পাঠ্যপুস্তক যে-ভাষারই হোক না কেন, সব ভাষাতেই একই বিষয় পড়াতে হয়। সিঙ্গাপুরে অবশ্য বেশীর ভাগ চীনা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ইংরেজীতে পড়াশুনা করে থাকে। সিঙ্গাপুরে কোন বিশেষ ভাষা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে সংগঠন বা সভা-সমিতি করতে দেওয়া হয় না। লি কুয়ান ইউ এ-বিষয়ে বলেছেন, 'আমি লোকের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিপক্ষে নই। কিন্তু যখন তারা একটি দেশে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়, তখন আমার জিজ্ঞাসা—তারা কীজন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে? আমার বিরুদ্ধে যদি তারা ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে কার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' (সোশ্যালিস্ট সলিউশন ফর এশিয়া, পৃঃ ২২)। ইন্দোনেশিয়ায় যে কোন কারণেই হোক চীন-বিরোধী মনোভাব খুবই তীব্র। কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার বিরোধের মাশুল দিতে হয়েছে ওই দেশের চীনাদের, যারা চীনা-ভাষা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের সমস্যা ঠিক এক নয়। মূল ভূখণ্ডের চীন সরকার বরাবরই চীনাদের দ্বৈত নাগরিকত্বে বিশ্বাসী, যেখানেই থাকুক না কেন তারা চীনদেশেরও নাগরিক। ওই এলাকার বিভিন্ন দেশে যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চীনা-নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারলে তাদের ওই সামরিক শিক্ষা নিতে হয় না। কিন্তু ভারত সরকার বরাবরই ভারতীয়দের ওইসব দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে বলে থাকেন এবং ভারতীয়েরা অসুবিধায় পড়লে ভারত সরকারের কোন হস্তক্ষেপ আশা করা যায় না। ওই এলাকার অন্যান্য অধিবাসীর মত চীনা-পরিবারে মেয়েরা বাইরের কাজ করে, চীনাদের মধ্যেও উচ্চমধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা অনেক। ফলে চীনাদের পক্ষে সামাজিকভাবে ভারতীয়দের চেয়ে অনেক সহজে মিশে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য চাল-কলের মালিকানা, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত চীনাদের হাতে থাকায় ওইসব দেশের সরকার মাঝে মাঝে চীন-বিরোধী মনোভাব কাজে লাগিয়ে থাকেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিটি দেশে বিদেশী নাগরিকদের বংশধর অপেক্ষা দেশের বিভিন্ন উপজাতি ও বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীরাই বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মদেশে বর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কারেন, কাচিন, মন, আরাকানী প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী প্রথম থেকেই সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার পর বার বার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী চালু করায় সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ওইসব উপজাতির সঙ্গে রেঙ্গুনে অবস্থিত সরকারের বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজী বিদায় দিয়ে বর্মীকে রাষ্ট্রভাষা করায় বর্মীদের বিরুদ্ধে অ-বর্মীদের বিদ্বেষ আরও বেড়ে গিয়েছে। শ্যামদেশেও বিভিন্ন উপজাতি ও

শিক্ষিত হচ্ছে, তারা ততই ব্যাঙ্কক-সরকারের বিরোধী হয়ে উঠছে। আমেরিকানদের দৌলতে সারা পৃথিবীতে প্রচার হয়েছে যে, গোটা দেশের সর্বত্রই একভাষাভাষী লোকের বাস। কিন্তু এটা নেহাতই প্রচার। শ্যামদেশের উত্তর সীমান্তের অধিবাসীরাও লাও ভাষায় কথা বলে, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্য ভাষা আলাদা, দক্ষিণের চারটি প্রদেশের মুসলমানেরা প্রধানত মালয়ী ভাষা-ভাষী। থাইকে প্রথম থেকে সরকারী ভাষা করায় এবং ব্যাঙ্ককই দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র থাকায় আগে অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেত। পূর্ব মালয়েশিয়ার মালয়ীরা জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হওয়ায় এবং দুই মালয়েশিয়ার দূরত্ব দেশে বিশেষ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ফিলিপিনের অধিবাসীরা প্রায় ৭৮টি ভাষা ও কথ্যভাষায় কথা বলে। উত্তর ফিলিপিনে ব্যবহৃত 'তাগালোক' পরবর্তীকালে তা একমাত্র সরকারী ভাষা হওয়ার কথা। কিন্তু মধ্য ফিলিপিনে তাগালোকের ভিন্ন ডায়ালেক্টের নাগরিকেরা ইংরেজী ভাষাকেই সরকারী ভাষা হিসাবে রাখতে চান। দক্ষিণ ফিলিপিনে মুসলমান ও বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা মধ্য ফিলিপিনের খৃষ্টান অধিবাসীদের সঙ্গে কয়েক শো বছরের বিরোধের ইতিহাস এখনও ভুলতে পারেন নি এবং সেজন্যও নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-দানের সময় খ্মের-অধ্যুষিত কোচিন-চীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্তর্ভুক্ত হয়। কম্বোডিয়ার নিকটে ফু কোক দ্বীপটিও দক্ষিণ ভিয়েতনামের হাতে অর্পণ করা হয়। অপর দিকে থাই-সীমান্তে কম্বোডিয়ার দুটি প্রদেশের উপর থাইল্যান্ডের লোভ রয়েছে। কম্বোডিয়ার নীতি কেন শ্যাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিরোধী ছিল, এই দুটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আবার স্থানীয় অধিবাসীরা বরাবরই উত্তর ভিয়েতনামীদের বিরোধী ছিল। কিন্তু সায়গন সরকারের যারা কর্ণধার, দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাদের হাতে, তাদের প্রায় সকলেই উত্তর ভিয়েতনামের উদ্বাস্তু। প্রাক্তন কোচিন-চীনের খ্মেররাও দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের বিরোধী। ফলে উত্তর ভিয়েতনামের ভিয়েতকং দক্ষিণ ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের আক্রমণ না হলেও সায়গন সরকারের পক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের সমর্থন লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। ইন্দোনেশিয়ায় আবার উপজাতিরা কোন সমস্যা নয়, সেখানে দ্বীপ-ভিত্তিক আঞ্চলিকতাই সমস্যা। জাভার লোক হলেই জাকার্তার ইন্দোনেশিয়া-সরকারকে সব ব্যাপারে শক্তিশালী করতে চাইবে, সুমাত্রার অধিবাসী হলে ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ চাইবে। ইসলামের মাধ্যমে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রেরণা পেলেও ইন্দোনেশিয়ায় পরে তা ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ পেয়েছে। ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ব্রহ্মদেশে। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করলেও পরে তা ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নেয়। কিন্তু উল্টো ব্যাপার ঘটেছে মালয়েশিয়ায়। মালয়ীরা যত বেশী শিক্ষিত হচ্ছে, যত বেশী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার হচ্ছে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাও তত বেশী শক্তিশালী হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই এলাকায় যে-অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, এখনও কয়েকটি দেশে তার অবসান ঘটেনি। মালয়েশিয়া ও শ্যামদেশের মধ্যে ট্রেনের প্রতিটি কামরায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করে এবং সশস্ত্র প্রহরী রেখে চলন্ত-ট্রেনে ডাকাতি বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে ব্যবসায়ীরা ট্রেনে মাল-পত্তর নিয়ে যাওয়ার সময় নিজেরাই সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করে থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা অবস্থানরত চিয়াংপন্থী চীনা সৈন্যদের ট্রেনে পাহারা দেওয়ার কাজে লাগাত। শ্যামদেশেও সড়ক-পথে রাত্রে যাতায়াত করা নিরাপদ নয়। কিন্তু সরকার এইসব সমাজ-বিরোধীদের কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে সমস্যাটি চাপা দিতে চান। এই

এলাকায় ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পথ নিয়েছিল, এক ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোথাও তা সফল হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার সুকার্ণ-হাত্তা সরকার ১৯৪৮ সালে যে-সময়ে ডাচদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময়েই মাদিয়ুনে কম্যুনিস্টরা ইন্দোনেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রহ্মদেশে ১৯৬১ সালে কম্যুনিস্ট নেতা থাকিন থান টুন সদলবলে নিহত হওয়ার পরেই যুদ্ধের পর এই প্রথম বদ্বীপ-এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন সরকারের অস্ত্রে সজ্জিত কারেন, কাচিন, চিন প্রভৃতি উপজাতির রেঙ্গুন-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এখনও অব্যাহত আছে। মালয়ে যোগা-যোগের পথ নষ্ট করে ইংরেজ সরকার ওইদেশে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের তৎপরতা বন্ধ করে-ছিলেন। কয়েক বছর যাবৎ মালয়েশিয়া সরকারের চীনা-বিরোধী নীতির জন্য বহুসংখ্যক চীনা শ্যামদেশের সীমান্তে অবস্থিত কম্যুনিস্ট গেরিলাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। দক্ষিণ শ্যামদেশের মুসলমানদের একটি অংশ মালয়েশিয়ার সঙ্গে মিশতে না পেরে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসে চীনা গেরিলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ফিলিপিনের হুক-নেতা তারুকের নেতৃত্বে গেরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, রামন ম্যাগসাইসাইয়ের হাতে সেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে, পরে কম্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তারুক সরকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। চীনে ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। এবং প্রতিবেশী চীনের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ায় ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য অন্যান্য এলাকার কম্যুনিস্ট গেরিলাদের সঙ্গে ভিয়েতনামের গেরিলাদের একটি মৌল পার্থক্য ছিল। হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের আন্দোলন প্রধানত জাতীয়তাবাদী ছিল, চীন ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামীদের দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে তাঁরা প্রেরণা পেতেন কিন্তু অন্যত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন কম্যুনিস্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী নেতারা। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গেরিলা-যুদ্ধ নূতন কোন ব্যাপার নয় চীনের মাও সে-তুংয়ের কাছ থেকেও তাদের ওটা শিখতে হয়নি। ১৮০৫ সালে ডাচরা জাভা আক্রমণ করলে যোগজাকার্তার রাজপরিবারের দিপোনেগোরো পাঁচ বছর গেরিলা-যুদ্ধ করে ডাচদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ডাচেরা সুমাত্রার 'আৎজে' রাজ্য দখলের জন্য ১৮৭৩ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ৩৫ বছরব্যাপী গেরিলা-যুদ্ধের মাধ্যমে ডাচদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল সেদিন বাইরের কোন শক্তি সুমাত্রার ওই রাজ্যটিকে সমর্থন করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একে একে স্বাধীন হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সমষ্টিগতভাবে কোন কর্মসূচী নিতে পারেনি। ব্রহ্মদেশ ছাড়া অন্য দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ভারতের চেয়ে অনেক বেশী। আঞ্চলিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা আজও চালু হয়নি প্রথমে 'আসা' এবং পরে 'এসিয়ান 'গঠিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা এবং একাফের উদ্যোগে শ্যামদেশ, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং লাওস সরকার যুক্তভাবে মেকং নদী প্রকল্প কার্যকর করা ছাড়া ওই এলাকায় কোন যুগ্ম-অর্থনৈতিক উদ্যোগ চোখে পড়ে না। বরং সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ান সরকারের যুগ্ম-মালিকানায় যে মালয়েশিয়ান বেসরকারী বিমান পরিবহণ সংস্থা ছিল, এবৎসর তাও ভাগ হতে চলেছে। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা আদান-প্রদানেরও কোন ব্যবস্থা নেই। হংকং থেকে প্রকাশিত "ফার ঈস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ" ছাড়া আর কোন পত্রিকা নেই, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশের খবর খবর পাওয়া যাবে। মালয়ী গোষ্ঠীভুক্ত তিনটি দেশ যথা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপিনকে নিয়ে

Development Consultants
now engaged in complete engineering
service for three
Dry Process Cement Plants
producing 1,000 tonnes per day
Development Consultants are equipped with all the modern expertise and are now engaged in rendering consultancy services to Indian industries such as power generation - electrical and nuclear — aluminium, paper and pulp cement and other mining and metallurgical projects
Development Consultants have already made spectacular success in export of Indian expertise and know-how. As consultants to the Government of Syria for the cement project one of the biggest development projects in that country — Development Consultants will gain for India the largest foreign exchange earnings for any consultancy work done abroad by Indian consultants
DEVELOPMENT CONSULTANTS
PRIVATE LIMITED
24 B Park Street, Calcutta 16
FIRST MAJOR EXPORT OF INDIAN KNOW-HOW

মাফিলিন্দো গঠনের যে-সিম্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ম্যাকাপাগাল, প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো ও প্রধান-মন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমান নিয়েছিলেন, মালয়েশিয়ার সাবা'র ওপর ইন্দোনেশিয়া ও ফিলি-পিন দাবি জানিয়ে ওই প্রচেষ্টা বাতিল করে দিয়েছে। সিয়াটো গঠন করে আমেরিকা সিয়াটোভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি করেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তবে গত ১৬ বছরের চেষ্টায় ব্যাঙ্কক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সিয়াটোর সদর দপ্তর, একাফের অফিস, রাষ্ট্রপুঞ্জের এশিয়ান ইকনমিক ডেভেলপ-মেন্ট ইনস্টিটিউট ও ইউনেস্কোর অফিস স্থাপন ব্যাঙ্কককে এশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত বিমান-বন্দরে পরিণত করেছে। কিন্তু সামরিক গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য টাকা পাওয়ার যে-সুযোগ এতদিন ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানে ও চীন-মার্কিন সমঝোতার ফলে সেই সুযোগ নষ্ট হতে চলেছে।

মৃত্যুশব্দ জয় ক'রে

সমর রায়

প্লীজ হেল্প। হেল্প করুন একটু। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন দয়া করে।

ব্যালকনিতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে মুখে ঔৎসুক্য কৌতূহল। পেছনে ছেলেরা। দরজা ফাঁক করে কেউ কেউ প্রত্যক্ষদর্শী।

মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত উঠল দীপ্তেনের। মানুষ মারার কারিগর চার পাঁচজন, চলে গেছে তারা। হয়তো এতক্ষণ বাগবাজার ঘাট থেকে নৌকা চড়ে মাঝগঙ্গার কাছাকাছি। দম বন্ধ হয়ে আসছিল দীপ্তেনের। পাইপগানের গুলি বুকের ঠিক বাঁ দিক ঘেঁষে ভেতরে চলে গেছে। উঠে বসার চেষ্টা করল সে। একটু শক্তি। আরো একটু শক্তি। যাতে সে উঠে দাঁড়াতে পারে। হেঁটে যেতে পারে কিছুদূর। অন্তত যতদূর পর্যন্ত একখানা ট্যাক্সির সন্ধান না পাওয়া যায় ততদূর। দেহের মনের সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াল দীপ্তেন। আবার একঝলক রক্ত মুখ দিয়ে উঠে এল। জামা ভিজে গেছে রক্তে।

এখনো মস্তিষ্কের মধ্যে সেই দুপদাপ পায়ের আওয়াজ। কী ভয়ঙ্কর হিমশীতল সেই দৃশ্য। পিঠের কাছে এসে থেমে গেল ওরা চার-পাঁচজন। তার পরেই ঘিরে ফেলল দীপ্তেনকে। হাতে ওদের ধারালো সব অস্ত্র। একজনের হাতে পাইপগান। আত্মরক্ষার জন্যেই পাইপগান এনেছিল ওরা। কিন্তু যার হাতে ওটি ছিল, নিঃসন্দেহে সে একজন আনাড়ি। নয়ত নিতান্তই শিক্ষানবিশ। কেননা ঝটিতি পাইপগান ব্যবহার করে বসবে কেন সে?

গুলিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শরীরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল দীপ্তেনকে। বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। এরপর আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না, এই সিদ্ধান্তে ওরা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপ্তেন উঠে দাঁড়িয়েছে এবং এগোচ্ছে। আর একটু হেঁটে যেতে পারলেই গিরিশ অ্যাভিনিউ। ঐ বড় রাস্তা মানেই ট্যাক্সি। ট্যাক্সি মানেই মেডিকেল কলেজ। আর মেডিকেল কলেজ মানেই জীবন। বেঁচে ওঠা। দীপ্তেন নিশ্চিত যে, কোনক্রমে যদি সে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, তবে তার বেঁচে ওঠাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তাই দীপ্তেন প্রাণপণ শক্তি দিয়ে জোরে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। ভারতীর মেজদা। সঙ্গে তার আরো কয়েকজন, বন্ধু-বান্ধব হবে হয়তো।

—তুমি একা একা এই অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ? ভারতীর মেজদার গলায় উৎকণ্ঠা।

—একটা ট্যাক্সি।

—আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে আসছে জামাইবাবু।

গাড়ির মধ্যে দেহটাকে এলিয়ে দিতেই দীপ্তেনের মনে হল, জীবনে এই বোধহয় প্রথম মনে হল যে, সে অত্যন্ত ক্লান্ত। এবং দীর্ঘদিন বিশ্রামের প্রয়োজন তার।

গলি দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। অনেক বাড়ি থেকে লোকেরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন। দুঃসাহসী কতিপয় ব্যক্তি গাড়ির খুব কাছাকাছি এসে দীপ্তেনকে দেখার চেষ্টা করল।

গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল গাড়ি। বোসপাড়া লেন ভেঙে নতুন বড় রাস্তায়

মাঝখানে গিরিশ ঘোষের বাড়ি। বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক। বাড়ির সামনে তাঁরই একটি স্ট্যাচু দাঁড় করানো। মস্তকসহ মূর্তিটি বিস্ময়করভাবে তখনো অক্ষত, অভগ্ন।

দীপ্তেনের মনে হচ্ছিল গাড়ির গতি আরো দ্রুত করা দরকার। ড্রাইভারকে বার বার বলছিল,—আরো একটু জোরে চালান ভাই, আরো একটু।

ভারতীর মেজদা বললেন,—একটু চোখ বুজে থাকো দীপ্তেন। একটু চুপ করে থাকো। এক্ষুনি আমরা হাসপাতাল পৌঁছে যাব।

দীপ্তেন অনুভব করছে, কান দুটো দিয়ে যেন তার আগুন বেরুচ্ছে। গলার কাছে আবার চাপ রক্ত।

গ্রে স্ট্রীট পার হয়ে যাচ্ছে। পনেরো দিন আগে দীপ্তেনরা এইখান দিয়ে মিছিল নিয়ে গেছে। আর পাঁচ বছর আগে এই পথে তার নিত্য যাতায়াত ছিল। স্কুল—বাড়ি। বাড়ি স্কুল। গ্রে স্ট্রীট, অধুনা অরবিন্দ সরণীর দিকে হয়তো শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখল দীপ্তেন। আর কোনদিন মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে না হয়তো। হয়তো বেঁচে উঠবে দীপ্তেন। হয়তো! সবই হয়তো!

হেমন্তকালের বিকেল। ধুলোর মতো বিষণ্ণ। বাষ্পরুদ্ধ। অবেলায় বেলা ফুরিয়ে আসছে। ওপর থেকে কে যেন ছেঁকে ছেঁকে সমস্ত আলো তুলে নিচ্ছে।

বিডন স্ট্রীট পার হয়ে গেল। একদা জঙ্গী থিয়েটারের জন্য সুপরিচিত ঐ রাস্তায় নাটাপাগলাদের ঢল নেমে যেত সন্ধ্যে হলে। এখন শুধু মড়া যায় নিমতলা শ্মশানে।

আর আবার গিরিশ ঘোষ। মস্তকবাহী এক মর্মরমূর্তি। পার্কের এক কোণে ম্লানমুখে উপবিষ্ট বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক।

বিচিত্র ভারতবর্ষের একবারে পূর্ব প্রান্তে—আশ্চর্য এক রঙ্গমঞ্চ পশ্চিম বাংলা। সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের এক চরিত্র হয়ে গেল আজ দীপ্তেন।

গিরিশ পার্ক পেরিয়ে গাড়ির গতি স্তিমিত হয়ে গেল। আর বোধ হয়, মেডিকেল কলেজ পৌঁছনো যাবে না। জ্যামের মুখে গাড়ি হয়ত আটকে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে হাওড়ার ব্রীজে জ্যামের মধ্যে পড়ে ট্রেন ফেল করেছিল দীপ্তেন একবার। সেইদিনকার কথা মনে পড়ল। বেঁচে ওঠার প্ল্যাটফরমে কোনরকমে যদি পৌঁছে যেতে পারে আজকের মতো!

আর একটু জোরে, ভাই, আর একটু জোরে।

গাড়ির গতিবেগ বেড়ে উঠল আবার। গাড়ি এগিয়ে চলেছে দ্রুত। মহাজাতি সদন। আরো খানিকদূর পার হয়ে হ্যারিসন, অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোড-এ বাঁক নিয়ে কলেজ স্ট্রীট। দীপ্তেনের মুখ দিয়ে আর-একঝলক রক্ত। কলেজ স্ট্রীট! কতসব রোমাঞ্চিত মধ্যাহ্ন। রাস্তায় ব্যারিকেড সাজিয়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই। বারুদ-ঠাসা দিনগুলি কোথায় ফেরার আজ!

কফি হাউস। যার নিচে গিয়ে দাঁড়ালে জীবনের যে বয়সেই যাও না কেন মনে হবে, কে যেন গাইছে—যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি জাগো—

গোলদীঘি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যায় গাড়ি। গেট আগলে ঠায় বসে রয়েছেন বিদ্যাসাগর। দেহের ওপর মস্তককে বহন করার দায়মুক্ত, চিন্তাভারমুক্ত, যাবতীয় অনুভূতির সম্পর্ক-বিরহিত এই বিদ্যাসাগর, অথচ শেষ জীবনে বুর্জোয়া সমাজের প্রতি চরম তিক্তভাবশত সাঁওতাল পরগনায় চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেই চেষ্টার মধ্যে কোন খাদ ছিল না।

বসন্ত কেবিন পিছনে ফেলে মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল ইমার্জেন্সি ব্লকের সামনে। ভারতীর মেজদা গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গেলেন। এখন, লক্ষ্য করল দীপ্তেন, খানিকটা যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন ভারতীর মেজদা। বুঝতে পারছেন না কী করতে হবে এই সময়ে তাঁকে। লনে ভিড় জমে গেছে। ভিজিটারদের ভিড়। ভারতীর জামাইবাবু স্ট্রেচারসহ বাহকদের নিয়ে এলেন।

খুব দ্রুত ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছিল বিমূঢ় দীপ্তেনের সামনে দিয়ে। অফিস রুমে নাম, ঠিকানা, ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি লেখানো হল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর এক্সরে প্লেট নেবার জন্যে অন্য এক ঘর। ফটো নেওয়া হয়ে গেল। লিফট-এ তোলা হল দোতলায়। করিডর ভর্তি লোক। একজন রমণীর আর্তকান্না। চিরবিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণার সামনে ধোঁয়ার মতো মনে হচ্ছিল লোকেদের। তারা আসছে, যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছু পুলিস। ওয়ার্ড বয়। ডাক্তার। স্ট্রেচার থেকে নামিয়ে একটা বেডে শুইয়ে দেওয়া হল দীপ্তেনকে। রক্তভেজা জামা খুলে নেওয়া হল। হাসপাতালের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হল তারপর। অক্সিজেন সিলিন্ডার এসে গেছে। পাইপ দুটি নাকের ছিদ্রপথে গলিয়ে দেওয়া হল। প্রথমটা একটু অস্বস্তি। তারপরই, আঃ! কি আরাম বুকের মধ্যে। গলা বুজে গিয়েছিল। বুক দুমড়ে যাচ্ছিল। আরামের প্রলেপ বুকের অভ্যন্তরে, ফুসফুসে। স্যালাইন। ব্লাড। কারা যেন দৌড়োদৌড়ি করছে। ব্লাড দরকার হবে।

ও ব্লাড! ব্লাড! বলতে বলতে সম্মোহিত হয়ে যেত গৌতম। কলেজ-জীবনে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু গৌতমের হাত ধরেই রাজনীতি করতে নেমেছিল একদিন দীপ্তেন। গৌতমের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন আর সাধ ছিল—রক্তাক্ত বিপ্লব। ঐ রক্তেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ল একদিন গৌতমের মায়ের জন্যে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে কিছু রক্ত। কে রক্ত দেবে? অতি আবশ্যকীয় রক্ত দিতে ব্লাড ব্যাঙ্কে সেদিন আসতে হয়েছিল দীপ্তেনকে।

গৌতম এখন লন্ডনে বসে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। কলকাতায় ফিরে ভাল সরকারী চাকরি করতে করতে রক্তাক্ত বিপ্লবের ওপর কত ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখবে তখন। আপাতত দীপ্তেনের কিছু রক্ত প্রয়োজন। ও ব্লাড! ব্লাড!

বেড থেকে আবার স্ট্রেচার। করিডর দিয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দীপ্তেনকে। সহকর্মী বন্ধু অনেকেই এসে গেছে তখন। দাদা বৌদি ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতী? কী করছে সে এখন? দাদা-বৌদি, ভারতীর মেজদা, বন্ধু-সহকর্মী—সকলের উদ্বেগাকুল চোখের সামনে দিয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল দীপ্তেনকে।

পশ্চিমের আকাশে এতক্ষণ হয়তো সূর্যাস্ত হচ্ছে। আকাশে কোন কোলাহল নেই। বড়ই নিভৃত, শান্ত সে। চোখ বুজলে বোঝাই যায় না আকাশে কিছু আছে, কি নেই।

ঠিক সময়ে প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছেছে দীপ্তেন। অপারেশন থিয়েটারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাপ্রনপরা সার্জেন। যন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি বিশ্বাসযোগ্য। দীপ্তেনের মুখের সামনে ক্লোরফরম। ঠিক সময়ে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়ে দীপ্তেনের মনে হল, গাড়ি সে নিশ্চয় ধরতে পারবে। তারপর আবার নতুন করে এগোনো। নবীন সহযাত্রিণী হবে ভারতী।

এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—আর গুনে কী হবে? সংখ্যাগুলো তো ঠিকই থাকবে। ছয়—সাত—আ—

সংস্কৃতি সাময়িকী

প্রতিষ্ঠান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠান

সেনেট হলের পুরোনো বাড়ি যখন ভেঙে ফেলা হচ্ছিল, প্রায় এক যুগ আগে, পূর্ণেন্দু পত্রী তখন গোলদীঘিতে দাঁড়িয়ে থাকতেন ক্যামেরা হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নানা ভঙ্গিতে তিনি তুলে রাখতেন এই ভেঙে-পড়ার ছবি। সেসব ছবি আজ কোথায়? আর এর পাশাপাশি কবিতা লিখে যাচ্ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সেনেট ১৯৬০। লিখছিলেন, 'তৎপর কর্ণিক হাতে নিয়ে/সংস্কারপান্থ হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা'।

এই কবিতায় বা ওসব ছবিতে একটা সৌন্দর্যময় দীর্ঘশ্বাস ছড়ানো আছে সন্দেহ নেই। ভেঙে যাচ্ছে পুরোনো কলকাতা: হয়তো অনেকেরই ছিল এই ব্যাকুল শ্বাস। তখনকার দিনে পথচলতি অনেকেই খানিক বিষণ্ণ হয়ে দেখে নিতেন পুরোনো কলকাতার এই তৎপর ভাঙনের ছবি।

কিন্তু এর পেছনে আরো যে একটা গোপন ভাঙার কাজ চলছিল সেই একই সময়ে, প্রতিষ্ঠান ভাঙার কাজ, সেটা তখনই সবার চোখে পড়ে নি হয়তো। লেখার জগতে তৈরি হচ্ছিল ছোটোখাটো একটা অসন্তোষ, বিদ্রোহ। গদ্যেপদ্যে তরুণ কিছু লেখক বেঁকে বসেছিলেন অনেকটা, চলতি সব লেখার বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য রৈ রৈ রবটা প্রকাশ্য হয়ে উঠল, পাঠক এবং সমালোচকের দল নিন্দা এবং প্রতিরোধ নিয়ে এগিয়ে এলেন সামনে। তরুণেরা অন্তত বুঝতে পারলেন যে তাঁদের আঘাতটা ঠিক জায়গায় বিঁধেছে, প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করলে সেখান থেকে যে একটা আমূল আর্তনাদ উঠবে এইটেই সংগত। তাই এই নিন্দা বা প্রতিরোধ ছিল তরুণদের পক্ষে পরোক্ষ জয়টীকা।

তারপর এই কয়েক বছর জুড়ে সেই কবিদের ক্রমিক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই কয়েক বছরেই তাঁদের সেদিনকার বিদ্রোহী ধরন সাম্প্রতিক লেখক বা পাঠকের কাছে স্বীকৃত প্রকরণ হয়ে দাঁড়াল। এখন আর তাঁদের রচনায় তেমন-কোনো ভয় বা আঘাত নেই, আছে কেবল মেনে নেওয়া, মেনে নেওয়া এই চারপাশের সামাজিকতাকে। এখন উঠতি বয়েসের কবিদল এঁদেরই সামনে রাখেন লক্ষ্য হিসেবে, অভ্যাস হিসেবে, এমন-কী হয়তো-বা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই। অল্পদিন আগে যাঁরা প্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা ভাবছিলেন, আজ তাঁরাই হয়ে উঠছেন নতুন প্রতিষ্ঠান। তবে কি তাঁদের ভাবনায় ভুল ছিল কোনো? বিদ্রোহে কোনো ফাঁকি? লুকোনো সেই দীর্ঘশ্বাসেরই কি অনিবার্য ফলাফল এই পরাভব?

এই প্রশ্ন অল্পে অল্পে জেগে উঠছে কোনো কোনো নতুন তরুণের মনে। তাঁরা খানিকটা অভিমান নিয়েই দেখছেন যে একদিন যাঁদের উপর অনেক নির্ভর করেছিলেন তাঁরা, সেসব কবিকে তো প্রচলিত পরিপার্শ্বের সঙ্গে যুধ্যমান বলে চেনা যায় না আর। তাঁরা অভিমানভরে দেখেন যে এক পরম বশ্যতার ভঙ্গি নেমে আসছে আবার রচনার জগতে: প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠাকামিতার জগৎ। সেইসব কবি, যাঁরা প্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা বলেছিলেন এক সময়ে, আজ তাঁরা নিজেরাই যুক্ত হয়ে আছেন কোনো-না-কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠানে: হয়তো-বা খবরের কাগজে, হয়তো-বা স্কুলকলেজে। আর কে না জানে যে মুক্তবুদ্ধি বা মুক্তবোধের পক্ষে এই দুটি প্রতিষ্ঠানই আজকের দিনে সবচেয়ে সর্বনাশা!

তাই, আবার একটা ধিক্কার জাগতে শুরু করেছে নতুন ক'রে। অনেক সময়েই এসব ধিক্কার অবশ্য অস্পষ্ট, দুর্বল, অশীলিত। অনেক সময়েই আমরা অভাব বোধ করি তেমন-কোনো ভাবুক লেখকের, কবিতা বিষয়ে লেখার যোগ্য উদাম আমাদের চোখে পড়ে কম। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে এমনদুটি তর্কণীয় প্রবল গদ্য লিখেছেন শৈলেশ্বর ঘোষ, খুবই ছোটো দুটি পত্রিকায়।* সেখানে তিনি সরাসরি এই প্রশ্ন তুলেছেন আজ, '৬/৭ বছর পরে তথাকথিত কবিতার মঞ্চে এই বিশাল

* নিবাদ, আর্তনাদ।

স্তব্ধতা কেন? মঞ্চ থেকে এতো দ্রুত স'রে পড়ার কারণ কিছু আছে কি?' কারণ একটা অনুমান করেন শৈলেশ্বর, তিনি মনে করেন যে শিল্পের কথা ভাবতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে কবিতা, কেননা 'ঐ শিল্পকবিতার মধ্যে এমন কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না যা আমাকে, আমার জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে, তার মধ্যে এমন কিছু পাচ্ছি না যাকে সত্য এক নিশ্চিত নিষ্ঠুর আবিষ্কার ব'লে মেনে নেওয়া যায়, যার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়, বা যে আমাকে শান্ত করতে পারে, দূর করতে পারে দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা ভয় তাড়না, এক ও একা এই শরীরকে যুক্ত ক'রে দেয় মাটি ও আকাশের সঙ্গে।'

এক নিশ্চিত, নিষ্ঠুর আবিষ্কার? ঠিক তাই। কেননা মিথ্যে যে সামাজিক প্রলেপে আমরা ঢেকে রাখি সত্যের মুখ, সেই লেপন মুছে গেলেই ভয় পাই আমরা, তাকে ঢেকেই রাখতে চাই প্রাণপণ। বড়ো সাহিত্য সেইজন্যে সব সময়েই আমাদের কোনো ভয়ের মুখোমুখি নিয়ে যায়, এই ভয়টাই সত্যের অন্যতম নিরিখ। তাই শৈলেশ্বরের এ-কথার মানে আছে যে 'কবি শব্দই বিদ্রোহবাচক, কারণ জীবনের ষড়যন্ত্রময় বস্তুসমূহের মারাত্মক অবস্থানকে যে মেনে নিতে অস্বীকার করে ও বেঁকে বসে সে-ই কবি'।

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কবির চিরন্তন অভিযান এই জন্যেই। প্রতিষ্ঠান মেনে নেয় এই ষড়যন্ত্রময় অবস্থান, মানিয়ে নিতে চায় অন্যকে দিয়েও। একটা ভুল সামাজিকতায় সে ঢেকে রাখতে চায় সত্যের মুখ, তাই প্রতিষ্ঠান মিথ্যাচারী। এই মিথ্যার প্রতাপ এতোটাই যে সাধারণ মানুষকে সে ভুলিয়ে দিতে পারে জীবনের মানে। আর তখনই তৈরি হয় সাহিত্যজগতের এই কূটাভাস, এই প্যারাডক্স সকলের জন্য লেখা মানেই জীবনের জন্য লেখা নয়, সকলকে নিয়ে লেখা মানেই জীবনকে নিয়ে লেখা নয়। যে-জীবন আছে লুকোনো, যে-জীবনকে এড়িয়ে থাকতেই মানুষ স্বস্তি বোধ করে, তার ছবি তুলে ধরলে সহসা আর নিজেকে চিনতে পারে না মানুষ। তাই যে-কবি জীবনের কথা লেখেন, ভাগ্যবশত তিনিই হয়তো পরিচিত হন জীবনবিরোধী কবি হিসেবে, যেমন একদিন হয়েছিলেন জীবনানন্দ। কেননা প্রতিষ্ঠান মানুষকে সব সময়েই তার ভুল জীবনকে চিনতে শেখায়।

ঠিক, সত্য জীবনে পৌঁছবার সমস্ত পথ রুদ্ধ ক'রে রেখেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। সব দরজা বন্ধ। কিন্তু কতো অসংখ্য এই দরজা, শৈলেশ্বর? কেউ তা জানে না। কেউ জানে না যে পরম্পরায় কতোগুলি দরজা খুলবার পর তবে দেখা যাবে সম্পূর্ণ আলো। কিন্তু কেউ কেউ জানে যে দরজা আছে এবং দরজা বন্ধ।

এটা হয়ই যে শতাব্দীর এক-একটা পর্যায়ে নবীনদলের মনে এই অভিমান জাগতে থাকে যেন তাঁরাই প্রথম এসে দাঁড়ালেন এমন-কোনো রুদ্ধ দুয়ারের সামনে। এটা হয়ই যে পরম হতাশা এবং দুঃখ নিয়ে তাঁরা তাকান তাঁদের পূর্বসূরির দিকে। ভাবেন, কেন এঁরা দেখেন নি বা দেখেও খুলতে চান নি এই বাধা। কেন তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন সব? আর মেনে নিয়েছিলেন ব'লেই, শৈলেশ্বরের ভাষায়, তাঁরা কবি নন।

কিন্তু কে জানে, হয়তো-বা মেনে নেন নি তাঁরা। লোকে কী বলবে এই ভাবনা অগ্রাহ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ যখন একটি-কেবল মোটা চাদর গায়ে চটি পায়ে উড়নচণ্ডি হয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর ঢুকে পড়তেন সাহেবি বইয়ের দোকানে, সেও এক হিসেবে ছিল প্রতিষ্ঠান ভাঙারই নিন্দাজনক আয়োজন। তাঁর তরুণদিনের কবিতায় যখন জেগে উঠেছিল শরীর—হ্যাঁ, নিঃসন্দিগ্ধ উজ্জ্বল মুক্ত শরীর -সেও ছিল অল্পসময়ের প্রতিষ্ঠানভাঙাই। আজ আর সেটা তেমন ক'রে বুঝতে পারি না আমরা। আসলে, ঐ যে বলেছিলাম সত্যের কাছে পৌঁছবার মুখে পরম্পরায় অনেকগুলি দুয়ার, এক-একটা লগ্নে খোলা হয় তার একটি বা দুটি। আমাদের পুরোনো কবিরা ভুল করেছিলেন ঠিকই, সে-ভুল এই যে সেই একটি বা দুটি উন্মোচনেই তাঁরা ভেবেছিলেন শেষ মোচন। তাঁরা হয়তো জানেন নি যে এরও পরে বাকি আছে আরো অসংখ্য দুয়ার। অথবা, কখনো হয়তো এক-লহমার জন্য জেনেও ছিলেন তা, কিন্তু বুঝেছিলেন যে তাঁদের পক্ষে অসাধ্য আর বেশিদূর এগোনো। একটা দুয়ার খোলা হয়ে গেলে সেইখানে কবি আধেক নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যান, অনুগামীরা অল্প অপেক্ষা করেন, তারপর সকলেই ভিড় ক'রে ঢুকে পড়েন নতুন-পাওয়া এই ঘরে, কেউই তাঁরা টের পান না যে কখন যেন সেইটেই হয়ে উঠেছে এক নতুন রুদ্ধতা, এক নতুন প্রতিষ্ঠান। তখন, আবার একে নতুন ক'রে ভাঙতে এগিয়ে আসেন বিদ্রোহী উত্তরসূরির দল।

আজকের কবিরা যদি অগোচরে তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন নিজেরা, তাহলে সেটা ভয়ের কথা সন্দেহ নেই। সেটা ভাঙতেই হবে। তাঁরা নিজেরাই কি ভাঙবেন নিজেদের না অন্যদের হাতে উঠে আসবে ভার? এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে আগামী দশ বছরের ইতিহাস।

কিন্তু ইতিমধ্যে মনে রাখা ভালো যে বাইরের দিক থেকে নিজেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করাটাই যে ভয়ের তা নয়। কেননা, এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে শারীরিক ভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন কেউ। এটা অসম্ভব নয় যে এরই ফলে জেগে ওঠে প্রতীক্ষিত এক বিরোধ, বাইরের আর ভিতরের নিরন্তর সংঘর্ষের ফলে কবি এক তৃতীয় সত্তায় পৌঁছতে পারেন তাঁর কবিতার মুহূর্তে, যে-সত্তা প্রতিষ্ঠানমুখী নয় কখনো, যে-সত্তা গূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী। নিজেরই সঙ্গে নিজের এই বিরোধ।

তাই, প্রতিষ্ঠানে থাকাটাই ভয়ের নয়, প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠাই ভয়ের। একদিন যাঁরা প্রতিষ্ঠান ভাঙার কথা বলেছিলেন বাঙলা কবিতায়, আজ কি তাঁরা এগিয়ে আসবেন আত্মপ্রতিষ্ঠান ভাঙবার প্রয়োজনে? দীর্ঘশ্বাস সরিয়ে কি তাঁরা দেখবেন আবার ভয়ের মুখ? এই একটা সমস্যা আজ আমাদের সামনে।

শঙ্খ ঘোষ

বাংলা মঞ্চে বিদেশী নাটক প্রসঙ্গে

মানব সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগে—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষাব্যবস্থা, কৃষিবিদ্যা, ভাষা, চারুকলা সাহিত্য—যখনই কোন সৃষ্টি বা আবিষ্কার বা অভিজ্ঞতা নতুনের চেহারা নিয়ে আসে, কল্যাণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, নবতর দিগন্ত উন্মোচিত করে, তখন প্রায়শই তা আন্তর্জাতিক সম্পদে পরিণত হয়। একদেশ আর একদেশ থেকে সভ্যতার উপাদান আহরণ করে; গোটা বিশ্ব সভ্যতা এক-এক ধাপ সামনে এগোয়। এই বিনিময়ের সুপ্রাচীন রাজত্বে বাংলাদেশও এক শরিক। আমরা বিশ্বসভ্যতাকে অনেক কিছু দিয়েছি; দিয়েছি উপনিষদ, কথাকলি, ভারতনাট্যম, খুচপুড়ি, কোনার্ক, তাজমহল, দিয়েছি গান্ধীজীকে, এবং রবীন্দ্রনাথকে। রবিশঙ্কর, আলি আকবর খান ও সত্যজিৎ রায়কে দিয়েছি আমরা নিয়েছিও অনেক কিছু। এই আন্তর্জাতিক বিনিময়ব্যবস্থার সম্ভাবনা বিংশশতকী যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বহুগুণ বেড়ে গেছে—যদি সভ্যতার সকল ক্ষেত্রেই কল্যাণকর হয় তাহলে সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা উচিত যে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বিনিময়-ব্যবস্থা শুভ হতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যের দীনতম শাখা নাটক যে বিদেশী মহৎ নাট্যপ্রচেষ্টার অনুকৃতি বা অনুসৃতির ফলে ধনী হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে সন্দেহ করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সহজ সত্যের স্বাভাবিক স্বীকৃতি বাংলাদেশে ঘটেনি। হালফিল বহু বক্তার বক্তৃতায় বহু প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধে বাংলা মঞ্চে বিদেশী নাটক অভিনয় সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অনীহা কখনো বা সুস্পষ্ট বিরোধিতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাঁরা এইজাতীয় সমালোচনা করছেন তাঁদের যুক্তিবিমুখতা তুলনারহিত। আধুনিক কালের শক্তিধর নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের নাটক যখন উনিশ শতকের শেষভাগে প্রথম ইংল্যাণ্ডে অভিনীত হতে থাকে তখন তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো পত্র-পত্রিকায়। ইবসেন সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'নরওয়ের দাঁড়কাকটা অবক্ষয়িত মাংসের জন্য অপ্রতিরোধ্য ক্ষুধা নিয়ে পাথরের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়েছে।' গোস্ট্‌স্‌ নাটকটিকে বলা হয়েছিল, 'একটা খোলা নর্দমা, একটা আবরণহীন কুৎসিত ক্ষত একটা নগ্ন নোংরামি; এটি একটি অনৈতিক কুষ্ঠাগার।' ইবসেনের বিরুদ্ধে এমনি হাজারো অভিযোগ এসেছিল সেদিন। কিন্তু লক্ষণীয় যে 'তাঁর নাটক বিদেশী সুতরাং মঞ্চস্থ করা উচিত নয়' একথা কিন্তু একবারও শোনা যায়নি। অথচ প্রায় একশ বছর পরে বাংলাদেশে 'অনুবাদ-নাটক করে কি লাভ?' 'ও নাটক বিদেশী!' ইত্যাদি কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে।

বাংলা মঞ্চে বিদেশী নাটক অভিনয়ের বিরোধিতা বিস্ময়কর। তবুও এই বিস্ময়ের কারণগুলো বোঝা দরকার। আমাদের ধারণা একশ্রেণীর লোক বিদেশী নাটক সম্পর্কে বিশিষ্ট শুধুমাত্র ব্যক্তিগত

অভিসন্ধির জন্যেই। বাংলাদেশের বহু ভদ্রলোক নাটক লিখে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নাটকগুলোর অধিকাংশেরই গতি হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তখন শুরু হয় এঁদের জেহাদ মঞ্চসফল 'বিদেশী' নাটকের বিপক্ষে এবং নিজেদের 'মৌলিক' নাটকের স্বপক্ষে। বিদেশী নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বিতীয় সূত্রটি মারাত্মক। এর জন্ম যুক্তিবিযুক্ত মূঢ় জাতীয়তাবোধ থেকে। এই জাতীয়তাবাদীরা ভুলে যান যে এটা 'আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কাল' (গ্যয়টে), এঁরা 'স্বদেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে শ্রেয়' এই মন্ত্রের আক্ষরিক অনুভবে মুহ্যমান। বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করার বিপক্ষে তৃতীয় কারণটি সবচেয়ে বেদনাদায়ক। এটির জন্ম মৌলিক রসবোধের অভাব থেকে। যে সংবেদনশীলতা থাকলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে সোফোক্লেস, শেক্সপীয়র, মলিয়ের, রাসিন, ইবসেন স্ট্রিন্ডবার্গ, বেকেট ও ব্রেশটের নাটকের শাশ্বত মানবমুহূর্তগুলিকে অনুভব করা যায় তার অভাব ঘটছে আমাদের। এই শুষ্কপ্রায় শিল্পচেতনায় ফলে মাথা চাড়া দিচ্ছে খণ্ডিতমনস্কতা এবং বর্তমান ভৌগলিক-সীমাবদ্ধতা। এই ব্যক্তিগত স্বার্থসর্বস্বতা, যুক্তিবিবর্জিত জাতীয়তাবোধ, মৌলিক রসবোধের অভাব—এ সর্বের জন্ম কিন্তু মূলত ইতিহাস-চেতনার অভাব থেকে। যে কোন দেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, এই ধারণাগুলো কত ভ্রান্ত কত যুক্তিরহিত। ইংল্যান্ডের দিকেই চোখ ফেরানো যাক।

ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত ইংরাজী নাট্যজগতের বিপুল কর্মচাঞ্চল্য এবং অপরিসীম সৃজনশীলতার কথা সকলেরই সুবিদিত। এই একটি মাত্র যুগেই ইংল্যান্ডের মতো থিয়েটার-সচেতন দেশেও নাটক মুষ্টিমেয়র আমোদের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় শিল্পের চেহারা পেয়েছিল। এই যুগেই নাটক লিখেছিলেন মার্লো, সেক্সপীয়র, বেন জনসন, ডেকার, ওয়েবস্টার প্রমুখ প্রতিভাবান নাট্যকারেরা। এঁদের প্রতিভার কথা এবং তৎকালীন নাট্যসৃষ্টির উপযুক্ত জাতীয় পরিবেশের কথা অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে যে এই গৌরবময় যুগের নাটকের গঠনরীতি এবং ভাববস্তু উভয়ক্ষেত্রেই 'বিদেশী' নাট্যকার প্লটাস, টেরেন্স এবং সেনেকার প্রভাব ছিল অপরিসীম। উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজী নাটকের ইতিহাসে যে গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে তার জন্য সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব 'বিদেশী' হেনরিক ইবসেনের। ১৮৮১ সাল থেকে ইবসেনের বিভিন্ন নাটকের অনুবাদ মঞ্চস্থ হতে থাকে। ১৮৯০ সাল থেকে আবির্ভাব ঘটে শ, গলসওয়ার্দি, গ্রানভিল-বার্কার, সেন্ট জন হ্যাঙ্কিন প্রভৃতি দেশী নাট্যকারদের। এই যুগের দেশী নাটকের সমাজ-সচেতনতা, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী, স্বভাববাদী গঠনরীতি এসবই 'বিদেশী' ইবসেনের অনুপ্রেরণাসঞ্জাত। একেবারে আধুনিক কালেও এই ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ১৯৫৫ সালে লন্ডন "অবজার্ভার" পত্রিকার সমালোচক কেনেথ টাইনান লিখছেন : 'ইদানীং নাটকের বাজার বড় মন্দা যাচ্ছিল কিন্তু এবছরে কিছু পাওয়া গেছে ইতিমধ্যেই ইবসেনের "হেডা গ্যাবলার", আনুইয়ের "টাইম রিমেমবার্ড" এবং পিরানদেল্ওর "রুলস্ অব্ দা গেম" সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে এবং শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই জিরাদু এবং আনুইয়ের আরো নাটক অভিনীত হবে।' এই তথ্য পরিবেশনের পর টাইনান যে সিদ্ধান্তটি করছেন সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'আকাশকুসুম বলে মনে হতে পারে তবু বলছি, আর বছর খানেকের মধ্যেই ভালো দেশী নাটক বাইরের সাহায্য ছাড়াই জন্ম নেবে।' এই আশার বাণী উচ্চারিত হল ১৯৫৫ সালে, ১৯৫৬ সালে লেখা হল জন অসবোর্নের ***Look Back in Anger***। শুরু হল 'রাগী ছোকরা'দের আন্দোলন; নাটক লিখতে লাগলেন অসবোর্ন, পিন্টার, ওয়েস্কার, ডেলানি, সিম্পসন, মর্টিমার, আর্ডেন এবং আরো অনেকে। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের পুনর্জন্ম হল।

ইংল্যান্ডের ইতিহাস থেকে যদি একথা স্পষ্ট হয়ে থাকে যে বিদেশী নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে দেশজ নাট্যসাহিত্য উপকৃত হয়েছে, বাংলা নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেই একই সত্যের নজীর মিলবে। বাংলা মঞ্চের শুরু থেকে এপর্যন্ত সোফোক্লেস, শেক্সপীয়র, মলিয়ের, শেরিডান, গোগোল, চেহভ, ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ, শ, ওয়াইল্ড, ওয়েস্কার, পিরানদেল্ও, সার্ত্র, বেকেট, ইয়নেস্কো, আনুই, ব্রেশট, ও'নীল, ওয়াইল্ডার, মিলার, উইলিয়াম্স্ প্রমুখ অজস্র বিদেশী নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কোন গোঁড়া স্বদেশীয়ানার ঠুলি পরেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে বাংলা নাটকের গঠনশৈলী পুরোপুরি বিদেশী ছাঁচে গড়া; সংস্কৃত নাট্যঐতিহ্য অস্বীকার

করে ট্র্যাজেডি লেখা শুরু হয় বিদেশী প্রভাবেই। আর বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ে হেন নাট্যকার নেই যাঁর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শেক্সপীয়রের প্রভাব ছিল না। একেবারে আধুনিককালে বহুরূপী প্রযোজিত "এ ডল্‌স্‌ হাউস" (পুতুল খেলা), "এ্যান এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল্‌" (দশচক্র), "রাজা অয়দিপাউস" লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত "লোয়ার ডেপথ্‌স্‌" (নীচের মহল), অনুশীলন প্রযোজিত "স্টপ-নিউজ" (শেষ সংবাদ), চতুর্মুখ প্রযোজিত "ডেথ অব এ সেল্‌সম্যান" (জনৈকের মৃত্যু), নান্দীকার প্রযোজিত "সিক্স ক্যারেক্টার্স ইন সার্চ অব এ্যান অথর" (নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র), "দ্য চেরী আর্চার্ড" (মঞ্জরী আমের মঞ্জরী), "দ্যুট্‌স্‌" (যখন একা) ও "থ্রিপেনি অপেরা" (তিন পয়সার পালা) ইত্যাদি নাটকের অভিনয় বাঙালী নাট্যামোদীদের রুচি এবং বাংলা নাটকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

এতক্ষণ আমরা বিদেশী নাটক অভিনয়ের ইচ্ছাকে সদিচ্ছা বলে স্বাগত জানিয়েছি, এর স্বপক্ষে যুক্তিও উপস্থাপিত করেছি। কিন্তু একথা আমরা কখনই বলছি না যে যাকিছু বিদেশী তাই প্রযোজনা করতে হবে। বিদেশী নামটাই বাংলামঞ্চে অভিনয়ের চূড়ান্ত ছাড়পত্র হতে পারে না। স্বভাবতই বাছাই করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু নির্বাচনের মাপকাঠি কি হবে? এটি খুঁজে বার করার জন্য আমাদের শিল্পতত্ত্বের একটি মৌলিক সূত্রের পর্যালোচনা করা দরকার। অন্য যে কোন শিল্পের মতই নাটক প্রাথমিক পর্যায়ে একের সৃষ্টি। কিন্তু যতক্ষণ না সেই একক সৃষ্টির সঙ্গে শিল্পরসিক সমষ্টির একটি বোঝাপড়ার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই সৃষ্টিকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই বিদেশী নাটক বাছাই করতে গিয়ে বিদেশী কথাটি মূল্যবান নয়, নাটকটি মূল্যবান কিনা সেইটেই একমাত্র বিচার্য। এবং নাটকটি শুধুমাত্র তখনই মূল্যবান বলে স্বীকৃতি পেতে পারে যখন দর্শকের সঙ্গে সেটির বোঝাপড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই বোঝাপড়া 'বিদেশী' নাটকের নিজের দেশের সার্থকতার ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি তখনই সম্ভব হয় যখন বিদেশী নাটকের স্রষ্টা এবং যে পরিবেশ থেকে এই নাটকের জন্ম তার সঙ্গে আমাদের কৃষ্টি ও সমাজ-মনের আত্মীয়তার পথ খোলা থাকে। স্যামুয়েল বেকেটের "এন্ডগেম" বা ইউজিন ইয়নেস্কো'র "কিলার" ফরাসী তথা য়ুরোপীয় পটভূমিকার বিচারে সফল সৃষ্টি। কিন্তু এ নাটকগুলো যে সামাজিক অবস্থা ও কৃষ্টির ফলশ্রুতি তার সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থা ও কৃষ্টির মানসিক সখ্যতা নেই বললেই চলে। স্বাভাবিক ভাবে এই নাটকের জগৎ আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। ফলত এই জাতীয় নাটকের প্রযোজনা দায়িত্বহীনতার নামান্তর মাত্র। আমাদের বিচার করতে হবে যে বিদেশী নাটক আমরা নির্বাচন করছি তা স্থানীয় দর্শকের কাছে নিজের আবেদন পৌঁছে দিতে পারে কিনা। এই সংযোগ সর্বস্তরে না ঘটলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্ততপক্ষে মোটামুটি তাৎপর্যপূর্ণ স্তরে উভয়ত বোঝাপড়া না ঘটলে সমগ্র প্রচেষ্টাটি মূতের বলক্ষয়ে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

আর একটি কথা। যাঁরা বিদেশী নাটকের বিরোধী তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে দেশজ নাটকের উন্নতি বহুলাংশে বিদেশী নাট্যাভিনয়ের ওপর নির্ভরশীল। ভালো দেশী নাটকের অভাবে বিদেশী নাটকের অভিনয় অন্ততপক্ষে আমাদের থিয়েটারকে কর্মচঞ্চল তো রাখবেই। এবং কর্মচঞ্চল থিয়েটার ছাড়া দেশী নাটকের বৃদ্ধি ও বিকাশ অসম্ভব। সব দেশের থিয়েটারের ইতিহাস তাই বলে।

সবশেষে একটি কথা মনে রাখা দরকার। শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশী নাটক অভিনয় করার সার্থকতা আছে। আন্তর্জাতিক নাট্যজগতের যে গভীর ব্যাপক রসের ভাণ্ডার তার রসাস্বাদনের সুযোগ থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত রাখব?—কেন যাব না বোহেমিয়ায় বা আর্ডেনে শেক্সপীয়রের হাত ধরে?—কেন পৌঁছবো না মানবমনের প্রাণকেন্দ্রে ইবসেন চেহভ স্ট্রিণ্ডবার্গকে পথ প্রদর্শক করে?—কেন জানব না আধুনিক বিশ্বজীবনের বিরাট বৈচিত্র্যকে সার্ত্র, কামু, বেকেট, জেনে, আদামভ, ইয়নেস্কো, আনুই, ব্রেশট্, ভাইস, পিরানদেল্‌ও, লরকা, অসবোর্ণ, ওয়েস্কার, পিন্টার, ও'নীল, উইলিয়াম্‌স্‌, মিলার, অল্‌বী এবং আরো অনেকের নাট্যদর্পণে?

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

স্বাতন্ত্র্যের মোহ

পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুর্গত শরণার্থীদের ছবি আজ আমরা খবরের কাগজে রোজ দেখতে পাই। বিষণ্ণ বৃদ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধা, অসহায় শিশু। ফোটোগ্রাফি হিশেবে সুন্দর, বিষণ্ণতা, অসহায়তা, দুর্গতির ছবি।

কিন্তু এই ফোটোগ্রাফি থেকে কি বর্তমান শরণার্থীদের শোচনীয় পরিস্থিতির massive দিকটি ফুটেছে? অকস্মাৎ রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং অদূরদর্শিতার ফলে নিরপরাধ কৃষক এবং মধ্যবিত্তদের যে বাস্তুচ্যুত হয়ে জীবনকে হাতে নিয়ে অজানা অচেনা দেশ পাড়ি দিতে হল এবং তা প্রায় এক কোটি লোকের, সেই লোকগুলোর এতদিনকার জীবনযাপনের ধরণটাই যে সম্পূর্ণ পাল্টে গেল চিরকালের জন্য, পুরো একটা দেশ হঠাৎ শ্মশানের রূপ নিল, তার পরিচয় কি এই একটি বিষণ্ণ বৃদ্ধ বা দশটি জড়াজড়ি করা শিশু বা তিনটি আলুথালু বৃদ্ধার ফোটোতে পাওয়া যায়? যত সুন্দর কোণ থেকেই নেওয়া হোক, ফোকাস যতই নিখুঁত হোক, দুঃস্থতার আবহাওয়া যতই ভালো ফুটুক পূর্ব পাকিস্তানের অকল্পিত বিস্তীর্ণ দুর্দশা এইসব ফোটোতে আসে না। যদিও ছবিগুলো এককভাবে নিঃসন্দেহে সত্য। অথচ ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। সত্য নয় কারণ বাস্তবতার সঠিক পরিচয় এতে আসে না। এই বিষণ্ণ বৃদ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধা বা অসহায় শিশুর ছবি আমরা আগেও দেখেছি বন্যার সময়, খরার সময়, দাঙ্গার সময়। এমন কি সাধারণ জীবনে সাধারণ পরিবেশেও এমন বিষণ্ণতা এমন দুঃস্থতা, এমন অসহায়তার দৃশ্য আমাদের অজানা নয়। লোলচর্ম বৃদ্ধ, কুঞ্চিতমুখ বৃদ্ধা, অস্থিচর্মসার শিশুর ছবি আমরা অহরহ দেখেছি, দেখি। যে কোন চালাক ফোটোগ্রাফার রাজস্থানে ক্যামেরা ঘুরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীর ছবি বার করতে পারেন। এককভাবে দুঃস্থতা সর্বত্রই সমান শোচনীয়, সমান দুঃখকর। কিন্তু সমবেত দুঃস্থতার রূপ অন্য, তার ভার অসহনীয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত নেই, তাই তার আবেদনও massive নয়।

বাঙলাদেশের বর্তমান যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চরম অরাজকতা চলেছে তার ফলে বাঙালী জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এর কারণ কোন একক ব্যক্তি নন, কোন একটি কারণ নয়। কারণ অনেক, যার কিছু স্বেচ্ছাকৃত কিছু ভবিতব্য। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, এই পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত। পঞ্চাশ বছর আগেও, রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হয়েছিলেন, সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে থেকেও সমস্ত বিক্ষিপ্ততা সমস্ত অশান্তি সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বাইরে থেকে টেনে নিজের ভেতরে নিয়ে একটি শান্ত জগৎ তৈরি করতে পেরেছিলেন যেখানে তিনি সুন্দরের শান্তির বিশ্বাসের একটা ঠাণ্ডা মোহময় আবহাওয়ায় বেঁচে থেকেছিলেন। আজ এটা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সময় সমাজ তবু দাঁড়িয়েছিল, আজ তিরিশ বছর পর চুরমার হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এক একটা পড়ছে, আমরা চমকে চমকে দেখছি।

এর ফলে আজ আর কোন সাহিত্যিকের পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের মতো, নিজস্ব পরিশ্রুত একক জগৎ তৈরি করা সম্ভব নয়। তাঁকে সমাজের এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঙনের রূপ দিতেই হবে। যে জন্য আজ সাহিত্যিক যখন প্রেমের গল্প লেখেন তখন তাকে মনে হয় বিরাট ঠাট্টা অথবা ফ্যান্টাসি। অথচ প্রেম তো অসত্য নয়। প্রেম এককভাবে সাময়িকভাবে সত্য, কিন্তু সাহিত্য একক ব্যাপার নয়। সুতরাং ধরে নিতেই হবে, আজকের সমাজে প্রেম শুধু যে প্রথম শক্তি নয় তা-ই নয় কোন তাৎপর্যপূর্ণ শক্তিও নয়। অবিমিশ্র প্রেম দুটি মানুষের মধ্যে, এটা আজকাল সাহিত্যের বিষয় হতে পারে না, কারণ তা সমাজে ঘটছে না। অথচ এই প্রেমই সত্য, যখন একে সামাজিক অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

একই কথা খাটে বিচ্ছিন্নতাবোধ, মোহমুক্তি, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি সাহিত্যিক বিষয় সম্পর্কে এক সময় ছিল যখন সাহিত্যিক সম্পূর্ণ আত্মগত কারণে নিজেকে বিচ্ছিন্ন, মোহমুক্ত, বিশ্বাসহারা মনে করেছেন। কিন্তু আজ সেই আত্মগত কারণ সামাজিক কারণের প্লাবনে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। আত্মগত কারণ আজ তাই সাহিত্যের পাঠকের মনে আবেদন আনে না।

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যিককে একথা ভাবতে হবে। ব্যক্তিগত সুখ, ব্যক্তিগত দুঃখ, ব্যক্তিগত সমস্যা, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখলে আজ তা সঙ্কীর্ণ মনে হয়, সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা সেসময় ভালো লাগত, এখনও ভালো লাগে কারণ মনে

হবে যে এ লেখা আগেকার লেখা আজকের লেখা নয়, কারণ পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের ধারণা ছিল সচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজ আমরা, স্বাধীনতা পেলে, গড়ে তুলতে পারব, যেখানে প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হবে। তখনও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হতো। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই ধারণা অসত্য, আমরা মধ্যবিত্ত সমাজকে বিস্তীর্ণ সচ্ছলতা আনতে পারছি না, মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশই নির্বিত্ত সমাজে নেমে আসছে, ভেঙে পড়ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি আজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভাগ্যের বিষয়। এখন যদি লেখক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে সাহিত্যরচনা করেন, তাহলে তা সাধারণের চোখে মনে হবে আমবাসাডার-ফিয়াট-চড়ুইস্থানের মতোই, চোখের সামনে আছে, তবে তাদের ব্যাপার নয়।

ছোটগল্পের ব্যাপারে বিশেষ করে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ প্রত্যেক সাহিত্যিকের কাছেই বিপজ্জনক মনে হওয়া উচিত। ছোটগল্প, সাহিত্যের অন্যান্য রূপের তুলনায়, সহজতম। এখানে বিন্যাস নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, চরিত্রসৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আনার দরকার নেই, হঠাৎ-দর্শনকে পূর্ণ-দর্শনে রূপান্তর করার দায় নেই, মুহূর্তের আবেগকে ঘনতর করার দায়িত্ব নেই। হঠাৎ দেখা চরিত্র, হঠাৎ প্রকাশিত রূপ, বা মুহূর্তের আবেগকে ছোট পরিসরে প্রকাশ করা একটা ছোট কবিতার মতোই সহজ। একটি জলের বিন্দুর সাহায্যে সমুদ্র বোঝানো যায় না, তেমন একটি চরিত্র বা একটি ঘটনা বা একটি আবেগ দিয়ে মানবপ্রকৃতি বোঝা যায় না। আবার যায়ও। সার্থক ছোটগল্প তিনিই লেখেন যাঁর ক্ষুদ্র গল্পের মধ্য দিয়েই বৃহৎ জীবনকে অনুভব করা যায়, কল্পনা করা যায়। কিন্তু এই শক্তি খুব কম লেখকেরই থাকে, যার ফলে বেশিরভাগ গল্পে ঘটনাটি একটি ঘটনাই থেকে যায়, চরিত্রটি চরিত্রটিই থেকে যায়; জীবনের ব্যাপ্তির আভাস তা আনে না। অধিকাংশ ছোটগল্প আশ্রয় খোঁজেন ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, তাঁর লেখার অজুহাত এই চরিত্রটি ঘটনাটি আবেগটি দর্শনটি স্বতন্ত্র হলেও সত্য, ছোটগল্পের অবয়ব ছোট হওয়ার দরুন এই স্বাতন্ত্র্যের অজুহাত ঘনঘন এসে পড়ে। লৌকিক উপন্যাসে বৈচিত্র্য আনতেই হয়, ফলে সেখানে সাহিত্যিকেরা অনুপাতে কম অজুহাত দেন স্বাতন্ত্র্যের, সমাজের গোষ্ঠীভাব তাঁদের আনতেই হয়।

আমাদের আধুনিক জীবনে স্বাতন্ত্র্যের স্থান যে কোথাওও নেই, তার মর্মান্তিক পরিচয় পাওয়া গেল পূর্ব পাকিস্তানে ২৫শে মার্চের ঘটনার পর থেকে। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তদের আশার বাহক হয়ে আওয়ামী লীগ তাঁদের সংগ্রাম শুরু করলেন এবং যোদ্ধাদের তৈরি না করেই সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দিলেন। ভরসা ছিল, পৃথিবী পাল্টিয়েছে, ফ্যাসিজম তার ক্লাসিক ফর্মে পুনরাগত হবে না, হিটলারও অতীতের স্মৃতি। কিন্তু সমস্ত অনুমান ব্যর্থ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেলেন, এক মাসে ছয় লক্ষ থেকে দশ লক্ষ লোককে খুন করে এবং এক কোটি লোককে দেশত্যাগী করিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের বর্বরতার কাহিনী ক্রমশই প্রকাশ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের চাক্ষুষ সাক্ষ্য থেকে। এই বর্বরতার অনেক দিকই আছে। তবে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে যেটা এসে পড়ে তা হলো, এই লক্ষ লক্ষ লোক জানতেই পারল না, কোন অপরাধে তাদের জীবন গেল, দেশ ছাড়তে হলো। এই লক্ষ লক্ষ লোক মনে করছিল তাদের জীবন তাদেরই নিজস্ব। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবন। প্রত্যেকেই আপন আপনভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল, যখন মনে হচ্ছিল তাদের ভবিষ্যৎ তাদের আপন হাতে। যে মেধাবী সে তার মেধার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছিল, যে পরিশ্রমী সে তার পরিশ্রম করে চাষবাস উন্নতি করার চেষ্টা করছিল, জমির ফসল যাতে সে হাতে পায় তার চেষ্টায় কালাতিপাত করছিল, যে চতুর সে ব্যবসায়ে উন্নতি করার চেষ্টা করছিল, যে প্রেমিক সে প্রেম খুঁজছিল, যে বিদ্বান সে বই লেখার চেষ্টা করছিল, যে কবি সে ধান-পাটের সৌন্দর্য নিয়ে মগ্ন ছিল। গ্রামে গঞ্জে শহরে এরা যখন এদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মগ্ন ছিল, তখন এমনই এক শক্তি গজিয়ে উঠছিল যার ঝড়ের সামনে সমস্ত স্বাতন্ত্র্য কুটোর মতো উড়ে গেল। এই ঝড় অবশ্য প্রকৃতির ঝড় নয়। এই ঝড় মানুষেরই তৈরি এবং যারা বর্তমান সমাজে স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন নয় তাদের কাছে এই বর্বর অত্যাচার অমানুষিক মনে হলেও অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটল তা অবশ্য প্রকাশ্যেই। সাধারণ-লোকের স্বাতন্ত্র্য যে শাসককুলের মর্জিসাপেক্ষ তার প্রকট পরিচয় সেখানে পাওয়া গেল। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক আধাধনতান্ত্রিক দেশেও

একই ব্যাপার, একমাত্র পার্থক্য পূর্ব পাকিস্তানে শাসকরা স্থূলভাবে যা প্রয়োগ করল, অন্যত্র তা-ই হয় সূক্ষ্মভাবে। ফলাফল কিন্তু একই, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যলোপ। আধুনিক গণতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য থাকতে থাকতে পারে না।

আমাদের সাহিত্যিকদের এই বোধটি এখনও হয় নি। এর কারণ বাঙলা সাহিত্যিকদের ট্র্যাডিশন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বিরল ব্যতিক্রম। আমাদের বর্তমান সাহিত্যিকদের, তাঁরা সত্তর বছর বয়সেরই হোন বা সতেরো বছর বয়সেরই হোন, এমন এক সাহিত্যিকের নাম করা যায় যাঁদের ইতিহাসবোধ, রাজনীতিবোধ সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা যায়? এ'দের মধ্যে যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের চোরাকুঠরিতে বসে স্বাতন্ত্র্যের স্বপ্ন দেখেন, তাদের লেখায় বৃহত্তর জীবনের স্পর্শ আসে না।

বাঙালীর জীবনে যদি কোন একটি ঘটনা সমস্ত বাঙালী জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে থাকে, তবে তা হলো ১৯৪৭-এর বঙ্গব্যবচ্ছেদ এবং ১৯৭১-এর পূর্বপাকিস্তানে অত্যাচার। বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়ে একটা কোন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তৈরি হয় নি। অথচ এই ব্যবচ্ছেদে সবচাইতে বেশি যারা বিপর্যস্ত হয়েছিল তাদের মধ্য থেকেই বর্তমান সাহিত্যিকরা এসেছেন, তাঁরা সব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। ১৯৪৭ এর বঙ্গব্যবচ্ছেদেও যা ঘটে নি, বলা নিস্প্রয়োজন পূর্বপাকিস্তানের ঘটনার পর তা ঘটবে, বাঙলা সাহিত্যে পূর্বপাকিস্তানের ঘটনা তার সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে ফুটবে, এটা আশা করা বাতুলতা। পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত সাহিত্যিকরা কী লিখবেন জানি না, তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু এপার বাঙলার সাহিত্যিকদের কাছে পূর্বপাকিস্তানের ঘটনা ভিয়েতনামের ঘটনার মতোই দূরের। জয় বাঙলা আন্দোলনের ফলে এদেশের আলুপটলের দাম বাড়া ছাড়া অন্যদের মতো সাহিত্যিকদেরও আর কোন বড়ো ক্ষতি এপর্যন্ত হয় নি। অবশ্য বাঙলাদেশ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সকলেরই সমবেদনা খবরের কাগজে রাস্তায় প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে সেটা প্রতিফলিত হবে কি না হবে তা ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু বাঙলাদেশ আন্দোলনের প্রভাব ফোটোগ্রাফিতে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, অনুমান হয় সাহিত্যেও তা থেকে পৃথক হবে না। কোন একজন বাস্তুচ্যুত পূর্ববঙ্গবাসীর করুণ কাহিনী নিশ্চয়ই আজ কাল বা সামনের শারদীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হবে এবং ভবিষ্যদ্বাণী অবৈজ্ঞানিক মনে হলেও বাঙালী সাহিত্যিক এবং বাঙলা সাহিত্য আমরা যতটুকু চিনতে পেরেছি, তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় তা নিয়ে আলোচনাযোগ্য কিছুই থাকবে না। অথচ বাঙলাদেশের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক উপনিবেশবাসীদের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি এটা। এই বোধটা আমাদের উপলব্ধির অনেক বাকি।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

স মা লো চ না

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

শিল্পের ইতিহাস অনুশীলন কি শুধুই পুরা-কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য? মানুষের ধ্যান-জ্ঞান-কর্মকাণ্ডে কি শিল্প-ইতিহাস চর্চার অন্যতর কোন সার্থকতা নেই? এবংবিধ প্রশ্ন নিছক অ্যাকাডেমিক নয়। এ-ধরনের প্রশ্নের উত্তরের উপর শিল্প-ইতিহাস অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নির্ভরশীল।

উপক্রমণিকাতেই একটি তত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে শিল্প-ইতিহাসের প্রয়োজন সবশ্রেণীর অনুসন্ধিৎসুর কাছে এক ধরনের নয়। সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক শিল্প-ইতিহাস অনুশীলন করেন মানুষের চেতনতার বিবর্তন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ-শব্দ-অনুভূতিসম্পন্ন এক বিশেষ জাতের মানুষের চৈতন্যে সমসাময়িক পরিপার্শ্ব, সমাজ ও ধ্যানধারণা কী অনুষঙ্গে প্রতিভাত হয়েছে এবং তাদেরকে কী ধরনের কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত করেছে তারই পরিচয় পাবার জন্য ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক শিল্প-ইতিহাসের দ্বারস্থ হন।

একই শিল্পচর্যায়-রত শিল্পী এবং শিল্প-রসিক কিন্তু ভিন্নতর কারণে শিল্প-ইতিহাস অনুশীলন করেন। একান্ত শিল্প-ইতিহাসবিমুখ শিল্পীও তাঁর চর্চিত শিল্পের ইতিহাসের কাছে যান শিল্প-মাধ্যম এবং পদ্ধতি-প্রকরণ ব্যবহারের বিবর্তন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য। অবশ্য, অভ্যাসদাস ইতিহাস-বিমুখ শিল্পীরা বোধহয় কখনও শিল্প-ইতিহাসের বিষয় হয়ে ওঠেন না। আর যে-সব শিল্পী এবং শিল্পধারা শেষ পর্যন্ত শিল্প-ইতিহাসের বিষয়—আঁদ্রে মালরোর মতে শিল্প-ইতিহাসই সে-সবের উৎস এবং নিয়ামক, তার সম্বন্ধে শিল্পীরা যতো সচেতন বা অচেতন হোন না কেন। এ-ধরনের ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ (অবশ্য, মালরোর শিল্প-ইতিহাস-দর্শনকে নিয়তিবাদ আখ্যায় ভূষিত করা যায় কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ, মালরো বিশ্বাস করেন ব্যক্তিশিল্পী তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে পূর্বসৃষ্ট শিল্পকর্ম থেকে নিজোপযোগী ঐতিহ্য খুঁজে বার করেন।) মেনে না নিয়েও বলা যায় যে শিল্পচর্চার এবং শিল্পরসগ্রহণে শিল্প-ইতিহাস অনুশীলনের প্রয়োজন বহুবিধ। কী প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির একান্ত-ব্যক্তিগত স্থানিক-কালিক অভিজ্ঞতা সৃষ্ট শিল্পবস্তুতে সাধারণ এবং সার্বিক অভিজ্ঞতার কারক হয়, কী প্রক্রিয়ায় ধ্যানধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে ধারণ করে এবং অভিজ্ঞতার রূপক হয়, কেন অভিজ্ঞতার সাযুজ্য সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন কালের এবং দেশের শিল্পবস্তুর রূপ ভিন্ন হয়, কেন অভিজ্ঞতার বৈপরীত্য সত্ত্বেও একই দেশ-কালের শিল্প-ভাষায় আত্মীয়-সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়, কোন্ কারণে শিল্পবস্তুর মূল্যভেদের এবং অর্থবহতার তারতম্য ঘটে—এবংবিধ বহু প্রশ্নের সমাধানের আশায় শিল্পী এবং শিল্পরসিক শিল্প-ইতিহাসের অনুশীলনে ব্রতী হন। ব্রতী হন এই কারণে যে এবংবিধ প্রশ্ন তাঁর অবশ্যকর্মের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত। অতএব শিল্প-ইতিহাস অভিধায় অভিষিক্ত হবার দাবি নিয়ে উপস্থিত যে-কোন পুস্তক যদি এ-ধরনের প্রশ্নের কোন একটিকেও আলোচনাসূত্র হিসাবে গ্রহণ না করে তবে তা আলোচ্য

পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কিনা সন্দেহ।

জানি না বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা অদ্যাবধি হয়েছে কিনা। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় এ-ধরনের প্রথম উদ্যোগ শ্রীঅশোক মিত্রের "পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা" । প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। বইখানি কিশোর এবং সদ্য-যুবকদের জন্য লিখিত পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ভূমিকা বিশেষ। শিল্প-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা এবং শিল্পবস্তুর কার্যকারণসম্পর্ক ব্যাখ্যা অপেক্ষা শিল্পের মাধ্যম এবং শিল্পীদের অনুসৃত পদ্ধতি-প্রকরণের স্বরূপ ব্যাখ্যানই বইটিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই পদ্ধতি-প্রকরণের ব্যাখ্যান যদি স্থানিক, কালিক, বিন্যাস-ভিত্তিক এবং ব্যক্তিক স্টাইলের বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হত তবে বইটি formalist art history-র ন্যূনতম শর্তাদি পূরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত।

শ্রীঅশোক মিত্রের বইখানি প্রকাশিত হবার দীর্ঘ ষোল বছর পরে বাংলাভাষায় পাশ্চাত্য চিত্রকলার ইতিহাস চর্চার দ্বিতীয় নিদর্শন আলোচ্য বইখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, একথা বলা প্রয়োজনীয় যে বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত পাশ্চাত্য শিল্পবিষয়ক পুস্তকাদির অপ্রতুলতাকে বর্তমান লেখক ঐসব ভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম দৈন্যসূচক বলে মেনে নিতে অপারগ। লেনিনগ্রাদ থেকে লস এঞ্জেলিস ও মসকো থেকে মেকসিকো-সিটি পর্যন্ত অবশ্যদ্রষ্টব্য চিত্রশালা পর্যটন করে বইয়ের উপাদান সংগ্রহ করার সামর্থ্য বোধহয় কোন ভারতীয় গবেষকের নেই। দ্বিতীয়ত, আদিপ্রস্তর যুগের গুহাচিত্র থেকে শুরু করে মার্কিন বিমূর্ত-অভিব্যক্তিবাদ পর্যন্ত প্রতিটি য়ুরোপীয়-মার্কিন শিল্প-রীতির উপর যে-কোন য়ুরোপীয় ভাষায় এত বেশি লিখিত হয়েছে যে কোন লেখকের শিল্প বা শিল্প-ইতিহাস বিষয়ক নিজস্ব কোন বক্তব্য, দৃষ্টিকোণ বা বিশ্লেষণপদ্ধতি না থাকলে সে-লেখকের লেখা সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠাও তস্করতাদোষে দুষ্ট বলে প্রতীত হবে। অথবা অহেতুক বলে মনে হবে। অপরদিকে, ভারতবর্ষে শিল্প-ইতিহাস চর্চার সাধারণ দৈন্যহেতু এমন আশা করা বাতুলতা যে বক্তব্য বা বিশ্লেষণ-পদ্ধতিগুণে কোন ভারতীয় শিল্প-ঐতিহাসিক বুর্কহার্ডট্, পেটার, ওয়েল্‌ফেলিন্স্কি, হেন্‌লফ্‌লিন, বেরেনসন, হাউসের বা প্যানফস্কির পাশে নিজের স্থান করে নেবেন; আর তা-ও পাশ্চাত্য শিল্প-আলোচনা মারফত।

বাংলা বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করার আদৌ কোন সার্থকতা, অন্তত শিল্প-ইতিহাস চর্চার বর্তমান পরিস্থিতিতে, আছে কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশেষ করে যখন জানি এ-ধরনের পুস্তক সম্বন্ধে তাঁরাই আগ্রহান্বিত হবেন যাঁদের ইংরাজি-জ্ঞান বুর্কহার্ডট, পেটার, ওয়েলনস্কি, হেন্‌লফলিন, বেরেনসন, হাউসের, প্যানফস্কি নিদেন ক্লাইভ বেল বা হার্বার্ট রীড পড়ে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। এবং এও যখন জানি যে শিল্প-ইতিহাসে আগ্রহী ভারতীয় পাঠকের পক্ষে এইসব শিল্পবেত্তাদের বইয়ের সুলভ সংস্করণের লোভ এড়ানো দুষ্কর। তবে কি পাশ্চাত্য শিল্প-বিষয়ক বাংলা অথবা অন্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের কোনই সার্থকতা নেই? অবশ্যই আছে। কিশোর এবং সদ্যযুবক যাঁদের বিদেশী-ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত পরিমিত, তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টির কাজে মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থাদির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। যে-সব ছাত্র উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারুকলা বিষয়ে অনুশীলনরত তাঁদের জন্য মাতৃভাষায় রচিত পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী অত্যাবশ্যকীয়, তা সে-সব গ্রন্থাদি যতই অন্যনির্ভর হোক না কেন। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় কিশোর, সদ্যযুবক এবং বিদেশীভাষা-অনভিজ্ঞ ছাত্-

দের জন্য রচিত পাশ্চাত্য শিল্প-ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকাদিকে শিল্প-ইতিহাস রচনার সাধারণ কয়েকটি শর্ত অবশ্য পালনীয় বলে মেনে নিতে হবে। তা নাহলে শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ধরা যাক, মধ্য-যুগের গথিক শিল্পধারার আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ বললেন, এ যুগে ফ্রেসকো ও সাবেকি পুঁথিচিত্রণ ছাড়াও এক নতুন 'চিত্রাঙ্গিক' (?) দেখা দিল, তা হল রঙিন কাচ। এই বক্তব্য থেকে শিল্পমাধ্যম বিষয়ে কিছু জানা গেলেও, মাধ্যমের ব্যবহার ও তার ফল সম্বন্ধে কিছু জানা গেল কি? লেখক কিন্তু জানাতে চান; দেখা যাক তিনি কী জানান: 'তাঁরা (গথিক শিল্পীরা) পুঁথিচিত্রণেও যুগান্তর ঘটালেন। কারণ পুঁথিতে চিত্রিত মূর্তি-গুলিকে শুধু প্রতীক নয়, আবেগ ও অনুভূতিতে প্রাণবন্ত করে তোলাও তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো।' এ বক্তব্যে শিল্পালোচনা কোথায়, শিল্পবস্তু প্রতীক হয় কী প্রকারে? শিল্প-শরীরে আবেগ নামক নির্বস্তুক চেতনা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় কোন্ জাদুতে? সে-সম্বন্ধে কাহিনী-কার নির্বাক।

তারপর আসুন, 'নবজাগরণের পথিকৃৎ জত্তো দ বনদনে' প্রসঙ্গে, এই 'শিল্পনায়কের কর্মসাধনা ইতালী তথা সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পধারার একটি অবিস্মরণীয় কালচিহ্ন', তার 'মধ্যে একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যময় যুগের শেষ এবং আরেকটি অকল্পিতপূর্ব সম্ভাবনাময় যুগের শুরু...'। জত্তো 'প্রথম মডেল দেখে ছবি আঁকা শুরু করেন'। নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় তথ্য। কিন্তু সেই কারণেই কি তিনি বৃহৎ শিল্পী? 'পূর্ববর্তী শিল্পীদের কাছে তিনি বহুল পরিমাণে ঋণী।' কোন্ শিল্পী নয়? ঋণটা কোথায় আর কোথায় তাঁর নিজস্বতা বা অ-স্বীকৃত ঋণ? 'জত্তোর কাছে চিত্রাঙ্কন ছিল লিখিত রচনার বিকল্প।' প্রমাণ: 'তাঁর ছবি দেখে মনে হয় যেন মঞ্চের উপর বাস্তব অভিনয় চলছে।' বাস্তব অভিনয়? রোমান শিল্পের পতনের পর থেকে শুরু করে মিকেলাঞ্জেলো এবং এল-গ্রেকোর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পুঁথিচিত্রাবলী বাদে কোন্ ধরনের ছবির সাংগঠনিক রূপের উপর মঞ্চ-সংস্থাপনরীতির প্রভাব নেই? লেখকের মতে 'শুধু শিল্পে নয়, শিল্পীদের ইতিহাসেও জত্তোর সাধনার দ্বারা এলো পালাবদল...শুরু হল শিল্পীদের ইতিহাস।' খুব সত্যি কথা; শুধু জানা গেল না শিল্প-শরীরে এই পালাবদলের সাক্ষ্য কিভাবে লিখিত থাকল। জানা গেল না শিল্পগোষ্ঠীর ইতিহাস কী করে ব্যক্তিশিল্পী সমষ্টির ইতিহাসে রূপান্তরিত হল। শিল্পে ব্যক্তিশিল্পী কিভাবে স্বপ্রকাশ হলেন। জানা গেল না কী জাতের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণের ফলে গোষ্ঠীভুক্ত কারিগর শিল্পীর স্থান নিলেন স্ব-চৈতনা-চালিত ব্যক্তিশিল্পী।

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে গথিক এবং জত্তোর শিল্প সম্বন্ধে এবংবিধ আলোচনা করেছেন "পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী" রচয়িতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখো-পাধ্যায়। সাংবাদিকতার কর্মসূত্রে শ্রীমুখোপাধ্যায় বহুকাল যাবৎ য়ুরোপনিবাসী। সে-সুবাদে তাঁর একাধিকবার য়ুরোপীয় চিত্রশালাগুলি দেখার সুযোগ ঘটেছে। তারই ফলশ্রুতি এই পুস্তক। লেখক এই বইকে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী বলেছেন। ইতিহাস নামে অভিহিত করেন নি। সুতরাং বইটিতে যদি কাহিনীর ভাগ প্রাধান্য পেয়ে থাকে তার জন্য লেখককে দোষা যাবে না।

লেখক য়ুরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের কাহিনী শুনিয়েছেন। শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীও বলেছেন। কিন্তু শিল্পে রাজনৈতিক ঘটনাবলী কিভাবে প্রভাবিত হয় বা শিল্প রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীকে কিভাবে প্রভাবিত, নিদেন প্রতিভাসিত করে সে-আলোচনার

আশপাশ দিয়েও লেখক যাননি। শিল্পের ক্ষেত্রে যে-ইতিহাস আলোচনার গুরুত্ব সর্বাধিক—সেই সামাজিক ইতিহাস তথা ধ্যানধারণার ইতিহাসের পরিচয় দেবার এতটুকু প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি। মেডিচিরা কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত কতটুকু ভূখণ্ডের উপর তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে বিরাজ করতেন জানলেই বোঝা যাবে না মেডিচিরা কেন রেনেশাঁসের শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তা জানার জন্য শহুরে বণিকদের পৃষ্ঠপোষক এবং বণিকদের উপর নির্ভরশীল ম্যাকেয়াভেলির প্রিন্সের সঙ্গে গ্রামের সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরোধজনিত নবমানসিকতার উদয় বিষয়ে আলোচনার অবতারণা আবশ্যিক। শ্রীমুখোপাধ্যায় শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। রেনেশাঁসের পর থেকে সব শিল্প-আলোচনা প্রসঙ্গেই শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনীর আলোচনা তাঁদের শিল্প-আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ প্রাসঙ্গিকতা তখনই গ্রাহ্য যখন আলোচক জীবনের ঘটনাবলীকে শিল্পের কারক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারছেন। নতুবা নয়। বিশ্বনাথবাবু কিন্তু শিল্পীদের জীবনকাহিনীর সঙ্গে তাঁদের শিল্পকে যুক্ত করার কোনই প্রয়াস পাননি।

গল্প-শোনার মেজাজ নিয়ে য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এবং শিল্পীদের জীবন-কাহিনীর উপাদের উপাখ্যান কিছু শোনা গেলেও, শিল্পবস্তু নিয়ে কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা অক্ষমার্হ। চিত্রকে যদি চিত্রে ব্যবহৃত মোটিফগুলির ভাষা-বর্ণনা মারফত প্রকাশ করা যায় তবে চিত্ররচনা না করে সাহিত্যরচনা করেই তো একই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া যায়। দৃশ্যমান শিল্পকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। দৃশ্যমান শিল্প-রচনার উপাদানগুলির অর্থাৎ, রেখার, রঙের, ডৌলের, ক্ষেত্রের, মাত্রার এবং বিন্যাসের বিশ্লেষণ করে কোন এক দৃশ্যমান শিল্পবস্তুর পরিচয় দেওয়া চলে, কিন্তু চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। শত বিশেষণ প্রয়োগেও দৃশ্যমান শিল্পবস্তু চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতা অনন্য।

শিল্প-আলোচনায় বিশেষণ ব্যবহার প্রসঙ্গে বলি, ভারতীয় ভাষায় শিল্প-আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষণ-চর্চায় পর্যবসিত হয়। শিল্প-আলোচনায় বিশেষণের ব্যবহার সর্বথা পরিত্যাজ্য এমন কথা বলি না। কিন্তু বিশেষণেরও প্রকারভেদ আছে। বিশেষণ যেখানে বর্ণনামূলক, সেখানে বিশেষণকে অনুসরণ করে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, তা শিল্প-আলোচনার সহায়ক। কিন্তু বিশেষণ যেখানে শুধুমাত্র বিমূর্ত ভাবপ্রকাশক সেখানে তা বক্তার অবিশ্লেষিত মানসিক ভাবের বাহকমাত্র এবং অধিকাংশ সময়ে cliche-তে পরিণত। বর্ণনামূলক বিশেষণের জন্য বইটি ঘাঁটতে হয় প্রচুর।

পুস্তকটিতে ছবির প্রাচুর্য লক্ষণীয়। কিন্তু ছবি সংকলনের ব্যাপারে লেখক এবং প্রকাশক উভয়েরই আরও একটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। বর্ণপ্রধান ছবি, বিশেষ করে যেসব ছবির বর্ণপ্রলেপনে বর্ণান্তর (tonal gradation) বেশি—সে-সব ছবির মনোক্রোম্যাটিক প্রিন্ট প্রায়শই ছবির স্বাদের কোন পরিচয় দেয় না। বিশেষ করে যদি সে-সব ছবি রিপ্রোডাকশনের রিপ্রোডাকশন হয় এবং লেটার-প্রেসে ছাপা হয়। রঙ ছাড়া রঙিন ছবি অর্থহীন। নেহাতই যদি তা ছাপতে হয় তবে রেখা এবং ড্রইং প্রধান ও চড়া-বিপরীত বর্ণবিশিষ্ট ছবিই ছাপা বিধেয়। আর তা মূল ছবির ফোটোগ্রাফ থেকে করা রিপ্রোডাকশন হওয়া দরকার। ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

প্রণবরঞ্জন রায়

সন্ধ্যাসঙ্গীত— পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। বিশ্বভারতী। কলিকাতা ৭। মূল্য সাত টাকা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। বিশ্বভারতী। কলিকাতা ৭। মূল্য ছয় টাকা।

শুনেছি, "জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশের পর সান্নিবিষ্ট একটি খসড়ার প্রতিচিত্র দেখে সুধীন্দ্রনাথ অবাক হয়েছিলেন জীবনানন্দের পরিমার্জনপ্রবণতার কথা ভেবে। অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিতার আপাত অপ্রসাধিত সারল্যে প্রতারিত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথও। এ-দিক থেকে আরো বেশি ছলনাময়ী রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর আশ্চর্য বাক্‌সিদ্ধি, কবিতার অনায়াস ভঙ্গি, ভাবের অপরিমেয় বৈচিত্র্য, অনুভূতির চিত্রল প্রকাশ ক্রমে যেন আমাদের বিশ্বাস করায়, খাঁটি অর্থেই এই কবিতাগুলি 'স্বপ্নলব্ধ'—নির্মিতির কোনো কৌশলই যেন জানা নেই তাঁর, প্রয়োজনও নেই। আধুনিক পাঠকের কাছে এই বাহ্যত প্রযত্নহীন রচনার অজস্রতা তাঁর সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার যৌথ প্রমাণ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিচিত্র ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয় অংশ তাঁর সম্বন্ধে এই প্রায়-বদ্ধমূল ধারণা কিছুটা শোধন করেছিলো। কিন্তু কী প্রভূত তাঁর সংস্কার-সাধনা, কী অমিত তাঁর অনুশীলন, পাঠপ্রচয়ী সংস্করণের সাহায্য ছাড়া তা আমাদের অনুমানের বাইরেই র'য়ে যেতো। তাঁর এই সংস্কারপ্রবণতা থেকেই আমরা বুঝতে শিখি, কোনো রচনাই সংশোধনের অতীত নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'লেও নয়।

এ-কথা মেনে নেওয়া ভালো, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর পাঠান্তরপঞ্জি সংকলন এখনো ততোটা দুরূহ হবার কথা নয়। মাত্র তিনটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর এবং মুদ্রণের যুগেই তাঁর জন্ম। সুতরাং বহুমুখী সংস্করণ রচনার সবচাইতে শঙ্কিল পাঠনির্ণয় বা পাঠশুদ্ধির সমস্যা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নেই, যেমন আছে শেক্সপীয়রের রচনা প্রসঙ্গে। অথবা উইলিয়ম হেনরি আয়ার্ল্যান্ড বা টমাস বোড্‌লারের মতো কোনো রবীন্দ্রপ্রেমীর সন্ধানও এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আশা করা যায়, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি যে-প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছেই থাক্‌-না কেন, এখনো তার পাঠোদ্ধারের জন্য লিপিতত্ত্ব-বিশারদের দ্বারস্থ হতে হবে না। সময়ের দিক থেকে বিচারে আমরা নিশ্চয়ই সুযোগপ্রাপ্ত। কিন্তু আমাদের দেশে বাধা আসে অন্যদিক থেকে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, বাঙলাদেশের শিক্ষিত এবং সাহিত্য নিয়ে ভাবিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এই সত্তরের দশকেও গ্রন্থশুমারির কাজটিকে যোগ্যতার অপব্যবহার ব'লে মনে করেন। বাঙলাদেশের সাহিত্যে প্রতিভাবানের সংখ্যা বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে; কিন্তু পারদর্শীর অভাব ঘটছে একই অনুপাতে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির বেশ-কিছু এখনো ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। যত্নেই আছে হয়তো, কিন্তু ভয় হয়, কারো কারো সম্পত্তিবোধের কবলে প'ড়ে সেগুলো লোকচক্ষুর বাইরেই থেকে যাবে।

গত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর; কিন্তু এই বিচিত্র রচনার মূলে 'মনে হওয়া' ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ নেই। শব্দ বিচার ক'রে সাহিত্যপাঠ শুরু হয়েছে এই সম্প্রতি। আমি বলতে চাইছি, ভাষ্য দেওয়ার অধিকার সবার না-হোক্‌ নিশ্চয়ই অনেকের আছে; কিন্তু অর্থবহ ভাষ্য তখনই দেওয়া যেতে পারে, যখন তথ্যের উপকরণ ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ পান ভাষ্যকার। একটা উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে বেশ কয়েকটি বই লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রভাতকুমারের মতো কয়েকজনের স্মৃতিকে নির্ভর করা ছাড়া কোনো

গানের রচনাকাল জানার প্রায় কোনো উপায় নেই। অথবা ধরা যাক্, "রাজা ও রানী" ও তার পুনর্লেখন "তপতী" নিয়ে বহু প্রবন্ধই বাঙলায় লেখা হয়েছে, কিন্তু অভিনয়কালে "তপতী"রও যে-পরিবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার কোনো সাক্ষ্যই আলোচিত হয় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাটক আমরা পড়ি বটে, তার অভিনয়যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নও ক'রে থাকি; কিন্তু পাঠ্য আর অভিনেয় নাটকে রবীন্দ্রনাথ কোথায় পার্থক্য করেছিলেন, সে-খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। অথচ সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্র-সংগ্রহশালায়, যতোদূর জানি, সেগুলো রক্ষিত আছে।

প্রায় ছয়টি দশক ব্যেপে ["সন্ধ্যাসঙ্গীত" : প্রথম প্রকাশ ১২৮৮—রচনাবলী সংস্করণ ১৩৪৬ ; "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" : প্রথম প্রকাশ ১২৯১—রচনাবলী সংস্করণ ১৩৪৬] রবীন্দ্রনাথ "সন্ধ্যাসঙ্গীত" ও "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র যে-পরিমার্জন করেছিলেন তারই ওপর ভিত্তি ক'রে পাঠভেদসম্বলিত গ্রন্থমালার সূচনা হয়েছে। কাজটি বিশ্বভারতীর এক্তিয়ারভুক্ত। সাধুবাদ তাঁদের অবশ্যপ্রাপ্য। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে-কাজের সূত্রপাত এবং যাঁর হাতে, নিবেদিতপ্রাণ প্রচারবিমুখ সেই মানুষটির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এমন কাজ কখনো সম্ভব ছিলো না। যতো ছোটো হরফেই তাঁর নাম মুদ্রিত থাক্ বা আদৌ না-ই থাক্, ওয়াকিবহাল পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন, এই প্রকল্প পুলিন-বিহারী সেন মহাশয়ের অন্যতম কীর্তি। আমি লক্ষ করেছি, বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমকালীনদের বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, পুলিনবাবুর কাছে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কৃতজ্ঞতা কতো গভীর। কিন্তু এ-কাজ তো একার নয়, বহু বিশেষজ্ঞের সমবেত প্রচেষ্টাতেই একটি নিখুঁত সংস্করণ গ'ড়ে উঠতে পারে। তবে অনুমান করতে পারি, উত্তরসাধকদেরও হাতেখড়ি হচ্ছে তাঁরই শিক্ষায়। দেখে ভালো লাগলো, "সন্ধ্যাসঙ্গীত" সঙ্কলনে পুলিনবাবুর সহকারী শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় একাই এই পর্যায়ে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছেন।

যেহেতু পাশ্চাত্যকে আমরা পাঠনির্ভর সাহিত্যপাঠে উত্তমর্ণ ব'লে মেনেছি, এই গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে স্বভাবতই বহুমুখী বা ভেরিঅরম সংস্করণের কথা মনে আসে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটি সে-মানদণ্ডে বিচার্য নয়, সঙ্কলক দু-জন অবশ্য সে-দাবিও করেননি। এখানে তাঁদের লক্ষ্য পাঠের পরিবর্তন নির্দেশ করা, তার বেশি কিছু নয়, অন্যদিকে বহুমুখী সংস্করণে নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রবর্তনার সঙ্গে সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাবৎ জ্ঞাতব্য তথ্যও পরিবেশিত হয়। কিন্তু যে-দেশে এখনো পাঠককে প্রায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে শিল্পীর সেই কারখানাঘরে নিয়ে যেতে হয়, সেখানে অতোটা আশা করা অর্থহীন বই-কি। আর তাছাড়া বাঙলাদেশে এমন উৎসাহী পাঠক, এমন-কি গ্রন্থাগারের, সংখ্যাও এতোই গল্প যে তাঁদের ক্রয়-ক্ষমতা ও -ইচ্ছার ওপর নির্ভর ক'রে গ্রন্থপ্রকাশের ঝুঁকি নেওয়াও কঠিন। বলতে গেলে এঁরাই প্রথম বাঙলাদেশে তেমন পাঠক তৈরিরও দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

পাঠপ্রচয়ী সংস্করণ সঙ্কলন করতে গেলে যে-উপকরণগুলোর প্রয়োজন (যেমন, প্রাথমিক খসড়া, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন মুদ্রণ, লেখক-সংশোধিত প্রুফ্ ইত্যাদি), সুখের বিষয়, বর্তমান সম্পাদকেরা তার প্রায় সবগুলোই ব্যবহার করতে পেরেছেন। জানি না, নিজের গ্রন্থাবলীর ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের ছিলো কিনা; যদি থেকে থাকে তাহ'লে তার পৃষ্ঠাতেও কোনো কোনো সংশোধনের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র নয়। উপকরণ সংগ্রহ ছাড়াও সম্পাদককে স্থির করতে হয়, কোন্‌টিকে তিনি মূলপাঠ হিসেবে গ্রহণ করবেন। দুটি পথ

খোলা থাকে তাঁর সামনে : ১. প্রাচীনতম (এমন-কি পাণ্ডুলিপি হ'লেও) পাঠটিকে আশ্রয় ক'রে তার ক্রমবিবর্তনের চেহারাটিকে স্পষ্ট করা। ২. রচয়িতার জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পাঠটিকে আদর্শ ধ'রে নিয়ে পাদটীকায় পূর্বেতন (এবং যদি গ্রন্থপ্রকাশের পরেও লেখক পুনরায় কোনো সংশোধন ক'রে থাকেন, তবে সেই) পাঠসমূহের নির্দেশ দেওয়া। পাঠকের দিক থেকে লেখকের বিবর্তমান মানসতার রূপরেখা চিনে নিতে প্রথমটি নিঃসন্দেহে বেশি উপযোগী। কিন্তু অনেক সময় একটি পরিচিত কবিতা হয়তো প্রথম পাঠে এমনভাবে থাকে যে পাঠক সেটিকে সনাক্ত করতে পারেন না, উভয়ের মধ্যে একটা অপরিচয়ের দূরত্ব ঘটে যায়। যেমন, 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা/নিশীথ যামিনী রে' এই পদটির বিন্যাসে প্রথমেই চোখে পড়ে : 'আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা/চমকত দামিনী রে'—'ঘোর ঘনঘটা' ছাড়া এটিকে ঐ অতি-পরিচিত গানের পূর্বলেখ ব'লে চিনে নেওয়া দুষ্কর। সে-দিক থেকে আদর্শ হিসেবে প্রচলিত পাঠের ওপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত; বর্তমান সম্পাদকদ্বয় উভয় গ্রন্থেই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সাঙ্কেতিক সংখ্যা বা বর্ণসমষ্টি ব্যবহার ক'রে অনেক সময় পাঠান্তর-সূত্র নির্দেশ করা হয়, তাতে স্থানসঙ্কোচও হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পাঠককে বার-বার ফিরে যেতে হয় সঙ্কেতসূত্রের নির্দেশিকায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্য খণ্ডে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি জন মনরো সম্পাদিত ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ London Shakespeare গ্রন্থের। দ্বিতীয়ত, আমার বিশ্বাস, মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞরাই এই সংস্করণের একমাত্র অভিপ্রেত পাঠক নন। এই সুযোগে সঙ্কলকেরা বৃহত্তর পাঠকসমাজেও উৎসাহ সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

প্রসঙ্গত আমার কয়েকটি আপত্তির উল্লেখ করছি। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র সঙ্কলক জানিয়েছেন : 'যে-সকল স্থলে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হইয়াছে (কোনো কোনো মুদ্রণপ্রমাদ পূর্ববর্তী সংস্করণ হইতে চলিয়া আসিয়াছে) সে-ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করিয়া পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।' (পৃ ১০৫) কোনো প্রমাদেরই (বিশেষত যখন লেখকই প্রুফ দেখেছেন) সংশোধন মূলপাঠে করা বিধেয় নয় ; পাদটীকায় বরং শুদ্ধ পাঠের উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, এ-জাতীয় প্রামাণ্য সংস্করণের মূল্য সঙ্কলকের প্রচ্ছন্ন থাকার কৃতিত্বে। দুটি গ্রন্থেই যেহেতু একই গ্রন্থমালার অন্তর্গত, পরিকল্পনা বা বিন্যাসে একই নীতি প্রত্যাশিত। "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এ প্রকাশসূচী বিশদ ও অনুপুঙ্খভাবে সঙ্কলিত, "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র প্রকাশসূচী নিছকই তালিকা। কয়েকটি গ্রন্থনামের সংক্ষেপেও দুটি বইতে তফাত আছে। এক হ'লে পাঠকের পক্ষে অভ্রান্ত হওয়া সহজ হয়।

এই সংস্করণটি ব্যবহার করতে গিয়ে "রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী"র অভাব বিশেষ ক'রে বোধ করেছি। পুলিনবিহারী সেন দীর্ঘকাল ধ'রে সেটি সঙ্কলন ক'রে চলেছেন। বলতে গেলে পাঠভেদসম্বলিত গ্রন্থমালার পরিপূরক হিসেবে সেই গ্রন্থটির প্রকাশ না-হওয়ায় এই প্রকল্প এখনো অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে। বর্তমান গ্রন্থমালার সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ হ'লে তবেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার উপযুক্ত সাঁকো তৈরি হ'তে পারবে।

স্বপন মজুমদার

দুই বাংলার সেরা গল্প—শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত। বাক্ সাহিত্য। কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি ওপার বাংলার গল্পলেখকদের গভীর আস্থা, তাঁরা জীবনকে একটা সুস্থতার পটভূমিতে পেতে চান এবং যেখানে পান না সেখানেই তাঁদের অভিযোগ। এপার বাংলার গল্পলেখকদের মানসিকতা অন্যরকম, বিষাদ অবক্ষয় অনাস্থা তাঁদের অস্থি-মজ্জায় ঢুকে গেছে, জীবন-অভিমুখীনতা নয়, জীবনের উৎকেন্দ্রিক অর্থহীনতাকেই তাঁরা বেশি করে জেনেছেন। এই মন্তব্য অবশ্যই সামগ্রিক, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবু দুই বাংলার গল্পলেখকদের মেজাজের ভিন্নতা যে মূলত এইখানেই তা স্বীকার করতে হবে।

এই ভিন্নতার কারণ নির্দেশ করতে আমি যাবো না। তা সহজেই অনুমেয়। ওপার বাংলায় এখন সবদিক থেকেই জেগে-ওঠার সময়, নতুন উদ্দীপনা, সম্ভাবনা প্রভৃত। একটা নতুন জাতি যেখানে জন্ম নিচ্ছে সেখানে জীবনের প্রতি আকর্ষণ যে প্রবল হবে, এটা স্বাভাবিক। এপার বাংলায় তেমন কোনো উজ্জীবন নেই, উদ্দীপনা নেই, যা আছে তা কখনো এক অন্তর্মুখ অভিনিবেশ, কখনো ছিন্নমূল কাতরতা।

মানসিকতার এই ভিন্নতা, জীবনের প্রতি এই আকর্ষণ ওপার বাংলার গল্পলেখকদের এক ধরনের ক্ষতি করেছে বলেই আমার মনে হয়। তাঁরা জীবনের উপরতলাকে যেমন দেখেছেন, তার আনন্দ তার ব্যর্থতা তার তিক্ততাকে, তেমন করে তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন নি। জীবনকে তার সম্পূর্ণতায় জানতে হলে জীবন থেকে সরে দাঁড়ানো প্রয়োজন, আবেগ উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতায় তাঁরা এখনো সেই নিরাসক্ত অভিনিবেশকে লাভ করতে পারেন নি যা যে-কোনো শিল্পীর কাছেই অত্যাবশ্যক। এর জন্য অবশ্য আক্ষেপ করার কিছু নেই, হতাশ হবারও কিছু নেই, তাঁরা ক্রমপরিণত হচ্ছেন এটা সহজেই বোঝা যায়।

বোঝা যায় যখন কাজী আবুল হোসেনের 'মন-গহন' কিংবা রাবেয়া খাতুনের 'হাত' গল্পের পাশাপাশি সাখাওয়াত কাদিরের 'চন্দনে মৃগপদচিহ্ন' গল্পটি পড়ি। 'মন-গহন' শিশু-শোভন ভাবপ্রবণতার গল্প, 'হাত'ও প্রায় তাই, 'চন্দনে মৃগপদচিহ্ন' একটি আধুনিক মনের তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভবের প্রতিচ্ছবি। এখানে সেই তরল উচ্ছ্বাস নিয়ে জীবনকে দেখা নেই, যেমন করে কায়েস আহমেদ 'অপূর্ণ, তুমি ব্যর্থ বিশ্ব'তে দেখেছেন। এ-কাহিনী সমগ্র অস্তিত্বের কাহিনী, অস্তিত্বের অন্তঃসারের কাহিনী।

বস্তুত 'চন্দনে মৃগপদচিহ্ন' আমার কাছে ওপার বাংলার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য গল্প মনে হয়েছে। এই গল্প পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বোঝা যায় ওপার বাংলার গল্পে দিন-বদলের পালা শুরু হতে আর দেরি নেই। 'চন্দনে মৃগপদচিহ্ন'র রচনারীতি অবশ্য একটু বেশি উচ্ছ্বাসী, সেটা না হলেই ভালো হতো। রচনাকৌশলের নিপুণতার জন্য বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'মাছ' গল্পটির কথা উল্লেখ করতে হবে। 'মাছ' গল্পটির কাহিনীগত গুণে তেমন কিছু নয়, যে বাউণ্ডুলে চরিত্রটি এখানে আঁকা হয়েছে তা আমাদের পূর্বপরিচিত, একটু সেকেলে যদি বলি তাহলেও অন্যায় হবে না, কিন্তু গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে তার সংহত সুন্দর কাঠামোর উপর।

এই কলাকৌশল বিষয়ে ওপার বাংলার গল্পলেখকেরা অনেকেই বেশ সচেতন, অনেক সময় একটু বেশি সচেতন, যার ফলে শব্দপ্রয়োগ অব্যবস্থ হয়, এসে যায় অতিকথনের ঝোঁক, অনাবশ্যক কাব্যময়তা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শেখ আতাউর রহমানের 'অন্ধকার আছে' নামের

গল্পটি। তৎসম শব্দের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার এবং অকারণ কাব্যধর্মিতা গল্পটির অনেকখানি নষ্ট করেছে। আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে সরে দাঁড়াতে পারলে তা আরো শক্ত মাটির ভিত পেতো সন্দেহ নেই। প্রবীণ লেখক শওকত ওসমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর বিষয়ে অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। অকারণ বিশেষণ, অপ্রচলিত উপমা ব্যবহারের প্রবণতায় তাঁর ভাষা অনেক সময়েই হোঁচট খায়, তবু তাঁর 'ঘোর নিদ্রা' যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা তা স্বীকার করতে হবে।

শামসুল আলমের 'অনুক্ষণ অনুভবে' গল্পটি এই সংকলনের অন্যতম সেরা গল্প। কেবল রচনা-নৈপুণ্যের জন্য নয়, উপলব্ধির আন্তরিকতায় গল্পটি অমোঘ স্পর্শ করে। যে আনন্দ, বিশ্বাস এবং ভালোবাসার উজ্জীবন এই গল্পে, এপার বাংলার সাম্প্রতিক গল্পের পাশাপাশি তা এক উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য। এই ধরনের মানসিকতা আধুনিক দোলাচল-বিক্ষুব্ধ সময়ে সম্ভব কিনা সে আলোচনার প্রয়োজন নেই, এটা সহজেই বোঝা যায় গল্পটি কোনো বাইরে-থেকে-পাওয়া কৃত্রিমতা নয়, একটা হয়ে-ওঠা সম্পূর্ণতা।

এই সংকলনের সম্পাদক জানিয়েছেন 'এই সংকলনে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তরুণ গল্পকারদের রচনাই স্থান পেয়েছে', এপার বাংলার ষাটের দশকের কোনো গল্পলেখকের রচনা যদিও আমি এই সংকলনে খুঁজে পাইনি। জানি না ওপার বাংলার ষাটের দশকের লেখকেরা সত্যি-সত্যিই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কিনা। যাই হোক, এপার বাংলার ষাটের দশকের লেখকেরা যে এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পই পছন্দ করবেন না, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। এপার বাংলায়, বিশেষ করে ষাটের দশকে, গল্প বিষয়ে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, রমানাথ রায় বা সুব্রত সেনগুপ্তের গল্প যদি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যেতো। তা না হওয়াতে সংকলনটির সম্পূর্ণতা ব্যাহত মনে হয়।

এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি ওপার বাংলার সাম্প্রতিক গল্পের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা বোঝা দুষ্কর। এপার বাংলার গল্পবিষয়ে আমি কোনো আলোচনা করলুম না। তার বিশেষ প্রয়োজন নেই, তাঁরা সকলেই পরিচিত লেখক। তবু বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা' এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘরের পথ' নামের গল্প দুটির উল্লেখ করার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। এই দুটি গল্পই, আমার বিবেচনায়, বাংলাভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে।

আলোক সরকার

নাটকের নাম ভীষ্ম—মণীন্দ্র রায়। লিপিকা। ৩০/১, কলেজ রো। কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তিরিশের কবিরা, সাম্প্রতিককালে একমাত্র বুদ্ধদেব বসু ছাড়া, কেউ কাব্যনাট্য রচনায় হাত দেননি, যদিও রবীন্দ্রকাব্যে তার নিদর্শন ছিল, পথের নিশানা ছিল। সুতরাং আত্মপ্রকাশের এই কর্মটি তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবু যে তাঁরা কাব্যনাট্য রচনা করেন নি তার ব্যক্তিগত কারণ থাকা অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক কারণও ছিল। আধুনিক কবিরা তখন খানিকটা উৎপাতের মতো দেখা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যে অভ্যস্ত পাঠকরা তখনো আধুনিক

কবিতার জন্যে তৈরি হন নি, সুতরাং আধুনিক কবিদের রচিত কাব্যনাট্যেরও মঞ্চস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া অভিনেতা অভিনেত্রীই বা কোথায় পাওয়া যেত? নাটক রচনা এবং তার অভিনয়ে আজ যে প্রগতি দেখা দিয়েছে তখন তার সূচনায় সম্ভাবনাও দেখা যায় নি। সেই সময়ে আধুনিক কবিরা কাব্যনাট্য-রচনা করলেও "শিবাজী" বা "চন্দ্রগুপ্তের" দাপটে মঞ্চে স্থান পেত না। অতএব তখন কাব্যনাট্য রচনার চেয়ে কবিতা রচনাই অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল। মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা না থাকলে নাটক বা কাব্যনাট্য লিখে কী লাভ? রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবশ্য এসব অসুবিধে একেবারেই ছিল না। পাঠক এবং দর্শক পুরোপুরি তৈরি ছিল, মঞ্চের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন, অভিনেতা অভিনেত্রীও তিনিই তৈরি করেছিলেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথম কাব্যনাট্য বোধহয় রচনা করেছিলেন মণীন্দ্র রায়। তাঁর সে নাটক এখন বিস্মৃত হলেও এই তথ্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। তারপর তিনটে দশক চলে গেছে, মণীন্দ্রবাবু কবিতা রচনায় নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন, কাব্য-নাট্যে আর হাত দেন নি। ইতিমধ্যে অনেকে কাব্যনাট্য রচনা করেছেন, কিছু কিছু মঞ্চস্থও হয়েছে। কিন্তু এমন কোন কাব্যনাট্য রচিত হয় নি যা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে লাভজনকভাবে অভিনীত হতে পারে। অস্বীকার করে লাভ নেই যে আধুনিক বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির তুলনায় বাংলা কাব্যনাট্য বড়ই ম্রিয়মাণ।

"নাটকের নাম ভীষ্ম" মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যটির কাহিনী দুটি স্তরে বিভক্ত--অজয়-উমা-হিতেন-কেয়া-র কাহিনী এবং ভীষ্ম-অম্বা-দ্রৌপদী-অর্জুন-এর কাহিনী। প্রথম কাহিনীর নায়ক অজয়, দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক ভীষ্ম। এক অন্তর্বাহী মানবিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর এই দুই স্তর নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে বেষ্টন করে আছে এবং পারস্পরিক প্রভাবে অবশেষে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। এই দুই স্তরের অন্তর্বন্ধন অত্যন্ত মসৃণ, অবাধ এবং সুসংগত। ফলে পাঠক বা দর্শক অনায়াসে স্তর থেকে স্তরান্তরে বিচরণ করতে পারেন।

অথচ ঘটনায় ফাঁক অবশ্যই আছে। যেমন ভীষ্ম চরিত্রে। ভীষ্মজীবনের সব ঘটনাই এ-নাটকের বিষয়ীভূত নয়, সুতরাং এক ঘটনা থেকে সম্পর্কহীন অন্য ঘটনায় সঞ্চরণ কিছু ফাঁক রেখে যাবেই। তাছাড়া যেহেতু নাটকের কাহিনী দুটি ভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত তাদের অন্তর্বর্তী ফাঁক অবশ্যই আছে। মণীন্দ্রবাবু দক্ষ নাট্যকারের মতো এইসব বিভাগকে সমবেত করেছেন। একাজে নাটকের নানা চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন প্রথম অঙ্কে ভীষ্ম অম্বার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলে ঘটনার একটি পর্যায় শেষ হল। পরবর্তী ঘটনা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। মণীন্দ্রবাবু এই দুই দূরবর্তী ঘটনার সেতুবন্ধন করেছেন হিতেনকে দর্শকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে। তার বক্তব্য:

ভদ্রমহোদয়গণ, এ নাটকে আমি
এখনো প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দেখুন কপাল,
বারে বারে রসভঙ্গ করছি। দয়া করে
ক্ষমা করবেন। এবার দেখুন সে দৃশ্য
যার জন্যে আজো জগৎসংসারে ভীষ্ম
কিছুটা দুর্বোধ্য, মানে, বলছি আমি সেই
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা, কেন

ভীষ্মের চরিত্রে তার প্রতিবাদ নেই।
বস্তুত আমার কিংবা আপনারও কতোটা
আছে তা সন্দেহ।...কিন্তু শুধু হে বিশ্ব,
কী বলেন মহামতি কুরুপতি ভীষ্ম।

এ নাটকে ছিতেনের এটা দুনম্বর ভূমিকা। এবং এর ফলে ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে পদক্ষেপ যেমন সহজ হয়েছে নাটক তেমনি বৈচিত্র্যময়ও হয়েছে। কাব্য এবং নাটকীয়তা এ নাটকে পরস্পরের পরিপূরক। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় নি। অবশ্য কাব্যনাট্যে সব সময়ই এরকম হতে হবে তা নয়।

"নাটকের নাম ভীষ্ম" কোথাও অতিকাব্যজর্জরিত নয়। অথচ যেমন হওয়া উচিত, তীব্র মুহূর্তগুলিতে কবিতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেমন ভীষ্মের আত্ম-উপলব্ধি:

'আমি যে গাঙ্গেয়, আমি গঙ্গার তনয়;
দিনে দিনে পলি জমে আমিই কি নয়
মাটিতে মানুষে বাঁধা নিহিত স্বদেশ?
দুরন্ত বিষের জ্বালা কণ্ঠে ধরে তাই
আমি আজো শান্তি চাই, প্রাণ চাই, চাই
আলোর উন্মেষ!'

নাটকের কাহিনী দুই ভিন্নধারাবাহী এবং ভিন্ন যুগের অন্তর্গত হলেও কোথাও অস্পষ্ট নয়, শ্লথ নয়। কোথাও সামঞ্জস্যহীনও নয়। মঞ্চে বর্ণাঢ্য পৌরাণিক জীবন, রাজকীয় ঐশ্বর্য ও সাজসজ্জা এবং সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের বর্ণহীনতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও সংগ্রামের সমাবেশ কাব্যনাট্যটির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে।

মৃগাঙ্ক রায়

নিরহঙ্কার
গর্ব ...
দীন বাউলের গর্ব
তার একতারা।
একতারার তারে যে
সুরের ঝঙ্কার সে তোলে
তা লক্ষ প্রাণে সঞ্চারিত
হ'য়ে অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি
করে। বাউল ও তার একতারা
আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের
সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত
অনাড়ম্বর রেলপথও আমাদের গর্ব।
বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্র গ্রথিত করে,
বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সমগ্র
দেশকে সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
পূর্ব রেলওয়ে

The VIPs

Very Indignant Persons

They expect us to fulfil our tasks honestly. But are we doing so?

Who are they? Why are they so indignant? And with whom? They are the large mass of India's population, either under-employed or unemployed. Their employment, their hopes, rest upon the honest performance of those employed like us, who work in factories, in offices, in government and industry. The employed create the conditions for reducing unemployment and under-employment.

Every single person employed—manager, engineer, technician, factory worker, clerk, miner, doctor, lawyer, civil servant—has to answer these indignant persons; whether he has been more concerned with preserving and improving his privileged position, than with fulfilling his assigned tasks with sincerity.

Those of us who are involved in the manufacture of steel have a special responsibility in meeting the challenge posed by these indignant persons, because there is no employment which does not involve the use of implements and facilities and there are few implements or facilities which do not involve the use of steel at some stage or the other.

Our task in Hindustan Steel is to meet the rising tide of indignation, by providing the steel needed for development. Dedication, discipline, peace at the working place and the will to work are our most important resources. Do not destroy them. Help us to build.

iam-HSP-10A/71

উষা

পাদ প্রদীপের আলোয়
দু'টি নকশাই সামনে চওড়া। বস্তুত আরো আরামের কথা ভেবেই তৈরি। অথচ খুব একটা বেশি চওড়া নয়। তাই এই জুতো পায়ে আপনাকে আধুনিক দেখাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কখনই মত মনে হবে না। এনভয় ডার্বি ৫৬ ও এনভয় ক্যাজুয়াল ৯০-ও এখন পাওয়া যাচ্ছে।
নতুন বাটা এনভয়। আশ্চর্য আধুনিক দু'টি নকশা। এনভয় ১০: সামনে চামড়ার স্ট্র্যাপ ও স্থায়ী বকলেস যুক্ত স্লিপ-অন। এবং এনভয় ২৯, ফিতে বাঁধা— সামনে ও দু'পাশে সাঁইত্রিশ নম্বর।
এনভয় ২৯
সাইজ ৫-১০
৩৬.৯৫
এনভয় ১০
সাইজ ৫-১০
Bata

বর্ষ ৩৩ কার্তিক পৌষ ১৩৭৮

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ৩৩ কার্তিক পৌষ ১৩৭৮

ছন্দ

আলোক সরকার

ছন্দ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য ছন্দহীনতা। মন্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রচলিত ধারণায় ছন্দ শব্দটি সমতারই সমার্থক, কখনো সেই সমতা প্রত্যক্ষ কখনো অন্তর্নিহিত। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রত্যক্ষ, অক্ষরবৃত্তে অন্তর্নিহিত; মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি পর্ব প্রত্যক্ষত সমতা রক্ষা করে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সেই সমতা জোড়মাত্রার সাঙ্গাত্যের উপর নির্ভরশীল। কেবল কবিতায় নয়, সাধারণ ব্যবহারে ছন্দ শব্দটি শৃংখলারই অর্থদ্যোতক, ছন্দহীনতা বিশৃংখলারই অর্থদ্যোতক, ছন্দহীনতা বিশৃংখলারই নামান্তর। প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য থেকে সরে এসে যেমন অনেক কর্মই মানবিক জীবনযাপনের উপর নীরক্ত যান্ত্রিক সংস্কাররূপে আধিপত্য বিস্তার করে, এ-ক্ষেত্রেও তেমন হয়েছে বলে মনে হয়।

বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চীর বিরহবেদনায় অভিভূত হয়ে প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করেন, তখন, বাস্তব ক্রৌঞ্চীর বিরহবেদনা আর নয়, ছন্দহীনতার রোমাঞ্চকর রহস্যই তাঁকে বিস্মিত অভিভাবে সমাচ্ছন্ন করে। এই যে শ্লোক তিনি উচ্চারণ করলেন মানবিক ভাষাব্যবহার তার অনুরূপ নয়, মানবিক ভাষাব্যবহারের যে ছন্দ, যে শৃংখলা, যে নিয়মানুবর্তিতা ইতিপূর্বে প্রচলিত, এই শ্লোক, এই শ্লোকের ভঙ্গিমা তার অনুরূপ নয়, এমনকি মানবিক ভাষাব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে বিশৃংখল এই শব্দসংযোজনা মানবিক বোধ-উপলব্ধির প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিকতাকেও পাল্টে দিচ্ছে। এই ছন্দহীনতা, এ বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দময় সুশৃংখলার প্রতিপক্ষ—নিয়মনির্ভর বস্তুজগৎ, সংস্কারনির্ভর অনুভূতিজগৎ সে নিজের রৌদ্রে সুস্পষ্ট করে নিতে চায়, দিতে চায় অন্য প্রাণনা, অপূর্বশ্রুত ধ্বনি। আদিকবির বিস্ময় তখন আর সংস্কারনির্দেশিত বেদনা নয়, রূপপ্রকল্প, রূপপ্রকল্পের অনিবার্য ক্ষমতার উপলব্ধিতে তিনি অভিভূত।

বস্তুত ছন্দ শব্দটি নিয়ে আমাদের বোধ—এবং অনেকসময় অভিজ্ঞতা—ভ্রান্তিজনক। সংস্কারবশত আমরা যেমন ছন্দকে শৃংখলার সমার্থক বুঝি সেইরকম অনেক কবির হাতে ছন্দ শৃংখলেই পরিণত হয়। ছন্দ বিষয়টিকে কেবল নিয়মানুবর্তী শব্দসংযোজনা অথবা সুশৃংখল বিন্যাস বলে ভাবলে এইরকম ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, ছন্দ আসলে কবিতার রূপপ্রকল্পের একটা প্রধান অঙ্গ, সে রূপপ্রকল্প বন্ধন নয়, মুক্তিরই সহজাত সহায়ক। ছন্দের

প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে ফর্ম বা রূপপ্রকল্পের বিষয়টিকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে।

শিল্পকর্ম রূপনির্ভর, বিশ্বপ্রকৃতি রূপবর্জিত, স্বতঃস্ফূর্ত। শিল্পকর্মের যে রূপ তার পিছনে মানবিক সচেতন পরিশ্রম কাজ করে, বিশ্বপ্রকৃতির শিল্পকর্মের পিছনে কাজ করে এক অমোঘ যান্ত্রিকতা, প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা। এই যান্ত্রিকতা, এই নিয়মানুবর্তিতা ফুলকে ফুলের মতো করে, ফলকে ফলের মতো। যা স্বাভাবিক যা লৌকিক তাকে স্বাভাবিকতা, লৌকিকতার ভিতরেই আবদ্ধ রাখে। মানবিক শিল্প রূপবর্জিত প্রাকৃতিক ফুলকে, রূপবর্জিত ফলকে রূপের বিন্যাসে সাজায়, তাকে তার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা থেকে সরিয়ে এনে, প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতা থেকে সরিয়ে এনে নিজের বিন্যাসে সাজায়, সেই বিন্যাস স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ছন্দের বিপক্ষে কাজ করে, তা ছন্দহীন, আপন অর্থে স্বাধীন। মানবিক শিল্পকর্মের রূপ, তার বিন্যাসই মূলত ছন্দহীন, ছন্দ যা রূপপ্রকল্পের একটা প্রধান অংগ, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মনিরুদ্ধ স্বাভাবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ছন্দহীনতাকেই অনিবার্য ফিরিয়ে আনতে চায়।

মানবিক শিল্পকর্ম বিশ্বপ্রকৃতির শিল্পসম্ভারের প্রতিপক্ষে কাজ করে। বিশ্বপ্রকৃতির শিল্প স্বতঃস্ফূর্ত, অপরিকল্পিত; মানবিক শিল্প সচেতন নির্মাণ, পরিকল্পিত। বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে মৌল উপাদানগুলি সংগ্রহ করে মানবিক শিল্প যখন তাকে পরিকল্পিত রূপ দেয়, তখন সেই শিল্প এক অনন্যতা লাভ করে, বিশ্বপ্রকৃতির শিল্পসম্ভারের পাশাপাশি তখন তা হয়ে ওঠে এক বিশিষ্টত, অলৌকিক এবং রহস্যময়। বিশ্বপ্রকৃতির শিল্প অবাধ, মানবিক শিল্প অসীম—বিশ্বপ্রকৃতির শিল্প তার চারপাশে কোনো বাধা রাখে না, তা অনন্তের পটভূমিতে হয়ে ওঠে, মানবিক শিল্প এই বন্ধনকে অত্যাবশ্যক মনে করে, এই বন্ধনের ভিতরে এনে সে পরিচিত বস্তুকে তার সার্বিক্যাক নিয়মনিরুদ্ধ সাধারণ উপস্থিতি থেকে মুক্ত করে, তার ভিতরে এনে দেয় এক অপরিজ্ঞাত দ্যুতি, ধ্বনিময় গহনতা। মানবিক শিল্পের পিছনে এই পরিকল্পনা, এই বন্ধন পরিচিতকে অপরিচিতের রহস্যে সাজায়, মুক্ত করে প্রাত্যহিকের ধূলিম্লানতা থেকে, বিশ্বপ্রকৃতির শিল্পের অভ্রান্ত নিয়মানুবর্তী পৌনঃপুনিক আবেদনের পাশাপাশি তাকে করে তোলে এক অনিবার্য দ্বিতীয়, অভাবনীয় ঘোষণা।

মানবিক শিল্পের পিছনে এই যে পরিকল্পনা, এই যে বন্ধন এটাই রূপপ্রকল্প, কবিতার প্রসংগে এটাই কাব্যকলা। কবিতার প্রধানতম উপাদান ভাষা, এই ভাষার প্রতিটি শব্দের অর্থ পূর্বনির্ধারিত, এই ভাষাবিন্যাসের একটা সার্বিক্যাক নিয়ম আছে। ছন্দ যা কাব্যকলার অন্যতম অংগ, তা ভাষাবিন্যাসের এই সার্বিক্যাক নিয়মকে অমন করে, ভাষাবিন্যাসের প্রচলিত সার্বিক্যাক নিয়মের ভিতরে সে এক বিশৃংখলা আনে, আনে ছন্দহীনতা। এই ছন্দহীনতার ভিতরেই স্পন্দিত হয়ে ওঠে ধ্বনি, যা কেবল শব্দকে তার আপাত অর্থ থেকে দূরে নিয়ে যায় না ভাষাকে তার নিয়মনিরুদ্ধ প্রতিন্যাস থেকে, শব্দ-ভাষার সহজ স্বাভাবিকতাকে বদলে দেবার সংগে-সংগে, সে ভাষানিশ্চিত শব্দনিশ্চিত বস্তুজগৎকেও তার স্থিরকেন্দ্র থেকে চ্যুত করে, প্রাকৃতিক বস্তুজগতের বিশ্রামবিবশ ছন্দোময়তার অন্তর্লোক ধরে নাড়া দেয়।

বিশ্বপ্রকৃতি অবিচল নিয়মনিরুদ্ধ; মানবিক বোধ-উপলব্ধি-সংস্কারশাসিত। কুঁড়িটা হয়ে-ওঠার আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে ফুলের বিন্যাস, ফুলটা দেখার আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে মানবিক চিত্তে ফুলের প্রতিক্রিয়া। এই নিয়মানুগ যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তিই শিল্পের অভিষ্ট; তা একদিকে যেমন বাগানের চেনা ফুলের দ্বিতীয় বিন্যাস চায়, অন্যদিকে সেই

অপ্রত্যাশিত বিন্যাস সংস্কারনির্মিত মানবিক বোধ-উপলব্ধির ভিত্তিভূমিকেই টলিয়ে দিতে চায়। মানবিক শব্দ, মানবিক ভাষা একক এবং অনিবার্য বস্তু, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপস্থাপন ঘটাবে, সেই বস্তু প্রাকৃতিক বস্তু, সেই অভিজ্ঞতা, সেই অনুভূতি সংস্কারনির্মিত চেতনার যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। ছন্দের কাজ প্রবহমান মানবিক শব্দ, মানবিক ভাষার পরিচিত স্রোতের ভিতর এক বিরুদ্ধ তরঙ্গ তোলা যা সব বস্তু অভিজ্ঞতা অনুভূতিকে বিদেশীর সাজে সাজাবে।

বালকবয়সে 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' এই গানটি রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল। যে চেনা, যে একান্ত প্রিয়জন, একান্ত ঘরের মানুষ সে যখন বিদেশিনীর সাজে সাজে তখনই তো বিস্ময়, তখনই তো সেই রহস্যের উদ্ভাস যে রহস্য সব শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। প্রাত্যহিকতার দিনগুলি, আবেগ-নিরাবেগগুলি কখনোই তেমন ক'রে নাড়া দেয় না, যা সরল যা স্বাভাবিক তার সঙ্গে আমাদের একটা অভ্যাসের প্রিয় সম্পর্ক হ'তে পারে বটে কিন্তু তা আমাদের চেতনার স্নায়ুর কোনো জড়তাকেই ঘোচাতে পারে না, আমাদের বিস্ময়ও জাগাতে পারে না। এই জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনে তাকে বিদেশিনী সাজাতে হয়, হয়ে উঠতে হয় রহস্যময়, আনতে হয় তার পরিচিত রূপের বিন্যাসের উপর একটা আচ্ছাদন, যা তার পরিচিত রূপের সুশীল ছন্দময়তাকে আড়াল করবে, আনবে অতিরিক্ত বাইরের ছন্দহীন, আনবে অসমতা, তার পরিচিত দেহের কাঠামো, রূপ, রূপসজ্জা মেঘময় বেজে উঠবে। তখন তাকে আর অভ্যস্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখা নয়, পূর্বনির্ধারিত সংস্কার নিয়ে দেখা নয়, কোনো অনুষঙ্গ-পীড়িত মন নিয়ে গ্রহণ করা নয়, তখন তা একদিকে যেমন নিজের অর্থে হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তা আমাদের বিশুদ্ধ সত্তাকে উজ্জীবিত করে।

শিল্পমাত্রই রহস্যময়, কল্পনা-আশ্রয়ী। সেই কল্পনা বস্তুজগতের বাইরের কোনো সামগ্রী নয়, তা বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা-উপস্থিতিগুলির নতুন বিন্যাসের ভিতর দিয়েই হয়ে ওঠে। রূপপ্রকল্প, কবিতার ক্ষেত্রে কাব্যকলা, সেই নতুন বিন্যাসকে চায়, ছন্দ, যা কাব্যকলার প্রধানতম অঙ্গ, বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা-উপস্থিতিগুলিকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে তাকে ক'রে তোলে রহস্যময়। যা পরিচিত, যা প্রাত্যহিকের, যা প্রতিদিনের চেনা, ছন্দের আচ্ছাদনে তা হয়ে ওঠে অতলস্পর্শ ধ্বনিময় অপূর্বতা। আমাদের অভিনিবেশের উপর তখন আর বস্তু-জগতের অভিজ্ঞতা-উপস্থিতিগুলির আধিপত্য নয়, সেই রহস্যময় যেমন তার নিজের উদ্ভাসে জাগে, সেইরকম আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্কারনির্মিত জড়চেতনাকেও সে স্বাধীন বিশুদ্ধ পূর্ণতায় জাগিয়ে তোলে। ছন্দের আচ্ছাদন বস্তুজগতের স্বাভাবিকতাকে পাল্টে দেয়, পাল্টে দেয় আমাদের চেতনলোকের স্বাভাবিকতা, বস্তুজগৎ চেতনার জগতে সে আনে ছন্দহীনতা, আনে বিশৃঙ্খলা।

যা কিছু আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে উজ্জীবিত করে তাই-ই আনন্দময়, তাই-ই রহস্যময়। সংস্কার-অনুষঙ্গপীড়িত আমাদের প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা প্রাকৃতিক বস্তুজগতের ভিতর এক স্থিতাবস্থায় আচ্ছন্ন থাকে। প্রাকৃতিক বস্তুজগতের স্বাভাবিকতাকে ছন্দ যখন অস্বাভাবিক ক'রে তোলে, সংস্কার-অনুষঙ্গপীড়িত আমাদের ব্যক্তিসত্তা সেই অস্বাভাবিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সচকিত হয়, পূর্বপ্রচলিত সকল গ্রহণপদ্ধতিই তখন তার কাছে অকেজো মনে হয়, তখন সেই অস্বাভাবিকতাকে গ্রহণ করার প্রয়োজনে ব্যক্তিসত্তা সকল সংস্কার-ঊর্ধ্ব অনুষঙ্গ-ঊর্ধ্ব আপন অর্থে জেগে ওঠে, উজ্জীবিত হয়। প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতাকে পাল্টে দিয়ে ছন্দ আমাদের ব্যক্তিসত্তার প্রাকৃতিকতাকেও পাল্টে দেয়, পরিচিতকে ক'রে তোলে রহস্যময়, সেই

রহস্যময়কে গ্রহণ করবে যে ব্যক্তিসত্তা তার নিয়মনিরুদ্ধ স্বভাবের সুশীলতাকে করে খানখান। ব্যক্তিসত্তা তার স্বভাবের স্বাধীনতায় হয়ে ওঠে আনন্দময়, রহস্যময়তার উজ্জীবনে ছন্দ ব্যক্তি-সত্তাকে বিশুদ্ধ চিন্ময় ক'রে তোলে।

বিশ্বপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই যে বিশৃঙ্খলতা, এই যে ছন্দহীনতা ছন্দ আমাদের কাছে নিয়ে আসে তা বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের কোনো বস্তু নয়, বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর থেকেই তা হয়ে ওঠে। একটি চেনা মানুষ আমাদের কাছে যেমন রহস্যময় হয়ে উঠতে পারে, একজন অচেনা মানুষ কখনোই তেমন নয়। পরিচিত মানুষ, পরিচিত বস্তুজগৎ তাদের পরিচিতির সীমার ভিতরেই যখন সুদূর অচেনা হয়ে ওঠে তখনই বেজে ওঠে রহস্যময়তার ধ্বনি, চির-দিনের পরিচিত 'তুমি' যখন বিদেশিনীর সাজে আসে তখনই আমাদের উপলব্ধি-অনুভব সচকিত হয়। ছন্দের পরিপ্রেক্ষিতেই ছন্দহীনতা, বিশ্বপ্রকৃতির প্রবহমান ছন্দের পরিপ্রেক্ষিতেই শৈল্পিক ছন্দ ; ফর্ম বা রূপপ্রকল্প পরিচিত বস্তুজগৎ, পরিচিত ভাষাজগতের দ্বিতীয় বিন্যাস আনে, নিয়মনিরুদ্ধ যান্ত্রিক বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দকে সে কেবল এলোমেলো ক'রে দেয়, উলোট-পালোট করে দেয়।

ছন্দ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য ছন্দহীনতা। পর্ব-বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা চরণের যে সুশৃংখল বিন্যাসকে পাই, সেই শৃংখলা সামাজিক ভাষাব্যবহারের স্বাভাবিকতাকে অমান্য করে, ছন্দকে ছন্দহীন করে। কেবল কবিতার ছন্দ নয়, গদ্যও একধরনের পর্ব-বিন্যাসের দোলার ভিতর অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, ভাঙতে পারে সার্বজনিক ভাষাব্যবহারের রূপ-রীতিকে। মুখের ভাষা, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ভাষা যা লৌকিক অর্থবহ, লৌকিক ছন্দনির্ভর, স্বরধ্বনির উচ্চনীচতায়, পর্ব-বিন্যাসের সচেতন কৌশলে তা হয়ে উঠতে পারে অলৌকিক, ধ্বনিময় অপার্থিব। ছন্দ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য ছন্দহীনতা—সামাজিক স্বাভাবিকতা, বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে সে তার সুশৃংখল বিন্যাসের ভিতরে এনে বারবার ক'রে তোলে অস্বাভাবিক, ক'রে তোলে বিশৃংখল, ক'রে তোলে ছন্দহীন।

কুলপতি

দিনেশচন্দ্র রায়

আমি এ বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছি। আমার বিয়ের মাত্র এক বছর আগে আমার শাশুড়ী মারা গেছেন। বৌভাতের পরের দিনই দেখলাম সারাটা বাড়ি যেন আমার হাতে সব ভার তুলে দিতে, সব ব্যাপারে আমার আদেশ নিতে জো হুজুর হয়ে আছে। আমাকে ঘিরে নানা আশা আকাঙ্ক্ষা, নানা নালিশ সুপারিশ, অভিযোগ আবেদন। আমি তখনও এ বাড়ির সব ক'খানা ঘর পর্যন্ত দেখিনি। বাড়ির চারপাশটাতে চোখ বোলাতে পারিনি। রাতে শুয়ে শুয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি গো, এতবড় বাড়ির সবকিছু কি আমাকে দেখতে হবে?" আমার বর দুষ্টু দুষ্টু হেসে চুপ করে রইলো। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। দুদিন পরে আমরা দ্বিরাগমনে গেলাম। ভাবলাম আগে ঘুরে আসি, তারপর সব কিছু দেখা যাবে।

ফিরে আসবার দু-তিনদিন পরেই একদিন শ্বশুরমশায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার শ্বশুর খুব রাশভারি লোক। খুব লম্বা। ফুটফুটে রং। টাকমাথা। এখনও হাঁটলে মাটি কাঁপে। দুরুদুরু বুকে ঘরে গিয়ে দেখি শ্বশুর চুপচাপ বিছানাতে বসে আছেন। বসে বসে, ঘুমাচ্ছেন না জেগে আছেন বুঝতে পারলাম না। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতেই শ্বশুর চোখ খুলে একটু মিষ্টি হাসলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মা, তোমার শরীর ভালো আছে তো? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?—এটাই তোমার বাড়িঘর মা,– সব দেখেশুনে নাও।" উনি চুপ করলেন, পৈতেটাকে দুহাতে টানটান করে পিঠে চুলকে নিলেন, তারপর আবার কথা বলা শুরু করলেন, "মন্দিরে আমাদের কুলবিগ্রহ কালাচাঁদ খুব জাগ্রত দেবতা। তাঁর মহিমার শেষ নেই। প্রায় চার-পুরুষ ধরে আমরা এই কুলদেবতার সেবায়েত। এই ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, খানাদানা, পাইক বরকন্দাজ সব কালাচাঁদের। তাঁর সেবক হিসাবে আমরা ভোগ দখল করি মাত্র।" শ্বশুর আবার তাঁর ডানহাতের তর্জনী দিয়ে কানটা চুলকে নিলেন, "তোমার শাশুড়ী গত একবছর গত হয়েছেন, তুমি আমার মালক্ষ্মী, তুমি নিজে দেখবে কালাচাঁদের ভোগরাগে, সেবা-আরাধনাতে কোন ত্রুটি না হয়। তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে। এ বাড়িতে তুমি নতুন বউ, তোমার হাতেই সংসারের ভার, তাই আগামীকাল সকালে তোমাকে কালাচাঁদের সামনে বরণ করা হবে। তুমি আগামীকালের ভোগ নিজে হাতে রাঁধবে। এটাই এ বাড়ির রীতি।"

পরদিন সকালে দাসী এসে আমার চুল বেঁধে দিলো। বেনারসি পরে, সারা গায়ে অলঙ্কার ঝলমলিয়ে মন্দিরে গেলাম। আমি আর আমার স্বামী পাশাপাশি জোড়াসনে বিগ্রহের দিকে মুখ করে বসলাম। এক দীর্ঘ অনুষ্ঠানের পর কালাচাঁদের সেবিকা হিসেবে আমাকে বরণ করা হলো। বরণ করা হলো, না আমাকে আর একবার বিয়ে দেওয়া হলো এটা বুঝতে পারলাম না। তবে এটা বুঝলাম আমার অস্তিত্ব আমার স্বামী আর কালাচাঁদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল।

বলতে ভুলে গেছি অন্দরমহল আর মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গাতে একটা বিরাট পিপুল গাছ আছে। গাছটা আমার শ্বশুরের চেয়েও বয়সে বড়ো। এই পিপুল গাছটার ছায়া এতো ঘন আর বিস্তৃত ছিল যে আমার মনে হতো রোদ্দুরের নদীতে ছায়াটা সদ্যওঠা একফালি চর। এখানে এসেই আমার মনে হতো চরের নরম ঠাণ্ডা পলিতে আমার পা দুখানা কাদাতে মাখা-

মাখি হচ্ছে।

মোটামুটি চারপুরুষ কালাচাঁদ এ বংশের জাগ্রত কুলদেবতা। বিরাট দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক এই দেবতা। আসলে কালাচাঁদ কৃত নয়,—প্রাপ্ত। এক স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত। এ বাড়ির সে ঘরজামাই। এ বাড়িতে তোফা জামাই আদরে দীর্ঘদিন থাকার পর একটা গোলমাল বাধলো। আমার স্বামীর জন্মের অব্যবহিত পরেই জ্ঞাতিরা দাবি করলো কালাচাঁদের প্রকৃত সেবায়েত তারাই। আদালতে মামলা ঠুকলো রীতিমত। এই বিবাদে এ বাড়ির সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্ব দু দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ কেউ এলো শ্বশুরের দলে আবার অন্যরা অপর পক্ষে। স্টেট থেকে রিসিভার নিযুক্ত করা হলো কালাচাঁদের দেখাশোনা করার জন্য। উভয় পক্ষকেই নিষেধ করে দেওয়া হলো তারা যেন মন্দিরের একশো গজের মধ্যে প্রবেশ না করে।

কালাচাঁদ কষ্টিপাথরের একটি অনিন্দ্যসুন্দর বংশীবাদনরত কৃষ্ণমূর্তি। চোখদুটো হীরে দিয়ে বসানো। সারা গা সোনায় মোড়া। হাতের মুরলী পর্যন্ত পাকা সোনার। মুকুটে কতো মণিমুক্তা বসানো। পুজোঘরের পাশেই শয়নকক্ষ। তাতে রুপোর খাটে দুগ্ধফেননিভ বিছানা। ঝালরদেওয়া মশারি। রুপোর গড়গড়া, তাতে জরি দেওয়া বাদশাহী মটকা। তিন নম্বর ঘরের দরজাতে মোটা মোটা লোহার শিক বসানো। সেখানে বিরাট একটা রামসাই তালা ঝোলে। সেই ঘরের ভেতরে তিনটে কালো লোহার সিন্দুকে বিগ্রহের অলঙ্কার। দুটো কাঠের সিন্দুকে বেশবাস। ঋতু অনুসারে এবং পালপার্বণ অনুযায়ী নানা অলঙ্কার আর পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিগ্রহকে সাজানো হয়।

শ্বশুরের বিরুদ্ধ দল দাবি করলো এ বাড়ির সীমানার মধ্যে এত অলঙ্কার এবং মূল্যবান বাসনকোসন নিরাপদ নয়। সুতরাং আদালতের আদেশে বন্দুক হাতে সান্ত্রি এলো। তারা চামড়ার বেল্ট আর বুটজুতো খুলে খালি পায়ে পাহারা দিত। একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। চারবছর চললো এই লড়াই। সারাটা বাড়িতে অভাবের ছায়া। দাসদাসীদের বিদায় দেওয়া হলো। শাশুড়ীর গয়না বাঁধা পড়লো। হ্যান্ডনোটে চড়া সুদে শ্বশুর টাকা ধার করা শুরু করলেন। পুজো-আহ্নিক গোল্লায় গেলো। ঘোড়দৌড়ের মাঠে পাগলা বেসাড়ুর মতো শ্বশুর কোর্টকাছারি করা শুরু করলেন। অবশেষে একদিন খুব সকালে পাল্কি থেকে নেমে শ্বশুর হাঁক ছাড়লেন, তিনি মামলায় জিতেছেন।

সেই থেকে ঘরজামায়ের জামাই আদরে আর কোন ছেদ পড়েনি। বোশেখ মাসে পুরো ত্রিশ দিন ঝর্না দিতে হবে। দুপুরে ফুটি, কেশর, তরমুজ। রাতে তিন প্রকার মিষ্টান্ন। পরমান্ন এবং লুচি। এমনি চলবে আষাঢ় পর্যন্ত। আষাঢ়ে দুপুরে অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে সুপক্ক আম, সবরি কলা আর খোয়া ক্ষীর। দুর্গাপুজো থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রতিদিন ঘি-ভাত আর সপ্ত ব্যঞ্জন। পুরো চৈতমাস লুচি আর মিঠাকুমড়োর লাবড়া তরকারি।

জামাইষষ্ঠীতে অষ্টপ্রহর হরিনাম, তিমাথের মেলা, মচ্ছব। জন্মাষ্টমীতে একশত ব্রাহ্মণ ভোজন এবং তাদের বিদায়করণ। দোলে পুরো দিন হোলিখেলা। সন্ধ্যাতে তাম্রকূট সেবন, অতঃপর সাত বেহারার পালকিতে গঙ্গে যাত্রা। গাছের প্রথম ফল, নতুন বিয়ানো গাভীর একুশ দিন পরের প্রথম দুধ, নতুন চাল,—এসব কালাচাঁদকে প্রথম দিতে হবে। কালাচাঁদ ক্ষ্যাপাজামাই। পান থেকে চুন খসলে ক্ষেপে আগুন হয়।

বিয়ের পর প্রায় একবছর কেটে গেছে। হীরের চোখ মেলা, সোনা বাঁশি বাজিয়ে, সুবর্ণ মুকুটে রাজার মতো কালাচাঁদকে রাজবেশে, বাবুবেশে, জামাইবেশে সারাদিন ধরে বারে বারে দেখি আর ভাবি, এই মহারাজ আমাদের এই সমস্ত বিষয়সম্পত্তির মালিক। এই মালিকের

দয়াতেই আমরা খাইদাই ঘুরিফিরি। এই প্রবল শক্তিমান প্রভু আমাদের অন্নদাতা।

এ বাড়িতে আসবার পর প্রথম দোল উৎসবের দিনটা আমার পরিষ্কার মনে আসে। খুব সকালে পাকা বাঁধানো দোলমঞ্চে রুপোর দোলনাতে রাজবেশ পরিয়ে কালাচাঁদকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। সারাদিন অগণিত ভক্তরা আবিরে আবিরে আকাশে মাদারফুলের রং করিয়ে দিল। পড়ন্ত বেলাতে চান করিয়ে কালাচাঁদকে গরদে আর নতুন আর একসেট গয়নাতে সাজানো হলো। সেদিন কালাচাঁদ বেলাতে ফলার খেলো। তারপর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম।

সন্ধ্যাবেলায় আরও এলাহি কান্ড। বিকেল বিকেল তাড়াতাড়ি ভোগরাগ সেরে রাজবেশে সজ্জিত হলো কালাচাঁদ। সন্ধ্যা হতে হতেই বিরাট কৌতূহলী জনতা জমায়েত হলো মন্দিরের সামনে। কারণ দোলের দিনই মাত্র গন্তে যাবার আগে মহারাজ সিংহাসনে বসে রুপোর গড়গড়াতে মটকা মুখে খাম্বিরা তামাক খান। পরিষ্কার নাকি দেখা যায় যে কালাচাঁদের মুখ দিয়ে তামাকের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। খাম্বিরা তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারদিক ম'ম' করে। জয়ধ্বনি দিতে দিতে অগণিত মানুষ অপলক নয়নে এই দৃশ্য দেখলো। কাঁসার কলসি ভরা প্রণামীর টাকা অন্দরে এলো।

ধূমপানের পর সাত বেহারার সুসজ্জিত পাল্কিতে কালাচাঁদ গন্তে বেরুলো। প্রথম সারিতে সাতজন মশালচি মশাল নিয়ে, দ্বিতীয় সারিতে আটাসোঁটা নিয়ে লেঠেলরা, তৃতীয় সারিতে গরদপরা আমার শ্বশুর এবং স্বামী, তারপর জনতা।

আমার স্বামীকে দেখলে পুকুরজলে কলমিলতার কথা মনে পড়ে। এমনিতে আমার স্বামী সত্যি খুব সুন্দর। লম্বা দোহারা গড়ন। ঘন কালো চুল। টকটকে রং। অপূর্ব নাকমুখ চোখ। থুতনিটা শেষে একটু টোল খেয়ে দুভাগ হওয়া। যখনই দেখি তখনই মনে হয় ও বুঝি এখনই ঘুম থেকে উঠে এলো। আসলে ওর চেহারার মধ্যে কোন কিছুর মুখোমুখি হবার বেপরোয়া ভাবটা একেবারেই ছিল না। পুরুষের চেহারা সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব মত আছে—বয়ঃসন্ধি পেরুলেই পুরুষরা কেমন যোন্ধা-যোন্ধা হয়ে যায়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসে আর নাকের পাশে ব্রণ খোঁটে তখন ওদের বেশ বেপরোয়া-বেপরোয়া লাগে। বাতাসে চুলওড়া, জামার বোতাম খোলা, শার্টের হাতা কব্জি থেকে একটু উঠিয়ে গোটানো, কিন্তু চিবিয়ে খেলে চোয়ালের হাড় ওঠে নামে, গায়ে পুরুষ-পুরুষ গন্ধ। এই তো পুরুষ। কিন্তু আমার স্বামী পাখির ছানার মতো অসহায়। গ্রীষ্মের রোদ ওকে তামাটে করেনি, বর্ষার বিষ্টি শ্যামল করেনি, শরতে সে দিগ্বিজয়ী হতে চায় না, শীতে বেসামাল কিছু করে না। আজকাল মাঝেমাঝেই আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কালাচাঁদকে মিলিয়ে দেখি, কালাচাঁদের চারিদিকে কেমন ক্ষমতা আর প্রতাপ ঠিকরে পড়ে। আমি বাঁদী, আমার শ্বশুর ভৃত্য। তাই দুপুরে ভোগের পর বিপুল পিপুল বৃক্ষের ছায়ার চরে একাকিনী নৌকাডুবি থেকে বাঁচা রমণীর মতো আমার মনে হতো কোন অশ্বারোহী আমার কেশাকর্ষণ করে তার পাশে আমাকে তুলে নিক। কে নেবে। কে নেবে। আমার নাবালক স্বামী না প্রতিপালক অন্নদাতা কালাচাঁদ। আমি ছায়া-চরে একাকিনী বসে আছি। অশ্বারোহী কোথায়। কোথায়।

আমার শ্বশুরের খড়মের আওয়াজে তেজি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাই। সোজা হাঁটেন। সোজা হয়ে বসেন। সারাদিন সাদা পৈতে ঝুলিয়ে ফরাসে বসে জমিদারির নথিপত্র দেখেন। সংসারের খরচখরচা আমার হাতে থাকে। আমি বেশি কম যেভাবেই ব্যয় করি না কেন উনি একটা কথাও বলেন না। কিন্তু ওঁর হিসেব পাকা। প্রতিদিনের জমা-খরচের পাই

পয়সা খাতাতে জমা পড়ে। প্রতিমাসের প্রথম দশদিন শ্বশুর মহালে যান। কোন মহালে কত আদায়, কত বাকি, কতটা তামাদি, কে কোথায় কত টাকা আত্মসাৎ করলো এসব ওঁর নখদর্পণে। নিয়মিত বাড়ির গাইগোরুর খোঁজ নেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়েন। কোন গাছে কোন ফল ঝরেছে, পেকেছে, তার খবর তিনি রাখেন। বেড়াল যেমন বাঘের শক্তি দিয়ে তার সদ্যোজাত শাবকদের রক্ষা করে শ্বশুর তেমনি বৃদ্ধ মার্জারের মতো বিষয় রক্ষা করেন। বিষয়ের ব্যাপারে তিনি কাউকে খাতির করেন না। এমনকি নিজের ছেলেকেও না।

এর মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হলো। তিন-চারদিন আমি মন্দিরে যাইনি। মন্দিরের আশেপাশে যাওয়াও বারণ। ঘরে বসেই যতদূর সম্ভব খোঁজখবর রাখি। কিন্তু আমার অনুপস্থিতির চতুর্থ দিনে আমি পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলাম যে কালাচাঁদ আমাকে বলছে, "নতুন বউ, তুমি নেই তাই ওরা আমাকে ঠিকমতো আদর যত্ন করছে না। আজ আমাকে একপদ ভাজা কম দিয়েছে।"

পরদিন সকালে শ্বশুরকে সব খুলে বললাম। শ্বশুর একটু মৃদু হাসলেন। ব্যাপারটা যেন তিনি সব বুঝতে পেরেছেন। দুপুরে ভেতরে খেতে এসে শ্বশুর বললেন, "মা, কালাচাঁদ তোমাকে স্বপ্নে ঠিক কথাই বলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম গতকাল ওরা ভাজার একটা পদ সত্যি কম দিয়েছিল।"

সেবার খুব শীত পড়লো। দারুণ হাড়কাঁপানো শীত। সন্ধ্যা হতে না হতেই শীতের দাপটে সব লেপের তলাতে ঢুকে যেতো। বাড়ির খাওয়া-দাওয়া খুব তাড়াতাড়ি মিটে যায়। শুধু কামলারা গোয়ালঘরের কাছে আগুন জ্বেলে হাত-পা তাপায়। এই ভীষণ ঠান্ডাতেও আমি ছাইরঙের একখানা মোটা বিলেতি কম্বলে গা-মাথা জড়িয়ে ছাতে উঠে যাই। সারাটা বাড়ি একেবারে চুপচাপ। নিশুতি। মোটা কম্বলে জড়ানো থাকলেও শীত আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। প্রহার করে। নাকের ডগা ঠান্ডা হিম হয়ে যায়।

সারাটা দিন একমুহূর্ত সময় পাই না। সাতসকালে উঠে এই জমানো শীতে চান করে মন্দিরে চলে যাই। সেখানে কোটাকুটি, পুজো ভোগ শেষ হতে হতে বেলা দুটো। কী ভীষণ খিদে পায়। শ্বশুর আর স্বামীর খাওয়া শেষ হলে শেষ বেলায় খেয়ে আমার চোখ ঘুমে এঁটে আসে। কিন্তু আয়েস করার কোন উপায় নেই। বেলা পড়তে না পড়তেই বৈকালিকের ব্যবস্থা নিজে হাতে করতে হয়। তারপর ঘরে এসে চুল বাঁধি। হাতেমুখে সাবান দিয়ে একটু পাউডার বোলাই মুখে, আষ্টেপৃষ্ঠে কম্বল জড়িয়ে উঠে আসি ছাদে। জেলখানার ছাদে, তারাভরা আকাশের নিচে এইটুকু সময় হিমের প্রহারে জর্জরিত হয়েও আমি একটু রানীগিরি করি। কুকুরগুলো প্রহরীর মতো ডেকে উঠে জানান দেয় কয়েদীরা গুনতিতে সব ঠিক আছে। কিছু ছিঁচকাঁদুনে শেয়াল নাকে কাঁদে। তাস খেলে আমার বর তখন ঘরে ফেরে। একটা মাফলারে গলা মাথা জড়িয়ে ছাদে আসে। আমরা দুজন অনুচ্চস্বরে কথা বলি। একজন কয়েদী আর একজনকে কিছু কথা বলে। অধিকাংশ রাতেই তার কোন মাথামুণ্ডু থাকে না। শুধু অনেকগুলো উটকো আওয়াজ আমাদের ঘিরে রাখে।

"আমার একটুও ভালো লাগে না, সারাদিন তোমার সঙ্গে একবারও দেখা হয় না।"

"আমি কী করবো। মন্দির আর বাড়ি সামলাতে আমি হিমসিম খাচ্ছি।"

"এ আমি সহ্য করবো না।"

"কী করবে?"

"কলকাতায় ছোটখাট চাকরি করবো। তোমাকে নিয়ে থাকব। সারাদিন ছুটির দিনে

টোটো করে ঘুরবো। সার্কাস দেখবো। বাদামভাজা খাব।”

“বাবাকে মনের বাসনাটা বলতে সাহসে কুলোবে তো?”

“বলতেই হবে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, এবার বলতেই হবে।”

বলবো। ওগো তোমাকে বলতেই হবে। তুমি বলো। বলবো। ওগো কাল সকালেই বলো। দুজনে ঘুরবো। বিষ্টিতে ভিজবো। বাদামভাজা খাবো। আমরা বলবো। বলবো। ঠিক বলবো। বলবো। বলবো। বলবো।

নিস্তব্ধ কারাগারের ছাদে এক যুবক আর এক যুবতীর বিদ্রোহ ঘোষণা, পলায়নের এক ঝলক আশা,—আমার বর দিগ্বিজয়ী ঘোড়সওয়ার হবে আমি তার পাশে বসে এলোচুল উড়িয়ে বেরিয়ে যাব। আমি খুশি হয়ে উঠি। আমি জোর পাই। মাফলারে মুখমাথা জড়ানো আমার স্বামীকে তারাদের ম্লান আলোতে বেদুইনের মতো লাগে। ওকে আমি জড়িয়ে ধরি। মায়াবিনী নেকড়ের মতো আমার গা থেকে ধূসর কম্বল খসে পড়ে।

দেবোত্তর সম্পত্তির দেখাশোনা করার জন্য যে হাকিম আছে সে কালাচাঁদ এস্টেট পরিদর্শনের জন্য বাৎসরিক সফরে এলো। সারা বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেলো। মন্দিরের চারপাশ সাফসুতরো করা হলো তাড়াতাড়ি। সারাদিন শ্বশুর নাওয়া-খাওয়া ভুলে এস্টেটের কাগজপত্র ঠিকঠাক করলেন। হাকিম এসে দেখবে—সে কি সামান্য কথা, তাই কালাচাঁদকেও রাজবেশ পরানো হলো। আমি আর সেদিন মন্দিরে গেলাম না কিন্তু ভেতর বাড়ির হেঁসেল সামলাতে একেবারে হিমসিম খেলাম। আমার বর সারাদিন হাকিম সাহেবদের খিদমতগারি করলো। পরদিন সকালে গরম গরম লুচি খেয়ে এবং প্রচুর ভেট নিয়ে হাকিম সাহেবরা প্রস্থান করলো। দুপুরে মন্দিরে গিয়ে কালাচাঁদকে দেখে এলাম। বেশ লাগছিল রাজবেশে। কেন জানি না একটু জিভ ভেংচে দিলাম, যেমন করে নতুন বউরা বরদের দেখলে আড়ালে ভেংচি কাটে।

হাকিমবাবুরা চলে যাবার দুদিন বাদে এক কান্ড হলো। খুব সকালে পুজারী মন্দিরের সার্বোক দরজা খুলে দেখলো কালাচাঁদ তার আসনে নেই। পুজারী এখানে-ওখানে, সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাতে খুঁজলো, কিন্তু কালাচাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আমি স্নান সেরে কেবল বাইরে এসেছি এমন সময় মন্দিরে খুব হৈচৈ শুনতে পেলাম। মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে পুজারী বামুন হাউমাউ করে কাঁদছে। এর মধ্যেই একটা রীতিমত ভিড় জমে গেছে। শ্বশুরের মুখ থমথম করছে। কিছুক্ষণ পর গোলমাল একটু থামলে শ্বশুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কালরাতে আমি যখন প্রণাম করে ভেতরে গেছি তখন আর কেউ ছিল না। আমি নিজে হাতে বন্ধ করে চাবি দারোয়ানদের দিয়ে গেছি। সারারাত দারোয়ানরা পাহারা দিয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে কালাচাঁদ কোথায় যাবে?”

একটু বেলা বাড়তেই এই খবর রটে গেল। গাঁয়ের লোকজন দলে দলে এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। কেউ কেউ মানত করলো, কেউবা কান্না জুড়ে দিল। এতো খুঁজেও সারাদিনে কালাচাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দুপুরে উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হলো, স্নান করানো হলো, সন্ধ্যার আরতি ও শয়নও ঐ একইভাবে বিগ্রহশূন্য মন্দিরে নমনম করে হলো। দুপুর থেকে শ্বশুর জপে বসেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন কালাচাঁদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করবেন না।

সন্ধ্যাবেলাতে ছাইরঙের কম্বল জড়িয়ে আবার ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। কালাচাঁদ নেই এ কথাটা ভেবে আমার কেমন খুশি-খুশি লাগছিল। ছোটবেলাতে আমি আমার মাসিরবাড়িতে মানুষ হয়েছি। আমার মাসি প্রচন্ড প্রখরা ছিল। মাসিকে আমরা এতো ভয় করতাম যে ঘুমের

মধ্যে পর্যন্ত মাসির কথা ভেবে আতঙ্কে আঁতকে উঠতাম। সেই মাসি দু-দিনের জ্বরে হঠাং মরে গেল। সবার মতো আমিও খুব কান্নাকাটি করছিলাম, কিন্তু আমার মনের খুব ভেতরে একটা খুশি-খুশি লাগছিল। আজ বিগ্রহের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর যদিও সারা গাঁয়ে শোকের ছায়া তবু আমার যেন ভালোই লাগছিল। কেমন একটা ভারমুক্ত ভাবে আমি আনন্দিত হয়ে উঠলাম। কালাচাঁদকে না পাওয়া গেলে খবরের কাগজের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে ছাপা হবে, "কালাচাঁদ ফিরে এস, তোমার বাঁদি অন্নজল পরিত্যাগ করেছে।" স্টেশনে স্টেশনে কালা-চাঁদের ফটো ঝুলিয়ে রাখা হবে। থানার ডায়রি করতে হবে, "এমনি চোখ এমনি মুখ, কালো কুচকুচে রং, নাম কালাচাঁদ, বাড়ি থেকে উধাও।"

আমি নিজে নিজেই হেসে ফেললাম। তারপর মালিকহীন দেবোত্তর সম্পত্তিতে কার পুজো হবে? খুব ভালো হয় যদি সবাই মিলে পিপুল গাছটার পুজো করে। ওর গায়ে খুব জোর, আমার শ্বশুরের চেয়েও বেশি।

পরদিন সকালে স্নান সেরে শূন্য মন্দিরে গিয়ে শুনি ভোররাতে শ্বশুর আদেশ পেয়েছেন। গতকাল মালি এককাঁদি কলা কেটেছে। গাছের প্রথম ফল চিরকাল ক্ষীরের সঙ্গে বিগ্রহকে প্রথম দেওয়া হয়, কিন্তু কি করে জানি না সবাই সে কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই রাগ করে কলাবাগানে একটা গাছের নিচে শুয়েছিল। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কাক না ডাকতেই শ্বশুর ওকে তুলে এনে আসনে রেখে গেছেন।

ইংরেজী উনিশশো ছেচল্লিশ সালের শীতকালে আমার একমাত্র ননদাই খুব কঠিন অসুখে পড়লো। তার পেয়ে আমার স্বামী রওনা হয়ে গেল, রুগীর অবস্থা দেখে আর একটুও দেরি না করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু বিধান রায় থেকে শুরু করে কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, ঝাড়ফুঁক, জরিবুটি, সবকিছু করেও কোন ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে আমার স্বামী ননদ আর ননদাইকে নিয়ে এ বাড়িতে ফিরে এলো। ননদ বাড়িতে ঢুকেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর আছড়ে পড়লো।

জামাই, সব ডাক্তার শেষ, সব চিকিচ্ছে শেষ, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি আমাকে রক্ষা করো, তুমি আমার শাখাসিঁদুর অক্ষয় রাখো, তোমাকে হীরেবসানো মুরলী গড়িয়ে দেবো, সাতদিন দশমণ চালের মচ্ছব দেবো। তুমি আমাদের তিনপুরুষের জামাই, তিন-পুরুষ প্রাণপাত করে তোমার সেবা করছি আমরা, তুমি আমার মুখ রেখো, আমার স্বামীকে তুমি ভিক্ষে দাও।

ননদ প্রতিদিন নিজে গিয়ে ভোগ রাঁধা শুরু করলো। নিজের চুল দিয়ে বিগ্রহের খড়ম মুছিয়ে দিল। দাসীর মতো নাটমন্দির ঝাড় দিল। শ্বশুর দিনরাত জপের মালা নিয়ে মন্দিরের এককোণে বসে জপ করতে শুরু করলেন।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ননদাইয়ের অবস্থা বেশ ভালো হয়ে উঠলো। গাঁয়ের ডাক্তার দুবেলা আসে। খুব অভিজ্ঞ সেকেলে ডাক্তার। এতদিন বুড়ো রুগী দেখে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। সারাটা বৈশাখ মাস ডাক্তারবাবু হাসিমুখে একেওকে দু'একটা রসিকতা করতে করতে বাইরে বেরুত। সারাটা বাড়ি যেন দম ছেড়ে বাঁচলো। কালাচাঁদের মহিমা কীর্তনে দশ দিক ভরে গেল। ননদ ক্ষীরের নাড়ু করে হরিলুট দিল। আমার চোখের সামনে কুলবিগ্রহের দয়াতে প্রায় মরামানুষ বেঁচে উঠল। আমার মনের সমস্ত গ্লানি কেটে গিয়ে একটা নির্মল আনন্দে মন একেবারে ভরে গেল।

জ্যৈষ্ঠের শেষে একটা সন্ধ্যাতে খুব কালবোশেখী হলো। সেদিন বড়বাড়ির জন্য

খাওয়াদাওয়া তাড়াতাড়ি মিটিয়ে সকলে শুতে গেলাম। হঠাৎ গভীর রাতে প্রচণ্ড চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়িমরি করে ননদের ঘরে গিয়ে দেখি শ্বশুরও উঠে এসেছেন, আর নন্দাইয়ের তখন শেষ অবস্থা।

তুই কালাচাঁদ না হারামজাদা। তিনপুরুষ ধরে নবাবের বেটা নবাব সেবা নিচ্ছিস, সোনার চোখ মেলে কী দেখিস? তোর ও চোখে আমি বালি ছুঁড়ে দেব। তোর পায়ে মাথা কুটেছি, রাতের পর রাত জেগে জপ করেছি, মাথার চুল দিয়ে তোর পা মুছিয়েছি,— কিন্তু তুই পাষাণ। তোর মায়া নেই, দয়া নেই, তোর মুখ আর কোনদিন দেখবো না।

উনিশশো সাতচল্লিশের প্রথমে আমাদের গাঁয়ের হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক রীতিমত গরম হয়ে উঠলো। রোমহর্ষক সব সংবাদ নানা জায়গা থেকে আসতে শুরু করলো। সদর শহরে আমাদের আত্মীয়দের বাড়িঘর মুসলমানরা পুড়িয়ে দিল। সেখানে কালীমন্দির লুঠ করার চেষ্টা হল, কিন্তু সাবেকি ভারি দরজা ভাঙতে না পেরে মায়ের পুজোর জায়গা অপবিত্র করল। আমাদের থানা এই গ্রাম থেকে একটু দূরে। জায়গাটা হিন্দুপ্রধান। সেখানে পীর সাহেবের মাজার অতি পবিত্র স্থান। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সেখানে সিন্নি চড়াত, মানত করত। হিন্দু জনতা সেই মাজার অপবিত্র করল এবং বর্তমান পীর সাহেবকে খুন করল। আমাদের এক-নম্বর মহালে নমশূদ্রেরা একশ মুসলমান প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিল। কিছু মুসলমানকে তারা খুনও করলো। ব্যাপারটা চরমে উঠলো যখন একদিন সকালে মুসলমান আমলারা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে অস্বীকার করলো।

শ্বশুর সদরে গিয়ে কালাচাঁদকে রক্ষার জন্য পুলিশ প্রহরার তদ্বির করলেন। কিন্তু তখন সমস্ত দেশটা একেবারে টলমল করছে সুতরাং কোন এক গণ্ডগ্রামে কালাচাঁদ নামক বিগ্রহের কিছু অলঙ্কার নিরাপদ রাখার জন্য পুলিশ পাওয়া গেল না। পুলিশ না পাওয়াতে আমাদের মহালগুলি থেকে নমশূদ্র লাঠিয়ালদের আমদানি করা শুরু হলো। কাছারিবাড়ির নাটমন্দিরে ওরা থাকতো আর সারারাত হল্লা করে বাড়ি পাহারা দিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে ওদের কথাবার্তা কানে আসতো।

চারিদিকে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। শ্বশুর গ্রামেগঞ্জে আধাশহরে খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন, বোবামারার মজুমদারদের বাণেশ্বর, নলখোলার চৌধুরীদের রাধামাধব, পুর্ণিয়ার ভাদুড়ীদের কালী, স্থলের পাকড়াশীদের নারায়ণশিলা, রাকসার কায়স্থদের বালকৃষ্ণ, কালু-খালির বসাকদের জামাইগোপাল, তারাপুরের সাহাদের তারাসুন্দরী,—এদের অবস্থা কী। তিনি নিশ্চিত হতে চাইলেন এইসব এস্টেটের সেবায়েতেরা কী ভাবছেন। কী করতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এ কথাটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে শুধুমাত্র নমশূদ্র লাঠিয়ালদের ওপর ভরসা রেখে এই মুসলমানপ্রধান গ্রামে বাস করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল,—বোবামারার মজুমদাররা তাদের বাণেশ্বরকে ফেলে, ঘর-দোর ফেলে রেখে পালিয়েছে। প্রবল বাতাসে নাকি সেই প্রাচীন ভদ্রাসনের জানালা কপাট দেওয়ালে মাথা কুটছে। বাণেশ্বর চুপ করে আসনে বসে আছে। নলখোলার চৌধুরীদের রাধা-মাধবকে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্দির আর বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। কেউ জানে না সেই আগুনে রাধামাধবও পুড়ে মরেছে কিনা। পর্ণনার ভাদুড়ীদের অতবড় কালীমূর্তি স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় মুসলমানদের আশ্বাসে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাকি তার পুজো-আচ্চার ভার নিয়েছে। স্থলের পাকড়াশীরা গৃহত্যাগের সময় নারায়ণশিলা নদীতে বিসর্জন দিয়ে

গেছে। রাকসার বালকৃষ্ণ, কালুখালির জামাইগোপাল আর তারাপুরের তারাসুন্দরী হিন্দুস্থানের নবদ্বীপের এক দেবস্থানে রাখা হয়েছে। মাসোহারার পরিবর্তে আরও অনেক দেবদেবীর সঙ্গে এই বিগ্রহরা ভোগরাগ পাবে।

এদিকে পাকিস্তান হিন্দুস্তান ঘোষণার পর সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে উল্টে গেলো। নমশূদ্র লাঠিয়ালরা আর থাকতে রাজী হলো না। অবস্থা প্রতিদিন খারাপের দিকে যেতে লাগলো। একরাতে দুবার কালাচাঁদের মন্দির আক্রমণ করার চেষ্টা করা হলো। স্থানীয় মুসলমান দারোগার সাহায্যে ব্যাপারটা কোনমতে রোখা গেল। কিন্তু দারোগাবাবুও একদিন জানালো যে চারিদিকে এতো গোলমাল যে নিয়মিতভাবে কালাচাঁদকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আমি একবার গ্রামাস্টেজে একটা পালা দেখেছিলাম। মনে আছে একটা দারুণ যুদ্ধের সিনে হঠাৎ হ্যাজাক লাইট দুটো নিভে গেলো। সমস্ত অডিয়্যান্স একেবারে অন্ধকার। চেয়ে দেখি স্টেজের যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত মৃত সৈনিকরা বুকে হেঁটে উইংসের দিকে এগুচ্ছে। আমরা সবাই সেই আজকে নেভা গ্রামাস্টেজের মৃত সৈনিকদের মতো অন্ধকারে বুকে হেঁটে এগুচ্ছিলাম।

সেদিন রাতে বাতাস রাখাল বালক হয়ে গিয়েছিল। দূর গ্রামে বনের ধারে সে তার হারানো গাভীর নাম ধরে ডাকছিল। ঘরে ঘরে, জানালায়, টোকা মেরে সে তার হারানো সুরধুনীকে খুঁজছিল। আমরা গভীর রাতে তিনজন পথে নামলাম। ভুল করলাম, তিনজন নয় চারজন। প্রচুর গঙ্গাজল ছিটিয়ে নতুন গামছা দিয়ে কালাচাঁদকে বাঁধা হলো। বাঁধবার আগে বিগ্রহকে একেবারে নিরাভরণ করা হলো। সোনার মুকুট, হীরের চোখ, বেশবাস সব খুলে নিলে একটুখানি দেখতে কালাচাঁদকে একেবারে খেলনার মতো লাগছিল। ওকে দেখে আমার কেমন মায়া হলো। আমি বারবার আমার এই ছোট্ট জীবনে দেখেছি, তুমি যতই না অধঃপতিত দরিদ্র পরাজিত হও, কেউ না কেউ তোমাকে ভালোবাসবে। ভালোবাসবেই বাসবে। পুটুলিটা আমি ব্লাউজের মধ্যে রাখলাম। আমার দুই স্তনের মাঝখানে অন্ধকারে আমার সন্তানের মত কালাচাঁদ নিরাপদে রইল। বুকটা বেশ উঁচু লাগছে দেখে আমি গায়ে চাদর জড়িয়ে নিলাম।

সারারাত পায়ে হেঁটে ঠিক মোরগডাকা ভোরে আমরা যে জায়গায় পেঁছিলাম সেটা একটা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। গ্রামের পাশেই জঙ্গল, মাঝখানে নদী। পূর্ব ব্যবস্থামতো আমরা বিল পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। সারাদিন জঙ্গলে থেকে রাতের দিকে আবার আমরা রওনা হব। এখনও তিন দিন তিন রাতের পথ সামনে।

আমরা ইচ্ছে করেই কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছিলাম না। আমার শ্বশুরের ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা ঝড়োকাকের মতো ধুলোয় মলিন। কিন্তু তবু শ্বশুরকে দেখে আমার একটুও মায়া হচ্ছিল না। যদি শ্বশুর তক্ষুনি মরে যেতেন তবু আমার একটুও কষ্ট লাগতো না। অথচ আমার স্বামী? তেলহীন চুল, গেঞ্জির ওপর একখানা চাদর জড়ানো। ক্লান্ত চোখ। খালি পা। এই বিপর্যয় যেন তাকে কেমন দুমড়ে দিয়েছে, তাকে নতুন করে সৃষ্টি করছে। আমি জানি আমরা যখন হিন্দুস্থানে পেঁছাব তখন আমার স্বামী এক অক্ষৌহিণী বাহিনীর সেনাপতি হতে পারবে। আমি যেন পরিষ্কারভাবে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। আমার সামনে তিনদিন তিনরাতের পথ। অন্ধকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে লুঠেরারা আছে। তবু নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এর মধ্যে একটা শৌর্য আছে। আমার সামনে অনিশ্চিত জীবন তবু সেটা নতুন করে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে পারব। গ্রামের সেই কালাচাঁদের খবরদারিতে তার অন্নদাসীর জীবনের জন্য আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। আমার সারা জীবনের জেলখাটার মেয়াদ এই

উপলক্ষে যেন পুরোপুরি মকুব হয়ে গেল।

দ্বিতীয় রাতে আমরা পথের মধ্যে বিপদে পড়লাম। এই রাতে আমরা যে গ্রামে পৌঁছলাম সেটা আমাদের হিসেবমতো হিন্দুপ্রধান অঞ্চল। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তমনে এখানে এসে খাদ্য আর আশ্রয়ের সন্ধান করছি। হঠাৎ দেখি একটা অন্ধকার জায়গা থেকে মশাল হাতে একদল লোক আমাদের ঘিরে ধরলো। আসলে আমরা জানতাম না এই গাঁয়ের হিন্দুরা তখন সব পালিয়েছে। মুসলমানেরা এদের বাড়িঘর সব অধিকার করে নিয়ে হিন্দুস্থানগামী হিন্দু উদ্বাস্তুদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে তাদের হত্যা করছে।

ঘেরাও হবার পর মশালের আলোতে আমি পরিষ্কার বুঝলাম আমি লুঠ হয়ে যাব। অন্ধকারে মশালের আলোর একটা বৃত্তের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই বৃত্তের বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দাড়িওয়ালা মুখগুলো হাসিহাসি মুখে চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার স্বামী রুখে দাঁড়ালো। কিন্তু একটা লাঠির ঘায়ে ঘুরে পড়ে গেলো। উবু হয়ে বসে সেই সর্বনাশা আলোতে দেখলাম ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কিন্তু আঘাত গুরুতর নয়। তবু স্বামী বুদ্ধি খাটিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলো। কী করে জানি না শেষ পর্যন্ত শ্বশুর একটা রফা করলেন। আমাদের প্রায় যথাসর্বস্ব সেই মশালধারী ডাকাতদের হাতে তুলে দিলাম। আহত স্বামী শ্বশুরের সামনেই আমার হাত ধরে অন্ধকারে এগুলো। পেছনে মশালের আলো, শ্বশুরের ক্লান্ত ছায়া, আগে আগে আমি আর আমার বর। হাত ধরাধরি। জেলখানার দরজা আমরা এই প্রথম ভাঙলাম।

সেই রাতের ঘটনার পর আমরা আরও ঘোরাপথ নিলাম। সে পথে ভয় কম কিন্তু ভীষণ জঙ্গল ঠেলে আমাদের এগুতে হচ্ছিল। আমরা প্রায় সাতদিন সাতরাত পিছিয়ে গেলাম। কিন্তু এই প্রচণ্ড কায়ক্লেশের মধ্যে আমি যেন ক্রমশ হালকা ঝাড়াঝাপটা হচ্ছিলাম। একদিন খুব ভোরে আমরা একটা জায়গাতে পৌঁছলাম। সেদিন আমাদের ভাগ্য দারুণ ভালো থাকাতে অপর একটি দলের কাছ থেকে কিছু চালডাল আর মাটির হাঁড়ি পাওয়া গেল। জিনিসগুলো আমরা পালা করে সারারাত বয়ে পথ চলেছি।

আমরা খিচুড়ি খেতে বসে কেউ কারও দিকে একদম তাকাচ্ছিলাম না। খিচুড়ি প্রচুর ছিল কিন্তু তিনজনের খিদে তার চেয়ে বেশি ছিল। কেউ খিচুড়ি চাইছে না। দিতে গেলে আমার শ্বশুর আর বর দুজনেই "না না" করছে। যাই হোক, আমি কেন জানি না হঠাৎ উদার হয়ে গেলাম। আমাদের ঝিমানো ক্লান্ত স্নায়ুগুলো হঠাৎ টনটন করে সজীব হয়ে উঠলো। ঘন জঙ্গলে একটা পরিষ্কার জায়গাতে গাছপালার নানা আঁকিজুকি, পাখিরা ভীষণ কোলাহল করছে, ভোরের শান্ত বনস্থলীতে দীর্ঘ উপবাসের পর আমগত তিনটি প্রাণী আহারান্তে পরিতৃপ্ত। হঠাৎ আমার শ্বশুর চিৎকার করে উঠলেন, "বৌমা, এ কি হলো? এ ভুল কি করে করলে? আমাদের সঙ্গে কালাচাঁদও অনাহারী, তাকে উপবাসী রেখে আমরা পেটপুরে খেলাম। একটু খেয়াল করে উদ্দেশে সেইরকমে ভোগ দেওয়া হলো না। হায়! হায়! এ কী অঘটন, এ কী অঘটন!" একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আমি তখন শুয়ে পড়েছি। পাশে গামছাতে বাঁধা কালাচাঁদের পুঁটুলি পড়ে আছে।

আরও দুদিন দুরাত। তারপর আমরা হিন্দুস্থানে পৌঁছাব। এর মধ্যে আর-একটা ঘটনা ঘটলো। আমরা অন্যান্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একটা নদীর পারে পৌঁছলাম। এই নদীটা পার হতে পারলে আর কোন ঝুটঝামেলা নেই। খুব অঘটন কিছু না ঘটলে মোটামুটি নিরাপদে বর্ডার পার হওয়া যাবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতে শোনা গেল আনসার বাহিনীরা কী

করে টের পেয়েছে যে এই ঘোরাপথে অনেক উদ্বাস্তু সোনাদানা নিয়ে হিন্দুস্থানে পালাচ্ছে। আমাদের পাকড়াবার জন্য নদীর ওপারে ওরা ছাউনি ফেলেছে। আপাতত নদী পার হওয়া যাবে না। দীর্ঘ পথের শেষে মানুষ উদ্দিষ্ট জায়গার মাঝামাঝি এলে কেমন যেন ধৈর্যশীল হয়ে ওঠে। এই দুঃসংবাদে খুব একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো না। আমরা যেন মেনেই নিলাম নদীর এপারে আমাদের বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। কোথা কোথা থেকে লুকোনো অনেক খাবার জিনিস বেরুলো জানি না। গাছের আড়ালে রান্নাবান্না করে আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বহুদিন পরে নদীতে সাঁতার কেটে বেশ পরিষ্কার হয়ে চান করলাম। আমরা সবাই যেন চড়াইভাতি খেতে এসেছি। এই বৈতরণী পার হওয়া, ওপারে যমদূততুল্য আন্সার বাহিনী, হিন্দুস্থানের রাস্তায় দারুণ অনিশ্চয়তা আমরা যেন একেবারে ভুলে গেলাম।

নদীর পাশেই বেশ জংলা একটা জায়গা, তার ওপারে পরিষ্কার একফালি মাঠ। মাঠ ভর্তি বড় বড় শালগাছ। তারপর আবার জঙ্গল। মাঝখানের মাঠটাতে কেমন যেন তপোবন-তপোবন ভাব। কি করে এক চিলতে শালগাছ ভর্তি সবুজ মাঠ দুপাশের ক্রমবর্ধমান বেপরোয়া জঙ্গলের হাত থেকে বেঁচেবর্তে আছে জানি না। শীতের রাতে এখানে ওখানে যে যার মতো শুয়ে পড়লো। আমি একটু দূরে একটা শালগুঁড়ির আড়ালে শুয়ে আছি। কাছেই স্বামী আর শ্বশুর ঘুমিয়ে আছে। দুপুর রাতে অনেকগুলো রাতের পাখি ডেকে উঠলো। একটানা ঝিঁঝির ডাক। অচেনা পোকামাকড়ের আর্তনাদ। কিন্তু কিছুতেই আমার চোখে ঘুম এলো না। প্রাণ ভরে স্নান, পেটপুরে খাওয়া, একটা জায়গাতে একদিন একরাতের স্থিতি আমাকে কেমন গেরস্ত গৃহিণী করে তুললো। আমি সে রাতের কাছে করজোরে আরও কিছু বর চাইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম আমার স্বামীও জেগে এবং গড়িয়ে আমার পাশে। আমরা সরীসৃপের মতো নিঃশব্দে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই। হঠাৎ আমার স্বামী যেন ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। প্রথমে ভাবলাম ওকে এই বনজঙ্গলে বুঝি সাপে কাটলো, কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। আমি ব্লাউজের ভেতর থেকে সেই গামছার ভারি পুঁটলি একটানে বের করে গভীরতর অন্ধকারে ছুঁড়ে দিলাম।

খুব চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভাঙলো। তখনও আকাশে আলো পরিষ্কার হয়ে ফোটেনি। আনসারের দল কী একটা নতুন গোলমালে পাশের গ্রামের দিকে সরে গেছে. এই ফাঁকে এই মুহূর্তে খুব তাড়াতাড়ি আমরা নদী পার হলাম। ওপারে নেমে মনে হলো আমার বুকের বোঝা নেই।

অগণিত মানুষের মিছিল বর্ডার পার হচ্ছে। তারা ক্ষুধায় কাতর, ধুলোয় ধূসর আর তৃষ্ণাতে ছটফট করছে। কিছু সন্ন্যাসী গোছের স্বেচ্ছাসেবক আমাদের খিচুড়ি খেতে দিল এবং তারপর বিরাট মাঠের মধ্যে অগণিত সাদা তাঁবুর একটিতে আমাদের ঢুকিয়ে দিল। পথে আমার শ্বশুর দু-তিন বার কি যেন বারবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে "আচ্ছা যাক" বলে থেমে গেলেন। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে আমি গভীর, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অঞ্জলি

শঙ্খ ঘোষ

ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
সমস্ত মিলায়
এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
দাঁড়িয়েছ মুহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
সব ধারে ধাবমান জল
প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
আর, তুমি একা
এতো ছোটো দুটি হাত শক্ত ক'রে ধরেছ করোটি
মহাসময়ের শূন্যতলে :

জানো না কখন দেবে কাকে দেবে কতো দূরে দেবে!

সে একরকম গেরস্থালি

আবু কায়সার

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায় বাতাস হঠাৎ এবং তাকাও
কেমন কাঁপছে একতারা এক—মাঠের ধুলো
বাতাস এখন এগাঁয়ে খুব কষ্টে কাঁপে জানা আমার, ও যেন ঠিক
বিমর্ষ এক জোয়ান চাষী। কী জমকালো
সকাল দ্যাখো ঝুলছে রোদের আলনায় ইশ
কপাল বটে,—দুঃখী বাতাস।
যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া ধরাছোঁয়ার বাইরে যেতে
পরিস্থিতির কী আনন্দ;
তাই তো বাতাস পায় না আপন ঘরের দরজা ইচ্ছে হলেই
ইচ্ছে হলেই ঘরামী তার ঘরের মানুষ পায় না ঘরে।

ছুটির দিনে খুব সকালে বুকের পশম থামচে ধরবে যে বাসনা
এমন ধরন আগলপাগল আরো অনেক রকম অনেক
দুর্ভাবনা :
চলতেফিরতে মটরশুঁটির পাহারাদার কাকতাড়ুয়া
চুনকালি আর ধাপ্পা ভরা
ওই তো সামনে,
ধারকরা দাঁত তেমনি দেখছি ঝিকিয়ে উঠছে বিরাট রোদে :
কিন্তু ধারের দাঁতে বড়ই ধারের অভাব তাই কাটে না
শিল্পাগারের
লোহার জালি হাতকরাতে
তাই কবিতার ব্যারাম যায় না উস্কোখুস্কো কথার তাবিজ
ভিনদেশী পিল চোরাই শব্দে।

নিজের শহর নিজের জমি উলুকঝুলুক ঘর থাকলেও
যায় না ধরা এ দুর্দিনে আবহাওয়া আর আদম হাওয়ার
মনের লক্ষ্য নির্ভাবনায়;
ঘুরতে ঘুরতে থামছে তুখোড় ডায়নামো সব গাঁওগেরামে
রাইসমিলে
সন্ধ্যা আস্তে আস্তে নামছে লবণগন্ধী বাঁশের ঝাড়ে
এবং ছিঁড়ছে আচম্বিতে সায়ার ফিতে
নীলবালিকার।

নিকটবর্তী
পদ্মবিলের কাদায় তুমুল আছড়ে পড়ছে পোড়ামুখো
কোন বিদেশের উড়ুক্ষুর। মাছরাঙা এক ওগরালো মাছ
হঠাৎ পোড়া তেলের গন্ধে;
ভরভরন্ত পাইটা চেয়ে দেখলো কাণ্ড কী আলসো
বিস্ময়ে নয়।
এমনি কাটে দূরের সকাল মধ্যে মধ্যে ছুটিছাটায়
চলাবলায় স্বাধীনতায়;
হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরুলে ব্রীজের নীচে লম্বাটে জল
এগিয়ে গেলেই পুরুষ্টু লাউ লাল টম্যাটো শিমের মাচা;
ছুটির দিনে সে একপ্রকার ইকড়িমিকড়ি গেরস্থালি।

বাঁচাকাহিনী

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন-একটা মুখ চাই ; চাই অবয়ব
খোলশ-ফেটে-বেরিয়ে-আসা, সুপক্ক,
বানান জানে নিজের। যেন জানে
অস্তিত্বের সামনে আছে কী লক্ষ্য।

বেমক্কা সব বদলে যায় তবু
লাফিয়ে যদি উঠি ভিড়ের ট্রামে,
ডিগবাজি খায় যদি বাজারদর,
ভির্মি লাগে যখন টাকার দামে !

বামন ; কিন্তু চাই নতুন শরীর,
—যেন পাথর, এমন উদাসীন—
পাওনাদার যেমন ক'রে জানে
সুদসমেত কার কতটা ঋণ।

আছড়ে পড়ে তুলকালাম হাওয়া,
ওড়ায় পর্দা, ওড়ায় অন্ধকার--
হাঁ ক'রে রয় খরায়-ফাটা মাটি—
ঠাণ্ডা রাখে মাথা, সাধ্য কার ?

জ্যাম

দিব্যেন্দু পালিত

আর একটু এগোলেই সেই শান্ত উপত্যকা
দুর্বার হাওয়ায় যেখানে মাঠের পর মাঠ পড়ে আছে রক্তে সবুজ হয়ে
লাল গম্ভীর সূর্যাস্তের মতো
শব্দগুলি ডুবে যাচ্ছে নিরাকার
শিশুর হাড়ের মতো শাদা টেবিলে কাপের পর কাপ
ছুঁয়ে যাচ্ছে ঠোঁটের অভাব
আর শিরার ভিতর দিয়ে ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে
স্বচ্ছ শীত—

দূর বাহামা দ্বীপপুঞ্জ!

অহংকার

রঞ্জেশ্বর হাজরা

দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যায় অহং-এর বোধ—
আমি তার পিছে হাঁটি আমি যেন ছায়া তার পড়েছি আলোর বিপরীতে
আলো যতো সরে যায় ছায়া বেড়ে ওঠে ছায়া একদিন লম্বা হতে হতে
শেষতম দৈর্ঘ্যে যায় শেষে আরো দূরে গেলে ছায়াটায়া কিছুই থাকে না—,
আমি অন্ধকার হয়ে হেঁটে যাই অহংকার শব্দ ধ'রে হেঁটে যেতে থাকি
যেতে যেতে কারা যেন ঝরে যায়—সম্ভবত পাতা—বনে বনে
জল প'ড়ে পাতা নড়ে সীমান্তে সীমান্তে—আর পাতাদের নড়নচড়ন
গায় লেগে উঠে যায় মাথার ভিতরে তার নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মধ্যিখানে—
আমি বুঝি জল প'ড়ে পাতা নড়ে আর এম্নি জল পড়লেই পাতা নড়ে
অথবা মানুষ নড়ে—মানুষের চোখ তার মস্তিষ্কের কেন্দ্রে দুলে ওঠে
তাই পাতা নড়ে—নয়তো পাতা স্থির থাকে আর জলটলও পড়ে না
কিংবা জল পড়ামাত্র পাতা ছেড়ে পাতাদের অহং-এর বোধ
চোখে চলে আসে তাই চোখ দেখে পাতা নড়ে তারপর চোখ থেকে চোখ
পার হয়ে চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে সেইসব পাতাদের নড়নচড়ন—।
পাতা যেন পাতাদের অহং-এর ছায়া—পড়ে সর্বদা আলোর বিপরীতে
আলো যতো সরে যায় ছায়া বেড়ে ওঠে ছায়া তারপর দীর্ঘ হতে হতে
একদম সরে গেলে অহংকার—আর সেই অহংকার পিছে রেখে অহং-এর বোধ
দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যায় আর আমি শব্দ ধরে হেঁটে যেতে থাকি......

মোরগের ডাক

বুলবন ওসমান

রাত দ্বিপ্রহরের পর অবশিষ্ট নিশি আর কতটুকুই বা। হিসেব কষলে বাকী দুই প্রহর: বিভাবরীকে যখন চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু কখনো তো এমন এক-একটা রাত আসে যা কাটতে চায় না! চোখে থাকে না নিদ্রার রেশ! এক-একটা রাহুগ্রস্ত রাত! আত্মীয়বিয়োগে জেগে থাকা তেমন কোন রাত অনেকের অভিজ্ঞতার আওতায় সহজেই এসেছে। প্রায় পঁচিশ ছোঁওয়া টগবগে যুবক রশীদ ভাবে সে রাতে তারা তবে কেন জেগেছিল, সেই পঁচিশ মার্চের রাতে, তবে কি তার কোন আত্মীয়বিয়োগ ঘটেছিল? হ্যাঁ, তার আত্মীয়বিয়োগ ঘটেছিল। একজন নয়, অনেক জন, অনেক শো, অনেক হাজার। শুধু তার একার নয়, সবার আত্মীয়-বিয়োগ ঘটেছিল। তাই সে রাতে ঢাকার সবাই জেগেছিল। স্বজনহারানো শ্মশানে নিজেদের চিতাও তারা জ্বলতে দেখেছিল এবং জীবন এমনি একটা মোহ, নেশা, মায়া যে তাকে ত্যাগ করতে সহজে কেউ রাজী নয়, তাই তাদের সে বিনিদ্র জাগর ছিল যন্ত্রণাময়, উৎকণ্ঠার, কাঁটার মুকুট পরানো। আত্মীয়ের শবদেহের পাশে বসে তারা ধারণা করছিল যে-কোন মুহূর্তে তাদেরও এই দশা হতে পারে, কিন্তু কারো কি তা অভিপ্রায় ছিল? না।

নিশ্চয় ছিল না।

ছোট কামরাটার কথা মনে পড়ে রশীদের। অচেনা-অজানা অপরিচিত এক শোবার ঘর। যেখানে অনেকের সাথে সেও আশ্রয় নেয়। তারো আগে তার নিজের ঘরের কথা।

সেদিন কেন জানি বেশ তাড়াতাড়িই ঘরে ফিরেছিল। বলতে গেলে সন্ধ্যারাত, আটটার আগেই। টিভিতে বিভিন্ন সব আসর-অনুষ্ঠান ও মিছিলের চিত্র দেখছিল। এগুলো দেখতে ভালো লাগলেও রশীদ সব সময় বিরক্ত হোতো। একপক্ষ যখন আলোচনার নামে সময় নিয়ে জাহাজ জাহাজ আনছে অস্ত্র, সাধারণ পোশাকে আনছে হাজার হাজার সেনা, সেখানে পথচারী আর ব্রতচারী, গান-নৃত্য-চিত্র ও নিছক লাঠির আস্ফালনের যে কি অর্থ থাকতে পারে সে বুঝে উঠতে পারত না। চৈতন্যদেব থেকে চে গুয়েভারায় আকাশপাতাল পার্থক্য, অথচ বাংলাদেশের লোক আজও এই চৈতন্যদেবকেই তাদের গুরু মেনে উদ্বাহু নৃত্য করে ভাবের বন্যায় ডুবে রয়েছে। এই ভাবের বন্যার সাথে যে অস্ত্রের ঝঞ্জনা দরকার, মা-কালীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রনা দরকার কে বোঝাবে। তাই এই অসহযোগ আন্দোলনের নামে উৎসব-মিছিলে সে সাধারণত শরীক হোতো না, দূরে থেকে অবলোকন করে নাক কুঁচকাত। বন্ধুদের সাথে ঝগড়াও করত। সরকারী চাকুরে হয়েও বলত এবং প্রকাশ্যে, অস্ত্রে সাজো। জনতা ততটুকুই স্বাধীন যতটা তার অস্ত্রের জোর। জমিদারের ছিল লেঠেল, খাজনা না দিলে পিটিয়ে আদায় করত। তেমনি রাষ্ট্রের আছে সেনা, আর সেই রাষ্ট্র যদি জমিদারতন্ত্রী হয় বুঝতেই পারছ কি করবে।

হয়তো এই মানসিকতার কারণেই রশীদ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল। যদিও শহরে তখন রীতিমত উৎসবের আবহাওয়া চলছে। প্ল্যাকার্ড আর ফেস্টুন, ব্যানার আর পোস্টার, মিছিল আর শ্লোগান, নারী-পুরুষে শোভিত।

টিভি তেমন ভালো না লাগায় রশীদ রাতের খাবারে বসে পড়ে। খাওয়া শেষে মুখ মুছছে এমন সময় পাড়ার একটি কিশোর এসে বললে,—জানেন রশীদ ভাই, আবার মার্শাল ল হবে!

মার্শাল ল তো আছেই হে! হাসতে হাসতে বলে রশীদ।

এ-রকম মার্শাল ল নয়, এবার আর কোন কথা বলা চলবে না। আমার আব্বার কাছে খালু ফোন করেছেন। এমনকি মিলিটারি নামিয়ে লোক মারতেও পারে।

আমি তো শুনলাম আলোচনা সফল হয়েছে! মুজিবের কথা মেনে নিচ্ছে ইয়াহিয়া।

তাই তো সবাই জানত। কিন্তু খালু বলেছেন টক নাকি ফেল করেছে। তাই কোন গণ্ডগোল হলেই মিলিটারি নেমে যাবে।

কিশোরের গাম্ভীর্য ও উদ্বেগ রশীদের ভেতরেও সংক্রামিত হয়। তবু বলে, কই, টিভিতে তো কিছু বলল না?

সবাই তো এখনো জানে না, এটা ভেতরের খবর।

ভেতরের খবর! এ যদি ভেতরের খবর হয় কি যে হবে...রশীদ আপন মনে বিড়বিড় করে।

খবরটা তাকে দিয়েই কিশোর অপসৃত হয়।

রশীদের কাছ থেকে কথাটা শুনল তার মা-বাবা, ভাই-বোন এমনকি ভৃত্য পর্যন্ত। কেউ বিশ্বাস করে গম্ভীর হয়, কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়। বিভক্ত হয়ে যায় গোটা পরিবার।

কেউ বলে, দেখা যাক না, রাত দশটার টিভির খবরে সব জানা যাবে।

তার আগে সবাই খেয়ে নেয়। কখন কি হয়, শেষে হয়ত রাতের খাওয়া হবে না।

রাত পোনে ন'টার দিকে গৃহ-ভৃত্য এসে রশীদকে বলে, বুঝলেন বড় ভাই, পুলিশরা সব কাপড় পরে রেডি হচ্ছে। অনেকে খেয়েদেয়ে শুয়েছিল, তারাও কাপড়-চোপর পরছে। ই-পি-আর থেকে নাকি ফোন করেছে আজ রাতেই পুলিশ ব্যারাক মিলিটারিরা আক্রমণ করবে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বিরাট চৌহদ্দির চারপাশে ঘন-বসতি। রশীদরা এক পাশে। মাঝের রাজপথটা পুলিশ লাইন থেকে তাদের বিভেদ করে রেখেছে। এই রাস্তায় যদি গোলা-গুলি চলে ঘরে থাকা দায়। কি করব আমরা, কোথায় যাব? এই রাতে ঘর থেকে বেরনো মুস্কিল! বাড়ি ছেড়ে গেলে ফিরে এসে হয়ত আর জিনিসপত্র পাওয়া যাবে না। এ-সব ভাবতে ভাবতেই রশীদ আবার ভাবে দশটার খবরটা হোক, তখন বোঝা যাবে। গুজবও হতে পারে।

সবাই অধীর আগ্রহে টিভির সামনে বসে। সময় কাটতে চায় না। খবরের সময় এসে গেল। হাঁড়িপানা মুখ এক ঘোষক রোজকার মতই বাঙ্গালী জোশ নিয়ে খবর পড়ে যেতে লাগল...তাতে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটা অন্তত পঞ্চাশ বার উচ্চারিত হোলো, কিন্তু যে-খবরের জন্যে তারা ব্যগ্র, তার কোন ঠিকানা নেই। নেই কোন ইশারাও।

খবর শেষে সবাই বলে ওঠে, দূর! গুজব!

রশীদও প্রায় তাই বলত। এমন সময় তাদের চাকর এসে বলে, দেখেন বড়ভাই, পুলিশরা সব ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পজিশান নিচ্ছে।

ঘরের বাইরে গিয়ে সে দু'চার জন পুলিশকে রাস্তায় দেখল। মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে রাইফেল। দু'চার জনকে দেখে তখনও তেমন আমল দিচ্ছিল না।

টিভি-র পরে রেডিও-র শেষ খবর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে। খবর শেষ হোলো। তেমনি রোজকার মত খবর। রশীদ আবার বলতে যাচ্ছিল গুজব, হঠাৎ শোনে বাইরে রাস্তায় কিসের সব শব্দ এবং ব্যস্ততা।

ঘর থেকে পা না বাড়াতেই রাস্তার সব কটা নিওন বাতি একসাথে নিভে গেল। অন্ধকার ছুটে আসতেই বুকটা তার ছ্যাং করে ওঠে। নিজেকেই প্রশ্ন করে, বাতি নিভে গেল কেন? রাস্তার পুলিশ লাইনের রসুইঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করা এতিম ছেলেগুলো তখন খালি পিপে গড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করতে লেগে গেছে। আর কোন সন্দেহ নেই, কিছু একটা হচ্ছে।

আঁধারে ভূতের মত খাকি পোশাক পরা পুলিশরা যখন পাড়ার মধ্যে ঢুকে দেয়ালের পাশে পাশে জায়গা নিতে থাকে তখন সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকল না।

পুলিশরা তাদের পাঁচিল টপকে একেবারে বাগানে এসে গেলে রশীদের ছোট ভাই উঁচু গলায় বলল: কে ভাই আপনারা?

আমরা এখানেরি পুলিশ। আপনারা ঘরদোর বন্ধ করে পেছনে চলে যান।

রশীদ তার মাকে বলে, আপনি, আব্বা আর মীনা এখনি একেবারে পেছনের দিকে কারো বাসায় চলে যান, আমরা পরে আসছি। তারপর গলা নামিয়ে বলে, গহনাগুলো একটু সাবধানে রেখে যান!

এই সময় পাড়ার একজন তরুণ চীৎকার করে থমথমে আবহাওয়াকে আরো ভীত করে তোলে: আপনারা সবাই ঘরের বাতি বন্ধ করেন! সবাই পেছন দিকে চলে যান! সামনে কেউ থাকবেন না! শালা পাঞ্জাবী...

রশীদের মা-বাবা-বোন বেরিয়ে গেলে সে আর তার ছোট ভাই দুড়দাড় করে জানালা কপাট বন্ধ করে ফেলে। রশীদ লুঙ্গি ছেড়ে পরে কালো প্যান্ট। শার্টের উপর চাদর জড়িয়ে নেয়। বেশী রাতে যদি শীত লাগে তার প্রস্তুতি।

দু ভাইয়ে আলোচনা করে এখনি যাবে কিনা। শেষে ঠিক করে, না এখনি যাবে না। শেষ দেখে তবে যাবে।

কোন ঘরে আলো নেই।

অন্ধকার তখন আরো প্রকট। গোটা রাজারবাগ আর সেই সাথে গোটা শহরে শুধু ব্যারিকেড গড়ার একটা ব্যস্ত শব্দ। সারা শহরে সে শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! যেন বিশ্বকর্মার কারখানা চলছে। এত কাজ চলছে কিন্তু কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। নীরবে সবাই হাত চালিয়ে চলেছে। কারো মুখ নড়ছে না।

খানিক পর আরো বেশী সংখ্যায় পুলিশ পাড়ায় ঢুকতে শুরু করে। চার-পাঁচ জন করে এক-একটা দল। পাড়ার বেশ কিছু সাহসী ছেলে স্কাউটের কাজ করে যাচ্ছে। মই এনে পুলিশদের একতলার ছাদে ওঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। অনেক পুলিশ তিনতলার ছাদে উঠেও পজিশান নেয়। পুলিশরা সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবে। যখন ওরা মালিবাগ মোড় দিয়ে ঢুকবে এক দল আক্রমণ করবে ব্যারাকের বিশাল শেডের ভেতর থেকে। বাকীরা রাস্তার এপার থেকে, ঘর-বাড়ির ছাদ ও দেয়ালের পাশ থেকে প্রায় দু' হাজার পুলিশ, ব্যারাকের চারপাশে জায়গা নিয়ে নেয়।

রশীদ তার ছোট ভাইকে বলে, দ্যাখো, আমরা এই পুলিশকেই কত গালাগালি দিই, আর আজ তারাই প্রথম সারির যোদ্ধা।

হবে না! বাংলার পুলিশের ঐতিহ্য আছে। আটচল্লিশ সালেও তারা বিদ্রোহ করেছিল। মিলিটারি এসে সেবার অনেক পুলিশকে গুলি করে মারে। এবার ওরা তার বদলা নেবে। বাঙলার মাটির সন্তানদের এবার চিনে নিক দুর্বৃত্তগুলো।

রাতের আঁধার যেন একটা নাটক দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। মঞ্চে প্রতিপক্ষ এখনো

আসেনি, একপক্ষ অধীর নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

আচ্ছা, পুলিশরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্যে তৈরী হোলো! আমার এখনো কেমন অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে! বলে রশীদ।

জানেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা একটু আগে এসেছিল, তাছাড়া সারা অঞ্চলের থেকে এদের এসে বলে, আপনাদের পায়ে পড়ি, আপনারা অস্ত্র ধরুন! ওদের বিপরীত জেগে দিন! আমরা আপনাদের উপর ভরসা করে এ-দেশে বাস করছি! আপনারা যদি বিনা বাধায় সব ছেড়ে দেন, কাপুরুষ বলবে লোকে বাঙ্গালী জাতকে! পারি আর না পারি আপনারা একবার ওদের বাধা দিন! এরপর পুলিশরা না বলতে পারে?

হঠাৎ রাতের আঁধার বুককে ফুঁড়ে রাস্তা দিয়ে একজন ছুটে যেতে যেতে বলে চলে, মিলিটারি ইকবাল হল আক্রমণ করেছে, আপনারা হুঁশিয়ার...আপনারা হুঁশিয়ার...সাবধান ভাই সব...পুলিশরা সব সজাগ হয়ে ওঠে। যে যেখানে ছিল সবাই দৃঢ়মুষ্টিতে রাইফেল চেপে ধরে। পজিশান ঠিক করে নেয়।

আরো দশ মিনিট কাটে, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে। রশীদ আর তার ছোট ভাই ঘরে তালা মেরে অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে।

রাত বারটা প্রায় ছুঁই-ছুঁই, মধ্যরাতের সারা স্তব্ধতাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে মালিবাগে একসাথে অনেকগুলো রাইফেল গর্জে ওঠে। রশীদ ভাইকে বলে, ওরা পৌঁছে গেছে। এটা কিন্তু আমাদের পুলিশদের রাইফেল। ওরা কি আর রাইফেল চালাবে, চালাবে মেশিনগান!

তার কথা শেষ না হবার আগেই আবার একঝাঁক গুলি ছুটল।

যাক ভালোই করেছে পুলিশরা। প্রথম বাধা দিলে অনেকটা কাজ সফল হয়। শত্রুকে সব সময় প্রথম আঘাত হানো, এটাই যুদ্ধের রীতি। রশীদের ছোট ভাই বলে।

হঠাৎ তারা অবাক হয়ে যায়, দেখে একটা হাউই-এর মত জিনিস আকাশে উঠে গিয়ে ফেটে পড়ে। আর সমস্ত অঞ্চল দিনের মত আলো হয়ে যায়।

ম্যাগনেসিয়া ছেড়ে ওরা পুলিশদের পজিশান বোঝার চেষ্টা করছে। চল, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।

তারা দু' পা এগোতে না এগোতেই একটানা মেশিনগানের গুলি চলতে শুরু করে।

এবার ওরা আক্রমণ করছে। বলে রশীদের ছোট ভাই।

হ্যাঁ।

তারা দুজন তিন-চারটে বাড়ি ফেলে পেছন দিকে এসে দেখে কাজীবাড়ির বারান্দায় পাড়ার সব মহিলা ও বাচ্চারা বসে।

রশীদ ধমকে ওঠে, গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে আর আপনারা বাইরে বসে আছেন?

কে একজন বর্ষীয়সী মহিলা বলে, আমরা কোথায় যাব বাবা, তাই তো ঠিক হোলো না।

আমি তো আগেই বলে পাঠালাম সবাইকে রহিম চাচার বাড়িতে জায়গা নিতে। বাড়িটা মাঝখানে, গোলাগুলি সরাসরি লাগবে না। চলুন সব।

একরকম ধাক্কা দিয়েই সে সবাইকে নিয়ে চলে।

এই সময় জন দশেকের একটা পুলিশের দলকে দেখে সে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলে পুলিশদের অভিমত চায়।

আচ্ছা, মহিলাদের এখানে রাখব, না পেছনে আরো দূরে সরিয়ে দেব?

কোন জবাব পেল না তার প্রশ্নের। অন্ধকার থেকে একজন পুলিশ শুধু বলে, আমরা

এই তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠতে চাই, রাস্তাটা দেখিয়ে দিন।

রশীদ তার ছোট ভাইকে স্কাউটিং করতে বলে ওদিকে ব্যবস্থা করতে চলে যায়।

রহিম সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে দেখে দুই বয়স্কের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে। একজন বলে মহিলারা পেছনের মাঠটা পার হয়ে আরো দূরের কোন বাড়িতে গিয়ে উঠুক, বা মাঠের গাছতলায় গিয়ে বসুক।

আর একজনের অভিমত, না, কোনমতেই মহিলাদের বাইরে রাখা যায় না। এদের তর্কের মাঝেই রশীদ হাজির হয়। সে জোর গলায় ভারী কণ্ঠে বলে, কি হলো আপনাদের?

কথাটা শোনার পর সে বলে, দেখেন এটা ঝগড়ার সময় নয়, জান বাঁচানোর সময়। মহিলারা এখন সবাই ঘরে থাকবে। অবস্থা বেশী খারাপ দেখলে অন্য ব্যবস্থা করা হবে।

ব্যাপারটার সুরাহা হয়। রহিম সাহেবের বাড়িটা একতলা। চারপাশে দোতলা-তিনতলা বাড়ি সুতরাং অনেকটা রক্ষা। সরাসরি গুলি লাগার ভয় নেই, সহজে শেল এসেও পড়বে না।

বাইরে তখন একদিকে মেশিনগান আর দিকে রাইফেল মোকাবিলা করছে। পাড়ার যে-সব তরুণরা পুলিশদের সাহায্য করছিল হঠাৎ তাদের একদল দুড়দাড় করে এসে পড়ে। সবাই প্রায় একই কথা বলে, আপনারা একজনও বাইরে থাকবেন না। সবাই ঘরে ঢুকুন। হারামিরা ট্যাঙ্ক এনেছে। গোলা ছুড়ছে।

এই সময় আবার একটা ম্যাগনেসিয়া আকাশে উঠে ফেটে গেল। সারা আকাশ ও সারা অঞ্চল নীল আলোয় ভরে যায়। তারপরই ট্যাঙ্ক থেকে একটা গোলা এসে পড়ে অদূরে, রাস্তার পাশে। প্রচন্ড শব্দে গোটা অঞ্চল থরথরিয়ে ওঠে।

এতক্ষণ যারা বাইরে ছিল গোলার শব্দে সবাই হুড়োহুড়ি করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

মুহুর্মুহু গোলা ফাটতে থাকে, আর ঘরদোর ঝনঝন করে ওঠে।

রশীদ আর একজন তরুণ যে-কামরায় ঢুকেছে তার প্রায় সবটাই মহিলা আর বাচ্চায় বোঝাই।

জানলা তখনো খোলা। রশীদ তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। গোলার শব্দটা তাতে সামান্য কম শোনালেও চার দেয়ালের মধ্যে আরো গুম গুম করে বাজতে থাকে। জানলার কাঁচ এক-টানা ঘরঘর ঘরঘর করে সবার হৃদয়স্পন্দনকে আরো বাড়িয়ে দিতে থাকে।

কয়েক জন মহিলা তখনো কথা বলছিল, রশীদ ধমকে ওঠে। সবাই চুপ! পাড়ার সব বাড়ি খালি। এখন এ-পাড়ায় যদি মিলিটারি ঢোকে আর বুঝতে পারে এখানে সব আড্ডা নিয়েছে কুকুরের মত গুলি করে মেরে যাবে। একেবারে সব চুপ! যাতে বুঝতে না পারে এখানে মানুষ আছে!

মহিলারা চুপ করে যায়। কিন্তু দুটো বাচ্চা নিয়ে সবাই পড়ে মহা-ফ্যাসাদে। তাদের কান্না আর থামতে চায় না। বাচ্চাকে থামাতে গিয়ে মহিলারা বাচ্চাদের মায়েদের যে-ভাবে সব বাক্যবাণ চালাতে লাগল রশীদ দেখে এরা আবার না ঝগড়া বাধিয়ে বসে। কেউ বলে দুধ দিতে। কেউ বলে মুখ চেপে ধরতে...

এই সময় খুব কাছে একটা গোলা এসে পড়ায় বাচ্চা দুটো ভয়ে থেমে যায়।

বাচ্চা থামে তো, আর এক ফ্যাসাদ! মাঝবয়সী মিসেস রহিম রীতিমত প্রলাপ বকতে থাকে, আমারে আমার ভাই কইল গ্রামে যাবি? আমি যাইতে চাইলাম, তিনি-এ যাইতে দিল না, এখন আমি এখানে মরি!

কামরাটা খুবই ছোট। বার বাই পনের ফুট হবে। একটা খাট পাতা একপাশে, তার বিপরীতে একটা তক্তাপোশ, একটা আলনা, ফ্রিজ, ড্রেসিং টেবিল আর টুকিটাকি জিনিস। তারি মাঝে পঁচিশ জনের জায়গা হয়েছে। মেঝে আর তক্তাপোশে ঠাসাঠাসি করে বসেছে সবাই। খাটের উপরে কেউ বসতে চায় না। ওদিকে একটা জানলা। রশীদ বসেছে দরজা হেলান দিয়ে। দরজায়ও কেউ বসতে চায় না, অগত্যা পাহারা ও জায়গা কাজে লাগানর জন্যে সে বসে ওখানে।

এতক্ষণ কামরায় পাখা চলছিল। হঠাৎ তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। জানলা বন্ধ। সবাই গরমে দরদর করে ঘামতে থাকে। এই সময় ট্যাঙ্কের একটা গোলা আরো খুব কাছে এসে পড়ে। মিসেস রহিম হাউমাউ করে ওঠে, আমি কি করব, আমি কি করব! পাশের মহিলারা তাকে জড়িয়ে ধরেও স্থির রাখতে পারে না।

আরো একটা গোলা এসে পড়ে আরো কাছে। বাড়িটা ভীষণভাবে কাঁপে। রশীদের মাথায় কিছু চুন-বালিও খসে পড়ে। সে বুঝতে পারে, সময় হয়ে এসেছে. আর রক্ষা নেই।

এত দুড়দাড় শব্দের মাঝেও পাশের তিনতলা থেকে পুলিশদের রাইফেলের শব্দ শোনা যায়। পুটুং করে একটা শব্দ হয়। তিনতলা বাড়িটা কেন্দ্র করেই একঝাঁক মেশিনগানের গুলি ছুটে আসে। পাশের দীর্ঘকায় আমগাছটায় পড়ে ছররররর শব্দ করে ওঠে।

এই হারামজাদা পুলিশগুলো কেন গুলি চালাচ্ছে? একজন মহিলা বলে ওঠে।

ও, তারা সারা রাত ধরে জান দিয়ে লড়াই করছে দেশের জন্যে, আর বলে কিনা কেন গুলি চালাচ্ছে!

হঠাৎ মিসেস রহিম আবার হা-হুতাশ করে ওঠে। আমারে কান যাইতে দিল না, মারবার লাইগ্যা যাইতে দিল না! পানি, পানি! পানি দাও আমারে...আমি মইরা গেলাম!

অন্ধকারেই রশীদ ফ্রিজ খোলে। একটা বোতলও হাতড়ে জোগাড় করে, আর একটা গ্লাস। ছিপি খুলে পানি ঢালে। পানির ঢক ঢক শব্দে অনেকেরই তেষ্টা চাড়া দিয়ে ওঠে।

আমারে আগে দাও, আমারে আগে দাও...মিসেস রহিম অন্ধকারেও যেন বুঝতে পারে অনেকেই এর উপর হামলা চালাতে পারে।

হাতে হাতে গ্লাসটা মিসেস রহিমের হাতে গিয়ে পেঁছয়। মুহূর্তে ঢক ঢক করে পানি শেষ করে মিসেস আবার বলে, আমারে আর একটু দাও বাবা!

রশীদ গম্ভীরভাবে বলে, আর এক ফোঁটাও আপনাকে দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, যুদ্ধ চলছে। এমনি করে আমাদের কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! বাইরে থেকে কিছুই আনতে পারা যাবে না। আপনার মত অনেকেই কষ্টে আধমরা হয়ে রয়েছেন।

আর একটু দাও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি...মিসেস রহিম কাকুতিতে ভেঙে পড়ে।

না। গম্ভীর স্বর রশীদের। দক্ষ ক্যাপ্টেনের মত সে যেন বিপদে পড়া জাহাজ পরিচালনা করছে।

হাতে হাতে গ্লাসটা আবার রশীদের হাতে ফিরে আসে।

রশীদ ভাই, আমার বাচ্চাটারে একটু দেন। বলে এক তরুণী মা।

রশীদ বাচ্চার জন্যে খুব অল্প করে দেয়।

আরো দু-একজনকে তেমনি দিয়ে সে বুঝতে পারে এখনো আধ বোতল আছে। বোতলটা সে ফ্রিজেও রাখে না। কেউ যদি আঁধারে চুরি করে নেয়, তাই নিজের পাশেই রাখে।

গরমে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। গায়ের চাদরটা কখন কোথায় পড়ে গেছে খেয়াল নেই। শার্টও খুলে ফেলে, তবু স্বস্তি নেই। একটু পানি খাবে নাকি! অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে

না। প্লাসে না চালালে শব্দও হবে না। না। বিবেককে সে ধাক্কা মারে। তা করা যায় না।

এই সময় খুব কাছে আবার একটা গোলা এসে পড়ে। মহিলারা জড়াজড়ি শুরু করে। মিসেস রহিম আবার মাতন শুরু করেছে। তাকে থামানোর জন্যে রশীদ বলে, আপনি খাটের তলায় ঢুকে যান, আর ভয় লাগবে না।

খাটের তলাটার দিকে আঁধারেও অনেকের নজর ছিল। মিসেস রহিম বাধ্য মেয়ের মত খাটের নীচের জিনিসপত্র ঠেলে জায়গা করে নেয়। রশীদ বুঝতে পারে আরো দু-একজন তার পাশে স্থান নিচ্ছে। সে আবার ধমকে ওঠে, একেবারে চুপ সব! যদি প্রাণে মরতে না চাও, একেবারে চুপ! খাটের নীচে আর কেউ যাবে না!

বাইরে গোলাগুলির শব্দ তেমনি আবহসংগীত রচনা করে চলেছে। রশীদের চীৎকার করে হঠাৎ গান করতে ইচ্ছা হোলো, বক্ষে—বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান...

এমন সময় কে যেন বলে, এহ্! এমন ভিজে ভিজে লাগছে কেন? কার বাচ্চা মুতে দিয়েছে! আমার কাপড় ভিজে গেল।

বাচ্চা কি বুড়ো, আঁধারে কে বুঝেছে! কে যেন মন্তব্য করে। এই নিদানের সময়ও অনেকে হেসে ওঠে।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে। টক...টক...টকটক...

সবার হাসি উবে যায়।

একবারে নিশ্চুপ সব। নিশ্বাসের শব্দও শোনা যায় না। রশীদের কালঘাম ছুটে গেছে। কি করবে সে? কে দরজায় টোকা দেয়? তবে মিলিটারি হলে কি আর দরজায় টোকা দেবে, দেবে লাথ! নিশ্চয় মিলিটারি নয়!

উঠে দাঁড়ায় রশীদ। দরজার ছিটকানিতে হাত দিয়ে জোর গলায় বলে, কে?

এদিকে সমস্বরে চীৎকার আসে, দরজা খুলো না, দরজা খুলো না ..

আহ্ থামবেন তো আপনারা!

বাইরের জবাব এদের চীৎকারে মিশে গেছে।

রশীদ আবার বলে, কে?

আমি, রানুর মা...

মহিলাকণ্ঠ শুনে রশীদ দরজা খুলে দেয়।

কে? কে? সবাই আবার চীৎকার।

আমি রানুর মা। পাশের কোন এক বাড়ির রাঁধুনি।

তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

ঘরে ছিলাম।

তবে এখন মরতে এলে কেন?

ভীষণ ভয় লাগল।

ভীষণ ভয় লাগল! আগে ভয় লাগেনি! পাড়ার সবাই এখানে এসে উঠল, আর উনি বাহাদুরি করে ঘরে ছিলেন!

দরজা বন্ধ করার আগে রশীদ মুখ বাড়িয়ে বাইরে একবার সব কিছু দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘন আঁধারে ধাক্কা খেয়ে তার দৃষ্টি ফিরে আসে।

গোলাগুলির বিরাম নেই।

হঠাৎ একটা ধপ ধপ শব্দ হোলো, খুব কাছে। মনে হোলো কে যেন ভারি পায়ে দৌড়ে

আসছে। তবে কি মিলিটারি পাড়ায় ঢুকে পড়েছে, তারি সবুট পদধ্বনি!

উৎকণ্ঠায় সবার বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছে।

এমন সময় শব্দটা আবার শোনা গেল, তেমনি কাছে। মিলিটারি নয়, এক মুহূর্ত পর ডানা ঝাপটে একটা মোরগ ডেকে উঠল, কুক্ কুকুরের কুক......

ওহ্, মোরগ ডাকছে!

কে যেন বললে তাহলে সকাল হয়ে আসছে, না?

একটা মোরগের ডাক যে কত মধুর হতে পারে রশীদ কোনদিন এমন করে উপলব্ধি করেনি। মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনিও এত মধুর হয়। এ-যেন কোন দেবতার আশিস-বাণী, ভয় নেই, রাত কেটে আসছে। সরোদে ওস্তাদ আলী আকবর যেন ভৈরবীর আলাপ জুড়েছে। আলোক-পিয়াসী এই প্রাণীটা সুপ্রভাত বলে সবাইকে যেন সম্ভাষণ জানায়।

পরমুহূর্তে রশীদ ভাবে, কিন্তু মোরগ ডাকার মত সময় কি হয়েছে? কতক্ষণই বা কাটিয়েছে তারা? সময়টা জানতে পারলে হোতো।

কারো কাছে দেশলাই আছে? একটু ঘড়িটা দেখব!

না, কারো কাছে নেই। অন্ধকারে কে যেন জবাব দেয়।

সময় সম্বন্ধে সে সঠিক হতে পারে না।

তার মনে হয় কত শতাব্দী হয়ে গেছে। বাইরে একটা বিকট ডাইনোসর যেন তাদের তাড়া করেছে। তারা গুহায় ঢুকে গুহামানবের মত অপেক্ষা করছে, কখন সকাল হবে, পালাবে এই গুহা থেকে।

ঠিক তারই ভাবনার প্রতিধ্বনি করে কে যেন বলে, সকাল হলেই আমি কিন্তু বাবা এ-কামরায় আর থাকছি না। উঃ, গরমে দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছি!

এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে বললে, মা, আমি পিসাব করব!

কোথায় করবে? একজন প্রশ্ন তোলে।

দে, মেঝেতেই ছেড়ে দে! কোথায় আর যাবি! তার মা বলে ছেলেকে।

না, না, মেঝেতে কি! আমরা সব বসে আছি! একজন প্রতিবাদ করে।

রশীদ ডাক দেয়, দরজার দিকে এগিয়ে এসো!

ছেলেটা দরজায় এগিয়ে এলে দরজা খুলে তারা বারান্দায় বেরয়।

নাও, বারান্দায় বসে যাও, বেশী এগোতে হবে না!

ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে রশীদ আকাশের দিকে তাকায়। পুব আকাশ কালো। সকালের কোন লক্ষণ নেই। তবে মোরগ ডাকল যে? সে ডান দিকের বারান্দা পার হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখল। পুলিশ ব্যারাকের বিশাল শেডটা রাতের বুককে দিনের মত আলোকিত করে দিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে-আলোয় ঘড়ি দেখল, রাত মাত্র আড়াইটা। আগুন রাস্তা পার হয়ে এদিকের বাড়িগুলোও ছুঁই-ছুঁই করছে। পুলিতে না মরলেও আগুনের হাত থেকে কি রেহাই পাবে? সে ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে। সবাইকে কথাটা বলবে কিনা ভাবছে, এমন সময় একজন বললে, কটা বাজে বলে মনে হয় রশীদ?

আর-একজন বললে, মোরগ যখন ডাকছে তখন নিশ্চয় সকাল হয়ে এসেছে!

মোরগের ডাকটা সবার মনে যে আশার আলো জেলেছে তা মারতে ইচ্ছা হোলো না রশীদের।

বললে, চারটের মত বাজে, সকাল হয়ে এসেছে।

'চতুর্ভাণী'-র বৈশিক কর্ষণা

রমাকান্ত চক্রবর্তী

'পদ্মপ্রাভৃতকম্' [শূদ্রক], 'ধূর্তবিটসংবাদঃ' [ঈশ্বরদত্ত], 'উভয়াভিসারিকা' [বররুচি], এবং 'পাদতাড়িতকম্' [শ্যামিলক]—এই চারটি ভাণ-এর সমাহার 'চতুর্ভাণী' নামে বিখ্যাত।[1] সংস্কৃত ভাষায় রচিত একাঙ্ক 'মনোলোগ্' [আকাশভাষিত] নাটকের নাম 'ভাণ'। 'ভাণিকা' নামে আরো এক ধরনের নাটক আছে, কিন্তু একমাত্র শৃঙ্গাররসের প্রয়োগ ছাড়া তাতে ভাণের অন্য কোনো লক্ষণ নেই। 'ভাণিকা'-র একটি দৃষ্টান্ত, রূপগোস্বামিরচিত 'দানকেলিকৌমুদী'।

ভাণ নাটকে শৃঙ্গাররসই প্রধান এবং বসন্তকালই ছিল ভাণ অভিনয়ের সময়। এ-নাটকের বিষয়বস্তু বিট, গণিকাসেবী অন্যান্য পুরুষ, ও গণিকাদের কথোপকথন, এবং গণিকা-জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ও অবস্থার বর্ণনা। ভাণের আলঙ্কারিক প্রকৃতি সম্পর্কে ভরত, ধনঞ্জয়, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এবং ভাণ-রচয়িতাগণও আলঙ্কারিকদের বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করেননি।

মোতীচন্দ্র ও বাসুদেবশরণ অগ্রবাল-এর মতে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালে, কিংবা তার অব্যবহিত কালে 'চতুর্ভাণী'-র চারটি ভাণ লেখা হয়েছিল। ['শৃঙ্গারহাট' মোতীচন্দ্র ও বাসুদেবশরণ অগ্রবাল সম্পাদিত, (হিন্দী-সংস্কৃত), বোম্বাই, ১৯৫৯, পৃ. ৭-৮] কিন্তু মোতীচন্দ্র মনে করেন, খ্রীষ্টীয় ৮০০-৯০০-তে 'পাদতাড়িতকম্' রচয়িতা, কাশ্মীরের কবি শ্যামিলক জীবিত ছিলেন। [তদেব, পৃ. ৫] শ্যামিলকের কাল সত্যি সত্যি তাই হলে তাঁদের উল্লিখিত 'চতুর্ভাণী'-র কাল-নির্ণয় বোধ হয় ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বাদবিতণ্ডা পরিহার করেও স্বচ্ছন্দে বলা যায়, 'চতুর্ভাণী' গুপ্তযুগে ও তার পরবর্তীকালে রচিত হয়। সুতরাং 'চতুর্ভাণী'র ঐতিহাসিক মূল্য বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রকরণের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, ক্লাসিক সংস্কৃত নাটকের ঢঙে ভাণগুলো রচিত হয়নি। আকাশভাষিত 'মনোলোগ্' ভাণের মৌলভিত্তি; নায়ক বিট; চরিত্রগুলো তারই অভিনয়ে ব্যঞ্জিত হয়; মঞ্চে তাদের শরীরী উপস্থিতির কোনোই প্রয়োজন থাকে না। এই আঙ্গিক ক্লাসিক সংস্কৃত নাটকের রীতি-বিরুদ্ধ। প্রবণতার বিচারে ভাণের চরিত্রগুলো নীচশ্রেণীর। তারা রামের মতো নয়, রাবণের মতোও নয়। পুরুষ-চরিত্র গণিকাসেবী। স্ত্রী-চরিত্র গণিকা। পেশা বা বয়স, সামাজিক বর্ণ-বিভাগ, এ-সব ভাণের গণিকা-পল্লীতে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তার ফলে, ভাণ-চরিত্রের কোনো নাটকীয় মুখোশ, অথবা ছদ্মবেশ নেই। এরা বাস্তব, জীবন্ত। এদের চালচলন ও কথাবার্তা পার্থিব, সরস, মজাদার। আলঙ্কারিকদের নিয়মের ফাঁস ভাণে, বিশেষভাবে সুরচিত 'চতুর্ভাণী'তে, ঢিলে হয়ে পড়েছে। 'চতুর্ভাণী'র ঐতিহাসিক মূল্য এ-ধরনের জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতেই নিহিত। আকাশভাষিত উক্তি ও প্রত্যুক্তির মধ্যে চরিত্রগুলো সম্পর্কে আরো অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য—যেমন, বর্ণ, পেশা, বয়স, রূপ ও প্রবণতা—পরিবেশিত হয়েছে। এইসব বর্ণনার বিস্মৃত,

---

[1] মাত্র একটি পুঁথি অবলম্বনে মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ কবি পাটনা থেকে ১৯২২ সালে 'চতুর্ভাণী' প্রকাশ করেন। তার পরে আরো পুঁথি পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে জে. আর. এ. লোয়ান্-এর সম্পাদনায় আমস্টারডাম্ থেকে ইংরেজি অনুবাদ ও পাঠান্তর সহ শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতকম্' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোতীচন্দ্র ও বাসুদেবশরণ অগ্রবাল 'শৃঙ্গারহাট' নামে 'চতুর্ভাণী'র একটি পরিপূর্ণাঙ্গ হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করেন।

প্রাচীন জীবনধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে।

'চতুর্ভাণী'র রচয়িতাগণ চরিত্রসৃজনে নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির যে-পরিচয় রেখেছেন, মধ্যযুগীয় অর্বাচীন ভাণ-সমূহে তা নিতান্তই বিরল। 'চতুর্ভাণী'র ভাষা মূলত সরল ভাষা। মোতীচন্দ্র লিখেছেন : 'চতুর্ভাণী পড়বার সময় মনে হয়, যেন আধুনিক বারাণসীর দালাল, গুণ্ডা এবং বিশেষ-পল্লী-বাসিনী বিনোদিনীদের জীবিত ভাষা শুনতে পাচ্ছি।' [ভূমিকা, পৃ. ১০] রচয়িতাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তির বিচিত্র প্রকাশ এ রকম 'জীবিত' সংস্কৃতভাষায় সত্যি সত্যি সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, বিট, লম্পট, ও গণিকা বিষয়ক রচনার ভাষা খুব একটা সমাসবহুল ও গুরুগম্ভীর হলে যে নেহাত বেমানান হত, তা-ও 'চতুর্ভাণী'র লেখকদের জানা ছিল। কিন্তু শুধু যে ভাষার জন্যই 'চতুর্ভাণী' উপভোগ্য, তা নয়। এই রচয়িতাদের সাহিত্যিক প্রতিভার অভিজ্ঞান হল 'চতুর্ভাণী'র চরিত্রসৃষ্টি। ফলে ভাণগুলোতে কোথাও একঘেয়েমি নেই; তার কারণ, প্রবণতার সাম্য সত্ত্বেও প্রতিটি চরিত্র স্বতন্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় ছবি-আঁকা সহজ; কিন্তু এই ভাষায় রেখার আখর তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ভাষা-শৈলীতে ঘনত্ব না থেকে, থাকে রৈখিক সৌষ্ঠব। 'চতুর্ভাণী'তে ভাষার এই সৌষ্ঠব লক্ষণীয়। চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টিতে স্পষ্টতা তারই ফল। কোনো কোনো অর্বাচীন ভাণের—যেমন, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে রচিত কাশীপতির 'মুকুন্দানন্দ ভাণ'-এর ভাষাও চমৎকার। কিন্তু সে-সব ভাণের চরিত্রগুলো বৈচিত্র্যহীন; ভাষা একটা বিশেষ ভঙ্গীমাত্র।

ভাণের বৈশিক কর্ষণার তাৎপর্য বুঝতে হলে অন্য একটি প্রসঙ্গে যাওয়া দরকার। সংস্কৃতে গণিকা বিষয়ক শ্লোক ও বচন অসংখ্য। লুড্‌বিগ্‌ স্টার্নবাখ্‌ সম্পাদিত 'গণিকাবৃত্ত সংগ্রহঃ' [হোসিয়ারপুর, ১৯৫৩] নামক গণিকা-বৃত্তি বিষয়ক শ্লোক ও প্রবচন সঙ্কলনগ্রন্থে দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় নীতিবিদ্‌গণ গণিকাদের নরকের কীটরূপে বিবেচনা করেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যিক ঐতিহ্যে বৈশিকবৃত্তির প্রশংসা খুবই বিরল। কিন্তু ভাণে, বিশেষভাবে 'চতুর্ভাণী'তে গণিকাসেবী লম্পটরাই ব্যঙ্গের বিষয়; গণিকাবৃত্তির নিন্দা সেখানে নেই বললে ভুল হবে; কিন্তু গণিকা-নিন্দন ভাণের বিষয় নয়। 'চতুর্ভাণী'তে বৃদ্ধা বেশ্যাতপস্বিনীদের সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি আছে, কিন্তু সাধারণভাবে গণিকারা নিন্দিত হয়নি। বরঞ্চ, 'চতুর্ভাণী'র অনেক জায়গায় ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধভিক্ষু, বৈষ্ণব ও স্মার্ত পণ্ডিতদের ওপর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। জৈন লেখক হরিভদ্র 'ধূর্তাখ্যান' নামক গ্রন্থে এ-ধরনের বিদ্রূপ করেছেন। [ধূর্তাখ্যান এ. এন. উপাধ্যায় সম্পাদিত। বোম্বাই, ১৯৪৪] কিন্তু 'চতুর্ভাণী'র লেখকগণ কোনোকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন কি না, জানা যায় না। অথচ, সমকালীন ব্রাহ্মণ্য ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে তাঁরা প্রহসনমূলক গদ্য-পদ্য রচনা করতে ভয় পাননি।

'ধূর্তবিটসংবাদ' ভাণে কবি ঈশ্বরদত্ত যে-ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন, চার্বাকমতের সঙ্গে তার সাধর্ম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ভাণটি যৌনপ্রেমের পার্থিব ব্যাখ্যায় ও দৈহিক সুখের জয়গানে মুখরিত। মোতীচন্দ্র ও বাসুদেবশরণ অগ্রবাল বিট-ব্যবহৃত, 'চতুর্ভাণী'তে উল্লিখিত, ১৩৫টি 'বিটভাষা'র তালিকা ও ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন, এই ভাষার প্রয়োগ 'চতুর্ভাণী'তে যেমন দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যত্র তা নেই। [পরিশিষ্ট ৩] দ্ব্যর্থবোধক বিট-ভাষার প্রায় প্রতিটি শব্দের দুটি অর্থ। একটি হল ধর্মীয়; অপরটি যৌন।

বররুচির উভয়াভিসারিকায় কণাদের বৈশেষিক দর্শনের প্রযৌক্তিক শব্দগুলোর দ্ব্যর্থ-বোধক প্রয়োগ উপভোগ্য ভাবে বক্র ব্যঙ্গোক্তির ব্যঞ্জনায় ভরে উঠেছে। শূদ্রক পদ্মপ্রাভৃতকম্‌-এ পাণিনি-ব্যাকরণের কৃদন্ত নিয়ে অট্টহাস্যে মেতে উঠেছেন। আর, পাদতাড়িতকম্‌-এর কবি

শ্যামিলক যে কাকে ব্যঙ্গ করেননি, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মনে রাখা দরকার, যে-কালে এই চারটি ভাণ লেখা হয়েছিল, সে-কালে স্মৃতি ও সংহিতার শাসন ছিল প্রবল। সুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত লিখেছেন, বড় বড় কবিরা ঐ-যুগে স্মৃতি ও সংহিতার দাপটে সমকালের প্রাকৃত নর-নারীর প্রেম নিয়ে কাব্য লিখতে সাহস পাননি। তাঁরা পৌরাণিক প্রেমকাহিনীর সূত্র ধরে প্রেমের কবিতা ও নাটক লিখেছিলেন। [S. N. Dasgupta, S. K. De : *History of Sanskrit Literature,* Cal. Uni. 1947. Intro. pp. 39-40]। কিন্তু 'চতুর্ভাণী'র কবিরা স্মৃতি ও সংহিতাসমূহকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। ঈশ্বরদত্তরচিত ধূর্তবিটসংবাদ ভাণের নায়ক পাটলিপুত্রের বিট-নায়ক দেবিলক বলেছে, 'স্ত্রী সংসর্গ করবে না, এই হল বৃহস্পতি, উশনস্ প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের মত। কিন্তু এটি স্রেফ্ উপদেশমাত্র। শোনা যায়, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও অহল্যা প্রভৃতি নারীদের সম্পর্কে রিরংসা প্রকাশ করেছেন। অন্তত আমি কাউকেই স্ত্রীপ্রসঙ্গ বর্জন করতে দেখিনি। ধর্ম ও অর্থ থেকে ভোগ অনেক ভাল। ভোগেই ইষ্টলাভ; ইষ্টের মধ্যে প্রধান হল স্ত্রীলোক... শোনা যায়, পুণ্যাত্মা মহাত্মারাও স্বর্গে দিব্যস্ত্রীদের লাভ করেন। কিন্তু মর্ত্য পুরুষের সঙ্গে স্বর্গীয় দেবীর মিলন কি পরস্পরবিরোধী নয়?...স্বর্গের অপ্সরাদের সঙ্গে প্রেম করা মহা ঝকমারি ব্যাপার! প্রথমত তাদের বয়সের গাছ-পাথর নেই, দ্বিতীয়ত তারা আবার সংস্কৃতে কথা বলে! প্রভাবও তাদের নাকি বিরাট! সর্বোপরি তারা আবার বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদের জননী! তাদের তো বিশ্বাস করাই মুস্কিল!' [চতুর্ভাণী, ১৯৫৯, পৃ. ১১১-১১৮]

কথাগুলো দৌবলকের জন্য পরিকল্পিত; কিন্তু লিখেছেন ঈশ্বরদত্ত, এবং লিখেছেন এমন এক সময়ে যখন এ-সব কথা ভাবাও ছিল পাপ। অবশ্য একথাও না মেনে উপায় নেই যে, সমসাময়িক রাজশক্তি সামাজিকক্ষেত্রে গণিকাবৃত্তির সমর্থন করেছে। মেগাস্থিনিস্ ও কার্টি-য়াস্-এর বিবরণে দেখা যায়, সেকালে দাসীদের ওপর রাজাদের দেহরক্ষার ভার অর্পিত হয়েছিল। 'অর্থশাস্ত্র'-এ বলা হয়েছে, বারবনিতারা ছিল রাজার 'স্নাপক', 'সংবাহক' এবং 'আস্তরক'। একটি অর্বাচীন প্রহেলিকামূলক শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, রামের অভিষেকের সময় একটি 'মদবিহ্বলা' তরুণীর হাত থেকে জলপূর্ণ 'হেমঘট' সোপানের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল! ['সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার,' বোম্বাই, পৃষ্ঠা ১৯১] কৌটিল্যের মত অনুসারে 'বেশ্যাধ্যক্ষ' রাজপ্রাসাদের নানাবিধ কাজের জন্য গণিকা ও প্রতি-গণিকাদের নিযুক্ত করতেন। গুপ্তযুগেও রাজাদের সঙ্গে গণিকাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হরিষেণ-রচিত 'শিলা-লেখ'-তে 'কন্যোপায়নদান'-এর সূত্রে রাজাকে কন্যাদানের ব্যাপার লক্ষণীয়। 'হর্ষচরিত'-এ পুত্রের জন্মের পর কুলবধূ ও বেশ্যাদের নাচগানের উল্লেখও লক্ষণীয়। তাছাড়া, ধর্মের দিক থেকেও বারবনিতারা নেহাৎ 'অচ্ছুৎ' ছিল না। মেঘদূতের শ্লোকে (১/৩৪-৩৬) উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দিরে চামরধারিণী বেশ্যাদের উল্লেখ দেখা যায়। [তখন বেশ্যারা, নাচের তালে যারা তুলেছে মেখলায় নিক্কণ/সলীল ভঙ্গিতে রত্নছায়াময় চামর নেড়ে যারা ক্লান্ত॥ ৩৬ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুচরণের বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদ] 'অর্থশাস্ত্র'-এ সূত্রাধ্যক্ষ প্রকরণে দেখা যায়, দেবদাসীগণ সুতো তৈরির কাজেও নিযুক্ত হত। 'ভবিষ্যপুরাণ'-এ সূর্যদেবকে বেশ্যাদানের ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ মুলতানের সূর্যমন্দিরে বেশ্যাদের নাচ-গান করতে দেখে-ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী'র বহু জায়গায় রাজাদের গণিকা-সংসর্গ বর্ণিত হয়েছে। আল্ বেরুনি লিখেছেন, ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকগণ গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধতা করলেও, রাজারা তার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। রাজস্থানে পাওয়া দশম শতাব্দীর একটি অনুশাসনে দেখা যায়, রাজা ব্রাহ্মণদের

বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে তাঁর বংশধরকে মন্দিরের দেবদাসীদের জন্য ব্যবস্থা করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। [*Epigraphic Indica,* Vol. 10; p. 28]

রাজারাই যখন বেশ্যাবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তখন স্মার্ত ব্রাহ্মণদের সে-বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা মানার জন্য অন্যদের উদ্বেগ না-থাকাই ছিল স্বাভাবিক। শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিকম্'-এ গণিকা বসন্তসেনাকেই নায়িকা করেছেন। পতিতার অপূর্ব সতীত্ব নিয়ে তিনি নিশ্চয় ব্যঙ্গ করেননি।

গণিকাগামী পুরুষদের সম্পর্কে 'চতুর্ভাণী'তে যে-সব তথ্য—অর্থাৎ, নাম, ধাম ও পেশার উল্লেখ আছে, তা এইরূপ।

১। বিপুলামাত্য; বৈয়াকরণ দত্তকলশি; ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণ পবিত্রক; ধর্মারণ্যের বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ধিলক; শেষোক্ত ব্যক্তি হুতোমী ভাষায়, একজন 'দুকুরে লোচ্চা' ['পদ্ম-প্রাভৃতকম্']

২। ধনিপুত্র কৃষ্ণিলক। ['ধূর্তবিটসংবাদঃ']

৩। শ্রেষ্ঠিপুত্র কুবেরদত্ত; রাজশ্যালক রামসেন; বণিকপুত্র ধনমিত্র; পাটলিপুত্রের রাজা। ['উভয়াভিসারিকা']

৪। বৈষ্ণব বিষ্ণুদাস; বাহ্লীক দেশের লোকসঙ্গীতশিল্পী বাপ্প; মৃদঙ্গবাদক স্থাণু-মিত্র; বৈদ্যপুত্র হরিশ্চন্দ্র; হূণ মথবর্মা; ভাঁড় হিরণ্যগর্ভক; মহাপ্রতিহার ভদ্রায়ুধ; চিত্রকর নিরপেক্ষ; রাজদূত গুপ্তকুল; চিত্রাচার্য শিবস্বামী; প্রতিহার পদ্মপাল; পণ্ডিত উপগুপ্ত; বৃদ্ধ রবিদত্ত; দুর্বল ও কৃষ্ণবর্ণ সূর্যনাগ; বিদর্ভের সৈনিক হরিশূদ্র; বেশ্যাধ্যক্ষ দ্রৌণিলক; নৃত্যশিল্পী উপচন্দ্রক; শকরাজকুমার জয়ন্তক; আভীলক ময়ূরকুমার; শার্দূলবর্মার পুত্র বরাহদাস; ঈভ্যপুত্র বিটপ্রবাল। ['পাদতাড়িতকম্']

প্রথম ও শেষ তালিকার পুরুষরা উজ্জয়িনীর নাগরিক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার পুরুষরা পাটলিপুত্র নগরের। শূদ্রক লিখেছেন, উজ্জয়িনীর গণিকাপল্লীতে নির্ধন ব্যক্তির যাওয়াটা ছিল নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ। 'নির্দ্রব্যাণামপ্রসিদ্ধপ্রবেশঃ'। ['চতুর্ভাণী', পূর্বোক্ত সং, পৃ. ৩১; শ্লোক, ২৩] 'চতুর্ভাণী'তে বর্ণিত গণিকাদের বিত্তের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মোতীচন্দ্র লিখেছেন, বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি তাদের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। কথাটা অমূলক নয়। 'পদ্মপ্রাভৃতকম্'-এ উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধির বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: বসুন্ধরা যেন বধূ। জম্বুদ্বীপ যেন তার মুখ ও কপোল। অবন্তিসুন্দরী উজ্জয়িনী যেন সেই মুখ ও কপোলে আঁকা পত্রলেখা। তার অপরূপ শ্রী যেন ভাণ্ডে ভাণ্ডে উচ্ছলিত। পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ঈশ্বরদত্ত লিখেছেন, পণ্যসমুদয়ের সমাবেশ ও জন-বাহুল্যের দ্বারা সংসূচিত পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি দেখে সবাই বিস্মিত হয়। 'উভয়াভিসারিকা' ভাণে দেখা যায় শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহগণ ছিল গণিকাসেবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অবশ্য ফরাসি ঐতিহাসিক জ্যাঁনিন্ অবোয়া-র মতে বড়লোক ক্ষত্রিয়গণ বেশ-কামিনীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। [*Daily Life in Ancient India.* Asia Publishing House. 1967, pp. 238-239]

'চতুর্ভাণী'তে বিত্তহীন গণিকার উল্লেখ নেই; সেখানে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র শহর দুটির গণিকা-নিবাসের সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের অসাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস্-এর 'হেটেরা' নামে বারাঙ্গনারা রূপেগুণে খ্যাতি পেয়েছিল; রোমান্ গণিকাদের খ্যাতিও ছিল খুব। তবু মনে হয় পাটলিপুত্র-উজ্জয়িনীর গণিকা-নিবাস তার তুলনায় প্রায় স্বর্গ ছিল।

অথচ ঐ পার্থিব স্বর্গের অর্থনৈতিক পটভূমি ছিল ক্রমবর্ধমান সামন্ততন্ত্র। 'দশবেশসমো-নৃপঃ', অর্থাৎ, দশজন বেশ্যার সমান একজন রাজা,—মনুসংহিতার এই হল একটি অর্থবহ বচন। [গণিকাবৃত্তসংগ্রহ', উদ্ধৃতি-সংখ্যা ৫৬০]। সেখানে আরো বলা হয়েছে, বেশ্যারা গ্রাম্য প্রধান অথবা 'গ্রামণী'র মতোই পরের দুঃখ বোঝে না। কাশ্মীরের প্রখ্যাত কবি ক্ষেমেন্দ্র লিখেছিলেন, যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে 'নিসর্গবঞ্চক' বেশ্যাও 'নিয়োগী', অথবা সরকারি কর্মচারী বার্ধক্যে ধনীরূপে খ্যাত হয়। গণিকা-নিন্দনে, শোষণ ও প্রবঞ্চনা প্রসঙ্গে, অনেক ক্ষেত্রেই রাজা, গ্রামণী, নিয়োগী, কায়স্থ কিংবা কেরানি, গণিকাদের সমধর্মীরূপে উল্লিখিত হয়েছে।

মোতীচন্দ্র অবশ্য 'চতুর্ভাণী'র সুদীর্ঘ অবতারণায় এ-সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেন নি। এক সময়ে ভারতীয় কৃষ্টির গৌরব আলোচনায় ঋষি, তপঃ, তপোবন, দর্শন—ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছিল। পরে গবেষকগণ দেখলেন, প্রাচীন ভারতে দৈহিক সুখভোগ কখনো অবহেলিত হয়নি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা কোনো কোনো ঐতিহাসিককে এমনি মাতিয়ে তুলেছিল যে, তাঁরা প্রাচীন ভারতের যৌন-জীবনের মধ্যেও সুগভীর একটি 'দর্শন' আবিষ্কার করে ধন্য হয়েছিলেন। গণিকা-বিলাসের বর্ণাঢ্য বিবরণ দিতে গিয়ে মোতীচন্দ্র ঐ ধারার রীতিই অবলম্বন করেছেন। অথচ, সমকালীন প্রমাণসমূহ থেকে গণিকা-বৈভবের পশ্চাৎপট হিসাবে সামন্তশোষণের নিদর্শনগুলো উপেক্ষণীয় নয় বলেই মনে হয়। 'ধূর্তবিট-সংবাদঃ' এবং 'পাদতাড়িতকম্' ভাণ দুটিতে গুপ্তযুগের বারবনিতাদের সমৃদ্ধির দুটো চমৎকার বিবরণ আছে। জ্যানিন্ অবোয়া লিখেছেন: গণিকা-পল্লী সে-কালে রাজবাড়ির কাছেই ছিল। তবে, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামিলক সে-কথা লেখেননি। 'ধূর্তবিটসংবাদঃ'-এ ঈশ্বরদত্ত লিখেছেন: 'মালা ও মদের গন্ধে ভরা বাতাস যেন গণিকার নিঃশ্বাসতুল্য। স্থান, পাটলিপুত্র। কাল, বর্ষাকাল। গণিকা-প্রাসাদের শিখরগুলো যেন কৈলাস-শিখর। সেখানকার গবাক্ষসমূহ, বারাঙ্গনাদের স্তনতটম্বারা মর্দামান।' 'স্তনতটোপমর্দামান,'—গবাক্ষের এমন শিল্পিত রূপ দেখা যাবে ভারহুত ও সাঁচীতে। বেশপল্লীর অগুরু ও ধূপের ধোঁয়া বর্ষার মেঘের ঘনঘটা সৃষ্টি করেছে। বেশ্যাদের গৃহদ্বার উপহারের ফুলে আচ্ছন্ন। অভ্যন্তরে কামীপুরুষের উদ্বেগ-বর্ধক কাঞ্চীর কন্‌কন্ নিনাদ শোনা যায়। কামিনীদের নূপুরের আওয়াজ যেন প্রেমিকার আবেগময় কথা! এখানকার গণিকা-পরিচারিকাদের কটাক্ষ-প্রহরণ সমুদ্যত; স্ফুট হাস্যে দশন-পঙ্‌ক্তি উন্মীলিত; কথা বলার সময়ে কথার তালে তালে লতারূপী ভ্রূদুটি নাচতে থাকে; তারা পীনপয়োধরা; স্বচ্ছ, দামী কাপড় পরেছে তারা; কখনো কখনো বিভ্রমবশে তাদের আবরণ খসে পড়ছে; তাদের গতি বিলসিত, ললিত ও চপল। এখানকার গণিকা-দারিকাগণ যুবতী; স্মিত হাস্যে তাদের মুখ অলঙ্কৃত; তারা মোটেই বিস্মিত নয়; অথচ তাদের ভাব-ভঙ্গিতে বিস্ময় অভিব্যঞ্জিত। স্নিগ্ধ, সুকুমার, কৃষ্ণ ও সুকুঞ্চিত তাদের কেশরাজি। নিতম্ব-গর্বে তারা হাতির মতো হেলেদুলে চলাফেরা করে।

বর্ণনা এখানেই শেষ হয়নি। বলা হয়েছে, তাদের প্রাসাদপঙ্‌ক্তি অনবরতই মৃদঙ্গধ্বনি ও পারাবতকূজনে মুখরিত; বহু শিল্পী সেখানে এসেছে। তাদের কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছে মানী এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যবর্গ। তারা সংগ্রহ করছে পুষ্পোপহার, রাখছে গৃহদ্বারে। কোথাও তৈরি করা হচ্ছে সুরত-প্রদীপের জন্য সুগন্ধ স্নেহসার। স্তনে লেপনের জন্য 'বর্ণক' বানানো হচ্ছে। মনস্বিনী রমণীর হৃদয়ের মতো সুকুমার মালা গাঁথা হচ্ছে। প্রিয়ার বাণীর মতো শ্রবণ-সুখদ 'বল্লকী', অর্থাৎ একধরনের বেহালার মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। কোথাও প্রবাহিত হচ্ছে শীধু মদের ধারা; সেখানে বারবধূদের নয়নকমল মুকুলিত; স্তনতট সব্যাজপ্রদর্শিত;

হাসি লজ্জাবিভূষিত; কথা আধো-আধো; নিশ্বাস মন্দ; সঙ্গীত, নিধুভে তালমানলয়-সমন্বিত। ['চতুর্ভাণী' (১৯৫৯), পৃ. ৭৬-৭৭]

শ্যামিলক 'পাদতাড়িকম্'-এ উজ্জয়িনীর বারবনিতা পল্লীর আরো বেশি তথ্য-সমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন: উজ্জয়িনী একটি সার্বভৌম নগরী। সেখানকার বাজারের রাস্তা জন-সংমর্দদুর্গম। সে-রাস্তা থেকে একটি 'পুষ্পবীথি' ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই পাওয়া যেত 'পূর্ণভদ্রশৃঙ্গাটক' নামে একটি জায়গা। তার পরেই ছিল 'মকররথ্যা', অথবা মকর-গলি। ঐ গলি দিয়ে খানিকদূর গেলেই পাওয়া যেত উজ্জয়িনীর বিখ্যাত গণিকা-পল্লী। তার প্রবেশ-পথেই ছিল একটি পানগৃহ। পানগৃহের কাছেই ছিল একটি 'জীর্ণোদ্যান'। ঐ 'জীর্ণোদ্যান' সংলগ্ন ছিল প্রাসাদোপম গণিকালয়। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ত সেই বিশাল বাড়ির 'বপ্র', 'নেমি', 'সাল', 'হর্ম্যশিখর', 'কপোতপালী', 'সিংহকর্ণ', 'গোপানসী', 'বলভীপুট', 'অট্টালক' 'অবলোকন', 'বিটঙ্ক'। বাড়ির ভেতরে গেলেই দেখা যেত, বড়ো বড়ো অনেক চারকোনা ঘর, এবং একটি নির্মলজলপূর্ণ পরিখা। সেই পরিখা থেকে টেনে আনা হয়েছিল বক্রিলর দীর্ঘ নল। ঐ নলে ফু দিয়ে জল ছিটিয়ে সাফ্ করা হত 'বন্ধসন্ধি', 'দ্বার', 'গবাক্ষ', 'বিতর্দি', এবং গৃহমধ্যস্থ 'সংজবন' বা আঙিনা। কাছেই ছিল নকশা-আঁকা, পলস্তারা-করা 'বীথি' ও 'নির্যূহক' সমূহ; মাঝখানে, একটু নীচে সুপ্রশস্ত, চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ; সেখানে একে-একে, দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে সাজানো গাছের সারি। কাছে ছিল সবজীর বাগান, মালার ফুল সংগ্রহের জন্য পুষ্পবন। ছিল শতশ্বেতপদ্ম-সুশোভিত চমৎকার গৃহদীর্ঘিকা, যার কাছাকাছি ছিল 'ভূমিগৃহ', 'লতাগৃহ' এবং 'চিত্রশালা'।

প্রধানা বারবধূদের আকাশচুম্বী বাড়িগুলো দামী মোতী ও 'প্রবালকিঙ্কিণী জালে' সুশোভিত। সেখান থেকে হাওয়ায় উড়ত সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য-সূচক 'বৈজয়ন্তী' পতাকা। ভোরবেলায় বিট-নায়ক সেখানে 'কর্ণীরথ'-এর পৈঠায় অবন্তিদেশের একটি লোককে বসে থাকতে দেখেছিল; দেখেছিল, কষে তক্মা-আঁটা দুজন 'কিরাত'-চৌকিদারকে; সামনে দাঁড়িয়েছিল কম্বোজ দেশের একটি ঘোড়া, এবং একটি হস্তিনী। আধো-ঘুমে অলস এদের পিঠের আসনগুলো মুড়ে রাখা হয়েছিল।

অন্দরমহলের দৃশ্য ছিল মনোরম। একজন প্রেমিক ঐ সকাল বেলাতেই প্রেয়সীর নয়নে চোখেরজল দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অপর প্রেমিক প্রেয়সীর কাতর আহ্বানে আবার তার ঘরে ঢুকেছে। খল দালালের দল ধনী বাবুদের তোষামোদ করছে। সামনেই বিহ্বলভাবে দাঁড়ানো কিছু সর্বস্বান্ত কামুক! কোনো গণিকা তার প্রেমিকের তোয়াজ করছে। কোনো প্রেমিক মানিনীর মান ভাঙবার চেষ্টা করছে। একটি উৎকণ্ঠিতা গণিকা বল্লকীর স্বননে করুণ রাগিণী ফুটিয়ে তুলেছে। কোথাও একজন প্রেমিক প্রিয়তমার প্রসাধনে সাহায্য করছে সামনে আয়না তুলে ধরে। অল্পবয়সী গণিকা-কন্যারা কন্দুকের খেলায় মেতে উঠেছে। কোনো গণিকা তার প্রিয়তমের পাশেই বসে আছে। একটি প্রৌঢ়া বেশ্যা ছবি আঁকতে আঁকতে অন্যদের গল্প বলছে। কন্দুকক্রীড়াশ্রান্তা কিশোরী ও তরুণী গণিকারা দুটি ঘরের মাঝামাঝি 'বীথি'-র ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে। ['চতুর্ভাণী'। (১৯৫৯), পৃ. ১৬৬-১৭৮]

গণিকাদেরও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। কিন্তু বাৎস্যায়ন সেই শ্রেণী-বিভাগের কোনো অর্থ-নৈতিক বিবরণ দেননি। সব শ্রেণীর গণিকারা এই ধরনের বহুকক্ষবিশিষ্ট প্রাসাদে বাস করত,—'চতুর্ভাণী'তে এ-রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গণিকা-প্রাসাদ যে শুধু 'চতুর্ভাণী'তেই বর্ণিত, তাও বলা যায় না। 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর আটকক্ষবিশিষ্ট গণিকা-নিবাসের বর্ণনা

আছে। অনুরূপ বর্ণনা বুধস্বামিন্-এর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহঃ' নামক গ্রন্থে পাওয়া যাবে। 'বসুদেব হিংডী' নামক প্রাচীন জৈন-গ্রন্থেও বেশ্যা-পল্লীর সমৃদ্ধি বর্ণিত। সমসাময়িক তামিল কাব্য 'শিলাপ্পাদিগারম্'-এ মাধবী নাম্নী গণিকার ঐশ্বর্য বর্ণিত হয়েছে।

অথচ, বারবিলাসিনীদের ঐশ্বর্য সংস্কৃত কবিরা তো বটেই, প্রাকৃত ভাষার কবিরাও ভাল চোখে দেখেননি। সুপ্রাচীন প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহ গ্রন্থ 'বজ্জালগ্গং'-এ 'বেসাবজ্জা'-র ২৮টি বজ্জাতেই বেশ্যাদের অর্থলোভ কঠিন ভাষায় নিন্দিত হয়েছে। অসামাজিক যৌন-সম্পর্ক সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত কবিদের আপত্তির কারণ হয়নি; কিন্তু গণিকা-প্রসঙ্গ তাঁরা ঘৃণা করেছেন।

'চতুর্ভাণী'তে কিন্তু কোথাও কোথাও পতিতার ভালোবাসার কথাও বলা হয়েছে। ঈশ্বরদত্তের মতে, কাঞ্চনমূল্য ছাড়াই যে-বেশ্যার হৃদয়ে অনুরাগের উদয় হয়, সে 'অধমা'। 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর নায়িকা বসন্তসেনা চারুদত্তকে ভালোবেসেছিল। শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতকম্' ভাণে নাট্যকারের একটি বিরহিণী বারবধূ, ভান্ডীরসেনার মেয়ে কুমুদ্বতী। 'উভয়াভিসারিকা'র অনঙ্গদত্তা, দরিদ্র প্রেমিক নাগদত্তকে পরিত্যাগ করেনি।

গুণগত বিচারে বাৎসায়ন বেশ্যাদের আট রকমের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন, যথা, কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, নটী, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রূপাজীবা, এবং গণিকা। 'চতুর্ভাণী'তে গণিকাদের বিশেষণ রূপে সাইত্রিশটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; এ-সব শব্দের আভিধানিক অর্থ এক নয়। 'পুংশ্চলী' এই রকমের একটি বিশেষণ।

'ধূর্তবিটসংবাদঃ'-এ 'বারমুখ্যা' কথাটি দেখা যায়। 'বারমুখ্যা' মানে প্রধানা বারাঙ্গনা। জ্যানিন্ অবোয়া লিখেছেন, বারাঙ্গনারা এক ধরনের 'গিল্ড্' বা ব্যবসায়-সংস্থা গঠন করেছিল; সেই সংস্থার নেত্রী ছিল সবচেয়ে মানী বেশ্যা। রোগে রূপ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত, কিংবা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, তার নেতৃত্বের অবসান হত না। (অবোয়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩৭) 'বারমুখ্যা' সম্ভবত ঐ গণিকা-সংস্থার নেত্রী। বারমুখ্যাদের হর্ম্যশিখর থেকে পতাকা উড়াবার উল্লেখ করেছেন শ্যামিলক। মোতীচন্দ্রের মতে, সেই পতাকা ছিল বারমুখ্যা গণিকাটির সৌভাগ্য-সূচক চিহ্ন।

বররুচি অর্থলোলুপ 'বেশ্যামাতা'র উল্লেখ করেছেন। 'উভয়াভিসারিকা'র একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, অপ্রিয় কিংবা প্রিয় ব্যক্তির অনুরাগ সর্বপ্রকারে উজ্জীবিত করে অর্থ উপার্জনই বেশ্যাধর্ম, এবং 'বেশ্যামাতা'র একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্যামিলক কন্দুকক্রীড়াসক্তা 'বেশকন্যকা'গণের উল্লেখ করেছেন। 'চতুর্ভাণী'র বহু জায়গায় 'বাসু' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। 'বাসু' মানে, আদর অর্থে আধুনিক বাঙলা স্ল্যাং-এ 'ছুঁড়ি'। অন্তত একটি জায়গায় 'বাসু' 'বনরাজিকা' নাম্নী তরুণী গণিকার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শূদ্রক; তার ফুলের সাজ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বিট-নায়কের মুখ দিয়ে বলেছেন,

সুবদনে! তোমার কেশপাশে বাসন্তী, কুন্দ ও কুরবক; শিখার শেষে অশোক; স্তনতটে সিন্দুবার ফুলের উপহার। কানে দুলছে আমের মঞ্জরী। বাহু দুটি করপুটেও ফুল। মূর্তিমান বসন্ত ঋতুকেই তুমি যেন নিজ দেহে বহন করছো।

'বেশকন্যকা'গণ 'পিচ্ছোলা', 'কৃতকপুত্রক', 'দুহিত্রিকা' প্রভৃতি পুতুল নিয়েও খেলত। এ-সব খেলা হত 'বেশরথ্যায়াঃ প্রতিভবনচ্ছায়াসু', অর্থাৎ, বেশ-পল্লীর গলিতে, ঘরের ছায়াতে।

বৃদ্ধা গণিকারা 'চতুর্ভাণী'তে বিদ্রূপের পাত্রী। এইরূপ একজন বৃদ্ধা গণিকা 'পাদ-

তাড়িতকম্'-এর সরণিগুপ্তা। তার বার্ধক্য সত্ত্বেও ছলাকলার শেষ হয়নি। ঘাড়ের ওপর কাশ-শুভ্র চুলের রাশি লুটিয়ে পড়েছে। বসন সদ্যোধৌত; উত্তরীয়টি একটি কাঁধে বিগলিত; সে উত্তরীয়টি এক হাতে তুলে ঠিক করে দেবার চেষ্টা করছে। তাই করতে করতে সরণিগুপ্তা কামদেবের মন্দিরের 'মকরযষ্টি', বা মকর-অঙ্কিত ধ্বজা প্রদক্ষিণ করছে, আর সামনেই ময়ূরের নাচ দেখছে অপাঙ্গ-বীক্ষণে। দেহটি তার জরাগ্রস্ত; কিন্তু 'এবে কিছু গুঁড়া আছে শেষে'! এই বয়সেও সে মৃদঙ্গ-বাদক স্থাণুমিত্রের প্রণয়িনী। দিন তিনেক আগে চুম্বনকালে ঐ বুড়ীর জরাজর্জর একটি দাঁত স্থাণুমিত্রের মুখের মধ্যে খসে পড়ে; তখন স্থাণুমিত্র 'থট্' শব্দে থুথু ফেলে সেই চ্যুতমূল দাঁতটি ফেলে দেয়।

উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ গণিকা-পল্লীতে দূরদেশ থেকে বহু গণিকার আমদানি হত। শ্যামিলক তাদের একটি তালিকা দিয়েছেন, যথা, সুরাষ্ট্রের বারমুখ্যা মদনসেনিকা, শূর্পারক কিংবা সোপারা থেকে আসা শমদাসী, পাটলিপুত্রের পুষ্পদাসী, কাশীর বারমুখ্যা পরাক্রমিকা, সিংহলের ময়ূরসেনা, দ্রাবিড় দেশের কাবেরিকা, এবং বর্বরিকা, যবনী কর্পূরতুরিষ্টা।

যবনী কর্পূরতুরিষ্টার বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক; সে শার্দূলবর্মার ছেলে বরাহদাসের প্রণয়িনী; সর্বদা মদ খেয়ে টং হয়ে থাকে; অথচ, সুন্দরী, এবং 'চকোরচিকুরেক্ষণা'। বর্বরিকা নামে যুবতীটি কৃষ্ণবর্ণা 'ঘটদাসী', অর্থাৎ বাৎস্যায়ন-উল্লিখিত নিকৃষ্ট স্তরের গণিকা, 'কুম্ভ-দাসী'। কিন্তু, সুরাষ্ট্রের শক অধিপতির পুত্র জয়ন্তক তাকেই ভালোবাসে।

বররুচির 'উভয়াভিসারিকা' ভাণে বিলাসকৌণ্ডিনী নামে কণাদমতাবলম্বিনী এক তরুণী 'তপস্বিনী'র মজাদার বিবরণ আছে। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় সে তপস্বিনী; কিন্তু আসলে সে একজন বারবনিতা। বিলাসকৌণ্ডিনী বৈশেষিক দর্শনের নিষ্ঠাবতী ছাত্রী; কথায় কথায় দার্শনিক তত্ত্ব বলে। কিন্তু, সুললিত ও মৃদু তার পদন্যাস; নয়নের অমৃত তার রূপ; তার পটবাসের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে, আমের মুকুল অগ্রাহ্য করে ভ্রমরগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে। তার দুটি নয়ন বিশাল; দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল, চারু ও রুচির। সুরতখেদালস তার গতি। সুন্দর অধর। আর, তার বৈশেষিক দর্শন? বিট-নায়কের ভাষায়, 'আয়তাক্ষি! তোমার দেহটি 'দ্রব্য'। রূপসমূহ 'গুণ'। যৌবনই 'সামান্য'। (সকলের ভোগের জন্য)। কর্ম-সমূহ যুবজন-প্রশংসিত। অয়ি আর্যে! তোমার সঙ্গে সবার সমবায়ের ইচ্ছাই 'বিশেষ'। মনোভি-লাষিত তরুণের সঙ্গে তোমার সম্পর্কই 'যোগ', আর অনভিলাষিত পুরুষের কবল থেকে তোমার মুক্তিই হল 'মোক্ষ'। চিহ্নিত শব্দগুলো কণাদের বৈশেষিক দর্শনের পারিভাষিক শব্দ।' এ-সব শ্লোক মামুলি নয়; ধ্রুপদী সংস্কৃত কবিতায় এ-ধরনের বিচিত্র শ্লোক কিংবা অদ্ভুত বিবরণ সুদুর্লভ; বিশেষভাবে বররুচি কণাদের দর্শন নিয়ে এ-রকম ঠাট্টা করেছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। এ-ব্যাপারে বররুচির যোগ্য সাথী ছিলেন শ্যামিলক। 'তথাগত', 'তথাগতশাসন', 'মুদ্রিতা যোষিৎ', বৈষ্ণব-পরিকল্পিত 'রাধিকা' প্রভৃতি সম্পর্কে বিট-নায়কের মুখ দিয়ে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিয়েছেন তিনি। এ ভিন্ন দিবা-সুরতমত্তা, প্রণয়-কলহমত্তা, রোদনশীলা, বারুণীমদমত্তা, দুঃখদগ্ধা, ঈর্ষান্বিতা, সঙ্গীতসাধিকা, 'পিচ্ছোলা' নামক বাঁশি বাজানো গণিকা—ইত্যাদি 'চতুর্ভাণী'তে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে এ-সব বর্ণনা আলঙ্কারিকদের নায়িকাশ্রেণীবিভাগের নিয়মকানুন অনুসারে রচিত হয়নি। 'চতুর্ভাণী'তে অলঙ্কারশাস্ত্র বিশেষ প্রাধান্য পায়নি; এবং সেই কারণেই পরবর্তী অলঙ্কার-গ্রন্থসমূহে দৃষ্টান্ত হিসাবে 'চতুর্ভাণী'র শ্লোক উদ্ধৃত হয়নি।

গণিকাদের রোজগার সম্পর্কে শ্যামিলকই শুধু একটিমাত্র তথ্য দিয়েছেন। কাশীর

'বারমুখ্যা', উজ্জয়িনীর গণিকা-পল্লীবাসিনী 'পরাক্রমিকা' নাম্নী গণিকার দক্ষিণা প্রথমে ছিল পাঁচ শ' সুবর্ণমুদ্রা; তারপরে হয় হাজার সুবর্ণমুদ্রা। এই উচ্চহার শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য নয়; কলাকুশলতার জন্যও বটে। পরাক্রমিকা 'পিচ্ছোলা' নামক বাঁশি বাজিয়ে খ্যাতি পেয়েছিল; তাছাড়া, সে ছিল একজন 'বারমুখ্যা'।

ভরতমতে 'বৈশিক' শব্দের অর্থ, সব রকম কলায় পারদর্শিতা। বাৎসায়ন-উল্লিখিত চৌষট্টি কলার মধ্যে গান-বাজনা ও অভিনয় শেখা গণিকাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম ছিল। রীতিমতো আচার্যের কাছে নাচ-গান শিখত তারা। 'সঙ্গীতক', অথবা জলসায় তাদের অংশ-গ্রহণ ছিল স্বতঃসিদ্ধ। জলসা হত নারায়ণের মন্দিরে। 'পাদতাড়িতকম্' ভাণে "ময়ূরসেনা"র নাচের বর্ণনা আছে; মেয়েটি সিংহল থেকে উজ্জয়িনীতে এসেছিল। শোণদাসী বীণা বাজাত। মগধসুন্দরী 'বল্লভা' নামক চৌপদী গীত গাইত। দ্বৈতসংগীতের উল্লেখ করেছেন বররুচি।

গণিকা-মানসের একটি সুগভীর অর্থ-ব্যঞ্জক ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি ঈশ্বরদত্ত। এখানে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শুধু দু-চারটি কথা তুলে দিয়ে ঈশ্বরদত্তের বৈশিক ধ্যানধারণার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়। তাঁর মতে, উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—এই শ্রেণী-বিভাগ রূপগুণের বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ঈশ্বরদত্ত তিনরকমের প্রবণতার কথাই বলেছেন, এবং তাঁর মতে যে-গণিকা সত্যি সত্যি ভালবাসতে পারে, সেই হল 'অধমা'। বেদনা ও আনন্দ সম্পর্কে সম্ভবত ঈশ্বরদত্তই সর্বপ্রথম একটি দার্শনিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, কামবাসনার উদ্দীপন সম্ভব করে বলেই নখক্ষত, দন্তক্ষত প্রভৃতি কামোপচার-সমূহে আনন্দ ও বেদনা সমভাবে মিশ্রিত থাকে। প্রেম, তাঁর মতে চার রকমের, যথা, প্রথম সমাগমের প্রেম, ক্রোধান্তে প্রেম, প্রবাসে অবস্থানকালীন প্রেম, এবং বিদেশ থেকে ঘরে ফিরে প্রেম। ক্রোধান্তে প্রেমই তাঁর বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। সে-গণিকাই সমাদরণীয়া, যে নিজের দেহ-লাবণ্য আকৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখাতে লজ্জিতা হয় না। শুধু রূপবতী, কিংবা শুধুই অনুরাগিণী গণিকা পুরুষের মন পায় না। রূপের সঙ্গে অনুরাগও থাকা উচিত। পৃথিবীতে বেশ্যাসঙ্গ, এবং মরণের পরে স্বর্গলাভের আনন্দের একটা তুলনামূলক বিচার করে ঈশ্বরদত্ত-সৃষ্ট বিট-নায়ক দেবিলক বলেছে:

'তপস্বী স্বর্গ চোখে না দেখেই, জপ, তপ, অগ্নিতে প্রবেশ, যাগ-যজ্ঞ করে স্বর্গলাভের সম্ভাবনায় উন্মত্ত হয়। স্বর্গ হয়তো আছে, এবং স্বর্গে উপভোগ্যা স্ত্রীলোকও থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে না আছে বিরোধ, না আছে বিরহ! বিরোধ এবং বিরহহীন স্বর্গে সুর-সুন্দরীদের সঙ্গে চিরমিলন সুখকর হতে পারে না। শোনা যায়, স্বর্গে গাছে গাছে সোনা ফলে। শুধু সোনা দিয়ে সুন্দরীদের সাজ কী ক্লান্তিকরভাবে একঘেয়ে ঠেকবে না? তারপর, স্বর্গে গেলেই সাবধানে থাকতে হবে। একটু অসাবধান হলেই দেবতারা শাপ দিয়ে সর্বনাশ করবেন। অপ্সরারা তো দৈব শাপের ভয়ে সব সময় কাঁপে! এই পৃথিবীতে মানিনী প্রেমিকার মানের অপনোদনে কতই না সুখ। কিন্তু স্বর্গে ঈর্ষা বলে কিছু নেই; কাজেই, সেখানে মানিনী নেই, এবং মান ভাঙাবার সুখও নেই।' ['ধূর্তবিটসংবাদঃ' পৃ. ৮৯-১১৮]

ওপরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের বড় বড় শহরে একটা বিশেষ অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। বেশ কিছু লোক ঐ বৃত্তি থেকেই জীবিকা আহরণ করত। 'পদ্মপ্রাভৃতকম্'-এ 'পুষ্পাঞ্জলিক' নামে একজন বেশ-ভৃত্যের উল্লেখ আছে। ঈশ্বরদত্ত পাটলিপুত্রের বেশ-পল্লীতে শিল্পী ও 'মাননীয়' ভৃত্যদের উপস্থিতির কথা লিখেছেন। শূদ্রক ও শ্যামিলক দিয়েছেন যথাক্রমে নাটেরক, দর্দুরক, গণিকাচার্য, এবং লোক-

সঙ্গীতশিল্পী বাপ্প, ও বেশ্যাধ্যক্ষ দ্রোণিলকের বিবরণ। বাপ্প নামক লোক-গীতিগায়ক উজ্জয়িনীতে এসেছিল বাহ্লীক দেশ থেকে; গণিকা-পল্লী-সংলগ্ন পানগৃহে সে নেচে নেচে 'যৌধেয়', অর্থাৎ বর্তমানের হরিয়ানা-অঞ্চলে প্রচলিত লোক-গীতি গান করত। বেশ্যাধ্যক্ষ পদটি ছিল কৌটিল্য-অনুমোদিত; মৌর্যোত্তর গুপ্তযুগেও এই বিশেষ পদের অস্তিত্ব যে ছিল, তা শ্যামিলকের বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায়। এরা ছাড়াও, বৈশিক বৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল বিট, পীঠমর্দ, ও ডিণ্ডিকগণ। 'চতুর্ভাণী'র চারটি ভাণেই বিটই নায়ক। বিটের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন বাৎসায়ন, বলেছেন, পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদের ভাষায়, 'যে সমস্ত বিভব ভোগ করিয়া (খোয়াইয়া) বসিয়াছে, গুণবান্ এবং দারপরিজনসমন্বিত, বেশ্যাজনোচিত বেশে ও গোষ্ঠীতে (নাগরকগণের) সমাহৃত, এবং বেশ্যাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহাকে বিট বলা যায়।' ['কামসূত্র', পঞ্চানন তর্করত্ন সং; বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩৩৪, পৃ. ৮৬] 'চতুর্ভাণী'তে বিটের উপজীবিকার উল্লেখ নেই; কিন্তু বাৎসায়ন-বর্ণিত অন্য লক্ষণগুলো বিট-নায়কের চরিত্রে দেখা যায়। শূদ্রক 'পীঠ-মর্দ'-এর উল্লেখ করেছেন। বাৎসায়ন লিখেছিলেন, 'যাহার কিছু মাত্র বিভব নাই, পুত্রকলত্রাদি নাই, শরীর মাত্র সহায়, ফেণক ও কষায় মাত্র পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ হইতে আগত ও কলাকুশল, সে ব্যক্তি নাগরকগোষ্ঠীতে কলার উপদেশ দিয়া বেশ্যাজনোচিত বৃত্তে আপনাকে প্রখ্যাত করিবে। ইহাকে পীঠমর্দ বলে।' ['কামসূত্র', পূর্বোক্ত সংস্করণ, ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা] এক জায়গায় 'চেট' নামক বৃত্তির উল্লেখ করেছেন শ্যামিলক। 'নাট্যশাস্ত্র' মতে শব্দটির অর্থ কলহপ্রিয়, বিরূপ, গন্ধসেবী, অথচ লঘু-গুরুজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। শ্যামিলক 'ডিণ্ডিক' নামক একশ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। এরা ছিল বেশ্যাদের গুণ্ডা ও দালাল। মোতীচন্দ্রের মতে, শব্দটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে, 'পাদতাড়িতকম্' এবং 'বসুদেব হিংডী' ছাড়া, অন্যত্র নেই।

বেশ্যাশ্রয়ী এই সব লোকদের মধ্যে প্রধান ছিল বিট। উজ্জয়িনীর প্রধান প্রধান বিটদের নাম দিয়েছেন শ্যামিলক, যথা : কামাচার ভাণ্ডু; লোমশ গুপ্ত; অমাত্য বিষ্ণুদাস; শৈব্য আর্যরক্ষিত; দাশেরক রুদ্রবর্মণ; আবন্তিক স্কন্দস্বামিন্; ভিষক্ হরিশ্চন্দ্র; আভীরক কুমার ময়ূরদত্ত; মৃদঙ্গবাদক স্থাণু; গান্ধর্বসেনক উপায়নি; পার্বতীয় ঈন্তকথ; প্রথম অপরান্ত অধিপতি ইন্দ্রবর্মণ্; আনন্দপুরের কুমার মঘবর্মণ্; সৌরাষ্ট্রিক জয়নন্দক; মৌদগল্য দয়িতবিষ্ণু, ইত্যাদি। লক্ষণীয়, বিশেষভাবে এই 'বিট'দের 'বিটবৃত্তি' ছাড়াও দ্বিতীয় বৃত্তি ছিল; কেউ ছিল অমাত্য, কেউ ভিষগ্, কেউ রাজপুত্র; কেউ রাজা, কিংবা মৃদঙ্গবাদক। এদের নেতা ছিলেন ভট্টিজীমূত।

ঈশ্বরদত্ত পাটলিপুত্রের দুটি বিট-গোষ্ঠীর কথা লিখেছেন। তাদের একটির দল-নেতা ছিল বিষ্ণুদাস, এবং অপর দল-নেতা ছিল রামিল। এই দুই দলের মধ্যে 'কামতন্ত্র' বিষয়ক বিতর্কের অনুষ্ঠান হত। শ্যামিলক উজ্জয়িনীর একটি 'বিট-মণ্ডপ'-এর বর্ণনা দিয়েছেন; সেখানে বিটজন সমবেত হয়ে নানারকম সমস্যার সমাধান করত। সুরাষ্ট্রের বারমুখ্যা মদন-সেনিকা বিষ্ণুনাগ নামক প্রেমিকের মাথায় নিজের চরণ স্থাপন করায় যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, 'পাদতাড়িতকম্' কথাটির সাহায্যে সে-সব সমস্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টির বিচার হয়েছিল উজ্জয়িনীর বিট-মণ্ডপে; বিচার-সভার সভাপতি হয়েছিলেন 'বিটমহত্তর ভট্টিজীমূত'।

বিট-প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে 'গোষ্ঠী'র কথা ওঠে। বাৎসায়নের মতে 'গোষ্ঠী'র সভা

হওয়া 'নাগরক'-এর পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক। দিবানিদ্রান্তে কেশ-সংস্কার করে 'নাগরক' অপরাহ্নে গোষ্ঠীতে যেতেন। 'গোষ্ঠী' কথাটির বাৎস্যায়ন-কৃত অর্থ, 'বেশ্যালয়ে, অক্ষশালাতে, অথবা কোন এক বন্ধুর বাড়িতে বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ধন ও বয়সে তুল্য বন্ধুগণের সম্মেলনে বেশ্যাসহ উপযুক্ত আলাপে যে অবস্থান, তার নাম গোষ্ঠী।' এখানে কাব্য ও কলা-বিষয়ক সমস্যার আলোচনা হত। উজ্জ্বলা এবং লোকমনোহরা গণিকারা এখানে মাননীয়া হত। 'অবদানশতক'-এর একটি কাহিনীতে আছে, স্বয়ং বুদ্ধদেব একবার শ্রাবস্তী নগরীতে ভোর-বেলা পৌঁছেই মাতালগোষ্ঠী-সভ্যদের বীণা ও মৃদঙ্গ সঙ্গতে গীত গাইতে শুনেছিলেন।

'পাদতাড়িতকম্' ভাণে বিট-গোষ্ঠী বর্ণনায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, যে-সব গোষ্ঠীতে কিছু কবি, চিত্রকর, গায়ক ও বাদক ছিল। কবি আর্যরক্ষিত, কাশী-কোসলে, ভর্গে ও নিষাদনগরে শ্রোত্রীয়দের বাড়িতে মদ্যপান করতে করতে নিজের রচিত কবিতা বিক্রি করতেন। গন্ধর্বসেনক উপায়নে ছিল বীণা-বাদক শিক্ষক; সে ধনিগৃহের অন্তঃপুর-সুন্দরী-দের বীণা-বাজানো শেখানোর সময়, মোতীচন্দ্রের ভাষায়, 'উন্‌কে নখক্ষতোঁ কা মজা লিয়া হৈ', অর্থাৎ, ছাত্রীদের নখক্ষতের মজা উপভোগ করত। গুপ্ত এবং মহেশ্বরদত্ত নামক দুজন কবি, ইংরাজ নাট্যকার বোমণ্ট্ ও ফ্লেচার-এর মতো, হরিহরাত্মা ছিল; কিন্তু নিজস্ব প্রতিভার অভাবে তারা বররুচির শ্লোক নকল করে নিজেদের নামে চালাত। কবিদের কুম্ভিলকবৃত্তি এই বিবরণ অনুসারে গুপ্তযুগেও ছিল!

বিটগণ কতগুলো বিশেষ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক কথা ব্যবহার করত; এ-রকম ১৩৫টি শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন মোতীচন্দ্র এবং বাসুদেবশরণ অগ্রবাল। যেমন,

'অকরুণ রাগ'। প্রথম অর্থ, করুণারহিত প্রেম; দ্বিতীয় অর্থ, নিষ্ঠুর রতি।

'অলেপক'। প্রথম অর্থ, সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত নির্লেপ পুরুষ; দ্বিতীয় অর্থ, বেশ্যার কামুক ভর্তা।

'কর্ম'। প্রথম অর্থ, বৈশেষিক দর্শনের কর্ম-সংজ্ঞক পদার্থ; দ্বিতীয় অর্থ, বেশ্যার ললিত হাব-ভাব।

'আলেখ্য যক্ষ'। প্রথম অর্থ, চিত্রিত যক্ষমূর্তি; দ্বিতীয় অর্থ, রতিশক্তিহীন, বড় বড় কথা-বলা, বেশ্যাগামী ধনী ব্যক্তি।

'তৃতীয়া প্রকৃতি'। প্রথম অর্থ, পরা ও অপরা থেকে ভিন্ন বিশিষ্ট লক্ষণযুক্তা তৃতীয়া প্রকৃতি। দ্বিতীয় অর্থ, নপুংসক। তাং যুগে রচিত, সুবিখ্যাত চীনা-উপন্যাস 'চিন্ পিইঙ্ মী'তে এধরনের দ্ব্যর্থ ও দুর্বোধ্য গণিকা-ভাষার বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

'চতুর্ভাণী'র বিট-নায়কের একোক্তিতে বহু চরিত্রই পর্দায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। চরিত্র-চিত্রণে 'চতুর্ভাণী' রচয়িতাদের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কতগুলো দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সব বিশেষ ধরনের চরিত্রের স্বরূপ পরিস্ফুট করা হচ্ছে।

১। বৈয়াকরণ দত্তকলশি। এই ব্যক্তির জনক 'স্বস্তশঙ্কু' ছিলেন বৈয়াকরণ। বাড়ি ছিল উজ্জয়িনীতে। দত্তকলশি পাণিনি পড়েছিল। তার 'বাগ্‌বাগুরা', অথবা কথার জালে একবার পড়লে আর রক্ষা ছিল না। তার প্রত্যেকটি কথাই ছিল 'কলহকণ্ডু-বন্ধুর', অর্থাৎ ঝগড়ার চুলকানিতে উঁচুনিচু। সে যেন মূর্তিমান 'অক্ষরকোষ্ঠাগার'। ভারী রকমের কৃদন্ত প্রয়োগে তার ভাষা 'কাষ্ঠপ্রহারের' মতো কষ্টদায়ক। বিট-নায়ক তার বিদ্‌ঘুটে বাগ্‌বিন্যাস সহ্য করতে না পেরে বলেছে, 'তুই চল্‌তি ভাষায়

কথা বল্ না রে।' এই লোকটির বিবরণ পাঠে, রাব্লের 'পেঁতা গ্রুয়েল্'-এ বর্ণিত প্যারি-নিবাসী পণ্ডিত ছাত্রের বিশ্রী লাটিন-মিশ্রিত ফরাসি শুনে পেঁতা গ্রুয়েল্-এর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়ার কাহিনী মনে পড়ে। চরিত্রটি এ'কেছেন শূদ্রক।

২। শূদ্রক-সৃষ্ট অপর একটি চরিত্র 'প্রচ্ছন্নপুংশ্চলীক' পবিত্রক। নামটি পবিত্রক। ছোঁয়াছুঁয়ির বড় বেশি বিচার করে চলে; রাজপথে জনসংস্পর্শ এড়িয়ে যায়। সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে চলাফেরা করে। ধর্মমতে সে হল 'চৌক্ষ', অথবা বৈষ্ণব। অথচ, প্রচ্ছন্নভাবে সে গণিকাসেবী।

৩। 'ধূর্তবিটসংবাদঃ'-এর অবিস্মরণীয় চরিত্র, শ্রেষ্ঠিপুত্র কৃকিলক। তার সর্বাঙ্গে রতিচিহ্ন। চোখে জল টল্‌টল্ করছে। বাবা বড়মানুষ; কিন্তু ছেলের ফূর্তির জন্য পয়সা খরচ করতে চায় না। কৃকিলকের বক্তব্য: যুবক ছেলের মূর্তিমান অ-সুখ হল তার পিতা। পিতার অত্যাচারে জুয়াখেলা যায় না। বেশ্যার সঙ্গে একাসনে বসে চাট্ দিয়ে মদ্য পান করা যায় না। প্রণয়িনীর সঙ্গে বসে পাখির লড়াই দেখা, কিংবা ধাঁধা বলার আনন্দ উপভোগ করা যায় না। বারবধূ-পয়োধর-পিষ্ট বাতায়নের কাছে বসে, বা দাঁড়িয়ে রাজপথে হাতির শোভাযাত্রা দেখা যায় না। 'বীররাত্রি' উৎসবে জাঙিয়া পরিধান করে, একহাতে উন্মুক্ত খড়্গ ও অন্যহাতে মশাল নিয়ে, উল্কাশিখাপিঙ্গল রাজমার্গে গুণ্ডামি করা যায় না। উপকারী বন্ধুর জন্য 'জান দিয়ে দেয়া' যায় না। তাই কৃকিলকের সিদ্ধান্ত, এই সব পিতা-জাতীয় অথর্ব লোকগুলো হচ্ছে 'দাসীপুত্রাঃ'। তার বাসনা, কুঠারপাণি, ক্ষত্রিয়সংহারে উদ্যত, জামদগ্ন্য পরশুরামের মতো পৃথিবীর সব পিতাকে একেবারে শেষ করে ফেলে!

৪। শ্যামিলকরচিত আকাশভাষিতে বহু চরিত্র এসেছে। প্রথম চরিত্রটির নাম 'দদ্রুণ-মাধব', কিংবা দে'দোমাধব; সর্বাঙ্গে তার ছাঁদ। অপর চরিত্র, বেশ্যার লাথি খাওয়া বাক্‌পটু শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুনাগ। বৈষ্ণব বিষ্ণুদাস বেশ্যাগামী; কিন্তু তার ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বিধবাদেরও বিড়ম্বিত করে। বাম্থীকের লোক-সঙ্গীতশিল্পী বাষ্প নামক লোকটি যেন 'বেশ কুক্কুট', অথবা বেশ্যা-পল্লীর মোরগ! 'কারুশ-মলদা', অথবা, মোতীচন্দ্রের মতে, বর্তমান বিহারের শাহাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার তৎকালীন 'মহাপ্রতিহার' ভদ্রায়ুধ নামক ব্যক্তিকেও উজ্জয়িনীর গণিকা-পল্লীতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর মাথার চুলে খোঁপা বাঁধা হয়েছিল; তাঁর দু'কানে ঝুলছিল দুটি 'কর্ণঢোলক', অথবা ঢোলকাকৃতির দুটি তাবিজ। গুণ্ডা-শ্রেণীর "ডিণ্ডিক'গণ তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। তিনি 'লাট'-দেশীয় ভাষার উচ্চারণ ঠিকমতো করতে না পেরে 'জ-জ-জ' শব্দে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথা বলছিলেন।

এ-রকম বহু দৃষ্টান্তেই দেওয়া যায়। ভরত ও ধনঞ্জয় ভাণে হাস্যরসের অস্তিত্ব দেখেননি: কিন্তু প্রায় সব চরিত্রেই 'চতুর্ভাণী'তে হাস্যরস প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পরবর্তী ভাণসমূহে চরিত্র-সৃজনের ব্যাপারে 'চতুর্ভাণী'র অসামান্য নিপুণতা দেখা যায় না; নির্লজ্জ রিরংসাই পরবর্তী ভাণগুলোর একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

'চতুর্ভাণী'র চরিত্র জীবন্ত। তার কারণ কি এই যে সে-সব চরিত্র ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের পৌরাণিক পাত্র-পাত্রী, রাজা-উজির, বা বিদূষক চরিত্র নয়? অথবা 'চতুর্ভাণী'র চরিত্রসমূহ সমকালীন সমাজের প্রান্ত থেকে উদাহৃত হয়েছে?

রাহু

কার্তিক লাহিড়ী

তখন পথে ঘাটে অলিতে গলিতে আকাশে বাতাসে যুদ্ধের খবর ও যুদ্ধের প্রস্তুতি, আর ট্রেঞ্চ কাটা বাঙ্কার তৈরী সিঁড়ির তলা সুরক্ষিত করা দরজা-জানলার সামনে বালির বস্তা বসানো তার জন্যে সিমেন্টের বস্তার খোঁজে হন্যে হ'য়ে ফেরা সরকারী ভবনে বিফলপ্রাচীর তোলার ধুম দরজা জানলার কাচে আড়াআড়িভাবে বা পুরো ঢেকে কাগজ সাঁটা কোন কোন বাড়িতে অতি সাবধানতার জন্য বাল্বে ঠুলি পরানো আশ্রয়-কক্ষকে রীতিমত দুর্গে পরিণত করার জন্য সেই কক্ষের দুর্বল জায়গাগুলো তীক্ষ্ণ নজরে রাখা ও দুর্বলতা চোখে পড়লে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া ট্রেঞ্চ বা বাঙ্কার কাটার সময় পরামর্শ নেয়া যেমন 'ভি-শেপ্' ভালো না 'জেড্-শেপ্' ইত্যাদি ইত্যাদি আরও সাতসতেরো অ-সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা লোকে নিচ্ছে দেখে পরিমল অবাক হ'য়ে এসব সাবধানতা নেয়ার দরকার কী ভেবে বিমূঢ় হয়, কারণ সে বুঝেছে, মনে মনে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে সেই যুক্তি অনুযায়ী আঁক কষে কষে, কারুর পক্ষেই যুদ্ধ করে লাভ নেই, বরং ক্ষতিই তাতে, অতএব সীমান্তে বা দেশের ভেতরে যুদ্ধের উত্তেজনা উত্তাপ সৃষ্টি করলেও যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা শূন্য, ফলে এ-ব্যাপারে উদাসীন পরিমল অনেকের কাছে খোঁটা খেয়ে তার মধ্যে এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার চিন্তার যেটুকু অবকাশ ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এসব যারা মনে করে তারা ভীতু গুজব-রটনাকারী অপদার্থ ইত্যাদি মনে মনে গাল দিয়ে সমস্ত শহরের দিকে একবার চোখ মেলে দেখে যে শহরের মাথা মাথা বাঘা বাঘা লোকে বিশেষ করে পদস্থ আধিকারিকরা তাদের স্ত্রীপুত্রদের সীমান্তস্থিত এই শহর থেকে অনেক অনেক দূরে একেবারে দেশের ভেতরে যেখানে ও-পার থেকে গোলা আসার সম্ভাবনা নেই তেমন তেমন জায়গায় বেশীরভাগ মা-বাবার অসুখবিসুখের অজুহাতে সরিয়ে দিয়ে 'আমাদের মারাল হাই রাখতে হবে, বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে' প্রভৃতি অনেক হবে এবং উচিত-এর বান ছুটিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে নিজেদের বাসস্থান ও অফিসে বসার কক্ষটিকে বিফলপ্রাচীর তুলে পাশে দু-তিন সার বালির বস্তা বসিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সকলের কাছে সবচেয়ে আরামদায়ক বিষয় পরচর্চায় মন দেন, তখন তারিণীর উক্তি এই জরুরি অবস্থার শুরুতে তার বৌ-ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে পর 'ওআইজ ম্যান নোজ হোয়েন টু ফ্লাই' এত সঠিক ও হাস্যোদ্দীপক মনে হয় যে পরিমল তার স্ত্রী মীনার সামনে হঠাৎ হাসলে 'কী হাসছো যে' শুনে সত্যি কেন হাসছিল তার কারণ খুঁজে না পেয়ে চুপ মেরে গেলে 'তারিণীবাবু অনেকদিন আসেন না, অসুখ বিসুখ করলো নাকি' মীনার কথা খেই ধরিয়ে দিলে 'চিঁড়িয়া ভাগ্ গিয়া' বললে মীনার 'মানে'-র উত্তরে সে নিঃশব্দে হাসে, 'তারিণী ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে', 'ওমা! সে কী! তারিণী-বাবুই বা তোমাকে—', 'বুঝে দেখো, মুরদ কত', তারপর একটু থেমে 'তখুনি বুঝেছিলাম ও পাঠাচ্ছে, না হ'লে বড় বড় কথা বলে', 'এলে আচ্ছাসে ধরবো' তখন মীনা তার দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল তাতে যে কোনও পুরুষের পৌরুষ কাবু হতে নিমেষমাত্রের দরকার, অতএব সে এগিয়ে গিয়ে কোমর বেড় দিতে মীনা 'শুরু হলো' বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিমলের ঠোঁট হারিয়ে গেল মীনার সমস্ত মুখে, তারপর মুখ তুলে নিজের ভয়হীনতা ও ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করার সুযোগ

পেয়ে মীনাকে যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা নেই তার কারণসমূহ ব্যাখ্যা ক'রে যে বা বলুকে গুজবে কান না দিয়ে মনোবল অটুট রেখে নিজের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দেবার সময় মীনা হেসে উঠলে সে তেড়ে আসার ভান করলে মীনা 'এই শুরু হলো' বলতে সে মীনাকে ধ'রে ফেলে, 'আজ মনে থাকে যেন' বলার পর খেয়াল করে যে মীনা তার যুক্তি বা কথা কিছুই শোনে নি, খানিকটা 'তুমি আমার স্বামী, তোমার কথা মানবো' তেমন ভান ক'রে গোবেচারার মত আস্তে আস্তে সরে যায় সেখান থেকে, তাই অন্যরা যখন সাবধান হওয়ার নামে মাত্রাতিরিক্ত ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে শুধু নিজেরাই নয় আশপাশের অনেককে ভীরু করে দেয়, তখন সে তাদের এধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 'মীনাই যখন আমার কথা শোনে না' অ-সমাপ্ত বাক্যটি তার স্পষ্ট কথা বলার উৎসাহকে লহমার চাবকালে সে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত বন্ধুবান্ধব সহকর্মী উপর-ওয়ালা নীচ-ওয়ালার অহেতুক নানা আচরণ দেখে 'এদেশের মুক্তি নেই, আমরা এখনও সেই তিমিরে' ইত্যাদি ভেবে নিজেকে সকলের চেয়ে আলাদা ও 'আমার ম্যাচিওরিটি অনেক বেশী' এমন আত্মশ্লাঘায় বুঁদ হয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকে থমকে যায়, 'খাট সরালো কে?' এঘরের দুটো দরজা, বাইরের বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের দেয়ালে কোন জানলা নেই—বাঁ পাশের দেয়াল নিশ্ছিদ্র, অথচ ভেতরের বারান্দা বেয়ে ঢুকলে দরজার রুজু রুজু জানলা থাকায় মীনা তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাশের ঘর থেকে শোয়ার ঘর বর্তমান ঘরে এনে মুখোমুখি দরজা জানলার মধ্যিখানে খাট পাতলে সে প্রকাশ্যে সম্মতি জানালেও মনে মনে পড়ার ঘর স্থানান্তরিত করার জন্য অখুশি হয়, অথচ মীনার যুক্তি অকাট্য, অতএব তাকে মেনে নিতে হয়, কিন্তু আজ এখন ডানদিকের দেয়াল ঘেঁ'সে (ভেতরের বারান্দা দিয়ে ঢুকলে) এবং যে দেয়ালে একটা জানলা নেই সেখানে খাট সরানোর জন্য চটলেও 'বোধহয় শীত পড়েছে তাই' পরক্ষণে মনে পড়ায় সান্ত্বনা পেলে হালকা বোধ করে এবং তখন মীনা ঘরে, 'অ্যারেনজ্‌মেন্টটা কেমন হলো?' উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে মীনা 'ভালো হলো না? মানে এদিক থেকে—' থেমে গেলে সে 'শীত আসবে না ভাবছো' বলতে ততক্ষণে মীনার চোখ মুখ ঝিকঝিকায়, 'সেইজন্য তো সরালাম', কথার মধ্যে অতি উৎসাহ লক্ষ ক'রে পরিমল একবার সম্পূর্ণ ঘরটা দেখে 'তবে কি অন্য কারণে' মনে সন্দেহ জাগলে মীনার দিকে তাকাতে মীনা চকিতে চোখ নামালে বুঝল মীনা অন্যকারণে খাট এপাশ থেকে সরিয়েছে। কিন্তু তখনও কারণটা কী স্পষ্ট না হওয়ায় সে কিছুটা এগিয়ে এলে মীনা 'এক্‌বারে দেয়ালের কাছে ছিল তো, এদিকে অন্তত দুটো দেয়ালের প্রোটেক্‌শন পাওয়া যায়' বলতে সে মনে মনে দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়ে যুদ্ধ লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং সীমান্তের ঠিক ওপরেই এ শহরের অবস্থান হলেও কোনও ভয় নেই কারণ এখানে মিলিটারি প্রচুর এবং উপরন্তু এটা প্রায় 'আর্মি হেড্‌ কোয়ার্টার' এ অঞ্চলের প্রভৃতি পুরনো কথাগুলো পুনরাবৃত্তি ক'রে খানিকটা স্বস্তি পায়, যেহেতু এখন সে কেবল মীনাকেই এসব কথা বলতে পারে বা বলে, অন্যদের বললে তারা গ্যাঁক গ্যাঁক ক'রে অযৌক্তিকভাবে গলার জোরে দাবিয়ে দিয়ে উপমহাদেশে যুদ্ধ অনিবার্য এবং যুদ্ধ ছাড়া সমস্যার সমাধান নেই প্রভৃতি গায়ের জোরে ব'লে অন্যদেশ জয় করা মাত্র দু-চার ঘন্টার ব্যাপার এমন ইঙ্গিত দিয়ে যখন কথা শেষ করে, তখন পরিমল বোবা হয়ে যায় যেন তার কোনও বক্তব্য নেই অনুভূতি নেই আবেগ নেই। স্টাফ রুম-এ অনিল-বাবু বলছিলেন 'এখন স্ট্র্যাটেজি-র জন্য কোনও জায়গার দরকার হয় না, এটা মিজাইলের যুগ, এখান থেকে বসেই আমেরিকা বা অস্ট্রেলিআর যেকোনও টার্গেট হিট করা যায়, ম্যাথমেটিক্‌স বুঝলেন, ওসব এল.এম.জি. থ্রি নট থ্রি মর্টারের দিন গত হয়েছে।' পরিমল অত্যন্ত বিনয়ের

সঙ্গে এসব কথা শুনে যায়, তার আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে সকলে খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ ব্যাপারে অনেককিছু জেনে ফেললেও 'আমি কিছুই জানি না, অথচ বাড়ির কাছেই হচ্ছে মুক্তি সংগ্রাম।' বিকাশ ততক্ষণে অনিলবাবুর কথা কেড়ে নিয়ে 'স্যাবার জেট যদিও অনেক সফেসটি-কেটেড প্লেন, তবু ন্যাট্-ই হচ্ছে তার যম, কারণ কী জানেন?' এবং অন্যাকে বলতে সুযোগ না দিয়ে ন্যাট্ কোন কোন 'অ্যাঙ্গেল'-এ কত তাড়াতাড়ি নিজেকে ঘুরিয়ে নিমেষের মধ্যে তার ঈপ্সিত গতি সঞ্চার করে—তার একটা বেশ 'টেকনিক্যাল' বিবরণ দিলে সে মুগ্ধদৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বিকাশ 'পরিমলবাবু অবশ্য ভাবেন, যুদ্ধ লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই, আরে বাবা, ওরা হচ্ছে জঙ্গী সরকার, যুদ্ধই হচ্ছে ওদের পেশা, আর যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে তো আসল ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে পারবে, ব্যাস্ তাহলে কেল্লা ফতে, আর ওরা তাই চাইছে' বললে উপস্থিত সকলে একমাত্র পরিমল ও বিনোদবাবু বাদে (বিনোদবাবু তখন নীচু গলায় পরিমলকে 'সিমেন্টের বস্তার দাম জানেন' বলায় ব্যস্ত) সবাই উষ্ণ সমর্থন জানায়। 'যুদ্ধটা এখনও মাইল কয়েক দূরে হচ্ছে তো', চন্দন ফোড়ন কাটলে সকলের হাসিতে পরিমল বোঝে যে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল সে, তবু নিশ্চুপ থেকে খানিক খামকা হেসে আক্রমণের তীক্ষ্ম শরগুলো ভোঁতা ক'রে দিয়ে 'রামগিরি চা' বললে প্রসঙ্গটা তখন স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে বাঁক নেয়, কারণ ঐ প্রসঙ্গটি এখানকার সকলের কাছে উপাদেয় ও মুখরোচকও বটে।

এতজন সহকর্মী ও বন্ধুর মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ে তারই মত কেবল আলাদা হওয়ায় সে মধ্যে মধ্যে সংশয়ে পড়ে, 'তবে কি আমার ভুল? যা হচ্ছে তা কি যুদ্ধের ভূমিকা নয়? অনেকের সঙ্গে আর্মির মেজর-ক্যাপ্টেনদের জানাশোনা, তারা সেখান থেকে খবর পাচ্ছে, নিশ্চয় তারা আমাদের চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল, তবে কি আমি ভুল করছি?' তার সামনে তখন মিলিটারি-কনভয়, বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথ-নির্দেশক ফলক লাগানো, শহরের বড় বড় দোকানে মিলিটারিদের ভিড়, কদাচ কখনো বাড়ির সামনে মিলিটারি ট্রাক থামা ও জোয়ানদের কাজ-কর্মের নানান ধরন-ধারন ভেসে উঠলে এগুলি যে স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক নয়, বরং যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যাপক আয়োজন তা যেকোনও লোক ধরতে পারে, আর পরিমল এসব দেখেও কি মানবে না যে যুদ্ধের দিন এগিয়ে আসছে? 'কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি এক কথা, যুদ্ধ অনিবার্য অন্য কথা এবং তা বলা বোধহয় ঠিক নয়', পরিমলের অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ একদিন শেখরবাবু ও অনিলবাবুর আক্রমণ শাণিত করে: শেখর—'কোনকিছুর প্রস্তুতি ছাড়া কিছু হয় কি? যুদ্ধের প্রস্তুতি আগে হচ্ছিল না, আর ও-পক্ষ যদি ক্রমে সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসে, সৈন্য মোতায়েন করে, তবে আমরা কি চুপ করে থাকবো? আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য।' অনিল—(শেখরের কথার খেই ধ'রে) 'এবং তাই করা হচ্ছে। কোনও দেশ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না, আমাদের একলাই চলতে হবে। বাংলাদেশে যা ঘটছে, যা ঘটে গেল', অনিলবাবু এত তাড়াতাড়ি বলে চললেন যে পরিমল তার মাথামুণ্ডু ধরতে না পেরে মনে মনে মুক্তিযুদ্ধের খাতিরে অন্যপক্ষের যুদ্ধের উস্কানিতে সাড়া না দিয়ে একান্ত হয়ে বৃহৎ যুদ্ধ এড়িয়ে মানুষের সপক্ষে কাজ করা যে ভীষণ জরুরি তা ভেবে নিয়ে 'এদের সঙ্গে মতের মিল হবে না, কারণ' তখন 'কী দরকার এসব উদ্ভ্রান্ত জিনিস নিয়ে তর্ক করার, আমি নিশ্চুপ থাকবো' এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও সে সারা পথ দেশের লোক যে আবার যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে তার জন্যে সারা শরীরে উদ্বেগ বয়ে যখন বাড়ি পৌঁছয়, তখন মীনা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে, সে মুখে এখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা, তার কাছে এসে

বুক ধড়াস করে ওঠে, তারপর বুকের স্পন্দন অতি দ্রুতে স্বাভাবিক হয়ে এলে 'কী ব্যাপার?' বলতে 'কেরোসিন জোগাড় করো নইলে কাল থেকে রান্না হবে না' উত্তর দিলে 'কেন, মঙ্গলবারে তো ভোলা আসবে, তার কাছে' তখন মীনা কঠোরভাবে 'এসে উদ্ধার করে দেবে' এবং একটু থেমে 'সে আসতে পারবে না, বাজারে তেল নেই' তার উত্তরে সে 'কেন' 'তা কি জানি' মীনার কথায় ঝাঁঝ তখন পরিমল সুর নামিয়ে এনে 'কাঠকয়লা আনবো?' তাতে মীনা রেগে 'কাঠকয়লা দিয়ে কি চিতে সাজাবো, কাঠকয়লাও পাওয়া যাচ্ছে না' এবার সুর নেমে এলে সে 'তাহলে তো' তৎক্ষণাৎ মীনা 'ব্যবসায়ীরা আর মাল আনবে না' তখন 'কেন'-র উত্তরে 'যুদ্ধ লাগবে তাই, রিক্স্ নিতে চায় না তারা' তারপর সে 'কে বললে' মীনা সহজভাবে বলতে গিয়ে তোতলালে 'কে আবার। সবাই বলছে' তখন সে হেসে 'সবাইটা কে? তোমাদের মহিলামহল?' তাতে মীনা চটে উঠে 'মহিলামহল বলে হাসার কী আছে? সবার স্বামী জোগাড় করছে আর তুমি' পরিমল লঘুস্বরে 'আর তোমার স্বামী করছে না—এই তো, কিন্তু ব্যবসায়ীরা যে যুদ্ধের জন্য মাল আনবে না—সেকথা নিশ্চয়ই একজন বলেছে' সঙ্গে সঙ্গে মীনা 'তাতে তোমার কী' 'না মানে, সেই একজনটা কে?' তাতে মীনা 'তোমার সব তাতে বেশী বেশী। যখন যুদ্ধ লাগবে তখন বুঝবে ঠেলা।' তারপর বিজ্ বিজ্ করতে করতে 'দেখতে পারি না এই হামবড়া ভাব, সবাই কিচ্ছু না আর আমি-ই—' মীনার শেষ অংশ শুনতে পেয়ে সে 'মেয়েরা এই একধরনের, অন্যে করলো কী—ব্যাস্, আর স্বামীগুলোকে বলিহারি দিই, কোথায় কী শুনলো আর ওমনি বৌ-র কানে ফুসুর ফুসুর করা চাই' ভেবে মীনা রাগতভাবে চলে যাবার মুহূর্তে কাতরস্বরে বলল, 'এককাপ চা হবে', এবং মীনা হেসে ফেলতে সে টুক করে চুমু খেলে মীনা 'এই শুরু হলো, এবার পালাই' বলে চলে যেতে গেলে পরিমল কানের কাছে ফুসফুসালে মীনা হেসে পালায়।

'যুদ্ধের বিরুদ্ধে', পরিমল মনে করতে চেষ্টা করে, 'সেই কলেজে পড়ার সময় বোধহয় সেকেন্ড ইআরে পড়ার সময় নির্মল একদিন বলেছিল, যুদ্ধ হচ্ছে একটা চক্রান্ত, বর্ণবিদ্বেষ জাতিবিদ্বেষ ধর্মবিদ্বেষ একটা যেকোনও অজুহাত চাই, সেই সুযোগ এলেই যুদ্ধবাজরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, যুদ্ধ হচ্ছে রক্তাক্ত রাজনীতির ব্যর্থ চীৎকার, রাজনীতি ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, আর জেনে রাখবে পৃথিবীতে তাদের রাজনীতি ব্যর্থ যারা শত শত লোককে শোষণ করে দমন করে, যুদ্ধ মানে দেশের প্রগতি রুদ্ধ হওয়া, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, মানুষের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয়া' তার কথার পিঠে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তবে কি বিপ্লবের দরকার নেই', নির্মল অবাক হ'লে বলেছিলাম বিপ্লব তো যুদ্ধ, নির্মল হেসেছিল, ভুল করলে, বিপ্লব যুদ্ধ হলেও তা হচ্ছে ন্যায় যুদ্ধ, তবে জেনে রাখো বিপ্লব অন্যের ভূমি গ্রাস করে না, পরের জিনিস লুঠ করে না, বিপ্লব হচ্ছে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, বিপ্লব আমাদের উদ্দীপ্ত করে যুদ্ধ নির্বাপিত, বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ঐক্যের উপর যুদ্ধের ভেদবুদ্ধির উপর। বিপ্লবও একধরনের যুদ্ধ, তবে সে হচ্ছে ন্যায় যুদ্ধ। আর, একটু থেমে বলেছিল, দুই দেশের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় দেখবে সেই দুই দেশের কোন একটি হয়ত তৃতীয় কোনও পক্ষের পুতুল-মাত্র, সেই তৃতীয় পক্ষ যুদ্ধ চাইছে, অতএব গত্যন্তর নেই, কিন্তু তুমি কি ভাবতে পারো এই বিংশ শতাব্দীতে এই দ্বিতীয় অর্ধে একটা দেশ গায়ের জোরে অন্য দেশ গ্রাস করে ফেলছে? না, না, শান্তিকামী মানুষের চাপ বাড়ছে, যুদ্ধের আশঙ্কা কমে যাচ্ছে, শান্তির জন্য আন্দোলন —সে-ও তো একধরনের যুদ্ধ। আমরা পৃথিবীকে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ করবো, প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবো', পরিমল এখনও নির্মলের মুখ মনে করতে পারে, সেই মুখে

আশ্চর্য কোমল হাসি একটা দিব্য আলো, 'নির্মল আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়েছিল, বোধহয় ওর টানেই আমি মিছিলে গিয়েছি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সই জোগাড় করেছি, হিরোশিমা নাগাশাকির দুঃস্বপ্ন চোখের সামনে ভাসতে দেখেছি, নির্মল বলেছিল এই পৃথিবীকে বাসের যোগ্য করতে হলে শান্তিকে প্রথম শর্ত হিসেবে মেনে নিতে হবে, আর তাই আমরা ধ্বংসকারী সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস করতে চাই, দেশে দেশে সংঘর্ষ বন্ধ করতে চাই, পররাজ্য গ্রাস ও পরের ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ করতে চাই, তারপর সে অনেক কথা বলেছিল, পরিমল মনে করতে চেষ্টা করে, 'কিন্তু আমি ওদের শ্লোগান তোলা পছন্দ করি নি, তবু নির্মলের কথা, সেই আবেগভরা কন্ঠ, সে যেন বলছে—যুদ্ধ মানে ধ্বংস, মানে রক্ত, মানে দুর্ভিক্ষ হাহাকার, যুদ্ধ মানে মানবতার মৃত্যু', পরিমল এখন হাঁটতে হাঁটতে কেবলই প্রতিজ্ঞা করতে থাকল, 'এবার আমি একজার্ট করবো', কিন্তু একটু এগিয়ে চন্দনের সঙ্গে দেখা হ'লে চন্দন অনেক কথার পর যখন জোর দিয়ে বলে 'প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যুদ্ধ হওয়া দরকার' তখন সে চুপ ক'রে থাকলে চন্দন তার যুক্তি ক্রমে সম্প্রসারিত করে, 'যুদ্ধ হচ্ছে শুদ্ধির মন্ত্র, একটা জাত ঘুমিয়ে পড়লে ঝিমিয়ে পড়লে তাকে জাগানো উচিত, আর', চন্দন কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলে, 'আর যুদ্ধ ছাড়া জোয়ানদের রক্ত গরম থাকে না, বিনা ব্যবহারে ধারালো অস্ত্রও ভোঁতা হয়ে যায়, বসে খাওয়ার জন্য সৈন্য পোষা হয় না, তাদের কাজ দিতে হবে' চন্দন বলে চললেও কিছুক্ষণ আগে যে সে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল তা কাজে রূপায়িত করতে পারে না সে জন্য নিজের উপর বিরক্ত হয়, শেষে মজা করার জন্য জিজ্ঞেস করে, 'সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন?' চন্দনের এতক্ষণের ঔজ্জ্বল্য দপ্ ক'রে নিভে যায়, 'না মানে, বাবা বললেন কিনা তাই', সে তখন হাসলে চন্দন গলা চড়ায়, 'তা বলে ভাববেন না যে আমি ভয় পেয়েছি, আই ওয়ান্ট টু গো টু ওঅর', সে উত্তরে 'সাবাস জোয়ান' বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত করল, শুধু বলল, 'তা তো বটে' বলেই 'কি দরকার এদের পেছনে লেগে, এরা যুক্তির ধার ধারে না' ভাবে, অথচ সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে 'নাকি এরা যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তুলে আসল ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছে? আসলে আমরা সাম্প্রদায়িক?' সংশয় ক্রমে বাড়তে থাকলে একের পর এক খাদের মুখ ভেসে ওঠে, তারা কোনদিন কোনও সৎ কাজ করেছে কিনা মনে পড়ে না। নির্মল বলেছিল, 'আমার কথা শুনে হাসবে, কিন্তু আসলে যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চাল, একটা কেন্দ্র তারা চায়—এ ট্রাবল স্পট্, ব্যাস তাহলেই বাজিমাত, ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়বে আস্তে আস্তে', সে অবশ্য তখন হেসেছিল, নির্মলদের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ ছিল এই যে ওরা বড্ড সহজে একটা জটিল ব্যাপারকে নিজের তত্ত্বের খাপে খাপে বসিয়ে নিতে চায়, যখন সেই মাপে ঘটনা ঘটে না, তখুনি শুনতে হয় বুলির কপচানি, তবু নির্মলদের আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখে নি, বরং বুঝেছিল নির্মলরা সত্যি সত্যি শান্তি চায়, মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি। পরিমল হাঁটতে হাঁটতে সেই দিনগুলোকে আবার ফিরে পেতে চায় যখন সুখ ছিল, শান্তি ছিল, আশা ছিল। তারপর কী ক'রে কী ঘটে যায়, আবিষ্কার করে যে সে এক বিরাট অশান্তির কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে, তবে মীনাকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে। মীনা যখন তাকে জড়িয়ে ধরে বা আবেগে চুমু খায় অথবা সে-ই যখন সময় অসময়ে মীনাকে একেবারে নিজের শরীরে লীন করে দেয়, তখন সমস্ত ক্লান্তি গ্লানি ঘুচে যায় মুহূর্তে, সে বলে, 'জীবন যদি এরকম হতো?' মীনা হেসে 'কেমন?' তখন মীনা ও তার শরীর নানা আকারে আঁকাবাঁকা, 'এই এখন যেমন' তাতে মীনা 'তবে খুব ভালো হতো না নিশ্চয়' তখন মীনার বেষ্টনী শিথিল ক'রে 'কেন' তার উত্তরে মীনা 'সর্বদা কি এসব ভালো লাগে?' তাতে পরিমল খানিকটা নিজেকে

সরিয়ে নিয়ে ভাবে, 'ঠিক, মীনা মিথ্যে বলে নি।'

পরিমল যতই 'যুদ্ধ হবে কি হবে না'-র প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়, ততই সে ঐ প্রসঙ্গের পরিধি থেকে ক্রমে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হতে হতে এক সময় আপন মনেই উপমহাদেশের যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে যুদ্ধ অনিবার্য কিনা তা বুঝতে না বুঝতেই ২৫ মার্চ তারিখ থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যে নিষ্ঠুরতা বর্বরতার লীলা শুরু হয়েছে তার গভীরত্ব মাপতে গিয়ে পাকে পাকে এমন অথৈ জলে ঢুকে পড়ে যেখান থেকে বেরিয়ে আসা অভিমন্যুর মত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লে 'মুক্তিযুদ্ধ একদিন না একদিন সফল হয়' এমন নিশ্চিন্ত কথা ভেবে নিজের শিরা-উপশিরার টান-টান ভাব শিথিল করে। এই শহর সীমান্তর উপর অবস্থিত ব'লে এবং প্রথম থেকেই এ রাজ্যের উপর নানা দিক থেকে চাপ পড়ায় স্বাভাবিকভাবে লোকে প্রথমটা হতচকিত হলেও ধীরে ধীরে মানিয়ে নেবার পর খানিক নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে যে এই অসহ অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে এবং এখানকার অনেকে যাঁরা বহুদিন আগে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা প্রথম অবসরেই হৃত জন্মভূমি ও ভিটে দেখে আসবেন, হয়ত তেমন হ'লে আবার ফিরেও যাবেন যাঁরা সম্প্রতি এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। পরিমলের তেমন ইচ্ছে নেই, সে বরং এর মধ্যে একটা স্বার্থপরতার গন্ধ পায়, 'আমরা কী জন্যে ফিরে যাবো? যাঁরা মুক্তিসংগ্রাম করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য। তবে কি আমরা নিজেদের বাড়িঘরের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফিরে যাবো?' এমন মনোভাব তার কাছে দুর্বিষহ, সে বরঞ্চ গ্রামবাংলার আসল চেহারা দেখার জন্য বা স্মৃতিতে আক্রান্ত হ'লে একবার বাংলাদেশে যাবে কোনও স্বার্থ নিয়ে নয়, শুধু দেখার জন্য, বোঝার জন্য। তেমন তেমন সময় 'একবার যাবো' এধরনের ইচ্ছা চকিতে জাগলে সে মীনাকে একদিন জিজ্ঞেস করায় মীনার চোখমুখ জ্বলজ্বলায়, 'যাবে? সত্যি?' তখন সে হেসে 'বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি' মীনা তখন খুব কাছে সরে এসে 'ভারি দেখতে ইচ্ছে করে', মীনার কথার গভীরতা তার বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেউ তোলে, অথচ তারপর সে যে গভীরভাবে বিষয়টি ভেবেছে কিনা সেটুকু মনে করার ক্ষমতা এখন আর তার নেই, যেহেতু সে এখন অনেক কিছুর উপর বিরক্ত, বিশেষ করে সহকর্মী বন্ধুদের ভীরুতা তাকে মনে মনে ভীষণ উত্ত্যক্ত ক'রে তুলেছে, এবং সেই সঙ্গে গুজব রটানোর বহর ও তা বিশ্বাস করার অগাধ ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেছে এমনই যে এখন আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছে হয় না, ফলে ক্লাশে যাবার ঠিক আগে 'স্টাফ রুম'-এ এসে ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে 'রেজিস্ট্রি' তুলে নিয়ে রওনা হয় ক্লাশের দিকে, অফ-পিরিঅডই অবশ্য যত গোল বাধায়, হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে থাকতে বাধ্য এবং বসে থাকা মানে যত রাজ্যের গল্প আলোচনা কানে আসা, তা আসা মানেই রাগে শরীর রি-রি করা। 'জানেন আজ একটা মেয়ে স্পাই ধরা পড়েছে', চারধার থেকে কোলাহল উঠল, 'কোথায় কোথায়', অনিলবাবু সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'লোহার পুলের ম্যাপ আঁকছিল, দারুণ সেজেছিল, রীতিমতো একজন লেডি। প্রথমে সবাই ভেবেছিল পাগলি বুঝি, কিন্তু একটু নজর রাখতে দেখা গেল মেয়েটা বার বার লোহার পুলের দিকে তাকাচ্ছে আর পেন্সিল দিয়ে কী লিখছে' শ্রোতাদের কান খাড়া, সকলে ঘন হয়ে বসলেন, 'চট্ ক'রে তো ধরা যায় না, তাই একজন লোক আস্তে আস্তে মেয়েটার কাছে এগিয়ে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই, দেখছে আর লিখছে, আর মাঝে মধ্যে ডান হাত মুখের কাছে তুলে নিয়ে কী যেন বিড়-বিড় ক'রে বলছে। আর যাবে কোথায়—ক্যাচ্', শ্রোতাদের মধ্যে দু-একজন 'তারপর তারপর', অনিলবাবু নড়ে চড়ে

বসলেন, 'মেয়েটা কী ধুরন্ধর দেখুন, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে রিস্ট-ওআচ নিয়ে গিয়ে আমি আর নেই বলেই রিস্ট-ওআচটা রাস্তায় আছড়ে মারল, দেখা গেল ঠিক, লোহার পুলের ম্যাপ আঁকছিল আর অয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছিল', অনিলবাবু থামতে ক্ষিতীশ বলে উঠল, 'আমাদেরও আরও ভিজিলেন্ট হওয়া উচিত', এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা কেন্দ্রিত হলো রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে। আলোচনার সারমর্ম এই—আমরা এখনও 'ক্যালাস' না হ'লে লাখুটিয়ায় গুপ্তচররা মাইন বসিয়ে পুল উড়িয়ে দেয় কী করে? অবাধে লোক ঢুকতে দেয়া অন্যায় হয়েছে, 'জেনুইন পারসন' জানার জন্য 'স্ক্রিনিং কমিটি' গঠন করা উচিত, রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত, সন্দেহজনক লোক দেখলে তক্ষুনি থানায় জানানোর জন্য টেলিফোনের 'পাবলিক বুথ' বানানো, ব্রিজের মাথায় মাথায় আর্মড গার্ড বসানো ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু এ-আলোচনার উৎসস্থলে যে মেয়ে স্পাই, সেই স্পাই যে কখনো কোন অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে ড্রইং খাতায় ব্রিজের নকশা আঁকে না—একথা বোঝার বা বিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা কারুর নেই, যেন এধরনের কথা অবিশ্বাস করলে দেশদ্রোহী সংজ্ঞায় ভূষিত হতে হবে সকলের কাছে। নির্মল বলেছিল, 'দেশপ্রেম হচ্ছে বড়লোকদের ব্যাপার এবং তার চেলাদের। তারা যতই অপকর্ম করুক তারা দেশপ্রেমিক, অথচ আমরা', নির্মল হেসেছিল, 'ইংরেজরা তো খুব দেশপ্রেমিক বলে বিখ্যাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের দেশেই কয়লাখনির মালিকরা কী করেছিল জানো, যুদ্ধের সময় খারাপ কয়লাখনি থেকে কয়লা তুলিয়েছিল, ভালো খনিগুলোর কয়লা রেখে দিয়েছিল যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের জন্য। জান তো যুদ্ধের সময় ভূষিমালও দামে কাটবে, বুঝলে! কিন্তু তাদের কেউ দেশদ্রোহী বলেনি, অথচ মজুর চাষি কিছু করলে কথা ছিল না', নির্মলের কথা সে সর্বাংশে মানে নি, তবে এটা বুঝেছিল যুদ্ধ-উন্মাদ করার পিছনে এক গভীর চক্রান্ত থাকে সর্বদা, এবং তার প্রচার এত সুক্ষ্ম যে আমরা তা বুঝতেই পারি না, 'না হলে আমাদের মত শিক্ষিত লোকের এভাবে মাথা বিগড়নো সম্ভব? সব জিনিসের একটা নিয়ম আছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে তা বোঝা যায়, কিন্তু আমাদের মাথা গরম, ভাবতে পারি না অন্য কিছু। নিশ্চয়ই আমরা সেই অদৃশ্য সুক্ষ্ম প্রচারের এক-একটা তন্তুবিশেষ', এবং তখুনি তার মনে হয় এমন যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব বোধহয় ব্যবসায়ীরাই সৃষ্টি করছে, তখন সে ভাবে নির্মলের মত, 'গল্প রটলে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে, তাহলে বিশ্বাস করানো যাবে যে এইজন্যই তারা মাল আনতে পারছে না, ব্যবসায়ী হলেও তো তারা মানুষ বটে, আর তাই বাজারদর চড়বে, তখন দাম চড়লে বলার কিছু থাকবে না, কারণ চাহিদা বেশী সাপ্লাই কম', ভাবতে ভাবতে কেমন দিশেহারা হলেও সে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে নিয়েছে যে ভয় যেটুকু আছে তার চেয়ে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে একদল লোক ধীরে সুস্থে, 'আর আমরা হাঁদারাম তাদের কথায় নাচছি।' এসব কথা কারুর অজানা এমন নয়, বিনোদবাবু ফিসফিসিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর নীরবতায় বলেন, 'হন্যে হয়ে ঘুরছি মশাই একটা বেবিফুডের জন্য। বাজারে আছে অথচ—' তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে 'এক-একটা হর্লিকস সাড়ে এগারো বারো ক'রে বিক্রি হচ্ছে, ঘাতঘুত জানি না, তাই ডবল দামেও একটা পাচ্ছি না, কী যে খাওয়াবো', তখন খুব সরলভাবে পরিমল বলে, 'মাল আসছে না তাই বোধহয়—', ফেটে পড়েন বিনোদবাবু, 'মাল আসছে না বুঝি? সবগুলো ঐ ধুয়ো তুলেছে, আর সেই সুযোগে লুকিয়ে ফেলছে মাল, না হ'লে নুনের কেজি একটাকা আশি হয়, পেঁয়াজ ছ'টাকা আলু দু টাকা কেরোসিন একটাকা', এবার সে সত্যি চমকায়, 'সত্যি!' বিনোদবাবু দাঁত খিচোন, 'তবে আর বলছি কেন, সব বজ্জাতি, যুদ্ধের ধুয়ো তুলে গুজব রটিয়ে নিজেদের পথ পরিষ্কার করছে,

আর গভর্নমেন্টও হয়েছে এদের ধামাধরা, জেনেশুনে ন্যাকা সাজে, আমরা ছা-পোষা মানুষ, দেখবেন সব ভার আমাদের বইতে হবে', বিনোদবাবু আর কী বলতে চাইছিলেন, বাধা পেলেন রামগিরির কথায় 'কর্তা ডাক্‌তাছেন আপনাকে।' পরিমল উঠে পড়ল, তখন তার ক্লাশ। ছোট্ট ক্লাশ, পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মনে হয় যুদ্ধ ব্যাপারে ছেলেদের মনোভঙ্গী কী তা জানার, সুযোগ পেয়ে নানা কথার পর যখন যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখে, তখন অবাক হয়ে যায় এই দেখে যে ক্লাশের সব ছাত্রই যুদ্ধের সপক্ষে। এতে তার মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ছাত্রদের প্রতি কোন কারণে দুর্বলতা থাকার ফলে সে ভেবেছিল অন্তত দু-একজন তার সপক্ষে মত দেবে, কিন্তু এদের কথা ও যুক্তি শুনে সে হতাশ হয়, তখন 'আমরাই যদি অবিবেচক হই, তবে ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ কী' ভেবে খানিক স্বস্তি পাওয়ার মুখে জিনিসের দাম যে হু-হু ক'রে বেড়ে চলেছে এবং তার পরিণাম দেশের পক্ষে শুভ নয়, এতে সাধারণ মানুষ মারা যাবে, দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে ভাবতে ভাবতে কখন যে সে তার যুদ্ধ-বিরোধী গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে খেয়াল করেনি, 'যুদ্ধ করে লাভ কার ? একমাত্র ব্যবসায়ী আর ধূর্ত রাজনীতিবিদ ছাড়া ? যুদ্ধ দিয়ে কোন কিছুর সমাধান হয় না, যুদ্ধ সমস্যা আরও জটিল করে তোলে, উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে যুদ্ধ এক মারাত্মক বিপর্যয়, কোন্ দেশ যুদ্ধ করে লাভবান হয়েছে ? প্রচন্ড যুদ্ধবাজ হিটলার-কে তার নিজের কবর নির্দেশ খুঁড়তে হয়েছিল যুদ্ধের জন্য......' ইত্যাদি ইত্যাদি, যদিও তার পদযুগল তাকে স্বীয় গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলছিল, 'যদি যুদ্ধ লাগে, তবে আমাদের সাধের সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে' ততক্ষণে সে সিনেমায় দেখা ধ্বংসস্তূপ গভীর খদ নিরন্ন মানুষ পোড়াবাড়ি বীভৎস শবদেহের জঞ্জাল বিকলাঙ্গ মানুষের মিছিল কান্না হা-হা ধ্বনি সমস্ত কিছু এই শহরের উপর আরোপ ক'রে থ হয়ে গেল, 'নাঃ, আমাদের কিছু করার নেই', তখন সমস্ত শোক দুঃখ বেদনা সুখ ভালোবাসার অতীত হয়ে যখন বাড়ি পৌঁছয় তখন বুকভরা শ্বাস বিরাট দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এলে সে 'আর ভাববো না' ভেবে নিশ্চিন্তে খাটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদবাবু একের পর এক দোকানে ঢুকছেন বেবিফুডের জন্য, হতাশ বেরিয়ে আসছেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছেন আর নয়—ঠিক তখুনি তার বুক মোচড় দিয়ে 'আমার নেই' এমন হাহাকার উঠলে 'আমি পঙ্গু নই, আমি অতি সক্ষম' মনে হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ও নানা পরীক্ষার শেষে ডাক্তারের উক্তি 'ইউ আর অ্যাকটিভ লাইক এনিথিং অ্যান্ড ইওর পোটেনসি' অর্ধসমাপ্ত বাক্যের সঙ্গে ঝকঝকে হাসি তাকে লাক্সের বিজ্ঞাপনের ভাষায় মালিন্যমুক্ত করে দিয়েছিল। 'কিন্তু আমার যদি সন্তান থাকতো' সঙ্গে সঙ্গে বিনোদবাবুর হতাশাগ্রস্ত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলে চোখের পাতা খুলে যায়, এবং ঐ অবস্থায় 'স্কাই-লাইট'-এ চোখ পড়ায় আঁতকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'ভুল দেখছি না তো' ভেবে দু-তিনবার চোখ বন্ধ ও খুলে আবার দেখে—স্কাই-লাইটের কাঁচে আড়াআড়ি ভাবে কাগজসাঁটা। বিরক্তি ও রাগের স্রোত 'আমার বাড়িতেও শেষে' এমন ধারা বেয়ে তিরতিরালে তার ভিতরকার একটা স্থৈর্যই বোধহয় তাকে শান্ত রাখে, সে উঠে ব'সে ডাকে 'মীনা', খুব জোরে নয়, তবে সে ডাক পরিমলের পক্ষে যথেষ্ট স্বাভাবিকও নয়, ডাকের সমান্তরালে মীনা ঘরে ঢুকে তার দিকে তাকালে সে কোনও কথা না ব'লে আঙুল দিয়ে স্কাই-লাইট দেখালে মীনা হাসে 'অসামরিক প্রতিরক্ষা,' তাতে সে 'কেউ বলেছে', উত্তরে 'সবাই করছে' এবং একটু থেমে 'তাতে দোষের কী ? সাবধানের মার নেই', তখন পরিমল 'কিন্তু যা হবে না, তারজন্য সাবধান হবে কেন ?' কথার মাঝ-পথে মীনা 'তোমার বেশী বেশী, সকলের থেকে আলাদা ভাবার কোনও মানে হয় না', তাতে সে 'সবাই যদি উন্মাদ

হয়?' তার উত্তরে মীনার কথায় ঝাঁঝ, 'ঐখানেই তো ঘোড়ার রোগ, সবাই উন্মাদ আর নিজে সঠিক, তাই না?' একটু কাছে এগিয়ে এসে, 'তাহলে টিকে আর টি-এ-বি-সি নিতে এত হুড়-হাড় করো কেন? আমরা কি বসন্ত কলেরায় মরছি?' এতক্ষণে চকিতে যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রে গেলে মীনা বলে, 'দেখো সবাই বাজে ভীরু আর আমি কেবল আসল ঠিক, এই মনোবৃত্তি ছাড়ো, আগে জানলে কিছুতেই বিয়ে করতাম না তোমাকে', এবার পরিমলের হাসার পালা এবং যখুনি মীনা এ ধরনের অভিযোগ করেছে আগে অর্থাৎ চারধারে অ-স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত সে হেসে বলতো, 'তুমি-ই কিন্তু বিয়ের জন্য পাগল হয়েছিলে' তখন মীনা 'ইস্' বললে দুজনে হেসে উঠত, কিন্তু এখন সে হাসার উদামটুকু পায় না এবং মীনা বলে ব'লেই আবার সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলে সে যে ঠিকপথ ও যুক্তি অনুসরণ করছে, এবং তা বদলাবার কোন কারণ নেই আবার বুঝে নিয়ে নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পায়, আর রাত্রে মীনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে যখন বলে 'তুমি কি তাই ভাবো, আমি খুব খারাপ' তখন মীনা তার পৌরুষের দৃঢ় পিঞ্জরে আবদ্ধ 'পাগল, মাথা গরম হলে কত কথাই তো বলি' বলতে বলতে মীনা নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতে দিতে 'প্রতিশোধ নাও তাহলে' বলার পর সমস্ত চরাচর লুপ্ত হয়, তারপর অবসাদ ও গভীর ঘুমের পর প্রশান্ত সকাল। তারিণী এলে মীনা চেপে ধরে, 'কী মশাই খুব বড় বড় কথা বলতেন, আর টুক করে পাঠিয়ে দিলেন লীলাদিদের', তার উত্তরে তারিণী হেসে 'আমি-ই যে পাঠালাম তা বলল কে, আপনার লীলাদিও তো যেতে চাইতে পারে', তখন মীনা 'লীলাদি নেই, তার ঘাড়ে দোষ চাপানো খুব সহজ', তাতে তারিণী 'আচ্ছা লীলা এলেই জিজ্ঞেস করবেন, তাছাড়া এখানকার অবস্থা ভালো নয়, একথা মানবেন তো?' মীনা নীরবে সম্মতি জানালে 'পরিমল তা স্বীকার করে না' বললে মীনা 'তার মাথায় ঢুকেছে যুদ্ধ হবে না, এমনকি সিভিল ডিফেন্স-এর—।' পরিমল এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'আমি শুধু অহেতুক ভয় আর সন্ত্রাস ছড়ানো পছন্দ করি না। মাথা ঠান্ডা রেখে একটু র‍্যাশনালি বিচার করলে দেখা যাবে যে যুদ্ধ হবে না', তখন তারিণী হঠাৎ মনে-পড়া কথার মতো বলে ওঠে,'এখনকার মিনিস্ট্রি ভেঙে দেয়া হচ্ছে, শুনেছো?' পরিমলকে নিরুত্তর দেখে, 'এভরিথিং পসিবল্ নাউ, সমস্ত কিছু সাস্-পেনডেড্, আন্দোলন নেই, মুভমেন্ট নেই, মওকা অতএব—' তখন পরিমল হেসে 'আর তুমি ঝোপ বুঝে কোপ মেরে দারা পুত্র পরিবার কে তুমি কে তোমার ব'লে পাঠিয়ে দিলে', তারিণীর মুখ রাঙালেও সে সহজ হওয়ার জন্য হা-হা হেসে উঠল, তারপর থেমে বলে, 'বাইদি ওয়ে তুমি কি বৌদিকে পাঠিয়ে দেবে?' পরিমলের আগেই মীনা উত্তর করল, 'ওঁকে ফেলে, না বাবা, সে আমি পারবো না, আমার শান্তিই থাকবে না', এরপর তারিণী ও মীনার মধ্যে কথাবার্তা সাধারণভাবে বহুল প্রচলিত যুদ্ধ, সিভিল ডিফেন্স, গভর্নমেন্টের ব্যর্থতা যথা রাস্তার ধারে ট্রেঞ্চ নেই রাস্তায় আলোর সংখ্যা কম ইত্যাদি বিষয়ক, ততক্ষণে পরিমল একবার তাস খেলতে যাবে কিনা ভাবলে তাসের প্রতি সেই দুর্বার আকর্ষণ বোধ করল না, যা তাকে কয়েক মাইল টেনে নিয়ে যেতে পারে, 'আর গেলেই তো সেই এক কথা', অতএব সে পাথুরে মূর্তির মত ভাবনাচিন্তা-লেশ হয়ে মীনা তারিণীর দিকে মন দিতে বুঝল, সে কেবল এদের মুখ নাড়াই দেখতে পাচ্ছে, তাদের সংলাপের কণাও বুঝছে না, 'আমার করার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি অসহায়, আমার কথা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, কিন্তু স্বীকার করবে না।' তারপর নিজের গভীর অন্দরে ঢুকতে ঢুকতে 'কে আমাকে দিব্যি দিয়েছে এসব কথা ভাবার বা বোঝাবার' মনে হলে হাজারবার নেয়া 'আর ভাববো না, মুখ খুলবো না' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা মনে মনে আওড়ে এবং

কিছু ঠিক করতে না পেরে তারিণী চলে যাবার পর গা এলালে মীনা বলে, 'কলেজ নেই ?', উঠতে হয় সুতরাং, অথচ কলেজের ঐ গর্তে ঢুকতে এত আপত্তি আগে মনে মনে টের পায়নি সে, 'কি প্রচণ্ড মূঢ়তায় দিন কাটাই আমরা, পড়াশুনোর বালাই নেই, কথায় কথায় বুকনি, ছাত্রদের অহেতুক সমালোচনা, নিজেদের বড় ভেবে ভেবে ফোলা'—এইসব বিরক্তি নিয়ে স্টাফ-রুমে ঢুকলে সে অন্য সকলের সঙ্গে দূরত্ব রেখে একলা চুপ করে বসতে পারে না, কোন মন্ত্রবলে নিজের অচেতনেই চা-এর কাপে ঝড় তোলার কেন্দ্র রামাগিরির কর্নারে গিয়ে হয়ত অনিলবাবু বা বিকাশের পাশে বসে ইচ্ছানিচ্ছা সমস্ত কিছুর উপরে। অমিতানন্দ শুরু করে 'অনিলদা মাঙ্কি রেজিমেন্টের কথা শুনেছেন নাকি ?' অনিলবাবু সিগ্রেটের ছাই তুড়ি মেরে ঝেড়ে সিগ্রেটে আর-একটা লম্বা টান দিয়ে 'বিশ্বাস হলো তো ক্ষিতীশবাবু ?' তারপর অমিতানন্দর দিকে চেয়ে 'আমি ক্ষিতীশবাবুকে মাঙ্কি রেজিমেন্টের কথা বলতে উনি ফুঃ মেরে উড়িয়ে দিলেন, আরে বাবা চর্মচক্ষে যে দেখেছে সেই বলেছে আমাকে, আর সে যেসে লোক নয়। নর্থরোড দিয়ে মার্চ ক'রে যাচ্ছিল', কথার মধ্যিখানে অমিতানন্দ 'নর্থরোড না বকুলতলা রোডে ?' তখন অনিলবাবু 'তাহলে তুমি বকুলতলা রোডে দেখছো, বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনারা, শিম্পাঞ্জিগুলো গ্রেনেড ছুঁড়তে পারে টার্গেট লক্ষ করে, তবে কমান্ডার না বললে একপা-ও নড়ে না, ভেরি ডিসিপ্লিনড', তাতে সরিৎবাবু 'কোতোয়ালীর একজন বলল, ওদের কলা খাওয়ানোর জন্য থানার সকলে অনেক চেষ্টা করেছিল, একটা কলাও মুখে দেয়নি, যেমনি কমান্ডার হুকুম দিল 'টেক্', ব্যাস নিমেষে সব কলা খতম, আশ্চর্য ব্যাপার', তখন সকলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারে তন্ময়, বিকাশ বলল 'ওদের নাকি রাশিয়ায় ট্রেনিং দিয়েছে', এতে এমন উৎসাহের সঞ্চার হলো যে সবাই প্রায় একইসঙ্গে নিজের জবান জাহির করার জন্য কথা বলার একটা হাউ-হাউ শব্দ উঠতে থাকল। প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখে সংবাদ দিচ্ছে এবং কার সংবাদ কত 'অথেন্টিক্' তা প্রমাণের জন্য কেউ বলছে তার সঙ্গে ইনফ্যান্ট্রির ক্যাপ্টেন-এর জানা-শোনা আছে, কেউ বললেন খোদ মেজর তাকে বলেছেন, আবার কেউ কেউ 'সোর্স' বলতে নারাজ, যেন তিনি বলে দিলে শত্রুর গুপ্তচর গিয়ে তৎক্ষণাৎ গুপ্তসংবাদ জেনে পাচার করে দেবে। তখন পরিমল সবার দিকে তাকিয়ে এরা শিক্ষিত লোক কিনা সংশয় জাগলে 'আমরা মধ্যবিত্তরাই এসব নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করি, যতবেশী শিক্ষিত ততবেশী হৈ-চৈ, কাজ কম বলেই আমাদের যত আজেবাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়, অথচ খেটেখাওয়া লোকগুলো কতটুকু আর এবিষয়ে ভাবছে', এরকম চিন্তায় কিছুক্ষণ নিবিষ্ট থেকে লক্ষ করল যাঁরা অবিবাহিত এবং যাঁরা তাঁদের বৌ-ছেলে-মেয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত তাঁরাই নানা আজগুবি গল্প বা আলাপ চালান বেশী, অবশিষ্টরা প্রায় মূতের মত দিন কাটান, অতএব তাঁরা, পরিমলের মনে হয়, এসব আলোচনা করলে শত্রু এসে হাজির হবে বলে মনে ক'রে চুপ থাকেন। সে এদের সবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, তার ভিতরেই বোধহয় আর একটা আমি আছে যা তাকে কেবলই সে যা বিশ্বাস করে না তার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। 'আমি নিশ্চয় দুর্বল, হয়ত দুর্বলতা ঢাকার জন্য আমি সকলের থেকে আলাদা থাকতে চাই, মীনা ঠিকই বলে যে আমার সব তাতে বেশী বেশী, আমি দৃঢ় হলে নিশ্চয় কাউকে তোয়াক্কা করতাম না', এতখানি ভাবার পর চিন্তা বাঁক নেয়, 'কিন্তু সবাই যদি কাপুরুষ হয়, যদি সে চোখকে মন ঠারে, তবে একজন বিবেকবান লোক নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না, অনিলবাবু বিকাশরা ঠাট্টাছলে যে কথা বলেন তা মিথ্যা হলেও সেইসব কথা ভয় আর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। আমরা যদি নিজেদের শিক্ষিত বলে মনে করি এ আলোচনা করতাম না।' মীনা বলে

'আমার কিন্তু ভয় করছে গো,' পরিমল চা-র কাপ হাতে নিয়ে একটু হেসে উত্তর দেয় 'ভয় কিসের, এর মধ্যেই তো অক্ষয়বাবুর ছেলে হলো, মিসেস সেন মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে চ্যারিটি শো করলেন, শহরের অবস্থা স্বাভাবিক, দোকান-পাট খোলা', মীনা তখন কাছে এগিয়ে আসে 'তোমার ভয় করে না?' পাঞ্জাবির বোতাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মীনা বোধহয় পরিমলের আবেগ মাপতে চায়, তাতে সে খানিকটা অভিভূত হয়ে গাল টিপে দিল সস্নেহে, 'ভয় কী, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তোমার ভয় কিসের,' তখনও মীনা বোতাম ঘোরানো থামায়নি 'এমনিতে ভয় পাইঁনা। কিন্তু সবাই চলে যাচ্ছে দেখে নানা কথা শুনে গা ছম্‌-ছম্‌ করে,' একটু থেমে 'বলো ভয় করে কিনা?' ততক্ষণে পরিমলের চা খাওয়া শেষ, এবং সে মীনাকে বুকের মধ্যে নিতে মীনার মাথা তার বুকের মধ্যিখানে হারিয়ে গেল, 'ভয় কিসের, সংস্কৃত শ্লোক আছে না যে—' মীনার মুখ হাসিতে খলখল 'তাবদ্‌ ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্‌' এবং সে হেসে মীনার ঝলমলে মুখ দেখে আশ্বস্ত হয়, এর মধ্যে অবশ্য অবিনাশবাবুকে কিছু বরদাস্ত করে সে, কারণ তিনি সকলের ভয় যে একটা আবরণমাত্র তা ধরে ফেলেছেন, 'বুঝলেন পরিমলবাবু সব বেটা সেয়ানা, এদিকে মুখে বিশ্ব জয় করছে, তার তলে অঙ্ক কষছে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেই গিয়ে উঠবো দেশের বাড়িতে, ফিরিয়ে নেবো হৃতসাম্রাজ্য, এর মধ্যে টি-এ বিল মেডিক্যাল বিলের কমতি নেই, বরং সেগুলো বেড়েই চলেছে, আর অন্যের বেলায় চোখ টাটায় এগুলোর, ছ্যা-ছ্যা, আমরা আবার শিক্ষিত,' আর সে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে বলে ফেলে 'একটা গভীর চক্রান্তের আভাস পাচ্ছি আমি, কিন্তু কী সে চক্রান্ত' ততক্ষণে অবিনাশবাবু কিস্তি দিলে সে তার মনোরাজ্য থেকে লহমায় নেমে আসে দাবার রাজ্যে, দেখে তার মন্ত্রী বিপন্ন। আজকাল অবশ্য তেমন বিপন্ন বোধ করে ক্লাশে যেতে -ছাত্ররা পড়ার নামে সাড়ে বাইশ, পড়াশুনোর পাট চুকে গেছে, শ্রদ্ধাভক্তির বালাই নেই, তার উপর কিছু বললে আর রক্ষে নেই, এবং 'আমরাও ক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছি, আমাদের যে একটা ভূমিকা আছে, কিছু করণীয়' ভাবতে থেমে যায়, কারণ বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক আছে তা ঠিক ধরতে না পেরে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে আজ চিনি জোগাড় করতে হবে, কারণ মীনা বলেছে 'ঘরে একদানাও চিনি নেই, বাজারেও নেই, হিমাংশুবাবু কোনমতে এক কেজি জোগাড় করেছেন, দত্ত ভান্ডারে এ বেলা গেলে পাওয়া যেতে পারে', পরিমলকে ক্লাশ সেরেই সুতরাং বাজারের দিকে ছুটতে হয়, এবং মীনার আশঙ্কা বিফল করে দিয়ে সে দু কেজি চিনি নিয়ে আসে অনায়াসে অবশ্য বেশী দামে।

বিকেলবেলায় বেড়ানো অভ্যাস তার বহুদিনের, ইদানীং তাতে কিছু শৈথিল্য এসেছিল, কারণ ভিড় গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং এবার সারা বছর বৃষ্টি হওয়ার দরুন রাস্তাও খারাপ, ফলে বেড়ানোর আরামের বদলে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, তাই বিকেল বেলায় বেড়ানোটা সে শহরের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বিদ্যাভবন রোডে সীমাবদ্ধ করেছে, অবশ্য এতেও কি শান্তি আছে, বিদ্যাভবন রোডে আসতে গেলে শহরের জনবহুল অঞ্চলের সবটুকু না হলেও প্রায় অর্ধেক পেরুতে হয়, আর সেই অংশ পেরুনোর সময় মনে হয় কী দরকার ছিল বেরুবার। যারা মানসিক কাজ করে—তাদের পক্ষে দিনে অন্তত চার-পাঁচ মাইল বেড়ানো উচিত—স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালনে সে একনিষ্ঠ না হলেও অনিচ্ছুকও নয়, নিজের অনিচ্ছা থাকলেও মীনার তদারকিকে উপেক্ষা করবে কোন অজুহাতে, এমনকি বিয়ের পর প্রথম বছর দুই তিন, পরিমল মনে করতে চেষ্টা করে, 'মীনা আর আমি বের হতাম সন্ধ্যার সময়। নর্থরোড হয়ে সবজীবাগান তারপর মোল্লা চৌমোহনী হয়ে কর্নেল রোড—উঃ, সে কি কম দূর! অনেক অনেক পথ, আর

মীনা এতটুকু হাঁফাতো না, দরকার হলে নির্মল কাফেতে চা খেয়ে আবার হাঁটা, তখন শরীর মন মেজাজ শরিফ ছিল, খিদে পেতো অসম্ভব, বোধহয় এখানকার মত চট্ করে বিরক্তও হতাম না। এই অনিলবাবু বিকাশের সঙ্গে কম আড্ডা দিয়েছি, অক্ষয়বাবু এলে তো কথাই ছিল না। আর আজ', দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'বয়েস বেড়ে গেলে বোধহয় মানুষের সহনশক্তি কমে আসে, নইলে আমি তো সম্পূর্ণ পালটে যাইনি, নাকি গিয়েছি?' প্রশ্নটি মীনাকে জিজ্ঞেস করায় মীনা হেসে পরিমলের কথা আমলে না এনে 'চা চাই?' বলে পাশ কাটাতে চাইলে সে আঁচল ধরে ফেলে 'সত্যি করে বলো তো?', মীনা এমনভাবে হাসে যে পরিমল বোকা বনে যায়, তখন তারিণী এলে রেহাই পেলেও আর-এক গাড্ডায় পড়ে তারিণীর কথায়, 'রিপ্রেজেন্টেশন্ লিখে এনেছি', তার উত্তরে সে 'কিসের', 'যা বাবা, ভুলে মেরে দিয়েছ নিজের কেসটা', তখন মীনা 'দেখুন তাহলে কাকে নিয়ে ঘর করি' ব'লে বেরিয়ে গেলে 'রিপ্রেজেনটেশন দেবো না' বললে তারিণী 'কেন', বলায় সে 'ওসবের মধ্যে আমি নেই', তারিণীর কথায় উষ্মা 'তাহলে লিখতে বলেছিলে কেন?' পরিমল তীব্রভাবে তাকায়, 'আমি লিখতে বলিনি, তোমরাই আমার উপর দরদ দেখাচ্ছিলে', তারিণী রাগই করল, 'যাক্, ঘাট মানছি, যে তার নিজের ভালো বোঝে না—' তারিণী বিজবিজ করতে থাকল। তারপর স্তব্ধতা এবং কিছুপরে চা হাতে মীনার প্রবেশ, 'যুদ্ধের খবর কী?' তারিণী 'এই আর কী', মীনা হেসে 'মানে', 'মানে চা-এ চুমুক', তখন সকলের হাসি। পরিমল যেন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না, যতদিন যাচ্ছে ততই বিরক্ত হয়ে উঠছে লোকগুলোর উপর, শেষে রাগ গিয়ে পড়ল জায়গাটার উপর। 'যেমন জায়গা তেমন তার লোকজন, সব সাব-স্ট্যান্ডার্ড' তাই মধ্যে মধ্যে সে মীনাকে বলে, 'কলকাতায় চাকরি পেলে কিন্তু চলে যাবো', মীনা নিস্পৃহ, 'তা যেও, কে তোমাকে মানা করেছে', তারপর থেমে, 'কে তোমাকে চাকরি দিচ্ছে সেখানে, এমন জায়গা বলেই চাকরি পেয়েছো, নইলে ঠনঠন করতে', পরিমল স্বীকার করে, 'ঠিকই বলেছো, এখন হলে এখানেও চাকরি পেতাম না'। এটা সে বোঝে, তবু যেখানে কারুর সঙ্গে মতের মিল হয় না, অন্যদের আচারব্যবহার যেখানে তার থেকে অনেক তফাত, এমনকি আত্মিক সাযুজ্যও কোথাও খুঁজে পায় না, সেই অনাত্মীয় পরবাসে লোকে থাকবে কী করে ভেবে কূল পায় না সে। এই সেদিনও বলেছিল, 'মীনা চলো এখান থেকে', মীনা হেসে, 'চাকরি ছেড়ে', পরিমল সম্মতি জানালে মীনা, 'খাওয়া চলবে কী করে? জমিদারি কোথায়?' তখন সে, 'একটা কাজ জুটিয়ে নেবো কোনমতে', তাতে মীনা, 'এখন চলে গেলে লোকে অন্যকথা ভাববে', 'কী কথা?', 'ভাববে যে যুদ্ধের ভয়ে আমরা পালাচ্ছি', ততক্ষণে সে নিজের ভুল ধরতে পেরে মীনার দিকে কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়, ভাবটা মীনা তাকে এক বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। 'কোথায় আর যাবে, সবখানেই তো খেয়োখেয়ি, কলকাতা বড় জায়গা, দেখা যায় না এইমাত্র,' মীনা অতি গভীর গহনে যেতে যেতে কথাগুলো বললে সে খানিকটা অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মীনা যে এমন কথা বহুদিন বলেছে তার একটি বিশেষ দিনের কথা মনে করতে না পারলেও মীনা যে গভীরতর কথা বলতে পারে তা স্বীকার করে। চারদিকের পরিবেশ ও আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠলেও এবং অন্য সকলের মতের সমর্থন হলেও একমাত্র তার কাছেই নিজেকে খুলে ধরা যায়। 'এসময় মা-দের আনলে বেশ হতো, তাই না?' পরিমলের কথা লুফে নেয় মীনা, কিন্তু পরক্ষণেই কেমন বিষাদগ্রস্ত হয়, 'যেমন দেশে থাকি, আর যা অবস্থা—', মীনা চুপ ক'রে গেলে সেই কথা বহুক্ষণ আলোড়ন তোলে তার মনে এবং স্বাভাবিক নিয়মে সেই আলোড়ন তাকে দোলাতে দোলাতে ক্লান্ত-ক্লান্ত করে।

ঠিক তার পরের পরের দিন যখন সে 'পথের পাঁচালী' পড়ায় নিমগ্ন এবং পড়ছে—'প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এরকম লতাপাতার মধুর গন্ধ-ভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সেসব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!'—এবং এইটুকু পড়ে আপন অলক্ষে সেই স্মৃতিময় বাল্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেছিল, ঠিক সেই সময় সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে সাতটা একান্ন কি আটান্ন মিনিটে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অকস্মাৎ আকাশ-খানখান-করা কানে-তালা-লাগানো ফেটে পড়ার শব্দ চকিতে শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র খেণ্তলিয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা হরণ ক'রে শহরের একোণ থেকে সেকোণ থেকে ওকোণে সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে দূরের অনেক দূরের আকাশে মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মীনার ভয়ার্ত কণ্ঠ 'শেলিং!' পরিমলকে ঠেলা দিয়ে 'শুনছো, শেলিং আরম্ভ হয়েছে', পরিমল প্রথমে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তারপর কয়েক মুহূর্ত তদ্ অবস্থায় থেকে কান পেতে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা ক'রে বলল, 'আমাদের দিক থেকে ছাড়ছে', মীনা 'কখনোই না, কক্‌খনো না' বলতে বলতে সেই আকাশ-খান-খান-করা কানে-তালা-লাগানো ফেটে পড়ার শব্দ সমস্ত শরীরের তন্ত্রীর সঙ্গে মানসিক স্থৈর্যকে সজোরে ধাক্কা মেরে নাড়িয়ে দিতেই আলো নিভে গেল। 'শুয়ে পড়, কানে আঙুল দিয়ে উপুড় হয়ে' এবং আশ্চর্য মীনা ও সে একই সঙ্গে খাট থেকে নেমে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে কানে আঙুল দিয়ে মেঝে থেকে বুক তুলে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে ও তখনও শরীর ঝন্‌ঝন্ করছে এক মুহূর্ত দুই মুহূর্ত অনেক মুহূর্ত পর্যন্ত যতক্ষণ সেই শব্দ এই শহরের আকাশে বাতাসে অলিতে গলিতে, সেই শব্দ থেমে থেমে আট কি ন' বার হলো, তারপর বিরাট স্তব্ধতা, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, আর পরিমল স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ের নদী পেরুতে পেরুতে সেই নিরেট ছিদ্রহীন স্তব্ধতা ও অন্ধকারের আস্বাদ নিতে নিতে কোথায় যেন আমার আত্মা আমার অস্থির পিঞ্জরে কোন এক নিভৃত জায়গায় যেখানে স্পন্দন মৃদু মৃদু অথচ উত্তাপে জীবন্ত সেই ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্যে যেখানে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ক্ষীয়মাণ প্রচণ্ড নির্জন শান্তিতে সেখানে আমি গভীর ঘুমের আস্বাদ নিতে নিতে ভেসে চলি যেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর যাবতীয় কোলাহল আর্তনাদ মুছে ফেলে কে বা কারা মরহুমের লাশ বহন ক'রে নিয়ে চলেছে মোনাজাত অনুষ্ঠানে, পরিমল পূর্ববৎ উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকল, শুধু মধ্যে মধ্যে দু-একটা মশার পিন্‌পিন্ মীনার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ তাকে ক্ষণে ক্ষণে টেনে নিয়ে আসতে থাকল বাস্তবে যেখানে সে – 'হ্যাঁ, শেলিং হয়েছে, আমি স্বীকার করছি, আমার অন্ধ কথায় ভুল ছিল, কারণ আমি ধারণাই করতে পারি নি যে বিনা প্ররোচনায় কোনও দেশে এমন কাজ করতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যুদ্ধ অনিবার্য', এতদূর চিন্তার পর কে যেন চিন্তার ঝাঁপি তার বন্ধ ক'রে তাকে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিতে 'অত সূক্ষ্ম বিচার না করলেও চলবে' বলতে বলতে বিশ্রী মুখভঙ্গি করলে সে ক্ষেপে ওঠে, এবং তখুনি সমস্ত সাবধানতা ভুলে গিয়ে উঠে পড়তে চাইল, একটা হাত চেপে ধরল। মীনা 'উঠো না, আবার হতে পারে' বললে সে বিনা প্রতিবাদে মাথা আরও বেশী নীচের দিকে ঠেলে দেয়, আশ্চর্য তখন আলো জ্বলে উঠল। মীনা উঠে বসলে সে ওঠে, আর তীব্র আলো সইয়ে নেবার জন্য এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার ফলে

বারবার চোখের পাতা খুলল বুজল। মীনা বলল, 'বিশ্বাস হলো তো এবার', পরিমল কিছু বলতে গিয়ে থামল এই ভেবে যে এমন দুর্ঘটনার পর তর্ক করা বৃথা, তাই চুপ করে থাকলে 'আমার কথামত চলবে তো' বললে সে মীনার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চায়। 'এসো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নি, কখন আবার শুরু হবে' বলতে সে প্রতিবাদ করল না, কারণ কখনও সে ঐ আকস্মিক হামলার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না, ক্রমে লোকের যাতায়াত শুরু ও রাত বাড়তে থাকল। খানিক বাদে প্রায় দশটার সময় জানা গেল যে শহরের কর্মবহুল অঞ্চলে 'শেল' পড়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তখনও অজানা।

সেই রাত্রে মীনা খাটের পাটাতন তুলে সরিয়ে দিয়ে মেঝেতে খাটের ফ্রেমের মধ্যে পরিমলের সাহায্যে গদি তোশক পেতে বিছানা ক'রে ফেলল, এবং এভাবে শোয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে যেমন সে নীরব থাকল, তেমনি মীনা শোয়ার পর তাকে ডাকলে সে বাধ্য ছেলের মত খাটের ফ্রেমের মধ্যে মেঝেয় পাতা বিছানায় ঠাঁই নিল, একবারও মনে হলো না যে এভাবে শোয়া তার নৈতিক দিক থেকে অনুচিত, যদিও সে স্বস্তি পাচ্ছে না, তবু অন্ধকার ও গভীর রাত্রির ভার তাকে ক্রমে ঘুমের গভীর থেকে গহনে টেনে নিয়ে চলল, আর মীনা পাশ ফিরে মাথা উঁচু ক'রে সেই নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে স্থির ঘুমন্ত পরিমলকে দেখে অপার প্রশান্তি নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

মীনার চিন্তাভাবনা:

পরিমল এমন ছিল না, যখন সে আসতো আমাদের বাড়ি কেমন স্মার্ট লাগতো ওকে, একটা সলজ্জভাব নিশ্চয়ই অনেকটা মেয়েলি, বোধহয় ঐজন্য ওকে ভালো লাগতো, সুজাতা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, দেখতে এমন কিছু নয়, তবু ওর গভীর কালো চোখজোড়া ঘন ভ্রূ আর কথা বলার মধ্যে একটা দৃঢ়তা, কোনও ভাসাভাসা কথা বলতো না, উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট, আমি একদিন ওর সামনে বের হয়েছি, পরিচয় হয় নি, কথাবার্তাও নয়, শুধু একবার ও তাকিয়েছিল আমার দিকে, সে দেখায় এমন কিছুই ছিল না যাতে প্রেমে পড়া যায়, তবু ওর সেই তাকানো সেই মুখ হঠাৎ কেন জানি সেই দেখার চার-পাঁচ দিন পর থেকে থেকে সারাদিন মনে পড়তে থাকল, বুঝলাম আমি গেছি, তবু সহজে কি ধরা দি, কিন্তু শেষে ধরা দিতেই হলো, ওর মধ্যে একটা সহজ উদাসীনতা ছিল, অনেক পুরুষের নাকি থাকে, বাবারও ছিল, কেন জানি ঐ উদাসীন ভাব আমার ভালো লাগতো, ও তখন কলেজের পাট চুকিয়েছে, পড়াশুনোয় ছিল তুখোর। দাদা যাঁকে আমরা বিশেষ পড়ুয়া বলে মানতাম, তিনি ওর কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতেন, বুঝতাম ওর পড়াশোনায় ফাঁকি নেই, তবু পড়ুয়াদের সন্দেহের চোখে দেখতাম। মনে হতো পড়ুয়ারা খুব স্বার্থপর হয়, নিজের স্বার্থ ছাড়া তারা কিছু ভাবে না বা ভাবতে পারে না, পরিমলকে সেই দলে ফেলে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে চাইতাম, হয়ত ওর দিক থেকে মন ফিরিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু যার দিকে চাই, তাকেই তো পরিমলের কাছে বামনের মতো লাগতো, ফলে ঠিক করলাম একাই থেকে যাবো, কিন্তু চিরজীবন অ-বিবাহিত থাকবো ভাবতেই স্কুলের টিচারদের বিশুষ্ক রূঢ় ক্ষুধার্ত মুখগুলো মিছিল ক'রে আসতো চোখের সামনে, আর সময় সময় মনে পড়ে যেতো স্কুলের মেয়েদের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারের কথা, মানুষ যে অমন নিষ্ঠুর হতে পারে, না, ঠিক করলাম পরিমলকেই বিয়ে করবো, তারপর বাঁধনছেঁড়া দিন, আমি আর পরিমল। পরিমল আর আমি, কী আসুরিক শক্তি ছিল ওর, আমি পেরে উঠতাম না ওর সঙ্গে, আমাকে প্রায় অক্টোপাসের মতো

জড়িয়ে থাকতো, ওর সেই সবল বাহু দুর্দমনীয় আবেগ কণাছেঁড়া শক্তিকে বারবার আমি শ্রদ্ধা করেছি, কী প্রচণ্ড আবেগে যে আমার শরীর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু করে দিত। আঃ, সেইসব দিন, কত পাহাড় পেরিয়েছি, সমুদ্রে স্নান করেছি, আর কোনও পুরুষ অমন শক্তি ধরে কিনা আমার জানা নেই, তবু এত শক্তি ধ'রেও ও আমাকে একটা সন্তান উপহার দিতে পারল না, অথচ সে শক্তি তার অদম্য ছিল, তারপর ও আমাকে টেনে টেনে নিয়ে গেছে এধার সেধার ভারতের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে, কত ছুটোছুটি সমুদ্রবেলায়, পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে নেমে গেছি দুজনে জড়াজড়ি ক'রে সমুদ্রের অনেক দূরে, ওর মতো এমন সপ্রতিভ জীবন্ত মানুষ দেখলাম কোথায়, তবে ও যা একগুঁয়ে। ভয় লাগে সময় সময়, না হলে যুদ্ধ হবে না একথা কে প্রচার করতে বলেছে ওকে, নিজে বুঝেছো, বেশ তো, ভালো কথা, পরকে বোঝাবার দরকার কী, সবাই শিক্ষিত, এম.এ বি.এ পাশ, কত মানা করেছি—এসব বিষয়ে মাথা ঘামিও না, জায়গা ভালো না, তা কি শুনবে, এক গোঁ, সবাই তো ভুল বলে না সব সময়, সবাই খারাপ আমি ভালো এ ভাবটা ভালো নয়, কিন্তু কে শোনে কার কথা, সকলের কথা একবার মানলে দোষ কী, যদি ওরা বিনা প্ররোচনায় শেলিং করে থাকে তবে বোম ফেলতে কতক্ষণ, আ-হা ঘুমোক ও আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না ওকে তবু ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বুকের ওঠা-নামা স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা কাদার ডেলার মতো এখন ঘুমিয়ে থাকলে ওকে দারুণ অসহায় লাগে হাঁটু ভেঙে শুলে মনে হয় একটা কচি বাচ্চা ভয় পেয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমের মধ্যে ঘুমের সময় ওর ভ্রূ আরও ঘন হয়ে ওঠে মুখ একটা আলোয় ভরে যায় ঠিক সকাল হবার আগে যে ফিকে আলো দিগন্তের অনেক নীচে সূর্য ওঠার আগে পশ্চিম আকাশ যেমন থাকে এখন দেখলে কে মনে করবে পরিমল এমন শক্তিধর দুর্ধর্ষ ঘুমিয়ে থাকুক ও যতক্ষণ ওর সমস্ত দাহ জুড়িয়ে না যায় আর আমি ওর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে বিকেলের সমুদ্রের ধার পাহাড়ের খাড়াই মীনাক্ষী মন্দির পদ্মার বিস্তার ইছামতীতে নৌকো আমার সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি আঃ আর আমি হারিয়ে হারিয়ে—

পরের দিন সকালে রেডিও শোনার আগেই পরিমল 'শেলিং'-এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে পারল: নিহত সাত আহত পনেরো তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, ইকবালপুরের তিনটে বাড়ি নষ্ট হয়েছে দুটো চালাঘর পুড়ে ছাই। বিবরণ শুনতে শুনতে তার মন বিষাদে ছেয়ে গেল, 'কি দোষ ছিল এদের! নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা, হয়ত শিশুটি তার মার পাশে শুয়েছিল, সে কিংবা তার মা, নাঃ, নির্মল ঠিকই বলতো—যুদ্ধ হচ্ছে অপচয়, মানবতার অপচয়', তৎক্ষণে নির্মলের সেই ভাব গম্ভীর মুখ গভীর চোখ ভেসে উঠলে সে যেন নির্মলের সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ হয়: 'তাহ'লে যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না, লিমিটেড ওয়র-ও নয়, হাজার যুদ্ধের পরও তোমাকে আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করতে হবে সমস্যাগুলো', তার উত্তরে আমি 'যদি প্রতিপক্ষ গোঁ ধরে থাকে', নির্মল হাসে 'তা তো ধরে নিতে হবে, আমাদের পথ মসৃণ নয়, বিশ্বের শান্তি আমাদের কাছে প্রথম শর্ত, তার জন্যে সাময়িক হারও মেনে নিতে হবে আমাদের, তাতে সম্মান খানিকটা হানি হলেও আসলে দূরদৃষ্টি সেই সম্মানহানি আমাদের পূর্ণ সম্মান প্রতিষ্ঠা করবে', তারপর ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধ এবং শান্তির কথা, আর সেই সূত্রে বিপ্লব আর যুদ্ধের মধ্যে তফাত কোথায় কোন পর্যায়ে বিপ্লব যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় কেন হয় এবং স্থায়ী শান্তির জন্য পঞ্চশীল নীতির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাত খাওয়ার সময় মীনা যখন বলে 'ভাত পড়ে রইল যে, কী ভাবছো?' তখন সে হাসে, অথচ সে হাসি যে গভীর বেদনা জড়ানো তা মীনা ধরতে পেরেছে ব'লে মনে হতে সে হেসে ওঠে 'আমি হাসছি কেন' ভাবতে থেমে যায়, 'মীনা তাই ভাবছিলাম', যেন নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপ 'যারা মারা গেল, তারা জানতেই পারল না কেন তারা মরলো', তাতে মীনা 'সে কেউ জানতে পারে না', তখন পরিমল 'তা ঠিক, তবু এভাবে মরে যাওয়া' বলতে বলতে কেমন অবসাদে আক্রান্ত হ'লে 'এসব কথা বলে লাভ কী' ভেবে চুপ করে গেল।

আজ স্টাফ-রুম তখনও তেমন জমে নি। অনিলবাবু কী যেন লিখছেন, তিনি যে অনেকক্ষণ লেখার কাজ করছেন তা বোঝা যায় কপালে চুল পড়া চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ দেখে, এমনকি বিকাশ সুবিমল অক্ষয়রা নিশ্চুপ যেন তারাও গভীর চিন্তামগ্ন যদিও রামগিরি চা দিয়ে গেল বিনা অর্ডারেই, সবাই চুপ, যেন এখনও কেউ কাল রাতের সেই আকস্মিক বিভীষিকার রেশ এখনও কাটিয়ে ওঠে নি, যেন আরও কিছু গভীরতর আশঙ্কার জন্য অপেক্ষমান, 'অথচ এরাই বীরদর্পে যুদ্ধের পক্ষে ওকালতি করতো। যুদ্ধ না লাগতেই এ অবস্থা হ'লে সবাই তো শব্দ শুনেই মরে যাবে যুদ্ধ লাগলে', ততক্ষণে অনিলবাবু হাই তুললেন, 'বুঝলে বিকাশ, অ্যাট্ লিস্ট পাঁচিশ বস্তা লাগবে', 'পাঁচিশ!' বিকাশ চমকালে তিনি 'এ তো খুব আম্বল এস্টিমেট্, ক্লাশ-রুমগুলো বাদ দিয়েছি', তখন বিকাশ 'পি-ডাব্লু-ডি এত দিতে পারবে না, তাছাড়া বালি আনার ঝঞ্ঝাট', তাতে অনিলবাবু 'আচ্ছা দাঁড়াও, ব্যাফল ওআল তুললে কমে হয় কিনা দেখছি' ব'লে তিনি আবার ঝুঁকে পড়লেন কাগজের উপর। সেই সময় বিনোদবাবু ঢুকে একটা আলোড়ন তুললেন, 'কাল টোএন্টিফাইভ পাউন্ডার ছেড়েছিল', তারপর আবার স্তব্ধতা, মনে হয় মুখ খোলা এখন অবিবেচকের কাজ, সেই আলোড়ন ওঠার পর স্থির খানিকক্ষণ, পরিমলের মনে হলো একটা 'শেলিং'-এর আর্তনাদ আকাশে আকাশে ফেটে ছড়িয়ে পড়ার পর যে নৈঃশব্দ্য তেমন, ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'যা একটা গর্ত হয়েছে, তাতে মনে হয় সেভেনটিফাইভ পাউন্ডার ছেড়েছিল', তাতে বিনোদবাবু ফোঁস ক'রে 'মিলিটারি বলছে টোএন্টিফাইভ পাউন্ডার আর আপনি বললেই হবে' বললে লেগে যায় তর্ক, তখন পরিমল হাঁফিয়ে উঠতে থাকে, 'শুরু হলো এঁড়ে তর্ক। কেউ কিছু জানে না, তবু তর্ক করা চাই, আরে বাবা শেলিং হয়েছে এইটে কথা তাতে লোক মারা গেছে, ব্যাস্— তা না পঁচিশ না পঁচাশি নিয়ে তর্ক', ততক্ষণে তর্ক চরমে, সে পালিয়ে বাঁচতে চায় এখান থেকে, 'কোথায় যাবো, ক্লাশও হচ্ছে না' সুতরাং ঠায় বকে থাকতে হয়, কারণ যতক্ষণ ক্লাশ আছে ছাত্র থাক বা না থাক বসে থাকা এখানকার দস্তুর। অবশ্য তর্কের সুরাহা করে দেন অনিলবাবু, 'ক্ষিতীশবাবু, অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড', তারপর শুরু হলো বিস্তারিত আলোচনা—শেল্ কোথায় কোথায় পড়েছে, ভাগ্যিস তখন দোকানে কেউ ছিল না, শীত বলে শহরের ভিড় কম ছিল, বসাক রোডে পড়লে বহুলোক মারা যেতো, ঠিক সময় লাইট না নিভলে আরও ক্ষয়ক্ষতি হতো, কার চেনা দারুণভাবে বেঁচে গেছেন, কার মেশোমশাই-এর বাড়িতে পড়েছে অথচ মারা গেছে পাশের বাড়ির লোক, রাস্তায় লোক ছুটোছুটি করেছে ভয়ে, কারুর মতে লাইট অফ্ করা অন্যায় হয়েছে পাওয়ার হাউস-এর, ছুটোছুটি অন্ধকারের জন্য জখম হয়েছে বেশী ইত্যাদি, পরিমল উত্তর দেয় না, তবে অন্যান্য দিনের মত আজ এখন সে আর তত বিরক্ত না হয়ে কখনো কখনো এদের আলোচনা শুনছে আর ভাবছিল, 'কিভাবে শক্তির অপচয় হচ্ছে আমাদের, শুধুই খোসগল্পে সময় কাটানো, না জেনে সবজান্তার ভান করা, কথার তুবড়ি ছোটানো, নির্মল ঠিক বলতো আমরা হচ্ছি বক্তিআর খিলজি', ততক্ষণে ওঠে

সিভিল ডিফেন্স-এর কথা, বেশীর ভাগ কথা ঐ সংস্থার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, তারপর প'য়ষট্টি সালে এআর-রেড হয়ে যাবার পর সাইরেন বাজার কথা তুলে সবাই নস্যাৎ করে দিতে থাকলে এ-পাড়ার ওয়ার্ডেন চন্দ্রভানু তখন বুঝিয়ে দিতে থাকলেন এবার কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে—কন্ট্রোল-রুমে ডাইরেক্ট টেলিফোন হট্‌লাইন শিলং-এর সঙ্গে, লাল লাইট সাদা লাইট, লোকাল এআর ফোর্স-এর সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন লাইন, তারপর ফোন তুলেই সব ওয়ার্ডকে জানানো ইত্যাদি, পরিমল বেশ মজা পাচ্ছিল, কিছুটা উৎসাহও, তবু সে উৎসাহ তাৎক্ষণিক, কেন না সে জানে চন্দ্রভানুবাবু যতই 'এফিসিয়েন্সি'-র গর্ব করুন না কেন তাঁদের মুরোদ বেশী নয় এবং এবারও প'য়ষট্টি সালের মত কাণ্ড হবে, চন্দ্রভানুবাবু তখন বলে চলেছেন, 'দোতলা হলে শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসা উচিত, সিঁড়ির তলা হচ্ছে বেস্ট, বালির বস্তা দিলে খোলা দিকটা আড়াল করে দিতে হবে, তবে ব্যাফল ওআল হচ্ছে দি বেস্ট, কিন্তু ব্যাফল ওআল আর কজন তুলতে পারে, তবে দেয়ালে সোজাসুজি হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া সবচেয়ে ভালো অবশ্য বুক বাঁচিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে', পরিমল অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে শুনতে কেবলই মনে করতে থাকল, 'এরা সব ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আসল যুদ্ধের দেখা নেই, একদিন শেলিংকেই ভাবছে যুদ্ধ, তবে' সে থমকালো, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি গেরিলাযুদ্ধ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে দু-চারটে বই পড়ে ফেলতে পারতাম, তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে এক্সপার্ট হয়ে উঠতাম এতদিনে।'

বাড়ি এসে তালা বন্ধ দেখে 'কোথায় যে যায়' মীনার উপর এধরনের বিরক্তি এখন তির-তিরিয়ে সারা শরীর ব্যস্ত করলে বন্ধ তালার সামনে মুহূর্তকয় দাঁড়িয়ে 'বেশী দূর যায় নি' ভেবে অপেক্ষা করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে 'এসে গেছি' শুনলে এতক্ষণের টান-টান ভাবটা শিথিল হয়, 'জানো কত বড় গর্ত হয়েছে' তালা খুলতে খুলতে থেমে মীনা আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা বৃত্ত রচনা করে, 'বাব্বাঃ, কি সর্বনাশা কাণ্ড, বাচ্চাটা মা'র সঙ্গে শুয়েছিল, সত্যি ভাবা যায় না', তখন ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সে 'এই সব করা হচ্ছিল এতক্ষণ' বলতে মীনা হেসে ফেলে, 'করছিলাম না মশাই, গিয়েছিলাম', 'গিয়েছিলে', 'তাতে চমকাবার কী আছে, আমি আর মিসেস দাশগুপ্ত মিলে' মীনাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে 'কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশ' বললে মীনার চোখ ছলছলায়, 'না দেখতে গেলেই ভালো ছিল, কত লোক যে যাচ্ছে!' তখন সে 'এবার যুদ্ধ চাও?' তাতে মীনা 'আ—হা, কে বাপু যুদ্ধ চায়' বললে সে হেসে ওঠে।

কিন্তু বিকেলের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই ঠা-ঠা হাসির ভাবটা আপসে চুপসে আসে। শীতের বিকেল, আলো পড়ে এসেছে, রাস্তায় লোকজন কমে আসে স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু আজ যেন লোকই চলছে না, রাস্তা নির্জন প্রায় ফাঁকা, একটা কুকুরও পর্যন্ত নেই, পরিমল হঠাৎ টের পেল তার লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, 'শীতের জন্য বোধহয়' এমন প্রবোধ মেনে চাদর জড়িয়ে নিল ঠিক ক'রে, তবু হাঁটতে হাঁটতে যে নির্জনতার জন্য সে মুখিয়ে থাকত, আজ অযাচিত নির্জনতা পেয়েও খুশি হলো না, 'তবে কি সবাই ভয় পেয়েছে?' তারপর নিজের জড়তা ভাঙার জন্যই মনে মনে বলে ওঠে, 'এ হবেই জানা কথা, সীমান্ত শহরে থাকলে এ ঝামেলা পোয়াতে হবে, সবাই ভেবেছিল এখানে কিছু হবে না, আরে তা কি হয়? উত্তেজনা এক জায়গায় কখনো স্থির থাকে না, জায়গা বদল করে—ছড়িয়ে পড়ে', এমন সময় মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে দেখা, 'কী খবর'-এর উত্তরে সে হাসলে মৃণ্ময়বাবু, 'আর থাকা যাবে না, যা পাইকারি হারে মিলিটারি আসছে', তখন পরিমল 'কী করবেন' ব'লে কোনমতে পাশ কাটাতে

চাইল, মৃন্ময়বাবু ততক্ষণে কাছে, 'কী বুঝছেন ব্যাপার স্যাপার', সে তখন 'কী বলবো বলুন, তবে', একটু থেমে 'বুদ্ধ লাগবে না বলেই মনে হয়, তবে—', মৃন্ময়বাবু হাসলেন, 'ঐ তবেটাই তো মুশকিল করেছে, ওরা বজ্জাতের জাত, সহজে ছাড়বে ভেবেছেন? যা বাবা, লেগে গেলেই হলো, তাড়াতাড়ি মিটে যাবে, তা না—', মৃন্ময়বাবু অনেক কথা বলে গেলেও সে বস্তাপচা পুরনো কথা শুনতে শুনতে এখন অতিষ্ঠ হওয়ায় কোনমতে হুঁ-হাঁ ক'রে সারতে দেখল মৃন্ময়বাবু চলে যাচ্ছেন।

পরের দিন দুটো থেকে কারফিউ শুনে সে একটু অবাক হলেও স্টাফ-রুমে তাতে কেউ অবাক হলো না দেখে চিন্তিত হলো। অনিলবাবু সিগ্রেটে টান দিয়ে বললেন, 'ট্রুপ মুভমেন্ট প্লাস ল অ্যান্ড অর্ডার', তাতে সুবিমল 'কিন্তু কারফিউ ক'রে নর্মাল লাইফ রেস্ট্রিক্ট করা হচ্ছে না?' তাতে অনিলবাবু হাসলেন, 'নর্মাল লাইফের আছেই বা কী? আপনাকে জরুরি অবস্থার কথা ভাবতে হবে', তখন বিকাল, 'অনিলদা, কারফিউ না করলে অবস্থা আরও খারাপ হতো, আমরা হচ্ছি ক্যালাস, বর্ডারের কাছে ওরা চলে এসেছে, আমাদের আর্মিকেও তো অ্যালার্ট থাকা উচিত', তারপর থেমে 'জানেন তো, আমাদের বর্ডারে প্রায় তিন ডিভিশন সৈন্য আছে', 'থ্রি ডিভিশন!' ক্ষিতীশ অবাক হ'লে অনিলবাবু 'ওদের কোড ডিসাইফার করে জানা গেছে, ওরা দারুণ ওয়াকিবহাল', পরিমল মনে মনে বিরক্ত হলেও আপন অলক্ষ্যেই সে এদের আলোচনার একজন উৎসাহী শ্রোতা হয়ে উঠছিল, তখন একটা ভীষণ শব্দ হতে আলোচনার মাথায় যেন মুগুর পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, সে লক্ষ করল সবাই এদিক ওদিক চাইছে, কে প্রথমে উঠে নিরাপদ জায়গায় যাবে তারই অপেক্ষা, ততক্ষণে আরও দু-একটা শব্দ হতে এতক্ষণে অনিলবাবুর মুখে হাসি ফুটল, 'ভয় নেই, আমাদের দিক থেকে' তারপর ঘড়ি দেখে 'উঠুন, উঠুন, একটা বাজতে চলল' বললে সবাই তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠল।

এগিয়ে আসতে আসতে ক্ষিতীশবাবু বললেন, 'সবে রেস্ট্রিকশন হতে শুরু করল, এরপর সারাদিন কারফিউ দিলে বলার কিছু থাকবে না', তারপর নীরবতা, ক্ষিতীশ ও পরিমল হাঁটতে থাকল, এক জায়গায় ক্ষিতীশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে পরিমল চোখের ইশারায় কী জিজ্ঞেস করতে 'দেখছেন বসাক বাড়ির সামনে ট্রাক বোঝাই হচ্ছে' বললে সে 'তাতে কী' বলায় ক্ষিতীশবাবু ফিসফিসালেন, 'পালাচ্ছে, বুঝলেন পালাচ্ছে', 'পালাচ্ছে?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ পালাচ্ছে', ক্ষিতীশবাবুর পালাচ্ছে কথাটা তার বুকে ধাক্কা মারল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি দেখল, 'তাড়াতাড়ি পা চালান, সময় বেশী নেই।' মীনা বলল, 'এবার থেকে তোমাকে বিকেলে বেরুতে দেবো না', 'কেন', 'না, বলা তো যায় না, কখন আরম্ভ হয়' তাতে পরিমল হাসলেও হাসিটা তেমন দানা বাঁধে না, 'সত্যি শেলিং হবে?' এবার তার বুকটা আগের চেয়ে বেশী কেঁপে কেঁপে ওঠে, সে বুঝল তার মনের কোথাও একটা আশঙ্কা বড় হয়ে উঠছে, তৎক্ষণাৎ সেই আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে 'আমি ওদের মত ভীরু নই' ভেবে নিজেকে অন্যদের চেয়ে অনেক অনেক বড় ভেবে আত্মশ্লাঘায় বুঁদ হয়েও স্থির থাকতে পারল না, 'আজ দুদিন হলো কেন এমন মনে হচ্ছে, গভর্নমেন্ট কি কারফিউ এমনি এমনি দিল, কালও নাকি কারফিউ দেবে?' বেশী ভাবতে পারল না, তবে আজ যা সে ভেবেছিল শোয়ার সময় মীনাকে বলবে যে সে আর মেঝেতে শোবে না, সে কথা এখন মেঝেতে শুয়ে বলতে পারল না, মীনা তখন ঘনিষ্ঠ 'বড্ড ভয় করে', তখন তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে 'ভয় কী, এই ভয়ের মধ্যে থেকে সবকিছু জয় করতে হবে' বললে ভারি ক্লান্তি লাগে এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে।

তারিণী বলে, 'না হে অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, বোধহয় শিগ্গী ব্ল্যাকআউট হবে,

আর রাত ন'টার পর থেকে কারফিউ', 'বটে?' 'শ্নেতে পাচ্ছি, তবে অন্যান্য বর্ডারের অবস্থাও খ্ব টেন্স্, বোধহয় লাগলই', তারপর একট্ থেমে তারিণী, 'তুমি যে কিছ্ করছো না, এদিকে সিভিল ডিফেন্স খ্ব কড়াকড়ি শ্র্ করেছে, ব্ল্যাকআউট রিহার্সেল-এ যারা কথা শোনে নি, তাদের কেস তো ঝ্লেছে', তখন সে হাসে, 'আমি তো সিভিল ডিফেন্স-এর বিপক্ষে নেই, তবে বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না', তারপর কিছ্ক্ষণ হাঁটার পর তারিণী বলে, 'অন্তত নিজেদের প্রোটেক্ট্ করতে আপত্তি কী? তোমাদের বাড়ি তো পাকা, আর তোমার তো', মনে করতে চেষ্টা করে, 'তোমার তো খাট আছে, খাট উঁচু ক'রে তার উপর বালির বস্তা চাপালে ডবল সেফ্টি, মেঝের শোবে, তাতে কিছ্ হবে না', 'কী দরকার, বেশ তো আছি' ব'লে তার খেয়াল হয় যে সে মেঝের শোয় এবং মীনাকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে প্রতিদিন ভুলে যায়, 'নাকি ইচ্ছে করেই ভুলে যাই? আমার মনের কোণে কোথাও সমর্থন আছে, নইলে এদের কথায় বিরক্ত হয়েও আমি এদের আড্ডায় গিয়ে বসি, নির্মল বোধহয় ঠিক বলতো, আমার এক্সজার্ট করার ক্ষমতা কম, সত্যি কি তাই?' সে এই সময় নিজেকে দ্ঢ় ক'রে 'আজ আমি মেঝেয় শোবো না, মীনাকে জানিয়ে দেবো আমি সকলের মতো নই' যখন এমন সংকল্প নেয়, ঠিক সেই সময় তাকে জানান না দিয়ে তার ঠিক হাত দশেক দ্রে একটা ভ্যান থেকে মাইক্রো-ফোনের ঘোষণা সচকিত করলে সে শ্নতে পায়, 'যদি কোন বাস বা গাড়িতে থাকেন তবে বাস বা মোটরগাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে থাকলে যা কর্তব্য তাই করন্, যদি সিনেমায় থাকেন আপনার আসনে বসে থাকুন, দৌড়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না', মাইকে ঘোষণা হয়ে চলেছে, আর পরিমল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল একটি ঘোষণার শেষ অংশ শ্নে, 'মনে রাখবেন আপনার একটি ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবনহানি হতে পারে, মনে রাখবেন আপনার সামান্যতম ভুলের জন্য··', সে কান চাপা দিতে চাইলে 'মনে রাখবেন, মনে রাখবেন' 'তবে কি আমি গোঁয়ার্তুমি করছি? আমার না হয় ভয় নেই, কিন্তু মীনা আছে। মীনাকে বিপদে ফেলার কী অধিকার আমার আছে, আর সত্যি তো', সে থমকায়, 'শেলিং-এর ভয় আছে', এবং সেইসময় সে সেদিনকার দ্রিম্-দ্রিম্ আকাশ-বাতাস-কাঁপানো মর্মঘাতী শব্দ শ্নতে শ্নতে আপন অচেতনে শিহরিত হতে থাকল, 'এভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না', ততক্ষণে স্বাভাবিক হতে হতে মনে মনে হেসে বলে ওঠে, 'আসলে আমি ভীর্, ভয়কে ঢাকার জন্য বড় বড় কথা বলি, ভাবি।'

মীনার চিন্তা-ভাবনা:

পরিমলকে দেখলে সত্যি মায়া লাগে, কেমন দ্র্ধর্ষ দ্র্দান্ত জোয়ান লোকটা আজকাল আমার পাশে এসে চুপটি করে শোয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘ্মিয়ে পড়ে, চারদিক যখন ওর সঙ্গে শত্রতা করছে, তখন পারবে কী করে, লোকটা কিন্তু ভয়ংকর ভালো, অনেকসময় ছেলেমান্ষের মত, মাঝে মধ্যে এমন সব কথা বলে যে শ্নলে হাসি পায়, ওর জন্য আমার ভাবনা বাড়ছে, বাবাকে একবার লিখবো কিনা ভাবছি, বাবা এলে খ্ব ভালো হতো, বাবার কথা ও মান্য করে, কিন্তু কী ছাই দেশে আছি, এখন এলেই বা লাভ কী বরং বিপদের সম্ভাবনা বেশী, দেখা যাক্, কী হয়—

'ব্ঝলেন শেলিং-এর ঘা বাঘে ছ্লে আঠারো ঘা-এর মত, ডক্টর দত্ত বলছিলেন, হি ইজ ওরিড অ্যাবাউট দি পেশেন্ট,' ক্ষিতীশবাব্ কথা আরম্ভ করতে অনিলবাব্ সিগ্রেটে টান দিলেন, 'ঠিক, এ তো আর এমনি স্পিলনটার নয়, সৈন্যদের বা আমাদের গায়ে লাগবে আর কিছ্ হবে

না, মানুষকে মারার জন্য এগুলো তৈরী হয়', অনিলবাবু হা-হা করে হাসতে পরিমল কুঁকড়ে যেতে থাকল, 'এত নির্মম হতে পারে লোক? মানুষের ক্ষতি', তার বুক দুড়দাড় করে উঠল, 'এসব জেনেও লোক যুদ্ধের কথা বলে, আজ কারফিউ, কাল ব্ল্যাকআউট, পরশুদিন সাইরেন, তারপর জিনিসপত্রের দাম, ভয়—সন্ত্রাস, বাঁচার অনিশ্চয়তা, যারা মরল তারা জানে না কেন মরল, নাঃ, আমাদের কিছু করার নেই, কয়েকজন দাবাড়ে বোড়ে নিয়ে যে চাল দিচ্ছে তারা যা ভাবছে', তার বুক থেকে দমকে দমকে নিঃশ্বাস বেরুতে থাকল, 'কেউ পালাচ্ছে, কেউ পারছে না, যাদের আছে তাদের ভয় নেই, যারা রিক্ত নিঃস্ব তারা পড়ে পড়ে মার খাবে, নাঃ, আমি পাগল হয়ে যাবো, আমার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠছে, নিরীহ লোকগুলোর জন্য' ভাবতে ভাবতে বিমনা হয়ে যায় 'সত্যি কি শেলিং হবে?' আশ্চর্য সেদিন রাত্রে শহরে 'শেল' পড়লে এবং হতাহতের সংখ্যা এক ও পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সে ঠিক করল অসামরিক প্রতিরক্ষার নিয়মকানুন জানা দরকার, কারণ 'শেলিং' একটা বাস্তব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মীনা খপ ক'রে হাত ধরতে সে 'ছাড়ো ছাড়ো' ক'রে হাতের জিনিসটা পাঞ্জাবির পাশ পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি জানালেও মীনা নাছোড়বান্দা, 'দেখি, পকেটে কী?' 'কী আবার', 'তবে লুকচ্ছো কেন?' 'না মানে এই আর কী', 'আমাকে দেখাতে এত আপত্তি?' মীনার কথায় অভিমান 'কী এমন জিনিস যে আমাকে দেখাচ্ছো না?' 'আর এমন কিছু নয়, একটা' ব'লে পকেট থেকে বের করার মুহূর্তে মীনা 'যাও, যাও—দেখতে চাই না' ততক্ষণে মীনার চোখ সজল হয়ে উঠলে সে ব্যস্ত হয়ে প্যামফ্লেটটা বের ক'রে দেখায়, 'অসামরিক প্রতিরক্ষা—দেখলে তো?' মীনা তখনও আহত, 'গরু মেরে জুতো দিতে এসো না', 'এই দেখো, আচ্ছা-আচ্ছা আমার ঘাট হয়েছে' ব'লে সে হাত জোড় ক'রে মীনার সামনে দাঁড়ালে দুজনে হেসে উঠলে পরিমল বলে, 'আমরা খুব ভুল করেছিলাম', 'ভুল! কেন?', 'হাঁ, দেখো এখানে, কী লিখেছে?', 'কী লিখেছে?', 'লিখেছে—দরজা-জানলার সোজাসুজি থাকবেন না, অথচ আমরা দরজা-জানলার সামনেই শুয়ে পড়েছিলাম', তাতে মীনা দরজা-জানলা ও শুয়ে পড়ার জায়গাটা দেখে 'ঠিক বলেছো, প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে জান দিয়ে ফেলছিলাম', 'অনুপ্রাস', তারপর সে অসামরিক প্রতিরক্ষা নামক পুস্তিকাটি দেখতে দেখতে বলে, 'আমাদের বোধহয়', কথা কেড়ে নিয়ে মীনা বলে, 'দরজা-জানলার কাঁচে কাগজ লাগানো উচিত', সে তখন 'ঠিক ধরেছো' বললে মীনা বলে, 'দেখো এসো একটা কাঁচও অরক্ষিত আছে কিনা?', 'সত্যি?', 'দেখে এসো', পরিমল জানে একটি কাঁচও অরক্ষিত নেই, তবু মনের কোণে একটা অবিশ্বাস চাড়া দিতে সে সমস্ত কাঁচগুলো পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে নিজেই অবাক হলো, 'আমিও তাহলে ভেসে যাচ্ছি, সকলের সঙ্গে আমার কোন তফাত থাকলো না', অতএব তখন সে এগুলোর উপর বেশী নজর দেয়া অযথা গুজব রটনার সামিল, যারা ভীতু তারাই এসব করে ইত্যাদি ভাবলেও পায়ের নীচে মাটি যুক্তির ভিত খুঁজে পাচ্ছিল না, ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল চোরাবালির গর্তে যেখানে 'শেলিং শেলিং' শব্দ তাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে জানিয়ে দিচ্ছিল, 'সামনে বিপদ—সাবধান', সেই সময় মীনা হঠাৎ বলে ওঠে, 'বলবো, তুমি রাগ করবে না তো?' পরিমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করে, 'সত্যি রাগ করবে না?', সে আশ্বাস দিলে মীনা, 'খাটটা উঁচু ক'রে বালির বস্তা দিয়ে মেঝেয় বিছানা করলে খুব ভালো হয়', মীনা থেমে গিয়ে বলে 'রাগ করলে?', পরিমলের বুক আনন্দে নেচে ওঠে, 'আমিও এই চেয়েছিলাম, শুধু লজ্জায় বলি নি, রাত্রে যদি একটু আরামে ঘুমুতে পারি, যদি—', কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না, শুধু প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে মীনার দিকে তাকাল, মীনা সাহসভরে এগিয়ে এলো, 'আমার কথা

রাখবে?' মীনাকে আবার বলতে চাইল, 'তোমার ব্যবস্থা অনুমোদন করি', কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে শুধু বলল, 'দেখি, কী করা যায়', 'না—না, দেখার কথা নয়, জানো', মীনা আরও ঘনিষ্ঠ হলো, 'মিসেস বিশ্বাস বলছিলেন আরও শেলিং হবে', পরিমল হাসতে গিয়ে থামল, 'বেশ তো, অবশ্য—', মীনা রাগ ক'রে চলে যেতে চাইলে সে মীনার হাত ধরে ফেলে, 'আচ্ছা আচ্ছা হবে হবে' ব'লেই 'তাহলে চা দাও' বললে দুজনে হেসে ওঠে, তখন সে 'অসামরিক প্রতিরক্ষা' পুস্তিকাটির আদ্যন্ত না পড়ে 'কামান বা রাইফেল প্রভৃতি গোলা হতে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি' শীর্ষের অধীন অংশগুলো পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেলেও সাত নম্বর অংশটি 'আপনার ঘরে সর্বদা যথেষ্ট পরিমাণ পানীয়, ৩।৪ দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম, একটা টর্চলাইট এবং কিছু মোমবাতি সঞ্চিত রাখা উচিত' বারবার পড়ে ঘরে অত্যাবশ্যকীয় কী কী রাখা উচিত তার একটা ফর্দ প্রস্তুত ক'রে মীনার কাছে বাড়িতে ঐসব জিনিস আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় মীনা অবাক হয়ে 'হঠাৎ এসবের খোঁজ পড়ল যে?' বললে সে মাতব্বরের মত মাথা নাড়িয়ে বলে, 'সময়ে সব বুঝবে, আগে নয়', শুধু এগুলোই নয় সে হঠাৎ অতি তৎপর হয়ে বাড়ি ঘুরে ঘুরে জানলা-দরজার সংখ্যা তাদের উচ্চতা ও প্রস্থ ইত্যাদি টুকে নিয়ে ডাইরিতে কত টাকা খরচ হবে তার একটা আন্দাজে বসে পড়ল, আর যাকে সে ভীরুতা ব্যক্তিত্বহীনতা ইত্যাদি আখ্যা দেয় আজ সেই কাজে নিজেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিমগ্ন করল।

পরের দিন সকালে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলে মীনার 'কোথায় বেরুচ্ছো'-র উত্তরে 'কাজে' বললে মীনা 'কাজে? এখন?' বললে সে 'বাঃ, বেরুতে নেই বুঝি?' তখন মীনা 'বলছিলাম, আজই হঠাৎ কী কাজ পড়ল' তাতে সে 'হঠাৎ পড়লেই কাজের গুরুত্ব বাড়ে' শুনে মীনা হেসে 'তোমার হঠাৎ কাজ' বলার পর সে চুপ থেকে ঘাড়িতে দম দিতে মন দেয়। পাঞ্জাবি পরে ধুতির কোঁচা পকেটে ঢুকিয়ে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' বলতে গিয়ে দেখে যে মীনা ঘর থেকে চলে গেছে, 'মীনা নিশ্চয় রাগ করল' ভাবতে খানিকটা দমে, তবু আজ যা যা কাজ করবে সেই কাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগুতে এগুতে মীনার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা মনে পড়ায় বিচলিত হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একসময় মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দ্বিধাটুকু মিলিয়ে গেলে সে দেখল, ফর্দটা তার হাতে এবং একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'মর্নিং শোজ দি ডে' বোধহয় মীনার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি বিফলতার উদাহরণ, তাই প্রথম থেকে শেষ দোকান পর্যন্ত কেবলই শুনল 'ছিল তো সার, অখন নাই' 'আমাগো নাই, ছিল না' 'যা ছিল বিক্রি হইছে' 'অতুল সাহার দুকানো পাইতে পারেন' ইত্যাদি নেই বা নঙর্থক জবাব। পকেটে টাকা আছে, খরচ করতে চাইলে করা যায় না—পরিমল অবাক হলেও এ ঘটনা অনেক-বার এই তো সেদিন নুন আর চিনি কিনতে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে যুদ্ধের গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়ালে বাজার থেকে বেছে বেছে জিনিসপত্র মন্ত্রের গুণে উধাও হয় 'আর তুমি আমি জরুরি দরকারী জিনিস পাবো না দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম দিয়েও।' বালির বস্তার জন্য হন্যে হয়ে হয়ে অবশেষে মরিয়া হয়ে এক ছাত্রের দোকানে হাজির হলে প্রাক্তন ছাত্রটি সাদরসম্ভাষণ জানাবার পর প্রস্তাব শুনে বিনয়ের সঙ্গে 'সার ছিল তো, অখন নাই, কিত্তা করতাম সার, পি-ডাবু-ডি হক্কল তান লিয়া টান মারে' বললে সে চারধার অন্ধকার দেখে এবার কোন পিছু দরজা দিয়ে বস্তা জোগাড় করবে তা ভাবতে ভাবতে যখন স্টাফ-রুম-এ পৌঁছয়, তখন তা বেশ জমজমাট।

অনিলবাবু,—আসলে টার্গেট ছিল চিন্তাপুরের পেট্রোল পাম্প, ইলেকট্রিক সাপ্লাই,

লক্ষ করে দেখবেন ঠিক ঐ লাইন দিয়ে পঞ্চাশেক গজ এধার-সেধার শেল পড়েছে। ওরা টার্গেট ছাড়া একটা শেলও বাজে খরচ করবে না, লজিসটিকস-এ আছে যে—, তার কথা কেড়ে নিয়ে বিকাশ—যাই বলুন, পেট্রোল পাম্প টার্গেট হবে কেন বহু পাম্প আছে, আর ওখানে ক' গ্যালনই বা পেট্রোল আছে? আর ওটা তো—', তখন ক্ষিতীশ,—বিকাশবাবুর কথা মানতে পারতাম, যদি দেখতাম যে শেলগুলো অন্য জায়গায় পড়েছে। অনিলবাবু,—আমিও তাই বলতে চাইছি, আমাদের সহায় সম্পত্তি নষ্ট করার জন্যই ওদের এই আক্রমণ, তা যদি না হতো তবে—, তখন বিনোদবাবু ফিসফিসিয়ে,—আমি কিন্তু অন্যকথা শুনেছি। সবার দৃষ্টি এবার বিনোদবাবুর উপর এবং সেই দৃষ্টিতে 'কী কী' রব। বিনোদবাবু জুত ক'রে বসেন,—'আসল টার্গেট ছিল ইওথ হোস্টেল।' উপস্থিত সকলের মধ্যে কয়েকজন—কেন? বিনোদবাবুর সারা মুখে গর্বের হাসি—ওখানে বাঙালী পাইলট আছেন কয়েকজন, মুক্তিবাহিনী এবার এআর ফোর্স চালু করবে তাই, তখন শেখরবাবু,—জায়গাটা ঠিকই ধরেছেন, তবে টার্গেট ছিল ইওথ হোস্টেলের উল্টো দিকের সাদা বাড়িটা, শেখরবাবু হেসে,—ওখানে মুক্তিবাহিনীর সি-এন-সি এসেছিলেন কনফারেন্সে।

তারপর লেগে যায় তর্ক, আগে হ'লে পরিমল পালিয়ে আসার চেষ্টা করতো, নইলে এরা মূর্খ, নির্বোধ ভেবে আপন জগৎ তৈরী ক'রে নিজেকে এদের চেয়ে অনেক বড় সংশুদ্ধ ভেবে কৃমিকীটের প্রতি লোকে যেভাবে তাকায় তেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে নিজের গুণপনায় মশগুল হয়ে যেতো, ভুলেই যেতো যে সে কৃমিকীটের মধ্যে বাস করে, চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। চাকরির বাজার আজকাল এমন হয়েছে যে নিজের সহকর্মীদের তুচ্ছ ভাবলেও তাদের সঙ্গে পাশাপাশি বসতে, নানা আলোচনাও করতে হয় শিক্ষাবিষয়ক। তার অবশ্য এখন কৃমিকীট ভাবার অবকাশ নেই, বরং 'এ বিষয়ে আমি কত কম জানি' এমন হীনমন্যতা তাকে ক্রমে চেপে ধরে, 'সত্যি তো, আমি এদের চেয়ে কিসে বড়, নিজে ভাবি বলে? কেউ কেউ হয়তো সামনাসামনি আমাকে খাতির করে, কিন্তু সে কি আমার প্রিন্সিপল-এর জন্য? আমি যদি সত্যি বড় হতাম, নিজে সৎ ও বিবেকবান, তবে নিশ্চয়ই অন্যকে এত হেয় মনে করতাম না, তবে কেন আমি নিজেকে বড় ভাবি, এ কি আমার হামবড়া ভাব, নাকি মীনা যাকে বলে বেশী বেশী, বোধহয় পরকে তুচ্ছ করলে নিজের দৈন্য ঢাকা সহজ হয়', ভাবতে সে দেখল, আলোচনা তখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, অনিলবাবু টেবিল চাপড়ালেন, 'আলবত যুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র সমাধান, টুথ ফর টুথ, শরণার্থীরা এমনিতে ফিরে যাবে না, যারা মেরে তাড়িয়েছে আমাদের দায়িত্ব তাদের মেরে তাড়ানো, পাষণ্ড নিধনই হচ্ছে কেবল পথ', তখন ক্ষিতীশ, 'তাছাড়া ওরা আমাদের শুধু মেরেই যাবে, আমরা গাল পেতে দেবো—এটা যিশুর ধর্ম, কিন্তু আমরা যিশু নই, আমরা যোগ্য উত্তর দেবো, এই একটা বিষয়ে আমরা সকলে একমত, ঐক্যবদ্ধ হয়েছি', তখন বিকাশ একটু হেসে 'তবে যুদ্ধ ঘাড়ের উপর না হলে ভালো হয়', সকলে হেসে উঠলেও আবহাওয়া উত্তপ্ত থাকে, অনিলবাবু বলছেন, 'রিফিউজিরা এলো কেন বলুন, গণহত্যা, মিলিটারি অ্যাকশন না করলে কে ঘর ছেড়ে আসতো, ভেবেছিল তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের ইকনমি ব্রেক করবে, ওটা ওদের ইন্টারন্যাল প্রব্লেম, কিন্তু লাখে লাখে লোক এলে এটা আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, এবং আমাদেরও বন্দোবস্ত করতে হয়, মিলিটারি শাসনের অবসান না হলে', সে সময় পরিমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, 'আমরা কিন্তু পলিটিক্যাল সলুউশনের পক্ষে, মিলিটারি অ্যাকশন—', বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিকাশ, 'যারা কোঁতকা ছাড়া কিছুই বোঝে না, তাদের কোঁতকাই দিতে হয়, অনেক ধৈর্য ধরেছি আমরা, ভারত

সর্বদা শান্তি চায়, এর আগেও আমরা শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু ওদের কাছে শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, দেশে দেশে আমরা দূত পাঠিয়েছি' বিকাশ বলে চললে পরিমল মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে ভাবতে থাকল 'ঠিক করেছি আমরা ধৈর্য ধরে, কারণ ব্যাপারটা রাজনৈতিক, রাজনৈতিক সমাধানই এর হওয়া উচিত', বিকাশ তখন অনেক সন তারিখ বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত ক'রে তার বক্তব্য অতি সুন্দর ভাষায় উপস্থিত ক'রে চলেছে, বিকাশ হয়তো আরও বলতো সরিৎবাবু হন্তদন্ত ভাবে ঢুকতে এতক্ষণের তেজোদৃপ্ত উষ্ণ আবেগপূর্ণ আবহাওয়া হঠাৎ কেমন অন্য এক উত্তেজনায় ভরে উঠল অনিলবাবুর আর্তনাদে, 'কী হয়েছে সরিৎবাবু, এত হাঁফাচ্ছেন?' সরিৎবাবু প্রথমে কোন কথা না বলে একটা চেআরে আসন নিয়ে মুহূর্তকয় চুপ থাকলেন বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক করার জন্য, তখন ক্ষিতীশ 'বলবেন তো কী হয়েছে', তাতে সরিৎবাবু একবার ভালো করে তাকিয়ে ঘরে কোনও অবাঞ্ছিত লোক নেই দেখে জোরে অথচ ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আজও শেলিং হতে পারে', 'শেলিং!' যেন সমবেত আর্তনাদ, পরিমল বুঝতে পারল 'শেলিং' শব্দটা শুনে তারও বুক টকাস্ ক'রে দুলে উঠল। 'মেজর চৌধুরী বলছিলেন', সরিৎবাবু বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, 'এটা জিটারিং, মিলিটারি এথিক্স্-এ এর কোনও স্থান নেই, আর্মি নার্ভাস হয়ে পড়লে এধরনের পাগলামি করে, আর যত দুর্বল হয়ে পড়ে তত পাগলামির মাত্রা বেড়ে যায়, মেজর চৌধুরীর মতে আমাদের এলার্ট থাকা উচিত।' সমস্ত ঘর স্তব্ধ, সকলের মনোযোগ সরিৎবাবুর কথায় অর্পিত, ঐ 'জিটারিং' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট না জানা থাকার দরুন সকলের চেতনা এমনভাবে হরণ করে যে উপস্থিত কেউ প্রশ্ন তুলল না 'সিভিলিআন' মেরে ওদের লাভ কী। অনিলবাবু কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, বিকাশ নির্বাক, ক্ষিতীশ বিনোদবাবু—অসহায়ের মত তাকাচ্ছেন এধার-সেধার, আর পরিমলের বুক টকাস্-টকাস্ ক'রে দুলে উঠছে 'শেলিং শেলিং'। অনেকক্ষণ সবাই চুপ, শেলিং-এর সেই কান-ফাটা দ্রিম্ দ্রিম্ কখনো বা কড়-কড় শব্দ ও সেইসঙ্গে আতঙ্ক মৃত্যু ভয় বাঙ্কার ট্রেঞ্চ সিঁড়ির তলা অথবা নিরাপদ স্থান ও সেইসঙ্গে তৎসমূহ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য কন্টযুক্ত হয়ে উপস্থিত ভাবৎকে মুহূর্তমধ্যে কোনও এক অজানা রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে সমস্ত আবেগ অনুভূতি নিমেষে হরণ ক'রে এক অদ্ভুত জীবে পরিণত করে, যার সঙ্গে মানুষের বোধহয় কোনও যোগ নেই, 'কিন্তু আমি কেন এমন হয়ে যাচ্ছি, শেলিং হয়েছে, ব্যাস্ আমি আমার সমস্ত কিছু বর্জন ক'রে এদের মত গুজব-রটনাকারী বাচাল হয়ে যাবো? যে যা খুশি বলছে, আর আমি মেনে নিচ্ছি। আমি একটা অপদার্থ, আমাকে উঠতেই হবে এই অবস্থা থেকে', পরিমল ফুঁসে উঠলেও তেমন জোর পায় না, 'আজ যদি শেলিং হয়' ভাবতে বালির বস্তা জোগাড় করার তাগিদটা হঠাৎ বেড়ে ওঠায় ক্লাশের কথা মনোরম আড্ডার কথা ভুলে ছুটল ওআর্ডেন-পোস্ট-এর দিকে। সমীরবাবু তাকে 'আশুতোষ স্টোর্স'-এ গিয়ে তার নাম করে চাইলে হয়তো সস্তা দামে কিছু বালির বস্তা পাবেন ব'লে আশ্বাস দিলেন। আশুতোষ স্টোর্স-এ গিয়ে সমীরবাবুর কথা বলায় ভদ্রলোক তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আছে, তবে কাল নিতে হবে', 'আজ নয় কেন?', 'একটু অসুবিধে আছে', তারপর থেমে বললেন, বালি জোগাড় করেছেন?' তখন খেয়াল হলো শুধু বালির বস্তা নিলে কাজ হবে না, সঙ্গে বালি চাই, 'কিন্তু কোথায় বালি পাবে' ভাবতে সে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'ক-টা বস্তা?' পকেট থেকে কাগজ বের ক'রে দেখল, 'পঞ্চাশটা হলেই চলবে', 'পঞ্চাশ' ভদ্রলোক কী ভাবলেন 'তাহলে এক ট্রাক হলেই চলবে', তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'এড্ভান্স করবো কিছু?' ভদ্রলোক হাসলেন। 'সব মিলিয়ে কত হবে' প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক

'পঞ্চাশ প্লাস ত্রিশ মোট আশি', পরিমলের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, 'আশি!' ভদ্রলোক ফিস-ফিসালেন, 'সমীরবাবুর খাতিরে কম করলাম, নইলে 'পার' বস্তা হতো দেড়টাকা আর বালি চল্লিশ', সিমেন্টের বস্তা এবং বালি এখন তার কাছে চাল-ডালের মতই মূল্যবান এবং অপরিহার্য, এবং এই দুটি জিনিসই এখন দুর্লভ, হয়তো আরও দুর্লভ হয়ে এমন হবে যে দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম দিয়েও জিনিস মিলবে না, তাই সে আর উচ্চবাচ্য না ক'রে চল্লিশ টাকা বের ক'রে 'আর কিন্তু প'য়ত্রিশ দেবো' বলায় ভদ্রলোক 'আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে সমীরবাবুই কম পাবেন' শুনে সমীরবাবু এইসব ব্যবসায়ে জড়িত জেনে মুহূর্তে 'টাকা ফেরত নিয়ে নেবো' ভেবে যখন চাইতে যাবে তখন 'সমীরবাবু না হলে অন্য বাবু জড়িত থাকতেন' মনে হলে 'কাল কোন সময় পাঠাবেন' জিজ্ঞেস করলে 'ধরুন দুপুরের দিকে' বললে সে বাড়ির ঠিকানা ও যাওয়ার রাস্তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে 'একটু সকাল সকাল পাঠাবেন' ব'লে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা দিতে একটা পরম নিশ্চিন্ততা বোধ করল, যেন এই প্রথম অনেক দিন বন্দী থাকার পর আকাশ বাতাস প্রকৃতি মানুষের স্পর্শ পায়। এই আনন্দ ও খুশিকে মনে রাখা ও মীনাকে তাক লাগাবার জন্য সে বাজার থেকে চিতলমাছের পেটি নিয়ে বাড়ি হাজির হ'লে মীনা খুশির বদলে বিরক্ত হয় 'অসময়ে কেন যে আনো', পরিমল হেসে বলে, 'হঠাৎ আসছিলাম, দেখলাম, তোমার কথা মনে পড়লো তাই', মীনা ভঙ্গি ক'রে 'ঢঙ্ দেখে বাঁচি না', সে উত্তর না দিয়ে কেবল হাসে। মীনা মাছ কুটতে কুটতে বলে, 'জানো, সোমবার থেকে সব রেশন হয়ে যাচ্ছে', 'নাকি?' একটু থেমে, 'ভালোই হলো, জিনিস পাওয়া যাবে', মাছ কোটা থামিয়ে, 'কি ভালো হল শুনি? রেশন কে আনবে শুনি?', 'কেন আমি?', 'তুমি? তাহলেই হয়েছে', 'কেন, আমি কি কাজ করি না?', মীনা হেসে 'ঠেলায় পড়ে, ঠেলার নাম বাবাজি, এই শর্মার জন্য', তারপর মাছ কোটা ও ধোয়া হয়ে গেলে 'জানো আজ নদীতে মিলিটারিরা নৌকো ছেড়েছিল', 'নৌকো!', 'হ্যাঁ, মিসেস দাশগুপ্ত বললেন ওরা নাকি নৌকো দিয়ে পুল বানাবে, ওপারে ট্যাঙ্ক নিয়ে যাবে', পরিমল চমকায়, 'ট্যাঙ্ক!', 'হ্যাঁ মিস্টার দাশগুপ্ত নাকি বলেছেন', 'তাহলে এদিকটাও আর সেফ্ থাকল না', তাতে মীনা 'কী করবে, অভয়পুরে ঘর দেখবে নাকি একবার', পরিমল হুঁ-হাঁ কিছু না ব'লে এদিক দিয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে গিয়ে কোথায় যুদ্ধ হতে পারে অথবা ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়া মানে যুদ্ধ আসন্ন ভেবে এতদিন এদিকে গোলাগুলির সম্ভাবনা ছিল না-র নিশ্চয়তার ভিতে ফাটল ধরলে কালকেই অভয়পুরে কি ভাবখোলায় বাড়ি খালি আছে কিনা দেখার কথা মনে হলে, 'আরে, কালই তো বালির বস্তা দিয়ে যাবে', হঠাৎ মনে পড়ায় বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে 'পথের পাঁচালী'খানা টেনে নিল।

সেদিন রাত্রে অবশ্য 'শেলিং' হয় না, কিন্তু উদ্বেগের জন্য বারবার ঘুম ভেঙে গেছে, বিশেষ করে সীমান্তের কাছে এ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে গোলাগুলির শব্দ আছড়ে পড়ছিল এখানেও, 'আগে', পরিমল মনে করতে পারে, 'এই শব্দ শুনে আমাদের ঘুম আরও গভীর হতো, আমরা ঠাট্টা করে বলাবলি করতাম কাল বেশ হচ্ছিল, কিন্তু এখন ঐ শব্দ আমাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে', সে খাটের ফ্রেমের মধ্যে মীনার ঠিক পাশে শুয়ে থাকলেও এখন বড্ড একা বোধ করে। যে কোন শব্দে কান খাড়া হয়ে ওঠে আচমকা, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে আশঙ্কা, নিজের মুখ দেখতে পায় না, তবু বোঝে হৃদপিন্ড-র দ্রুত দোলানিতে, এখন যে কোনও শব্দে আঁতকে ওঠে, মীনার হাত থেকে বাটি পড়ে যাওয়ার বা দরজা-জানলা বন্ধ করার শব্দে সন্ত্রস্ত হলে মীনা হাসলে সে লজ্জা পেলেও 'তুমিও চমকাও' বলতে মীনা 'না মশাই, তোমার মত নই' বলায় সে তক্কে-তক্কে থেকে আচমকা একটা শব্দ করলে মীনা চমকালে

চেপে ধরে, মীনাও সম্প্রতি জানায় যে আজকাল শব্দ শুনলে আগের মত উপেক্ষা করতে পারে না। 'আমি নিজেও শব্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি, অথচ আগে—', এধরনের আত্ম-সমালোচনা যথেষ্ট উপাদেয় না হওয়ায় সে 'আমি আগের মতই আছি' ভেবে আনন্দ পায়, এবং তখন 'সরিৎবাবুকে ধরতে হবে, বলতে হবে, কি হলো মশাই আপনার ফোরকাস্টের' ভেবে সুখ কুড়তে না কুড়তে সীমান্ত থেকে ভেসে আসা কখন কদাচ বিকট আওয়াজ যা জানলা-দরজায় ঝনঝনানি তাকে যেন কান মলে দিচ্ছিল, 'পরের পেছনে কাঠি দিও না, সামনে বিপদ।' সে সুতরাং সুখদুঃখের অতীত এক জীব হয়ে ঘুমের কোলে গা এলাতে চাইলেও নিদ্রাদেবী তাকে কিছুতে ঠাঁই দিল না, আর একটা দুটো তিনটের পেটা ঘন্টার শব্দ ও ঘুমন্ত মীনার শ্বাস-প্রশ্বাসের সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ ও ভেসে আসা শব্দের থেকে থেকে বিকট প্রচণ্ডতা তাকে মানুষী ক'রে তুলছিল, 'যদি বেঁচে থাকি তাহলে সব দেখা সাথক হবে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, আমাদের ভীরুতা, নাকি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে কামান মর্টারের নিরন্তর গর্জনে', তারপর মীনাকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেখে 'আ-হা, মীনা কেমন ঘুমুচ্ছে, কেমন নির্বিকার নিশ্চিত, শিশুর সরলতা ওর চোখে-মুখে, আমি কি সেই সরলতা নিশ্চয়তা খুঁজে পাবো না কোনদিন?' এবং এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল, তখনও অবিরাম গোলাগুলির শব্দ সীমান্তর কাছে ও দূরে, অথচ সেই শব্দ এখন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো না।

পরের দিন বাজার তেমন জমজমাট না দেখে 'কাল রাতে নিশ্চয় কোথাও গোলা পড়েছে' ভেবে সে তার ধারণা ঠিক কিনা যাচিয়ে নিতে তরকারিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করায় 'কাইল পড়ছিলো রামেন্দ্রনগরে' উত্তরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় এইজন্য যে রামেন্দ্রনগর শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, তৎক্ষণ কেশববাবু কাছে এসে 'বাড়ি ঠিক করেছেন' জিজ্ঞাস করায় ঘাবড়ালে 'সময় থাকতে সরে যান, আমি জিরাগ্রামে একটা ঘর ঠিক ক'রে রেখেছি' বলায় আবার বুক দুলে ওঠে 'শেলিং শেলিং', এবং সেই সময় একটা দুম শব্দ হতে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি লেগে যায়, কে কোথায় ছিটকে গেল তার ঠিক নেই, অথচ সেই শব্দটি যে 'শেলিং'-এর নয়, তা বুঝতে মুহূর্তকয় লাগলমাত্র, আবার বাজার জমে উঠলে সে খানিক অবাক হয়ে 'জীবন বোধহয় এরকম', এরকম চিন্তা করে বেগুনের দাম দেয়ার জন্য নুইতে 'স্টক করুন, পাবেন না' শুনলে পর সে দোকানীকে পয়সা দিয়ে হাসল, তখন অনিলবাবু বললেন, 'অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। আমি তো মশাই সরে গেছি, বাল-বাচ্চাকে তো বাঁচাতে হবে, আর বাঙ্কারের যা ছিরি, গোলায় শব্দেই ভেঙে পড়ে, তারপর মাথায় টিনের চাল', একটু থেমে ঘনিষ্ঠ হয়ে, 'আপনি কোথায় ঠিক করলেন? না-না, গোলার সঙ্গে বীরত্ব খাটে না, তাছাড়া আমাদের শাস্ত্রেই আছে যে পালায় সে বাঁচে, কি বলুন, হ্যাঁ-হ্যাঁ', অনিলবাবু যা বললেন, তাতে আরও দমে গেল পরিমল, 'তবে কি জিরাগ্রামের দিকে খোঁজ করবো? বাকির বস্তা কি—', প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে দেখল, অনিলবাবু নেই, আর সারাটা পথ এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে বাড়ি পৌঁছে মীনা যখন বলে 'পরেশবাবুরা চলে যাচ্ছেন মাখনপুরে', তখন তার শরীর থেকে লহমায় শক্তি অন্তর্হিত হতে সে চোখের সামনে কয়েকটা হলদে হলদে বৃত্ত ফুটতে ও ফাটতে দেখলো, কয়েক মুহূর্ত, তারপর কোনক্রমে সামলে নিয়ে বাজারের থলি নামিয়ে রেখে 'তুমি কী বল?' বলতে মীনা 'তুমি যা ভালো বোঝো, তবে' মীনা একটু থেমে 'আমার মতে কোথাও ছুট ক'রে যাওয়া ঠিক নয়, পরিস্থিতি যদি সেরকম হয় তবে নিশ্চয় যাবো, কিন্তু মিছিমিছি যাওয়া-যাওয়ি করলে নিজেদের কষ্ট বাড়বে' বলায়

পরিমল 'হ্যাঁ, তা ঠিক' বললেও মীনার কথায় সায় দিতে পারে না, 'মেয়েরা ঠিক পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝে না, না হলে অবস্থা যা হয়েছে, তাতে সামান্য কষ্ট হবে, ব্যাস', সবটুকু ভাবতে পারল না পেটের মধ্যে একটা খিঁচ ধরতে বুঝল 'কলিক পেন' মাথাচাড়া দেবে আবার। বাজার থেকে ফিরে চা খাওয়ার অভ্যেস তার, কিন্তু আজ সে চা খাওয়ার স্পৃহা বোধ করল না, অথচ মীনার হাত থেকে চা নিতে নিতে পেটে খিঁচ ধরার খোঁচা উপেক্ষা ক'রে অতি আরামে চা-এ চুমুক দিতে গিয়ে থামল, 'মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, ভিয়েৎনামে যেমন, কিন্তু ভিয়েৎনামের যুদ্ধ হচ্ছে স্বাধীনতার যুদ্ধ, বিদেশীকে হটাবার লড়াই, যেমন মাইকেল দেখিয়েছিলেন রাবণের ক্ষেত্রে, কিন্তু আমি যুদ্ধের নামে ভয় পাচ্ছি কেন? মুক্তিসংগ্রাম ন্যায় যুদ্ধ, তাতে আমার নৈতিক সমর্থন আছে, কিন্তু দুদেশের যুদ্ধ হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে, আমরা শান্তি চাই, কিন্তু ওরা লড়াই বাধিয়ে মুক্তিসংগ্রামে বাদ সাধছে, তবু কেন আমি যুদ্ধ সমর্থন করতে পারি না', একটা সংশয় ক্রমে মাথাচাড়া দিতে থাকলে 'বয়স বাড়ছে ব'লেই বোধহয় আমি স্থবির হয়ে যাচ্ছি, কলেজে পড়ার সময় এই আমি কত মিছিলে যোগ দিয়েছি, স্লোগান তুলেছি, কত তর্কবিতর্ক মিটিং, আমাদের সামনে তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কাকে পরোয়া করেছি আমি', ভাবতে থমকায়, 'কিন্তু তখনও আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, শান্তির সপক্ষে আন্দোলন করেছি, তবে কি আমি পালটাই নি? আমরা মতামতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র তাহলে আবিষ্কার করা যায়?' ভাবতে ভাবতে সে অস্থির হয়ে ওঠে, তবু সেই ভাবনার মধ্যে একটা প্রভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'আগে আমি যুদ্ধবিরোধী ছিলাম, এখনও, তবু আগে ভয় পেতাম না, এখন পাই', তখন সে আবার পুরনো পরিমলকে ফিরে পেতে গিয়ে দেখে বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে, 'না, যুদ্ধ ভালো নয়' এমন কথা স্ফুট হতে গিয়ে ঘন ঘন চুমুক দিল চা-এ।

তখন স্টাফ-রুম জমজমাট। অনিলবাবু সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে বলে চললেন, 'ঐজন্য টিক্কা খাঁ-কে সরিয়ে নিয়াজীকে নিয়ে এসেছে। নিয়াজীর স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে বর্ডার টাইট ক'রে ক্যান্টনমেন্টগুলোকে রিইনফোর্স করা, আর ইন বিটুইন কিছু কিছু ডিফেন্সিভ লাইন রাখা, এতে নিয়াজীর ধারণা মুক্তিফৌজ ঢুকতে পারবে না, অথচ রিফিউজি পাঠানো চলবে, কিন্তু লাভ হবে কি? হাজার মাইল তফাতে থেকে হাজার তিনেক মাইল সাপ্লাই লাইন দিয়ে', অনিলবাবু এবার অনেক 'টেকনিক্যাল' শব্দ ব্যবহার করলেন যার মানে বুঝতে পরিমলকে যথেষ্ট ভাবতে হয়, তবু সব মানে পরিষ্কার হয় না, কারণ তখন তার চোখের সামনে বাংলাদেশের ভূগোল অস্পষ্ট এবং পূর্ববঙ্গের মানচিত্র উজ্জ্বল নয়, কিন্তু অনিলবাবু যতই তেজোদৃপ্ত হতে থাকলেন ততই সে অবাক হয়ে উঠল, 'আশ্চর্য এই লোকটাই তাকে বাজারে কী বলেছিল, আর এখন, আজকাল এরাই বাজিমাত করে', ইতিমধ্যে সরিৎবাবুকে ক্লাশের পর ঘরে ঢুকতে 'এবার ধরবো সরিৎবাবুকে' ভাবার পর কেমন নিরাসক্ত হয়ে পড়ে, 'কী দরকার, যে যা খুশি বলুক, তাতে আমার কী? এই ব্যবস্থায় এর চেয়ে কী ভালো আশা করতে পারি, যে যত কপট সে তত দেশপ্রেমী, তৎপর লোক', তখন পকেটে 'লিভ অ্যাপলিকেশন'টা খচ খচ করলে মনে পড়ে যে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, কারণ বালির বস্তা আসবে।

কুলির সাহায্যে অনেকগুলো ইট জোগাড় ক'রে প্রথমে খাট উঁচু করল, তারপর পাটাতনগুলো যথাস্থানে বসিয়ে পাটাতনের উপর চাটাই পেতে একবার খাটের তলায় ঢুকে কুলিকে 'ঠিক হ্যায়'র উত্তরে 'জি বাবু' শুনে এবার কুলিদের বালির বস্তাগুলো কিভাবে সাজাতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে জানলার সামনে বস্তা রাখার জন্য খাবার টেবিল টান দিতে মীনা 'হা হা'

করে উঠলে সে 'টেবিলের উপর বস্তা রাখবো'র উত্তরে মীনা 'না-না', ওটা ভেঙে যাবে' বললে সে 'তবে কি জানলা আন্-প্রোটেকটেড থাকবে' বলায় মীনা একটু ভেবে 'ইটের ওপর রাখো না' বলতে 'ইট কোথায়' জবাবে মীনা এগিয়ে এসে 'ঐ দেখ' বলে বাড়ির খানিকটা পেছনে বুনোলতায় ঢাকা একটা ইটের পাঁজরা দেখাতে 'কার না কার' তাতে মীনা হেসে 'সরকারের' বলতে ঠিক করল, টেবিল না দিয়ে ইট সাজিয়ে তারপর বস্তা রাখবে। ততক্ষণে খাটের উপর বালির বস্তা রাখার কাজ শেষ, পরিমল কুলিদের 'ঠিক হুয়া' জিজ্ঞেস করায় কুলিরা মাথা নাড়ালে সে মীনাকে দেখে যাবার জন্য বললে মীনা দেখে 'ঠিক আছে' বলতে হেসে ফেলে, 'দুর্গ', একেবারে ব্যুহ, বোমাও তুচ্ছ হয়ে যাবে', তখন সে আবার কুলিদের নিয়ে ইটের পাঁজরা থেকে ইট আনিয়ে ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিকমত বসিয়ে বালির বস্তা রাখার কাজ শেষ ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 'এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, শেলিং হোক বোমা পড়ুক, এবার শান্তিতে ঘুমুতে পারবো', কুলিদের বিদায় দেবার পর বাড়িতে জরুরি অবস্থার জন্য কী কী রাখা দরকার তার ফর্দ বের ক'রে দেখে নিল, কী কী নেই, এবং কোনটা এখন না আনলেই নয়, তখন সে অতি-দরকারী জিনিসের একটা আলাদা ফর্দ ক'রে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরুতে যাবার মুহূর্তে 'কিছু দরকার আছে' বলায় মীনা কোথা থেকে হাজির হয়ে 'এখন বাজারে যাচ্ছো' বললে সে বলে, 'কেন', 'না এই আর কি, এসময় বাড়ির বাইরে যাবে তাই', পরিমলের বুক কেঁপে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে 'শেলিং শেলিং' শব্দটা বুকের মধ্যে টকাস্-টকাস্ ক'রে দুলে ওঠে। কিন্তু এখন না বেরুলে মীনা তাকে ভীরু ভাববে মনে হলে সে 'বেশী দূরে যাবে না, দু-একটা কেনাকাটি ক'রে' বলায় মীনা বলে, 'তবে একটা কনডেনস্ড্ মিল্ক্ এনো, আর হ্যাঁ, একটা গ্রিন লেবেল', সে দুটি ফর্দভুক্ত করে যখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো তখন 'যাবো কি যাবো না' এই দ্বিধায় ভুগছে, তবু এসময় ফিরে গেলে ঠিক হবে না ভেবে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে এগিয়ে চলল শহরের কর্মচঞ্চল অঞ্চলে চক-বাজারের দিকে। কিছুদূর এগুতে টের পেল আজ রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় শূন্যের পর্যায়ে, 'শেলিং-এর জন্যই মানুষ রাস্তায় বড় একটা বেরয় না' ভেবে কিছু আশ্বস্ত হতে 'আজ শনিবার সেজন্য দোকানপাট বন্ধ' মনে হলে আরও ভরসা পায়, তবু লোক চলাচল কম থাকায় এবং ক্রমে আলো পড়ে আসায় নিজেরই কেমন অস্বস্তি ঠেকতে থাকল, 'মীনার কথা মানলেই পারতাম, কী হতো, না হয় সে মনে মনে হাসতো, কিন্তু একবার যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন'—অতএব সে এবার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগুতে থাকল, তখন চক-বাজারে আলো এবং ভিড়, তবু চারধার দেখে সে বুঝতে পারল—অন্যান্য সময়ে এখানে যে আন্দাজ ভিড় থাকে, আজ তার সিকির সিকিও নেই, বুক ঢিপঢিপ ক'রে উঠল এর উপর বন্ধ কয়েকটা দোকানের দিকে তাকিয়ে, কারণ সেখানে অন্ধকার, আর অন্ধকারেই যত ভয় লুকিয়ে ওত পেতে থাকে। পুরনো অভ্যাস বশে সে ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিজের বিমূঢ় অবস্থাকে কাটাবার চেষ্টায় ইচ্ছে করেই একটা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, 'হরলিক্স আছে ?' এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝল, তার হৃত বল ফিরে পাচ্ছে, অতএব ফর্দ অনুযায়ী কেনাকাটি সেরে যখন কন্-ডেন্স্ড্ মিল্ক্ দিতে দোকানী দেরি করছে তখন 'তাড়াতাড়ি দিন, এখুনি বাস আসবে'-র উত্তরে 'বাস কই পাইভেন সার, চারটায় বন্ধ হয় আইজকাইল' শুনে 'চারটের বন্ধ হয় ?' উত্তরে 'হাঁ' শুনে এবার সত্যি যেন সে চেতনা হারাবে। 'একে রাস্তা ফাঁকা, তায় বাস বন্ধ', পরিমলের বুকের মধ্যে শেলিং-এর ধুপধাপ শব্দ ওঠে, 'আজ আর পরিত্রাণ নেই, কেন যে মরতে এলাম, মীনা যা ভাবতো ভাবুক' ততক্ষণে দোকানীর হাত থেকে জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়

'সার, পঁইসাটা' শুনে লজ্জা পায়, 'ও, সরি', তারপর দাম চুকিয়ে যখন রাস্তায় নামে তখন চক-বাজারে ভিড়, কিন্তু তার মনে হলো—এতক্ষণ তবু যে কজন ছিল, এখন তার অর্ধেকও নেই, সে গুনেগুনে দেখল সাত কি আটজন মানুষ রাস্তার উপর কেউ দাঁড়িয়ে কেউ জিনিস কেনায় ব্যস্ত। তারপর সে চক-বাজার পেরিয়ে সাউথ রোডের কথা চিন্তা ক'রে 'আজ রিকশায় যাবো' ভাবলে তখন ভুলে গেল যে সে রিকশায় না-চড়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কারণ রিকশা-ওয়ালারা ভাড়া নিয়ে খিটিমিটি করে। রাস্তার এধার-সেধার কোনদিকে রিকশা না পেয়ে আবার সে খানিকটা বিহ্বল হয়, 'এখন যদি শেলিং হয়', ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার সামনের দিকে দু-পাশে কোথায় আত্মরক্ষা করা যায় তার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হলে 'এই সরকারকে আমরা ভোট দি, এত বড় একটা বিপদ, অথচ পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই, একটা ট্রেঞ্চ বা দেয়াল তুলে দিলেই তো হতো, নেতাদের কেবল বড় বড় কথা—জনসেবা, জনকল্যাণ' এবং এইসব চিন্তা করতে করতে মুহুর্মুহু একটা শব্দ ও তারপর ফেটে পড়ার বিকট চীৎকার, 'আর তাহলে আমি রাস্তার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বো' দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসতে-ভাসতে চলতে থাকলে বার দুই হোঁচট খেলে 'আমি এবার থেকে বিকেল বেরুবো না' ভাবতে অতি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, মনে হলো বাড়িটা অনেক দূরে, সেই সময় হর্নের বিকট আওয়াজ কানে যেতে সে রাস্তার একপাশে একটা দোকানের আড়ালে শুয়ে পড়বে কিনা ভাবছে সেই মুহূর্তে দেখল—একটা মিলিটারি ট্রাক ছুটে চলেছে। মিলিটারি ট্রাক দেখে ভরসা পেলো, এবং এবার-সে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরতে থাকল।

বালির দুর্গে শুতে এক পরম নিশ্চিন্ততা যখন তার সারা শরীর মনে, ও যার আনন্দে চোখ বুজে আসে, ঠিক তখুনি সেই স্বস্তি ও নিশ্চয়তার দেয়াল কেঁপে ওঠে, কারণ ততক্ষণে সে চোখ খুলে দেখেছে যে তার মাথার দিকে এবং ডান দিকে ইটের বেষ্টনী থাকলেও বাঁ দিক একেবারে উন্মুক্ত এবং পায়ের দিকে, বালিশ থেকে মাথা উঁচু করে দেখতে ও মনে করতে চেষ্টা করল, অনুরূপ বেষ্টনী আছে কিনা, তখন বুঝল বারান্দায় প্রায় ফুট-তিনেক মত একটা দেয়াল আছে, খানিক শান্তি পেলেও 'ঐ তিন ফুট দেয়াল পেরিয়ে যদি স্পিলন্টার ঘরে ঢুকে পড়ে, আর এদিক থেকে', পরিমল উদ্বেগ বোধ করে, তার মনে হয় আজকেই সে খাটের যেদিকটা উন্মুক্ত সেদিকে বালির বস্তা বসাবে, এবং মনে হতেই উঠে পড়ল, অবশ্য পরক্ষণেই বুঝল—এই রাত্রে বালির বস্তা বসানো তার একার শক্তির বাইরে, কিন্তু উঠেই শুয়ে পড়লে মীনা কী ভাবছে মনে হলে সে সুইচ টিপল, আলো জ্বলে উঠলে মীনা বলে, 'কী খুঁজছো?' তাতে পরিমল উত্তর খুঁজে না পেয়ে টেবিল ল্যাম্পের জড়ানো তার খুলে টেবিল-ল্যাম্প বালিশের কাছে এনে হেড-লাইট নিবিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ টিপে দিল। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল 'এপাশেও বালির বস্তা দিয়ে দেবো, কী বল?' মীনা হাসল, 'অতো ভাবতে হবে না', তারপর পাশ ফিরে বলল, 'এবার লাইট নেভাও দিকি, আমার ঘুম পেয়েছে', পরিমল কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা ক'রে লাইটটা জ্বালানো থাক না' বলায় মীনা বলে, 'তাহলে দূরে সরিয়ে রাখো', তখন সে একান্ত অনিচ্ছায় টেবিল-ল্যাম্পটা দূরে টেবিলের আড়ালে রাখতে রাখতে বলল, 'চোখে লাগছে না তো?' একটু থেমে বলে, 'লাইট থাকা ভালো, যদি রাত্রে উঠতে হয়', মীনা উত্তর দিল না।

মীনার চিন্তাভাবনা:

মানুষটা যেন কী হয়ে যাচ্ছে, বোধহয় আমিই এর জন্য দায়ী, আমি নানা জায়গা থেকে

নানা কথা শুনে আসতাম, বলতাম ওকে, ও অবশ্য দারুণভাবে মনে করতো যুদ্ধ কখনো লাগবে না, ও বলতো আমরা শান্তি চাই, তা বলে যুদ্ধকে ও ভয় করে না, যদি ভয়ই করতো তবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ সম্বন্ধে এত উৎসাহ দেখাত না, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেও মনে-প্রাণে নিয়েছিল, ওর মুখে কতবার ভিয়েৎনামের গল্প শুনেছি, ভিয়েৎনামীদের শৌর্য বীর্য বীরত্বের কাহিনী, দারুণ সাহসী বলে মনে হতো ওকে, নাহলে যখন সবাই বৌ ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে, নিজেদের বাঁচবার জন্য নানা অযৌক্তিক ব্যবস্থা নিচ্ছে, তখন ও হাসতো, বলতো—যারা ভীরু তারা প্রতি মিনিটে মরে, আমি বিরক্ত হয়েছি, রাগ করেছি পরকে এমন খোঁটা দিতে, ও যখন বলতো—যাদের বেশী আছে তাদের মরার ভয়টা বেশী, তখন আমি পাল্টা অনেক উদাহরণ দিয়েছি—যাদের কিছু নেই তারাও পালাচ্ছে, তাতে ও বলতো সেটা নাকি আমাদের দেখে ওরা শিখেছে ভয় পাচ্ছে, অথচ সেই মানুষটা কেমন পালটে যাচ্ছে, সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির পর থেকে নাকি তারও আগে থেকে বদলে যাচ্ছিল, একদিন আমায় বলেছিল, জানো মীনা, যুদ্ধ আমাদের সমস্ত সৃষ্টি-শক্তি পঙ্গু করে দেয়, আমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে, তখন আমি হেসেছিলাম, অথচ এখন বুঝি আমাদের অবস্থা কী, এখনও যুদ্ধ লাগেনি তাই এই, না জানি লাগলে কী হবে, সর্বদা ভয়, আজ এটা নেই কাল সেটা, দেখা হলেই যুদ্ধের কথা, কোথায় লড়াই চলছে, এদিকে ভয় আছে কিনা, তারপর ব্লাক-আউটের রিহার্সেল, সিভিল-ডিফেন্সের আইনকানুন আর কত কী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা খাচ্ছি-দাচ্ছি ঘুমচ্ছি, আমাদের বিশেষ বিশেষ কাজ বন্ধ থাকেনি, অবশ্য আমরা ভাবতে পারি না, কেবল ভেসে চলেছি, শহরে থমথমে ভাব, সকলের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, যে যেদিকে পারছে চলে যাচ্ছে, কিন্তু পরিমল, এসব সত্ত্বেও ও অবিচল ছিল, ওর মনোবল দেখে আমার আশ্চর্য লাগতো, ভাবতাম কী ক'রে মানুষটা সবাইকে উপেক্ষা করতে পারে, দেখেছি ওর সমস্ত রেখা কেমন ঋজু ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতো, অথচ এখন, এইসব শেলিং-এর পর, লোকটা যেন কাদার ডেলায় পরিণত হয়েছে, কেমন জুবুথুবু—নড়তে চড়তে চায় না, আমিও কি পারি, আমারও মনে ভয় ঢুকেছে, তেমন স্বচ্ছন্দে আর ঘুরে বেড়াতে পারি না, তবু আমার ভয় নিজের জন্য নয়, আমার ভয় ওর জন্য, ওর যদি কিছু হয়, কিভাবে আমি সেই আঘাত সহ্য করবো, ভগবান করুন ওর যেন কিছু না হয়, শেল পড়লে আমার ঘাড়ে পড়ুক, ও যেন বেঁচে থাকে, ও বাঁচলেই আমার বাঁচা, অথচ ও বাঁচবে কী ক'রে যদি না ওর মনের জোর থাকে, একদিন পরিমল বলেছিল—দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধের সামিল হতেই হবে আমাদের, স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা যদি শরিক না হই, তবে কেউ আমাদের ক্ষমা করবে না, আমি বুঝেছিলাম ওকে ভালোভাবে, আমরা শান্তিপ্রিয়, যুদ্ধ চাই না, কিন্তু কেউ যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে কি নিশ্চুপ থাকব। এর উত্তর ও কী দেবে, জানি না, তবে নিশ্চয় বলবে কেউ চাপালে বরদাস্ত করবো না, অথচ এখন এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, এখন কেবল এক চিন্তা এক ধ্যান, নাঃ—ওকে আমায় জাগাতেই হবে, ফেরাতেই হবে একদিন, না হলে আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে যখন শহরের আকাশ-বাতাস ঘুমের শ্বাস-প্রশ্বাসে ভারি যখন সকলে সুখ দুঃখ আতঙ্ক ভয়ের অতীত এবং শান্তিতে সমাহিত ঠিক তখন রাত একটা চল্লিশ মিনিটে ফেটে ফেটে পড়তে থাকল ওপারের গোলা অবিচ্ছিন্নভাবে মনে হয় অনন্তকাল যদিও ঘড়ির সময়মত প্রায় এক ঘন্টা অবিশ্রাম ফেটে পড়ার শব্দ এই

বুঝি মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণ যায় হয়তো কত প্রাণ ইতিমধ্যে গত হয়েছে পরিমল টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ অফ্ করতে ভুলে যায়, কেবল বলে 'আর একটু পাশে সরে এসো, ঠিক বলেছিলাম এদিকটায় বালির বস্তা দিতে হবে', তারপর চুপ এবং মীনাও যে ভয় পেয়েছে তা টের পায় তার শরীরের কাঁপুনি ও নীরবতায়, 'এভাবে নিরীহ লোক মেরে লাভ কী তাদের? এমনভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার কি মানে হয়? যুদ্ধবাজরা এইভাবে আগ্নেয়অস্ত্র শক্তির জোরে শান্তি হরণ করতে চায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা শান্তিপ্রিয়, শান্তি চাই, তিলে তিলে মরে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ অক্ষয় কবচ তৈরী করে ফেলবে', অথচ এত স্পষ্টভাবে ভেবেও সে সেই সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, যা তাকে মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘোচাতে পারে।

পরের দিন ভোরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার আগেই সে প্রথমে একটা ছেলেকে যোগাড় করে নিয়ে এসে পাশের ঘর থেকে বস্তাগুলো এনে খাটের উন্মুক্ত দিকটা প্রায় ঢেকে ফেললে মীনার কথায় 'আরে সরিয়ে রাখ অন্তত হাত তিনেক, নইলে ঢুকবে কি ক'রে, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে' হুঁশ হলে আবার বস্তাগুলোকে সরিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছে?' তাতে ছেলেটি 'হু, সার' বললে সে একবার বালির দুর্গে, বর্তমানে যা প্রায় গুহায় পরিবর্তিত, ঢুকে পাতা বিছানায় শুয়ে আর কোন্ ফাঁক দিয়ে স্প্লিন্টার ঢুকতে পারে কিনা দেখার জন্য এখন গুহার মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ির চেয়েও কষ্ট ক'রে চারধার ঘুরে ঘুরে সব ফাঁক বন্ধ দেখে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার সেই আশ্রয়ের জায়গা পরীক্ষা ক'রে ভারি খুশি হলো, 'মীনা একবার দেখো তো', মীনা দেখে 'এবার অ্যাটম বোমাও কিছু করতে পারবে না' বলতে সে গর্বে হাসল, ভাবটা দেখো আমি কেমন ব্যূহ রচতে পারি। কিন্তু এত টানাটানির ফলে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে এখন মেঝেতেই টান টান শুয়ে পড়ল, তখন তার বুক হাপরের মত ফোঁস ফোঁস করছে। মীনা বলল, 'হলো তো', তারপর ব্যস্ত হয়ে মাথায়-বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল, 'তুমি কি পারো এসব, মিছিমিছি—', মীনার হাতের স্পর্শে ক্রমে পরিমল সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল, এমন সময় সাইরেন বাজল।

স্টাফ-রুমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কাল রাতের 'শেলিং' এবং আজকের 'সাইরেন' বাজার প্রসঙ্গ বারবার উঠল। অনিলবাবু সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'কি মশাই, ঠিক বলিনি? এআর অ্যাটাক যে হবেই এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না, তবে সেটা যে এত শিগ্রী করবে তা অবশ্য ধারণা করিনি', তখন বিকাশ 'আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কাল নাকি হান্ড্রেড পাউন্ডার ছেড়েছিল, এ. টি. ধরের যা ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না', 'শেলিং বড্ড বিরক্ত করছে আমাদের, আমাদের উচিত', ক্ষিতীশ কথা খুঁজে পেলো না, 'আরও শেলিং হবে', সরিৎবাবু দুম করে বলে উঠলেন, 'কাল কন্ট্রোল-রুমকে এলার্ট করা হয়েছিল', তাতে ক্ষিতীশ ফেটে পড়ল, 'তাহলে আমাদের জানায় নি কেন?' অনিলবাবু হাসলেন, 'ক্ষিতীশবাবু চটছেন কেন, আমাদের জানিয়ে কী লাভ হতো?' তখন ক্ষিতীশ 'না মানে আমরা তাহলে সাবধানে থাকতে পারতাম', তর্ক তখন জোর বেঁধে উঠল 'সিভিল-ডিফেন্স'কে কেন্দ্র করে। আর পরিমল ভাবতে থাকল, 'এরা কেবল কথার ফানুস, কাজের বেলা সাড়ে বাইশ। নাহলে সিভিল-ডিফেন্সে কাজের লোক পাওয়া যায় না, যদি দেশের ও দশের প্রতি এত দরদ থাকে, তবে কাজ ক'রে দেখাও, ফাঁকা বুলি মেরে লাভ কী?' তখনও তর্ক বিপুল বেগে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে শেলিং এআর-রেড প্রভৃতির ভয় উপেক্ষা ক'রে অবশেষে 'ইন্টারন্যাশন্যাল পলিটিক্স'-এ পৌঁছুলে পরিমল অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে, 'এত ফাঁপা

আমরা, কথায় কথায় দেশ উদ্ধার করি, আর কিছু করতে বললেই গায়ে জ্বর আসে, সাধেই কি দেশের উন্নতি হয় না, এতগুলো শিক্ষিত লোক আমরা, সাধারণ মানুষ যাদের অগাধ শ্রদ্ধা করে, সেইসব মানুষ যদি আমাদের এই চেহারা দেখতো, যদি দেখতো আমাদের অন্তঃসারশূন্যতা, তবে বুঝতো আমরা কী চীজ, শিক্ষার বড়াই করি, অথচ কথা বলি এমন বিষয়ে যার ক-অক্ষর জানা নেই, অথচ ভাবখানা আমরা কত বড় স্ট্র্যাটেজিস্ট, মিলিটারি সায়েন্স সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, ছ্যাঃ-ছ্যাঃ, ঘেন্না ধরে গেল', পরিমল উত্ত্যক্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেলো বিনোদবাবুর গলা, 'যে শেলের শব্দ শুনতে পেলেন, বুঝবেন বেঁচে গেলেন সে যাত্রা', শুনে পরিমলের বিরক্তি উপে গেল মন্ত্রের গুণে যেন, 'মর্টারের মুভমেন্ট শ্লোআর দ্যান ক্যাননস্, কিন্তু বেশী ক্ষতি করে মর্টার', বিনোদবাবু যতই মর্টার ও কামানের নানা পার্থক্য বোঝাতে লাগলেন ততই তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'শেলিং-এর সময় সাইরেন বাজালে কেমন হয়' বললে একটা হাসির হররা, 'কী বলছেন আপনি', বিকাশ বোঝায়, 'সাইরেন হচ্ছে কেবলমাত্র এআর-রেড প্রিকোশনের জন্য, শেলিং-এর জন্য সেরকম কোনও ব্যবস্থা কোথাও নেই,' পরিমল বাধ্য ছেলের মত ঘাড় নাড়াল, ততক্ষণে তার মন একবার বাড়ি পাক দিয়ে ফেলেছে, এবং কোন কোন জায়গা ফাঁক আছে তা হদিশ করে ফেলে, তাই বাড়ি গিয়ে প্রথম কাজ হবে ঐ জায়গাগুলো যথারীতি সুরক্ষিত করা। 'এখানে সবাই মস্ত বীর, বাইরে বেরুলে মস্তানি চলে যায়', পরিমল উঠে পড়ছিল, তখন শেখরবাবু বললেন, 'শুনেছেন খবর, কানাই ধর আর সৌমেন নাগকে ডিসচার্জ করেছে', 'তাই নাকি?', 'আজ চার-পাঁচ দিন হলো', কথা শেষ না হতেই সরিৎবাবু বললেন, 'এখুনি তো মওকা, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার, এখন মুভমেন্ট করা মুশকিল, দিস ইজ দি প্রপার টাইম', তখন প্রায় সকলে এইভাবে ডিসচার্জ করা অন্যায়, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, কানাইবাবু আর সৌমেন যাঁরা সমস্ত কর্মচারী আন্দোলনের খুঁটি তাঁদের উপর আঘাত হানা গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানার সামিল ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় কথা শুনতে শুনতে তার কানে তালা লাগার উপক্রম, 'এত ভণ্ড এরা, এখুনি বলছে এই কথা, আর কর্তার ঘরে গিয়ে বলবে উল্টোটা', বিরক্তি দারুণ তীব্র হতে সে লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ায়।

কলেজ থেকে ফেরার পথে যদিও তখন বিকেল শীতের বিকেল ব'লেই আলো কম সে দোকানে একটা জিনিস কিনতে আলো পড়ে এলে সামনের দিকে জনশূন্য রাস্তা ও দোকান-পাটের দরজা কোনটা বন্ধ কোনটা আধ-খোলা দেখে আজ থেকে নিষ্প্রদীপ মনে পড়তে তার চলার বেগ দ্রুত হলো, 'আমার আরও আগে বেরুনো উচিত ছিল, গভর্নমেন্টই বা কী, স্কুল-কলেজ বন্ধ দিলে কী ক্ষতি হয় তাদের। তা না যতসব ঝামেলা', সে প্রায় দৌড়ুতে শুরু করে, এ রাস্তা দিয়ে শহরের প্রতিটি অলিগলি দিয়ে সে কতদিন গভীর রাতে একা-একা নির্ভয়ে ফিরেছে কখনো বা মীনাকে সঙ্গে নিয়ে, কিন্তু কোনও দিন লোম খাড়া হয়নি আজ যেমন তার হচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা অপরিচিত মৃত শহর, যার মানুষগুলো মমির মত, যার রাস্তাঘাট মরুভূমির মত ধুধু, যে শহরের যানবাহন ভূতগ্রস্তের মত চলে ফেরে, এবং যেখানে যে কেউ এখন একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে নিজের পায়ের শব্দে হতচকিত, কোন এক সময় এখানে এক শহর ছিল, যেখানে আমি ছিলাম, যে আমি এই শহরকে ভালোবেসেছিলাম, কোনও অবন্তী বিদিশা নয়, অথচ আজ যেন আরও অতীত কোনও এক শহর, আর আমি হাঁটছি, হয়তো এখুনি কোনও মারণাস্ত্র উঁচিয়ে আছে তার তীক্ষ্ন আঘাতকারক বাণ, আমি জানি না, একটা শব্দ, তারপর আমি নেই, যে আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি আকাশ বাতাস মানুষকে, আমার

কিছু করার নেই, সে ক্রমে ক্রমে মৃত শহরের জনহীন পথঘাট পেরিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নিজে অর্ধমৃত হয়ে যখন স্বরচিত গহ্বরে গুহা বা দুর্গের সামনে উপস্থিত হয় তখন বিরাট স্বস্তি, মনে হয় পৌঁছে গেছে অভীষ্ট বন্দরে, যে বন্দরে আসার পথঘাট হারিয়ে ফেলেছিল চলতে চলতে, 'হ্যাঁ আমি নিশ্চিন্ত, এই আবাস ছেড়ে আমি যাবো না। যতদিন যুদ্ধ থাকবে যুদ্ধের আসন্নতা থাকবে ততদিন, ততদিন মীনা যাকে বলে ব্যূহ, সেই ব্যূহ হবে আমার আবাসস্থল', এবং কোনদিন যা করে নি, আজ বাইরে থেকে ফিরে মীনাকে না ডেকে হাত-পায়ে জল না দিয়ে চা-র জন্য তাড়া না লাগিয়ে এলিয়ে পড়ল সেই গুহার বিছানায়, 'আহ্', আর সেই একটি 'আহ্' ধ্বনি তার সমস্ত শরীর নিমেষে হালকা ক'রে দিল। তখন একটা শব্দ তবে তার শরীর কুকুরকুণ্ডলীবৎ, তদবস্থায় মীনার ঘরে প্রবেশ, 'একি! কখন এলে? শরীর খারাপ নাকি?', মীনা ব্যস্ত হয়ে গুহায় ঢুকতে গেলে 'শব্দ' কথাটা শুনতে পেয়ে 'দরজা বন্ধ করার শব্দ' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড শব্দ হলে মীনা চলে আসে গুহার ভেতরে, 'কী হবে গো', তারপর পর পর আরও দু-তিনটে শব্দ, তখন মীনা 'এগুলো আমাদের' বললে পরিমল 'উঠো না, কে বললে আমাদের শব্দ' বলতে বলতে ক্ষেপে 'সবাই এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে' ব'লে নিজেই উঠে বসল, ভুলে গেল যে এভাবে উঠে বসা উচিত নয়, অবশ্য পরমুহূর্তে সে উপুড় হয়ে কানে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ল, তখন থেকে থেকে গোলার শব্দ, মীনা ঠেলা দিল, 'এই ওঠো, এগুলো আমাদের', সে মীনার দিকে অবিশ্বাস্যভাবে তাকাতে 'এগুলো আমাদেরই শব্দ, একটা শব্দ, আর শব্দগুলো এদিকে আসছে না' মীনার কথায় এবার ভরসা পেল, তারপর চারদিকে তাকিয়ে ভাবল, 'এই ভালো, মিছিমিছি বাইরে গিয়ে লাভ নেই, প্রত্যেকেই চায় নিরাপত্তা, কেউ বলে, কেউ চুপ থাকে—এই যা তফাত', তখন ঘরে আবছা আলো, ঘাড় উঁচিয়ে দেখল বাল্‌বে ঠুলি পরানো হয়েছে, তা দেখে খুব খুশি হয়ে মীনা যে তার সঙ্গে এব্যাপারে সহযোগিতা করছে, এজন্য মীনাকে মনে মনে তারিফ করতে থাকল, 'মীনা আমাকে ঠিক বোঝে, আজ নিষ্প্রদীপের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ও কেমন মনে রেখেছে, দুজনের সহযোগিতা না হলে সংসার চলে না, আজ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে সহযোগিতা চাই বাঁচার জন্য, আবার সেই দিন ফিরে যখন—', কিন্তু পরিমল সেই সুখের দিনের ছবি চোখের সামনে ভাসাতে না পেরে চারধারে এই জগৎ গুহার জগৎ দুর্গের জগতের মধ্যে নিজেকে একান্ত নিশ্চিন্ত মনে ক'রে ধ্বংসের শক্তি সৃষ্টির শক্তির চেয়ে বড় নয়, তাই আমরা বেঁচে থাকি' ইত্যাদি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক উপপাদ্যসমূহেও সে এখন, বাইরে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ অন্ধকার যেহেতু নিষ্প্রদীপ ভেতরে ঠুলি-পরা বাল্‌বের রহস্যময় আলো, কিছুতেই সেই আগের দৃঢ়তা ফিরে পেলো না, যাতে সে জোর গলায় বলতে পারে, 'যুদ্ধ একটা ধাপ্পা।'

তারিণী বলল, 'এখনকার অবস্থা ভালো নয়, যেমন তোড়জোড় দেখছি তাতে হপ্তাখানেকের মধ্যে লেগে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়, তখন যে কোথায় পালাবো ভেবেই পাচ্ছি না', শুনে সে কিছু হতভম্ব হওয়ার পর বলে, 'গভর্নমেন্টও স্টেশন লিভ করতে বারণ করেছে', তাতে তারিণী 'যা গভর্নমেন্ট, এর চেয়ে বেশী কী আশা করতে পারো?' বললে সে 'কোথায় যাবে? যুদ্ধ লাগলে সমস্ত দেশই বিপদজনক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে' তখন তারিণী 'তা ঠিক, তবু শেলের মুখে দাঁড়ানো এক কথা, আর—', কথা খুঁজে না পেতে পরিমল অত্যন্ত বিনয়ে সরল ভাষায় জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি ধারণা যুদ্ধ লাগবে?' তাতে তারিণী ঈষৎ তির্যকভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে, 'তোমার কি সন্দেহ আছে? লাগল বলে, তুমি যতই যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো না, সবশেষে সবকিছু ভাসিয়ে ঘটনা বলে দেবে, যুদ্ধ বাধবে এবং যুদ্ধ

হবেই, আর যুদ্ধ বাধলে আমাদের রক্ষা নেই', তারিণীর কথার সঙ্গে সঙ্গে সে মানসচক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা আসতে ও ফেটে পড়তে ও মানসকর্ণে গোলা আসার ও ফেটে-পড়ার শব্দ দেখতে ও শুনতে পেল, আর তখুনি এই জায়গাটা অত্যন্ত অ-নিরাপদ ব'লে মনে হতে সে চট করে সেখান থেকে চলে যাবার অজুহাতে 'বাড়ির দিকে যাবে' ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে হাঁটতে শুরু করল, তখন তারিণী 'আরে যাচ্ছো কোথায়, তোমার সঙ্গে কথা আছে', সে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'জরুরি হলে এসো আমার সঙ্গে', 'আচ্ছা, এখন থাক, আমি পরে যাবো', এবং এবার সে তড়িৎগতিতে ছুটতে থাকল তার লক্ষ্যের দিকে--গুহার দিকে।

এখন নিশ্চিন্ত সে, যদিও দিনের আলোর বাইরে ভয় কম, তবু এই জায়গাটা যেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শান্তির জায়গা, নিশ্চিত ঠাঁই. 'এখন যুদ্ধ বাধুক, বোমা পড়ুক, আমি নিশ্চিতভাবে বাঁচবোই।' অনিলবাবু বলছিলেন, 'চব্বিশ ইঞ্চি বালির বস্তা ভেদ করা বোমারও অসাধ্য, তবু ছত্রিশ ইঞ্চি বেধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাতে আর কোনও ভয় থাকে না', তখন চন্দ্রভানুবাবু, 'কিন্তু ডিরেক্ট হিট্ হ'লে কোনও কাজ হয় না, এআর-ব্লাস্টারগুলো বালির বস্তাকে তুলোর মত উড়িয়ে নিয়ে যায়', তাতে পরিমলের বুক আবার দুলে ওঠে, 'তাহলে উপায় ?', কিন্তু তার শঙ্কা মুহূর্তে মুছে যায় বিকাশের কথায়, 'বাবা ওআর ক্লাসে ছিলেন ফরাটিওআন-এ, তিনি বলেছেন--পাক্কা বাঙ্কার সবচেয়ে সেফ্, কিন্তু বালির বস্তাও কম সেফ্ নয়, আমি ট্রেঞ্চ কাটাচ্ছিলাম, বাবা বললেন পাকা বাড়িতে ট্রেঞ্চের দরকার নেই, কয়েকটা বালির বস্তা দিলেই কাজ হবে।' পরিমল স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো, তখনকার সে স্বস্তি এখনও সে অনুভব করল এই গহ্বরে বসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'ক্লাশ আছে' মনে পড়তে এতক্ষণের অর্জিত স্বস্তি চকিতে অস্থৈর্যের বিরাট ঢেউ তুললে 'ছুটি নেবো' এমন সিদ্ধান্ত নিলে কাজুএল লিভ ছাড়া অন্য ছুটি গ্রান্ট হবে না মনে পড়ায় মুষড়ে পড়ল, 'দুৎ ছাই, কেন যে মরতে এসেছিলাম এখানে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছিলো, মীনার জন্যই আমাকে—' তখন সব রাগ গিয়ে পড়ল মীনার উপর। অথচ মীনা এসে যখন বলল, 'এখানে থাকলেই চলবে ? ক্লাশ নেই ?', তখন তার উপর রাগ করা দূরে থাকুক, বরং অতিরিক্ত কোমল সুরে বলে, 'ভাবছি ছুটি নেবো ?' তাতে মীনার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, 'এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, তুমি এবং ছুটি ?', 'কেন' 'আবার জিজ্ঞেস করছো, কোনদিন নিলে না, আর আজ', 'না নিলে বুঝি নিতে নেই ?', 'না তুমি', মীনা আমতা-আমতা করলে পরিমল ফিসফিসায়, 'আর দু-একদিনের মধ্যে লেগে যাবে বোধহয়', তখন মীনা গম্ভীর স্বরে ওঠে, 'তবে কলেজ গিয়ে কাজ নেই', তাতে সে ভারি খুশি হয়, 'মীনা সত্যি আমাকে বুঝতে পারে' এবং সেই খুশির আমেজে উঠে পড়ে, তারপর 'যাই একবার, কী বল ?', বলে বাথরুমের দিকে ছুটে যায়।

রাস্তা দিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে 'কোথায় চললেন' শুনতে আবিষ্কার করে যে সে কলেজের রাস্তা ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে এসেছে, ততক্ষণে কেশববাবু কাছে, 'শুনেছেন তো, দু-তিনদিনের মধ্যে ম্যাসিভ-অ্যাটাকের সম্ভাবনা রয়েছে', পরিমল চমকে ওঠে, কেশববাবু বলে চলেছেন, এরা যে কি করছে, আরে মশাই ওদের আগেই ঘায়েল করা উচিত ছিল, তা না হলে কেবল সময় নষ্ট ক'রে ক'রে', কানে কথা ঢুকছিল না, কারণ সে সময় 'ম্যাসিভ অ্যাটাক' 'অফেনসিভ—ওআন ইজ টু টু রেশিও' 'এল.এম.জি.' 'এম.এম.জি.' প্রভৃতি শব্দগুলো দুমদাম কানের মধ্যে ফেটে ফেটে তাকে অস্থির ক'রে তুলতে দেখল, কেশববাবু অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, এবং আরও দূরে তাকাতে দেখল, রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা, আর সেই সময় একটা

মিলিটারি ট্রাক বিকট আওয়াজ ক'রে ব্রেক কষলো, তার বাঁচা মরার কোনও প্রশ্ন নেই, কারণ সে রাস্তার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তখন, ব্রেক কষেই চলতে শুরু করল ট্রাকটা, তখন সে রাস্তা মোটে নিরাপদ নয় ভাবতে কেমন অসহায় বোধ করল, আর তাকে তার স্বরচিত গুহা হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকল, সে আহ্বান উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, উপেক্ষা করতে হয় তবু ভয়ঙ্কর সাহস সঞ্চয় করে, কারণ এদিকে সে সচেতন যে জানান না দিয়ে ছুটি নেয়া রেওয়াজ হলেও তা আইনসঙ্গত কিংবা উচিত নয়, সে অতএব কলেজের দিকে পা বাড়াল।

ক্লাশ হচ্ছে না কেন তার কারণ জানার আগেই সে স্টাফ-রুমের সেই আসরে ভিড়ল, যেখানে তখন ওঅর-স্ট্রাটেজি মিলিটারি মাইট নিয়ে কথা চলছিল। অনিলবাবু সিগ্রেটে টান মেরে বললেন, 'ইন ওঅর ইফ্ ইউ ফাম্বল্ ইউ লুজ দি গেম, চেম্বারলিন সম্পর্কে সেই অভিযোগ ছিল, বাট্ চার্চিল ওআজ অ্যানাদার স্টাফ, হি ওআজ ফারম, দেশটা শেষ পর্যন্ত জিতে গেল, তবে জার্মানিরাও কম যায় নি,' তাতে বিকাশ সায় দিল, 'নিশ্চয়ই, অতটুকু দেশ হয়ে রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স—সবাইকে ঘায়েল করেছিল, ভাবুন একবার', বিকাশের কথা শেষ না হতে ক্ষিতীশ বলে উঠল, 'উই ওআন্ট এ ডিক্‌টেটর লাইক হিম্, দেখতেন একদিনে ঠিক হয়ে যেতো দেশটা', তখন শেখরবাবু 'মিলিটারি ডিক্‌টেটর না হ'লে' তাতে সরিৎবাবু বলে উঠলেন, 'লাইক ইয়াহিয়া খাঁ', সকলে হেসে উঠতে পরিবেশটা লঘু হয়ে উঠল, কিন্তু পরিমল অবাক হয়ে যাচ্ছিল এই ভেবে যে যারা শিক্ষার বড়াই করে, তারাই কিনা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যার মান চা-এর দোকানের ছোকরাদের চেয়ে এতটুকু উঁচু নয়, 'কী বলে এরা? মিলিটারি ডিক্‌টেটর দেশকে ভালো করে? চোখের সামনে বাংলাদেশ দেখেও শিক্ষা হয় না', মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, 'মিলিটারির প্রতি এত ভক্তি! নাকি নিজেদের কমিউন্যালইজমকে এইভাবে ঢাকছে এরা', ভাবতে সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল যে প্রায় বলেই ফেলেছিল রাখুন' মশাই আপনাদের আলোচনা, মিলিটারি-প্রীতি থাকলে চলে যান যুদ্ধক্ষেত্রে', কিন্তু ততক্ষণে 'শেলিং' শব্দটা কানে যেতে তার শিরা-উপশিরা টান-টান হয়ে ওঠে, এবং এতক্ষণ এদের উপর বিরক্তি ও আক্রোশের প্রবল ঢেউ নিমেষে কাটিয়ে উঠে উপস্থিত আলোচনা শুনতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

বিকাশ বলল, 'শেল-এর স্পিলণ্টারেরই জোর বেশী, জানবেন যেদিক থেকে শেলিং হয় স্পিলণ্টার তার উল্টো দিকে ছুটে চলে, খুব কম পেছন দিকে ধেয়ে আসে', তাতে অনিলবাবু বললেন, 'ঠিকই বলেছো, তবে ওসব জিনিসকে বিশ্বাস না করাই ভালো, তাছাড়া এআর-ব্লাস্টার ছাড়লে তখন কোনও নিয়মই খাটবে না, এখনও ওরা ওগুলো বেশী ছাড়ে নি, তবে শয়তান তো, সিভিলিআন মেরে মেরে হাত পাকিয়েছে এ ক-মাস, কখন ছাড়ে তার ঠিক কী', তখন ক্ষিতীশ মজা ক'রে বলে, 'এখন যদি শেলিং শুরু হয়, কী করবেন?' সঙ্গে সঙ্গে একটি হাসির রোল, কিন্তু পরিমলের হৃদপিণ্ড টকাস্-টকাস্ ক'রে দুলতে শুরু করল, 'তাইতো তাইতো', সে লুকোবার সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা পরখ ক'রে কোনটিও নিরাপদ নয় বুঝতে বাড়িতে সেই উঁচু-করা খাট, খাটের উপর বালির বস্তা, একদিকে পরপর দুটো দেয়াল, খোলা দিকে তিন-সার বালির বস্তা প্রায় চার ফুট উঁচু করা, মাথার দিকে বাথরুমের দেয়াল, পায়ের দিকে বারান্দার দশ ইঞ্চি দেয়াল আর সেই দুর্গ গুহা বা ব্যূহ-এর কথা মনে পড়তে পা সুড় সুড় ক'রে ওঠে, 'কলেজ না এলেই হতো! কী দরকার ছিল, বাড়িই আমার ভালো', এবার সে কোনমতে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না, উঠে পড়ল, তখন বিমানবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি যাচ্ছেন?' সে উত্তর না দিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালে 'দাঁড়ান দাঁড়ান' শুনে বাধ্য হয়ে

দাঁড়ালে তার মন তখন গুহায় ফিরে যাবার জন্য উচাটন, বিমানবাবু কাছে এসে 'কী সব ফালতু আলোচনা' ব'লে একপ্রস্থ সবাইকে গাল দিয়ে নিজেই ঐসব কথা বলে যেতে থাকলেন, সে তার একবিন্দু শুনল না, বুঝল না, শুধু একবার বিমানবাবুর কথায় থমকে দাঁড়াল, যখন তিনি বললেন, 'কী বলবো মশাই, এই যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবটা আমাদের দিল শেষ করে। এ ক-দিন এক মিনিটও বসতে পারলাম না লেখা নিয়ে, যবে থেকে শুরু হয়েছে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা তখন থেকে কিছু ভাবতে পারছি না, আশ্চর্য, এরপর কি লিখতে পারবো, ভয় হয়, মনে হয় সমস্ত অনুভূতিগুলো একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে', বিমানবাবুর গলার ঘনিষ্ঠ উত্তাপ সে অনুভব করতে পারল, বিমানবাবু বড় লেখক না হলেও তিনি একজন লেখক, একজন লেখক লিখতে পারছেন না তার বেদনা স্পর্শ করল পরিমলের মন, 'আমি বুঝি বিমানবাবু, লেখকরা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সেনসিটিভ, আমরাই যদি কিছু ভাবতে না পারি, তবে আপনারা পারবেন কী ক'রে, কোথায় যে আমরা যাচ্ছি', তারপর একটু থেমে 'এ দিন যে কবে শেষ হবে' বলতে শেলিং-এর কথা মনে পড়তে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'বুঝলে মীনা, সাতদিনের ছুটি নেবো ভাবছি', মীনা রাজি হয়, 'বেশ তো, খেটে খেটে তো শরীর পচালে, এবার না হয়', মীনা হাসলে পর সে 'ঠিক তা নয়, মানে বেরুতে, মানে তুমি কাছে থাকলে বরং', অন্যসময় হলে মীনা 'ঢঙ' বলে উড়িয়ে দিতো, অথচ এখন খুব কাছে সরে এসে বলল, 'আমি তো সর্বদা তোমার পাশেই থাকি', এবং তারপর 'যাই, তোমার গরম জল হলো কিনা দেখি' বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, আর পরিমল নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল : 'যুদ্ধ কি পৃথিবীতে অনিবার্য? মানুষ বাঁচে পারস্পরিক সহযোগিতায়, তবে কেন এই মারামারি?' 'কেন জানো না? যে তোমাকে অসম্মান করে, মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না, তার সঙ্গে কথা কইবে কী করে?' 'তাকেও তো পথে আনতে হবে, অনাবশ্যক লোকক্ষয়—' এতদূর ভাবনা এগুতে হঠাৎ নির্মলকে মনে পড়ে যায়। আজ নির্মল উপস্থিত থাকলে সে কী বলতো? সে কি আগের মত বলতে পারতো, যুদ্ধে কোনও কিছুর সমাধান হয় না, যুদ্ধ সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে জটিল করে?' নির্মলকে অনেক অনেক দিন পর মনে পড়ায় সে খুশি হলেও সঙ্গে সঙ্গে অনিলবাবু, বিকাশ, ক্ষিতীশ, সরিৎবাবু, চন্দন, কেশববাবু প্রভৃতি একের পর এক আরও মুখ ভেসে ভেসে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' রব তুলতে তুলতে মিলিয়ে গেলে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করল, 'আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, আমি যুদ্ধের নামে ভয় পাই, যুদ্ধ দরকার, যুদ্ধ অপরিহার্য, হাঁ, ঠিক বলেছে চন্দন, পাঁচ বছর পর পর যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ আমাদের শুদ্ধ করে, সবাই যখন উদ্বুদ্ধ তখন আমি ভীরুর মত শান্তির কথা বলি, পালিয়ে বেড়াই, আমি একটা জঞ্জাল, শুধু নিজের কথা ভাবি, দেশের কথা দশের কথা ভাবি না, আমাদের রক্ষার জন্য আছে লক্ষ লক্ষ জওয়ান, সকলে ভুল করে না, আমাকে উঠতেই হবে, প্রমাণ করতে হবে আমি ভীরু নই, আমি কাপুরুষ নই', সে ক্রমে উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে থাকলেও সেই উদ্যম পায় না, যা তাকে এখুনি টেনে গুহার বাইরে বের করে দেয়। সে উঠতে চাইল, দেখল চারদিকে দেয়াল বালির বস্তা, এতটুকু ছিদ্র নেই, মাথা তুলতে চাইল, বুঝল উপরে সারি সারি বালির বস্তা মাথা তুলতে দেবে না, সুতরাং সে না উঠে মাথা না তুলে সেই গুহার ভিতরে চারদিকে ঊর্ধ্বে অধে দৃষ্টিক্ষেপ করল, দেখল তার চারদিকে প্রচণ্ড কারাগার এবং অন্ধকার, সেই অন্ধকার ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে তাকে পিষে ফেলতে চাইল, সে চেঁচিয়ে উঠতে গেলে তার গলা দিয়ে স্বর বেরুল না, শুধু একটা চিঁ-চিঁ শব্দ, পরিমল বুঝল—সমূহ বিপদ উপস্থিত, বুঝল—এখুনি হয়ত মারা যাবে, কিন্তু সেই মৃত্যুকে জয় করার মত শক্তি বা সাহস

নেই তার, অতএব সে অসহায়ের মত চুপে চুপে মাথা না তুলে চোখ না খুলে শুয়েই থাকল, একবার নিজের শরীরকে নড়াতেও চেষ্টা করল না।

স্টাফ-রুমে জমজমাট ভাবে কিছু ভাঁটা পড়েছে এখন, বোধহয় রামাশিসরি আসেনি তাই, দু-একটা টুকিটাকি কথা ওঠার পর একটা শব্দ হলো এবং আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ অন্ধকারে ডুবে গেল, চারধারে বালির বস্তা থাকায় আলো ঢুকতো না বলে আলো জ্বলতো, তা অতি ক্ষীণ হলেও আলো, হঠাৎ নিবে যাওয়ায় সমস্তটা অন্ধকারের অতলান্তে ডুবে যায়। পরিমল বুঝতে পারছিল তার শরীর কেঁপে কেঁপে কুঁকড়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত মাথাটা ভোঁতা যেখানে কোনও চিন্তা নেই ভাবনা নেই, অন্ধকার মধ্যে মধ্যে দুলছে সিগ্রেটের টানে, স্তব্ধতা বাড়ছে সকলের নিশ্চুপতায়, তারপর যেন অনন্ত মুহূর্ত ও অনন্ত অন্ধকার, একসময় অনিলবাবু নিশি-পাওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'আর ভালো লাগে না, কতদিন যে এ যন্ত্রণা আছে', পরিমলের বুক তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, 'অনিলবাবু তাহলে বুঝতে পারছেন যুদ্ধের কুফল ?', সে আনন্দে অনিলবাবুর হাত ধরতে যাবে এমন সময় সরিৎবাবুর কণ্ঠস্বর, 'না জানি, ওরা কেমন আছে ?' অন্যসময় হলে একটা হাসির রোল পড়ে যেতো, কিন্তু এখন কেউ সরিৎবাবুর কথা লঘুভাবে নিল না, কারণ প্রত্যেকের মনের কথা সেই 'না জানি বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেমন আছে' ইত্যাদি ; সেই অন্ধকার ঘন হয়ে শরীর ধারণ করে সরিৎবাবুর হয়ে যেন বলে উঠতে চায়, 'যারা কিছুই জানে না, বোঝে না, অবোধ শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী তারাই হচ্ছে এর বলি, কী দরকার ছিল', একটা হতাশা ক্ষোভ ফেটে ফেটে মিলিয়ে যেতে না যেতে হুঙ্কার দিল, 'আগেই করা উচিত ছিল, হেলায় সুযোগ হারাবার এই ফল, তখুনি যদি এগিয়ে যেতো, তা না হয় কেবল ধৈর্য ধরো শান্ত থাকো, সহনশীলতাই হয়েছে আমাদের কাল, মারো, মেরে তাড়িয়ে দাও শত্রুদের', অন্ধকার ফুলে ফুলে উঠল কথায়, কেশববাবু সিগ্রেটে টান দিয়ে বলে উঠলেন, 'টুথ ফর টুথ', আমাদের অ্যাপীজমেন্ট পলিসি এর জন্য দায়ী', এবং তখুনি আলো জ্বলে উঠল, পরে জানা গেল 'পাওয়ার ফেলিওর।'

বাড়িতে পৌঁছুতে মীনা ছুটে এলো, 'তোমরা সাইরেন শুনেছিলে', 'সাইরেন! কখন ?' 'ওমা, আজ এআর-রেড হয়েছিল', 'এ-আর রেড ?' পরিমলের হৃদস্পন্দন দ্রুত হলো, 'এই তো কিছু আগে, তবে এআর-পোর্টের দিকে, অবশ্য সাইরেন বাজেনি, তখন সে আতঙ্কিত, 'কেন', 'কেন আবার, পাওয়ার ফেল', তারপর মীনা আপন মনে বলে চলে, 'কী যে অশান্তি এলো দেশে, একমুহূর্ত শান্তি নেই, কেবল শেলিং আর সাইরেন, ভেবে চিন্তে কিছু করার উপায় নেই, কেবল প্রাণ বাঁচানো, দুঃছাই, কবে যে শেষ হবে', তখন সে বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে নিতে মীনার মুখের দিকে তাকালে সেই মুখ কেমন কাঁচ শ্যামল দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনেকদিন আগের মীনাকে মনে পড়ে যায়। মীনার সমস্ত কেমন আবছা আলোয় উদ্দীপ্ত তার চুলে ঘন অন্ধকার চোখে তলতল জলের স্নিগ্ধতা 'মীনা তোমাকে ভালোবাসি' বলার আগেই চোখ পড়ল আয়নায়। আয়নায় সে আর মীনা, অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে দুজনকে, চোখে বিহ্বলতা ক্লান্তি, 'আমি ভয়ের শিকার হয়ে পড়েছি' ভাবতে চমকায়, তখন কে যেন ফিসফিসায়, 'ভয় নয়, আমাদের সমস্ত সত্তার নির্যাস, আমরা আর মানুষ নই', তখন সে হিরোশিমা নাগাশাকির ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন স্মরণ করল, আর তখুনি ভেসে উঠল নির্মলের হাসি হাসি মুখ, 'বলেছিলাম না যুদ্ধ হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, যুদ্ধ হচ্ছে ব্যাধি" এবং সে মুখ মিলিয়ে যেতে অন্যান্য দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত হবার আগেই সে ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর, 'হাঁ, এবার নিশ্চিন্ত আমি, আমার চার-পাশে নিরাপত্তার প্রাচীর, আমি এই প্রাচীরের মধ্যে ঘুরে ফিরে আমি নির্বিঘ্নে, এই গুহা

দুর্গ বা ব্যূহ ছেড়ে আমি কখনো বাইরে যাবো না, আমার জীবন এখন গুহায় নিহিত, যুদ্ধ চলুক, আমি নিশ্চিন্ত, আমার গুহার মুখ ঢাকা, আমি জানি একদিন না একদিন সেই মুখ খোলা হবে, আমরা আবার আলোয় বেরুতে পারবো, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবো, ততদিন আমি এইখানে—'

মীনার চিন্তাভাবনা:

আজ কী হল ওর, সারাদিন গর্তের মধ্যে ঢুকে বসে আছে, কথা কম বলছে, কী যেন ভাবছে, আমার দিকে তাকালেও সে দৃষ্টি যেন কোথায় নিবদ্ধ, কিন্তু সেই চোখে মাঝে মাঝে স্পর্শ পাচ্ছি পুরনো পরিমলের, তবে কি ও বল সঞ্চয় করছে, সত্যি এই যুদ্ধ-যুদ্ধ আর ভালো লাগে না, সকলেই মনে মনে উত্যক্ত হচ্ছে, আলো নেই, বেরুনো বন্ধ, সর্বদা ভয়, মানুষ বাঁচবে কিভাবে, আজ কারফিউ, কাল চুয়াল্লিশ ধারা, ভালো লাগে কার, তবু এর মধ্যে চালাতে হবে, ও এত বিচলিত হয় কেন, এর চেয়ে বহু অশান্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছে, আর ও ভালো করেই জানে, সবার চেয়ে ভালো বোঝে, তবু কী যে ওর মাথায় ঢুকেছে, যখন বলে যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি বড্ড কম জানি তখন বড্ড ভয় করে, আশ্বাস দি, তবু ও বলে চলে—সবাই কেমন গড় গড় ক'রে বলে যায় স্যাবার জেট হান্টার ন্যাট ফ্যানটম মিরাজ, আর আমি হাঁ করে শুনে যাই, ওর মুখ কেমন কোমল হয়ে ওঠে, বড় মায়া লাগে, ও বলে একটা বই পেলেও হতো, তখন আমি বলি বাংলা কাগজে ওসব অনেক লেখা থাকে, ওসব জানা কিছু কঠিন নয়। শুনে হাসে, সে হাসি অদ্ভুত, মানুষটা কী হয়ে যাচ্ছে, কেবল এক চিন্তা যুদ্ধ যুদ্ধ, না, ওকে জাগাতে হবে, ওকে ফেরাতে হবে—

পরিমল স্বপ্ন দেখছিল বিরাট এক মাঠ মাঠের প্রান্তে ছোট ছোট কুঁড়ে নীল আকাশ রোদ সকলের চোখে খুশির হাসি সবুজ গাছ শান্ত কালো মেয়ের চোখের মত পুকুর তাতে পাতিহাঁস সুপুরির ঝুর-ঝুর শান্তি কেবল শান্তি মীনা সেই ঘরে সেই ঘর নিস্তব্ধ নিশ্চুপ আমরা মুক্ত আমরা স্বাধীন আকাশে পাখির ঝাঁক আমরা পাখির মত কেবল পাখির মত আর পাখি—

মীনার চিন্তাভাবনা:

ওকে জাগাতে হবে, ওকে ফেরাতে হবে

পরিমল তখন ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরে চলেছে এই নীল আকাশ অনন্ত বাতাসের নীচে একদিন আমরা পিকনিকে বেরিয়েছিলাম সেভন ব্রিজে যেখানে মাটিতে নেমেছে তিস্তা তার কাছাকাছি আমরা সকলে নেমে নেমে কেবলই নদীর বুকের কাছে যাচ্ছিলাম ব্রিজের অনেক অনেক গভীরে কী সবুজ জল অবাক হয়ে চারধার দেখলাম সবুজ ঘন সবুজ তারই ছায়া প্রতিফলিত জলে শান্ত নিস্তব্ধ সেই ছায়া নদীর বুক একটা চাপা ঝিঁ-ঝিঁ'র ডাক সেই সময় একটা প্লেন গোঁ গোঁ করে উড়ে যেতে কী হৈচৈ আমাদের বাবা তাড়া দিতে মা-র আহ্ তারপর সেই পাহাড় তারপর সমুদ্র—

মীনার চিন্তাভাবনা:

ওকে জাগাতে হবে, ওকে ফেরাতে হবে—

মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে সে কী ছুটোছুটি মীনার; মীনার আঁচল খসে খসে

বুক অনাবরিত করে করে আকাশ ছুঁতে যাচ্ছিল কখনো বা হাওয়ায় ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিচ্ছিলো আমাদের আমরা দুজন পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে সমুদ্রের ফেনা মেখে মেখে সমুদ্রের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছিলাম সমুদ্র ফুঁসে ফুঁসে পাথরে মাথা কুটছিল আমরা এগিয়ে চলেছি ডোন্ট গো বেঙ্গলিবাবু ডোন্ট গো গাইড ছুটে আসছে আর একটা ঢেউ মীনা কোথায় মী——না মী——

চোখেমুখে একটা ভয়ঙ্কর উষ্ণতা আছড়ে পড়তে পরিমলের ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনল একটা হিস্-হিস্ শব্দ, সেই আবছা তরল অন্ধকারে তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত চোখ তার দিকে উঁচিয়ে আছে, আর দেখল সেই জ্বলন্ত চোখ ফণা তুলে ছোবল মারল তাকে, 'মীনা মীনা', ততক্ষণে মীনার সমস্ত শরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলজ্বলালো, যেন অকস্মাৎ আলোর তীক্ষ্ণতা বেড়ে গেল, সে স্পষ্ট দেখতে পেল মীনার চোখমুখ স্তন উরু উত্তাপে উত্তাপে লাল, আর ক্ষণে ক্ষণে মীনা তার প্রজ্বলন্ত শরীর দিয়ে আক্রমণ করছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একের পর এক, আর মীনার নগ্ন উত্তপ্ত শরীর থেকে বাষ্প বিচ্ছুরিত হয়ে হয়ে তার সকল শরীর ঢেকে ফেলছে, সে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল নিজের শরীর, সেই শরীর নিরাভরণ ও নগ্ন, মীনা ছোবল মেরেই তাকে পরিমলের মসৃণ শরীর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পিষে পিষে শেষে লালাসিক্ত করে দিতে থাকল, একটা জ্বলন্ত অনুভব, সে হাত তুলে মীনার শরীর স্পর্শ করতে গেল, হাত উঠল না, নিজের পা দিয়ে মীনার শরীর বেষ্টন করতে গেল, পা নড়ল না, তখনও মীনা ছোবলের পর ছোবল মেরে যাচ্ছে এক দুই অসংখ্য অজস্রবার, মীনা তার শরীরকে দলে দলে পিষে পিন্ড করে ফেলতে চাইছে, পরিমল সাড়া দেবে, হাঁ দেবে, তার সমস্ত শরীর এঁকে-বেঁকে উঠছে, আরও উদ্যম আরও শক্ত, আর একটু, পরিমল চেষ্টা করল, পারল না, সে চোখ মেলতে চাইল আকর্ণ, সহসা তার চোখ জলে ভরে এলো, জলে জলে চোখ মুখ একাকার, চারধার কেমন এঁকেবেঁকে তুবড়ে যেতে থাকল, আর চোখ দিয়ে অজস্রধারা বেরিয়ে আসতে থাকল, পরিমল চীৎকার করে উঠল, 'মীনা-মীনা, আমায় ক্ষমা কর, আমি পারছি না, আমার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, আমি চাইছি, কিন্তু পারছি না', মীনার হিসহিসানি তখনও থামেনি, তার দেহ থেকে তখন কটুগন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, পরিমল বাধা দিতে গিয়ে কাতরস্বরে বলে উঠল, 'মীনা, সত্যি মীনা, আমি অক্ষম, আমি, কিন্তু যখন আমরা স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে পারবো, যখন এদিন কেটে যাবে, তখন আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে, আমি তোমাকে—', 'থাক্, থাক্' অন্ধকারে মীনার চোখ যেন শেষবারের মত জ্বলজ্বলালো, তার শরীর থেকে গরল বেয়ে বেয়ে পড়তে থাকল, আর পরিমল তার সমস্ত শরীরে সেই গরল মেখে মেখে আবছা তরল অন্ধকার থেকে আরও গভীর অতল অন্ধকারে পাড়ি দিতে দিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে থাকল, তখন মীনা মৃতের মতো অঘোরে ঘুমুচ্ছে তার পাশে।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ইতিহাসচর্চা যাঁদের কাছে বৃহত্তর স্বদেশী আন্দোলনের অংশ ছিলো, যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-৭২ খ্রী) সম্ভবত তাঁদের শেষ প্রতিনিধি। অতীতের পুনরুদ্ধার তাঁদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অপরিহার্য উপকরণ ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কলঙ্কমোচনের জন্য দেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনের কথা একাধিক প্রবন্ধে বলে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত আক্ষেপোক্তি পরবর্তী যুগে অনেকের প্রেরণাস্বরূপ ছিলো : 'বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।'

স্পষ্টত এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন যোগেশচন্দ্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপকতর প্রভাবে আমরা দেখতে পাই এক সময়ে কেউ কেউ স্কুল-কলেজ খুলেছেন, কেউ-বা কারখানা গড়েছেন, আবার কেউ হাসপাতাল তৈরি করেছেন। যোগেশচন্দ্র একই আদর্শে ঐতিহাসিক স্মৃতি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানত উনিশ শতকের বাঙলা—যে-নবজাগরণের যুগে আমরা জাতি হিসেবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছিলাম। যোগেশচন্দ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিরল নিষ্ঠার সঙ্গে গত শতকের প্রধান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতির ইতিহাস লেখা। সেজন্য দেখতে পাই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্দোলনে তাঁর সমান আগ্রহ। আধুনিক অর্থে তিনি বিশেষজ্ঞ হ'তে চাননি, সেজন্য তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহের ক্ষেত্র এতো বিস্তৃত। ইতিহাস রচনায় একটি পদ্ধতির প্রতিই তাঁর আনুগত্য ছিলো : সেটা হলো তথ্যনিষ্ঠা। জাতির আত্মজাগরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি কত লুপ্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্ধার করেছেন, কত বিস্মৃত মনীষীর জীবনী সংগ্রহ করেছেন।

এক্ষেত্রেও তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট : ভাষ্যের চেয়ে তথ্যে, বক্তব্যের চেয়ে বিবরণে তিনি অধিকতর মনোযোগী। ইতিহাস রচনায় কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন সেটা তাঁর কাছে কোনো সমস্যা ছিলো না। কেননা ঐতিহাসিকভেদে পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে ইতিহাসরচনায় প্রধান অবলম্বন হলো তথ্য। এই তথ্যসংগ্রহে তিনি সব সময়ে প্রাথমিক উৎসে গেছেন। সেজন্য গত শতকের কোনো ইতিহাস লিখতে গিয়ে যোগেশচন্দ্রকে উপেক্ষা করা অসম্ভব—সে হিন্দুমেলার ইতিহাসই হোক অথবা সাঁওতাল কিংবা নীল বিদ্রোহের কথা, ডিরোজিও থেকে রুস্তমজী কাওয়াসজী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর থেকে ভগবানচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু থেকে প্রমথনাথ বসু, রাধাকান্ত দেব থেকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত নানা ব্যক্তিত্বের বহুমুখী কর্মধারায় তাঁর সমান উৎসাহ দেখা যায়। কেননা তাঁর কাছে এঁরা তো শুধু ব্যক্তি নন, জাতির জীবনের বহুমুখী প্রকাশ। জীবনী রচনায় অনেকে উদ্বুদ্ধ হন ব্যক্তি-পূজার প্রেরণায়। যোগেশচন্দ্র ব্যক্তির জীবন থেকে জাতির ইতিহাসে যেতে চেয়েছিলেন।

এই কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যোগেশচন্দ্র একটি যুগের শেষ প্রতিনিধি। উনিশ শতকের বাঙলা দেশ নিয়ে এখনও অনেক তরুণ-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী গবেষক মূল্যবান চর্চা করছেন, কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধানের তাগিদ প্রধানত কেতাবি কিংবা ব্যক্তিগত। কাউকে ছোটো-বড়ো করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ। ঐতিহাসিক ইতিহাসেরও একজন—প্রবহমান ঘটনার মধ্যে নিজেকে একাত্ম ক'রে দেখার প্রচেষ্টা এ-যুগে বিরল।

সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে যোগেশচন্দ্র কর্মজীবনে যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রধানত যুক্ত ছিলেন তা হলো প্রবাসী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং পরে সরস্বতী প্রেস। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রভাবের কথা নতুন ক'রে কিছু বলার নেই। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি—এই কলঙ্কমোচনের জন্য যে-প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা সবচেয়ে ঋণী তা হলো সাহিত্য

পরিষদ। "সাহিত্যসাধক চরিতমালা"-র এগারোটি গ্রন্থের লেখক যোগেশচন্দ্র। তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষ জীবনী-রচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ সহযোগী ছিলেন তিনি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যুগে প্রবাসী মডার্ন রিভিউ-ও একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো। এখানে যোগেশচন্দ্রের সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ব্যক্তিত্বে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান, কিন্তু একটি জায়গায় এ'দের সবার মিল আছে এবং সেটি হ'লো উনিশ শতকের বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। এদিক দিয়ে যোগেশচন্দ্র তাঁদের সহধর্মী।

কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার প্রেরণায় শ্রীসরস্বতী প্রেসের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, রমেশ রচনাবলীর সম্পাদনা করেন যোগেশচন্দ্র বাগল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক দুষ্প্রাপ্য ও অপরিচিত লেখা ও চিঠিপত্র তিনি পুনরুদ্ধার করেন। উক্ত প্রকাশনা বিভাগের সরলাদেবী চৌধুরানীর "জীবনের ঝরাপাতা" বইটির তথ্যপঞ্জির সংগ্রাহক তিনি।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের কথা। তিনি বহু জায়গায় এই দুই ব্যক্তির কাছে ঋণ স্বীকার করে গেছেন। লেখক ও শনিবারের চিঠির বিতর্কিত সম্পাদকের আড়ালে গবেষক-ঐতিহাসিক সজনীকান্ত চাপা প'ড়ে গেছেন। কিন্তু প্রাথমিক উৎস ঘেঁটে সংকলিত তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁর। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত এবং যোগেশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় ও গ্রন্থগুলি এক হিসেবে পরিপূরক। অন্যভাবে বলা যেতে পারে তাঁদের ইতিহাসচর্চার মধ্যে একটা যৌথপ্রচেষ্টা আছে। যোগেশচন্দ্র তাঁর আলোচনায় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পরস্পর নির্ভরতা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেখতে পাই ব্যক্তির কর্মধারার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণাকার্যের মূল্যায়নের উপযুক্ত সময় এখন নয়। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে তাঁর "হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত" (প্রথম সং ১৯৫৪),"ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা" (প্রথম সং ১৯৪১), "ভারতের মুক্তি-সন্ধানী" (১৯৪৭) ইত্যাদি গ্রন্থ আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণা হ'য়ে থাকবে। "হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের নতুন সংস্করণে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা ও সম্পাদিত গ্রন্থের, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। যোগেশচন্দ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'যখন বুঝিলাম দৃষ্টিশক্তি অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, তখন বিভিন্ন পত্রিকায় ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির একটি তালিকা করার কথা আমার মনে উদিত হয় এবং আমার স্নেহভাজন কয়েকজনকে দিয়া এইরূপে একটি তালিকা করাইতে প্রবৃত্ত হই। ডক্টর শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলকৃষ্ণ দেব, শ্রীমলয় বসু এই পর্বে আমাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিয়াছেন।...শ্রীমান কানাইলাল দত্ত এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হইয়া তালিকাটির পরিণত রূপ দিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রদত্ত আমার রচনার তালিকায় কেবল গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধই সন্নিবেশিত হইয়াছে।' এই তালিকাটির বিচিত্র বিষয় নিতান্ত অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। মৃত্যু এমন একটা উপলক্ষ যখন অতিপরিচয়ের অবজ্ঞার ব্যবধান সরিয়ে দেয়। সেজন্য আশা হয় হয়তো যোগেশচন্দ্রের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর একটি সংকলন শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—সেকাজ করবেন সাহিত্য পরিষদ কিংবা সাহিত্য সংসদ কিংবা সাহিত্য আকাদেমী।

গত জানুয়ারি মাসে দুটি মৃত্যু আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছে—দুটি মৃত্যুর মধ্যে পুরো এক সপ্তাহেরও ব্যবধান নেই। একটি যোগেশচন্দ্রের, অন্যটি ডেভিড ম্যাক্‌কাচনের। দেশ-কাল, শিক্ষা ও রুচিতে দুজনের মধ্যে কোনো মিল নেই কিন্তু বাঙলা সংস্কৃতির প্রতি মমতায় দুজনের সাধর্ম্যও উপেক্ষণীয় নয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, ওহাবি আন্দোলনের ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র আর পট-পোটোর সংগ্রাহক, মন্দিরশিল্পের অনুরাগী ডেভিডের সাধনা কি শেষ পর্যন্ত একই বিন্দুতে মিলিত হয় নি? ডেভিডের মৃত্যু হ'লো অতি তরুণ বয়সে, যখন তিনি পূর্ণোদ্যমে কর্মরত—তাঁর মৃত্যু অতর্কিত এবং আকস্মিক। এটা মৃত্যুর কাছে জীবনের পরাজয়। অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথচ সব সময়েই মর্মান্তিক,

কিন্তু একজন ঐতিহাসিক—যিনি কর্মক্ষম—তাঁর কাছে দৃষ্টিহীনতার চেয়ে বড়ো অভিশাপ নেই। তবুও তিনি হার মানেন নি। অন্যের সাহায্যে লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে গেছেন। নতুন বই লেখার পরিকল্পনা করেছেন। ভাগ্যের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস হ'লো মৃত্যুর অব্যবহিত আগের অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি নাকি বাঁ চোখের দৃষ্টি একটু একটু ফিরে পাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহে আরো অনেক কিছু লেখার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আরেকবার গৌরবহীন নিষ্ঠুর মৃত্যু সব আশাকে ভেঙে দিলো। মৃত্যুর কোনো মহিমা আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না—মৃত্যু সব সময়ে মনে করিয়ে দেয় মানুষের সীমাবদ্ধতা, তার ব্যর্থতা।

আমি ইচ্ছে ক'রেই এতোক্ষণ যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে কিছু বলি নি। কেননা তা হ'লো দারিদ্র্যের সঙ্গে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু এই যুদ্ধে যে তিনি হার মানেন নি তার প্রমাণ তাঁর কর্মজীবন, তাঁর রচনাবলি। ১৯০৩ সালে বাখরগঞ্জ জেলার কুমিরমোড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। লেখাপড়া শিখেছিলেন বাগেরহাট কলেজ ও সিটি কলেজে। পয়সার অভাবে এম.এ. পড়তে পারেন নি। ১৯২৯ সালে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে কর্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের পর কয়েক বছর দেশ পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তারপর ১৯৪১ সাল থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত একটানা কুড়ি বছর আবার প্রবাসীর সহসম্পাদকতা করেন। ঐ বছর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার দরুন অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।

সুধীর রায়চৌধুরী

একা এবং কয়েকজন

কিছুকাল আগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুঃখ করে বলছিলেন, তাঁর এক পরিচিত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি, কৃষকদের বোঝার জন্য এবং কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিটি কয়েক বছরের মধ্যে পুরো চাষা বনে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা-বার্তা, বেশভূষা, চালচলন তো বটেই, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও সেই গ্রামের মতো ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই কৃষক ও শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবে, লেনিনের এই বক্তব্য মেনে নিলে, প্রশ্ন ওঠে শ্রমিক বা কৃষকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে না গেলে কী করে সেই কৃষক বা শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব, সংগঠিত করা সম্ভব? কৃষকরা বা শ্রমিকরা কেন এই নেতাদের মেনে নেবে, বিশ্বাস করবে, যদি নেতা এবং নীত একই জগতের লোক না হয়?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশা, নেতা তাঁর উন্নত শিক্ষা বজায় রেখে পুরো গ্রামের অধিবাসীকে তাঁর পর্যায়ে উন্নীত করবেন। তা না করতে পেরে তিনি যদি নিজেই গ্রামের পর্যায়ে অবনীত হন তাহলে পার্টি একজন শিক্ষিত কর্মীকে হারাল। এক হাজারের ভারে এক অবনীত হতে বাধ্য, এক হাজারকে টেনে তোলার সামর্থ্য একার হতে পারে না। এই দ্বন্দ্বের নিরসন, সমাজতান্ত্রিকতার স্বার্থে কীভাবে হতে পারে, তা জানা নেই, তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁর এক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছেন। উপন্যাসের নাম একা এবং কয়েকজন। এ নামে তাঁর এক কাব্যগ্রন্থও ছিল। একই বিষয় নিয়ে তিনি লিখতে ভালোবাসেন বলেছেন। সুনীলের উপন্যাসটি সবে শুরু হয়েছে, তবে নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়, এটা তাঁর পুরোনো উপন্যাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তাঁর সব উপন্যাসের প্রধান চরিত্রই একা। জগতের ডামাডোলের মধ্যে, সমাজের গড্ডলিকাপ্রবাহে এই চরিত্ররা গা-ভাসাতে পারে না। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের বুদ্ধি এবং অনুভূতির পরিশীলতার জন্য তারা একা। উপন্যাসের বাকি কয়েকজন থাকে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রধান চরিত্রের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। তারা একা, বিচ্ছিন্ন, দুঃখিত।

সুনীলের প্রায় অপ্রকাশিত রচনার উল্লেখ করার কারণ হল এই, সুনীল একা নন। সুনীল, শীর্ষেন্দু, মতি, শ্যামল, সন্দীপন, দিব্যেন্দু, সমরেশ—আজ যাঁরা উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের সব উপন্যাসেই দেখা যাবে, প্রধান চরিত্ররা একা, তাদের পাশে, পিছনে, সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন আছে, যাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন না করতে পেরে তারা সবাই বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুঃখিত। এঁরা

অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো মুষ্টিমেয় নন, তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁরা সত্য বলে মনে করেন। এটা আবার তাঁদের নিতান্তই নিজের জন্য। আধুনিক উপন্যাস বলতে যাঁদের মনে পড়ে, কাফকা, জয়েস, কামু, সার্ত্র, বেকেট প্রত্যেকেরই এই দর্শন। সমাজ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন। এটা এঁদের সাহিত্যের মূল কথা।

ইয়েটসের সেই পংক্তি কটা মনে করা যাক,

Shakespearian fish swam the sea, far away from land;
Romantic fish swam in nest coming to the hand;
But what are all those fish that lie gasping on the strand?

বিশ্বসাহিত্যের তিনটি মূল পর্ব ইয়েটস যেভাবে দেখেছেন, কলিন উইলসন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: শেক্সপীয়ারের সাহিত্য ছিল প্রকৃতির সামনে আয়না তুলে ধরা, প্রকৃতিকে বড়ো করে দেখানো। শেক্সপীয়ারের সাহিত্যে ঘটনাটা মূল কথা, ঘটনাকে উদ্ঘাটন করার জন্য চরিত্র। ঘটনা অর্থাৎ সমাজ, পৃথিবী। রোম্যান্টিক সাহিত্যে চরিত্রটাই ঘটনা; চরিত্র প্রধান, ঘটনা তাকে উদ্ঘাটন করে। আধুনিক সাহিত্য সেই চরিত্র আবার ঘাটের উপর ছটফট করা। আয়নাটা চরিত্রের একেবারে সামনে তুলে ধরা; ঘটনা প্রায় নেইই এখানে। সমাজ প্রায় অদৃশ্য।

ইয়েটস বা কলিন উইলসনের কথা লুকাচও বলেছেন, একই মর্মে, তবে মার্কসীয় ভাষায়: সমাজ ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। সাবেকি উপন্যাসে ঘটনা ছিল প্রধান। চরিত্রে-চরিত্রে সম্পর্ক, আত্মীয়তাই ছিল মুখ্য। আধুনিক সাহিত্যে চরিত্র চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন, সমাজ আছে শুধু চরিত্রের পশ্চাৎপট হিসেবে। সাবেকি উপন্যাসে গতিশীলতা ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল, আশা ছিল; আধুনিক সাহিত্যে এর কোনটাই নেই, আধুনিক সাহিত্যে জগৎ জগৎ নয় স্থাণু। এর অর্থ এই নয় যে আধুনিক সাহিত্য বা উপন্যাসে কোন গতিই নেই। গতি ঘটনা হয়ত আছে, তবে পৃথিবীর মূল স্থাণুত্ব তা পালটাচ্ছে না। যেভাবে ডস্টয়েভস্কির গল্পে জেলের কয়েদীরা অবিরাম কাজ করে যায়, অথচ এই কাজে তাদের মন নেই, এই কাজ তাদের এগিয়ে দেয় না, তাদের চরিত্রকে মনকে সমৃদ্ধ করে না। কাজ তাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কর্তার ইচ্ছায় নিতান্তই কর্ম। আধুনিক উপন্যাসের চরিত্ররাও গতিশীল, কিন্তু ওই জেলের কয়েদীদের মতো। কাজ তাদের বিকাশ করে না, সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হয়ে এই জগতে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এদের কাজের ধরন হোমার বা টমাস মান বা গোর্কির মানুষের কাজের ধরন থেকে ভিন্ন। সেই মানুষেরা মানুষের অসাধারণ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, সেই সম্ভাবনা বিকাশ করার জন্য কাজ করে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে হয়ত তারা হেরে যায়, তাদের সম্ভাবনা বিকশিত হয় না, কিন্তু সম্ভাবনাটা যে ছিল, সে বিশ্বাসে কখনও আঁচড় লাগে না। আধুনিক সাহিত্যের মানুষের কাছে জগৎ, সমাজ অপরিবর্তনীয়, তাই মানুষও সেখানে অপরিবর্তনীয়। মানুষ বাইরের জগৎকে সহানুভূতিহীন দেখে ক্রমেই নিজের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় সেও জড় হয়ে যাচ্ছে, ফলে নিজের মধ্যে ঢুকেও সে শান্তি পাচ্ছে না, স্বস্তি পাচ্ছে না। শুধু সাহিত্যে নয়, আধুনিক যে কোন শিল্পকলাতেই এই ভিতরে ঢুকে যাওয়া, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ প্রধান হয়ে উঠছে।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অবধারিত ফল। যে অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তার সংস্কৃতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রধান হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। বাঙালী সংস্কৃতিতে এই চিহ্ন স্পষ্ট। সামান্য বিশদ করা যাক, সম্প্রতি প্রকাশিত, ধারাবাহিকভাবে, একটি উপন্যাস নিয়ে। লেখক বিমল কর, উপন্যাস "অসময়"।

এই উপন্যাসে একদিকে জ্যাঠামশাই, মোহিনী, শচীপতি; আর একদিকে অবিন; মধ্যে সুহাস এবং আয়না। মোহিনীর ঠাকুর্দা তাঁর শেষবয়সে স্বোপার্জিত আয় থেকে তাঁর গ্রামে একটা বিশাল বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সে বাড়ির এতগুলো ঘর, যার প্রয়োজন ঠাকুর্দার জীবদ্দশাতে তো নয়ই, তিনপুরুষ পরেও কাজে লাগবে কি না সন্দেহ। ঠাকুর্দা অবশ্যই বাড়িটা বানিয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর নাতিনাতনীরা প্রত্যেকেই ওই গ্রামে থাকবে, ওই বাড়িতে। তিনি অবশ্য টের পাননি, তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি পুরোটা পায়নি, তদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রবল হয়ে উঠছে। সবাই একসঙ্গে আছে বটে, কিন্তু শারীরিকভাবে, আত্মিকভাবে নয়।

ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর, জ্যাঠামশাই একমাত্র বেঁচে রইলেন, তাঁর ভাইপোভাইঝিদের আগলে ধরে, মায়ামমতার ক্ষীণ-গ্রন্থিটুকু আঁকড়ে। পুরনো সমাজের একান্নবর্তী পরিবার, সামন্ততান্ত্রিক সমগ্রতার বাহক হয়ে।

মোহিনী এই সামন্ততান্ত্রিক আত্মীয়তার মধ্যে সামান্য বিদ্রোহ। সামন্ততান্ত্রিক কুলাচার, পিতা কন্যার বিয়ে দেবেন ঘরবর দেখে, সেখানে কন্যার কোন মতামত জানার প্রয়োজন নেই। ঘর অবশ্য বাইরে থেকে কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু বরকে বোঝা যাবে কী করে? যে সমাজে ঘরই বর, বরের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, পরিবার ভালো হলে তার প্রতিটি লোক একই রকম ভালো হবে আশা করা যেত, সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগে ফাটল ধরেছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ করছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মেজাজ, চরিত্র। পরিবারের চরিত্রের সঙ্গে তার সদস্যের চরিত্রের মিল না-ও হতে পারে। মোহিনীর বাবা মোহিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাসে। নতুন যুগে ফল শুভ হলো না। মোহিনী নতুন যুগের, নতুন সংস্কৃতির মেয়ে, স্বামীর পরস্ত্রীকাতরতা দেখে, বিদ্রোহ করে, বাড়ি ফিরে এল। সামন্ততান্ত্রিক যুগ হলে, মোহিনী স্বামীঘরে গিয়েই তার অনাদর, অপমান মুখ বুজে সহ্য করত, এবং ভগবানের কাছে মিনতি করত স্বামীর সুমতি ফিরে আসার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক যুগ হলে সে স্বামিগৃহে গিয়ে স্বামীর অনাদর সত্ত্বেও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করত। নতুন যুগের মেয়ের পক্ষে তা সহ্য হওয়ার কথা নয়, সে ফিরে এল পিতৃগৃহে। তার অবশ্য সমস্যার সমাধান হলো না। তার ভাগ্যে ঘটল সামন্ততান্ত্রিক অনাদর অপমানের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিশাল বাড়ি আগলে সে আছে বটে, কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর, আয়নার বিয়ে হয়ে গেলে, সুহাস তো গ্রাম ছেড়ে চলেই গেছে, তার ভবিষ্যৎ, একটি শূন্য বাড়িতে শূন্য মন নিয়ে পড়ে থাকা। ইয়েটসের কবিতাংশের তৃতীয় পংক্তির উদাহরণ হয়ে।

শচীপতিও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির লোক। তাকে ঔপন্যাসিক রেখেছেন প্রতীক হিসেবে, অভিশপ্ত সামন্ততন্ত্রের প্রতীক, অভিশপ্ত পরিবারের প্রতীক; যে সুখী পরিবারে প্রতিটি সুখী লোক দুর্নিরীক্ষ্য কারণে মারা যাচ্ছে, যে পরিবারের শেষ সদস্য শচীপতিও দুরারোগ্য ক্যান্সারের রোগী। জীবনের পরিবর্তে যে কেবল মৃত্যুকে নিয়ে ভাবে, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি বাঁচানো যাবে না বলে যে সেই সম্পত্তি বেচে দান করে শেষ জীবনটা যেমন তেমন করে কাটিয়ে যেতে চায়। এই চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই, একেবারেই প্রতীক, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের সাক্ষ্য।

অপরদিকে সামন্ততন্ত্রের ঘোরতর শত্রু, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী অবিন। তার মায়ের চরিত্র সে পেয়েছে, যে মা কবিতা লিখেছিলেন, আমি থাকি নিজ মনে। অবিন কারো সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে না, বন্ধুদের সঙ্গে নয়, ব্যবসায়ের সঙ্গে নয়, সে ছন্নছাড়া, মনে, শরীরে। শেষ দিকে সে আত্মীয়তা খুঁজে পেলে আর-এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজারী মোহিনীর সঙ্গে।

মধ্যবর্তী চরিত্র হচ্ছে সুহাস আর আয়না। তারাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চায়, সুহাস চলে গেছে কলকাতায়, আয়না ভালোবাসে গ্রামের এক ছেলেকে। কিন্তু মোহিনী বা অবিনের তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য নেই, অভিজাত ব্যক্তিত্ববোধ নেই। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তাদের নাড়ির টান কাটেনি, শচীপতির জন্য তাদের মন কাঁদে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তাদের নিবিড় বন্ধন, আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিত্বলোপেও তারা অনাগ্রহী। ফলে তারা ঘরের নয়, পরের নয়, মাঝখানে একা। ফলে ব্যক্তিগত সুখ ভাগ্যে ঘটলে তারা সুখী, নাহলে যেনতেন প্রকারেণ মনুষ্যজীবন যাপন করে মরলেই হলো।

এই ছয়টি চরিত্র নিয়ে বিমল কর উপন্যাস রচনা করেছেন। "অসময়" নামটি থেকেই তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার, প্রত্যেক চরিত্রই অসময়ে জন্মেছে। তিনি অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক বলে সময়কে চিহ্নিত করেন নি, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। যে সমাজের চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা সৎ।

একথা বলার অর্থ এই নয় যে অসময় অত্যন্ত ভালো রচনা। বিমল করের চাইতে তরুণতর ঔপন্যাসিকেরা, সুনীল, শ্যামল, মতি, সন্দীপন, আরো ভালো লেখেন, ভাষায়, প্রাখর্যে, সম্পাদনায়, চরিত্রচিত্রণে। এঁরা তাঁদের প্রধান চরিত্রকে দেখেন আরো ভেতর থেকে। বিমল কর ফর্ম হিসেবে পুরনো প্রথা মেনে ছয়টি চরিত্রের জবানবন্দী দিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য তাঁর কাছে অতি পরিষ্কার থাকায় উপন্যাসটি স্কীমেটিক, পরিকল্পনামাফিক হয়ে গেছে, কল্পনা পাখা মেলতে পারেনি। উপন্যাসের একচতুর্থাংশ পড়ে আন্দাজ করে নেওয়া যায়, এর শেষ কী হবে, চরিত্রগুলো

যেভাবে শুরু হয়েছে সেইভাবে শেষ হয়েছে, কোন প্রবল আলোড়ন মধ্যে ঘটেনি। ভেতর থেকে না দেখার ফলে, চরিত্রগুলো নিষ্প্রাণ হয়েছে।

এটা বিমল করের অসামর্থ্যের জন্য ঘটেনি, তিনি যে বিষয়টি নিয়েছেন তা সৎভাবে লিখতে হলে এটা অবধারিতভাবে হতোই, হয়েছে। কারণ, বিমল কর তাঁর চিত্রিত জগৎকে দেখেছেন, সামনের দিকে তাকিয়ে নয়, পেছন ফিরে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলেননি, যে সমাজ শেষ হয়ে গেছে, তার বিবরণ তিনি দিয়েছেন, এটা ইতিহাস। যে জন্য বারবার মনে হয়, এ লেখা পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হতে পারত, এটা শরৎচন্দ্রের জগৎ। এই উপন্যাস বিমল কর আজ লিখলেন কেন, এটা একটা মস্ত ধাঁধা। শরৎচন্দ্রের সময় যদিও এই জগৎ, এই জগতের বিশ্লেষণ নতুন, জীবন্ত মনে হতো, আজ এটা নিষ্প্রাণ। কারণ কী? কারণ বিমল করের যে সমস্যা সেটা আজকের দিনের সমস্যা নয়, এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এটা আরো পরিষ্কার করে দেখা যাক।

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, ব্যক্তি তাদের স্বাতন্ত্র্য বিকাশ করার জন্য, একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধকূপ থেকে, বেরিয়ে আসছে। সামন্ততন্ত্র ভেঙে ধনতন্ত্র বিকাশ হচ্ছে। এটা বর্তমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ নয়। বর্তমান বাঙালী সমাজে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশের প্রতিফলন ঘটছে, ধনতান্ত্রিক অবক্ষয়তার চিহ্ন তার সংস্কৃতিতে ফুটে উঠছে। এখন ধনতন্ত্রের শেষ যুগ, সাম্রাজ্যবাদী যুগ, যে যুগে ধনতন্ত্র প্রগতিবাদী নয়, প্রতিক্রিয়াশীল। আজকের দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমস্যা, সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন ছেঁড়ার সমস্যা নয় ধনতন্ত্রের বন্ধন ছেঁড়ার সমস্যা। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ঘটে গেছে, এতই স্বাতন্ত্র্য যে ব্যক্তি এখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে পড়েছে। এখন আবার সমস্যা একার সঙ্গে অনেকের মিলন, সমাজের সঙ্গে একার মিলন। এটাই সমাজতান্ত্রিক সমস্যা। সম্পূর্ণ বাঙালী সংস্কৃতি দেখলে দেখা যাবে, এই সংস্কৃতিতে সামন্ততান্ত্রিক চিহ্ন আছে, ধনতান্ত্রিক চিহ্ন আছে, কিন্তু দুটোই ক্ষয়িষ্ণু, এই দুটো চিহ্নই নিঃশেষিত হয়ে নতুন কিছুতে পরিণত হতে চাইছে। এই নতুন কিছু হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বহুদূরে বটে, কিন্তু পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক এখন চেষ্টা করছে সমাজতান্ত্রিক মানুষ তৈরি করতে। এই চেষ্টা, আধুনিক জগৎ বিজ্ঞানের দৌলতে ছোট হয়ে এসেছে বলে, আমাদের দেশেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক মানুষ সৃষ্টির চেষ্টা আজ আর কাল্পনিক নয়, চীনে রাশিয়ায় আজ সেটা ঘটছে। সার্থক হয়েছে কি হয়নি, সেটা বড়ো কথা নয়, সংস্কৃতির জগতে নতুন একটা দিক খুলে গেছে আজ। তাই ব্যক্তির একাকিত্ব ঘোচানোর সমস্যাই আজ বড়ো সমস্যা।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য অবিন-মোহিনীর মিলন, আয়না-সুহাস মিলন মনে হবে সমস্যার সমাধান। কিন্তু এই মিলন ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি অনুযায়ী। অবিন-মোহিনীর মিলন সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে, অবিন-মোহিনীর মিলনের পরে তারা কীভাবে এগুবে, তা দেখা হয়নি, তার কী দ্বন্দ্ব হতে পারে, হবে, সেটা উপস্থাপিত হয়নি। সেই মিলন হচ্ছে সামন্ততন্ত্র ভেঙে ধনতন্ত্রের প্রকাশের চিহ্ন। সুনীল, সন্দীপন এই পর্যায় থেকে আরম্ভ করে লেখেন, ফলে তাঁদের জগৎ আরো আধুনিক। কিন্তু আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক জগৎ ছাড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক জগতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত নয়। তাঁদের জগৎ তিক্ত, বিচ্ছিন্ন, দুঃখিত, একা। বর্তমান যুগের সমস্যা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অতএব ব্যক্তিতান্ত্রিক জগৎ থেকে বেরিয়ে সমাজতান্ত্রিক মানুষ হয়ে ওঠা, একা থেকে সামাজিক হয়ে ওঠা।

সামন্ততন্ত্রেও অবশ্য মানুষ একা ছিল না, ছিল পরিবারের একজন, সমাজের একজন। সমাজতন্ত্রেও তাই হবে। কিন্তু দুই মানুষের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। সামন্ততান্ত্রিক মানুষ সামাজিক ছিল, যন্ত্রবৎ, স্বেচ্ছায় নয়। ব্যক্তির আপন ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্তরায় ছিল সেই পারিবারিক একান্নবর্তী পরিবার। সমাজতান্ত্রিক মানুষ সামাজিক, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়কভাবেই। নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই সেই মানুষ অপরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সহায় হচ্ছে, এই যে মানুষ, এর বিকাশ কী করে হবে, সেটাই প্রশ্ন। সেইজন্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুঃখই হচ্ছে এ যুগের সমস্যা, সুনীল-শ্যামল-সন্দীপনের দুঃখ নয়।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'জয়বাংলা' রেকর্ড প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের বিষয়ে, এতদিন পরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ গানের রেকর্ড পাওয়া গেল। এ-বিষয়ে আর একটি গান 'শোনো একটি মুজিবরের' থেকে, কেবল কথার দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত। এর সুর নিতান্তই গতানুগতিক, বলতে গেলে, যে-কোনো সাধারণ বিজ্ঞাপন-গানের মতো। নতুন গানটির নাম 'ও ভগবান', স্রষ্টা ও গায়ক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এইচ-এম-ভি-র 'জয় বাংলা' রেকর্ডের প্রথম পিঠের দ্বিতীয় গান। বোধহয় বলবার দরকার হয় না যে সেতারবাদন ক্ষেত্রে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে যে প্রচণ্ড অদল-বদল ঘটেছে তার প্রধান নায়ক পণ্ডিত রবিশঙ্কর—সঙ্গীতযোগী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সেতার বিষয়ক গবেষণা ও চিন্তাধারা সঙ্গীত সমাজের সামনে তিনিই তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আগমনের পর থেকেই সেতারের বারো অঙ্গের আলাপ প্রচলিত হল, সেতারের প্রতি পর্যায় বৃহৎ ও কণ্ঠসঙ্গীতের সমকক্ষ হয়ে উঠল। হাজার রকমের কঠিন কৃন্তন সেতারযন্ত্রে চালু হল, সেতারের চেহারা বদলে গেল—সেতারের দণ্ডে বীণার অনুকরণে একটি গোলক সংযুক্ত হল, এতে যন্ত্রের আওয়াজ আরো গম্ভীর হয়ে উঠল—খরজ, ষড়জ তারে গুরুগম্ভীর নিনাদ পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার হতেই প্রথম নিঃসৃত হল। আবার ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তুলেছেন মুলত তিনিই। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তিনিই সর্বপ্রথম খাঁটি দিশী সুরের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ করেন—সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে। কাজেই খাঁটি আধুনিক গানের ক্ষেত্রেও—যে-গান খাঁটি বিংশ শতাব্দীর ঘটনা বা মনোভাব প্রতিফলিত করে—যে তিনি দিকপাল এও বোধ করি আশ্চর্য নয়।

গানটির কথা ও সুর শিল্পীমনের একই উদ্দীপনার সৃষ্টি একই অনুভূতির বাহক—সব মহৎ গানের মতো। এতে কেবল কতগুলি বাংলাদেশের ঘটনাশ্রয়ী মামুলি কথা যে-কোনো একটা সুরে বাঁধা হয়নি। কথা ও সুর বাংলাদেশের দুঃখের অকৃত্রিম অনুভূতির ফল। গানের প্রধান জিজ্ঞাসা ঈশ্বর কেন বাংলাদেশকে ত্যাগ করেছেন—কেন বাংলাদেশকে পীড়িত ও রক্তাক্ত হতে দিয়েছেন। গানের সুর বাউল, কীর্তন ও ভাটিয়ালি সংমিশ্রণে নির্মিত বলে মনে হয়। প্রথম পংক্তি 'ও ভগবান খোদাতায়লা' খাঁটি ভাটিয়ালি সুরে গাওয়া। দ্বিতীয় পংক্তি 'মোদেরকে ছেড়ে কোথা গ্যালা'তে কীর্তনের রেশ পাওয়া যায়। অন্তরায় দুটি নিখুঁত ভাটিয়ালির ডাক—'কেন ইয়েই অবিচার, ইয়েই অবহেলা' এবং 'আর কত বল সইব হেলা'—(যা কোনো খাঁটি ভাটিয়ালি গায়ক ছাড়া আর কারুর কণ্ঠে সম্ভব আগে কল্পনাও করতে পারতাম না) লক্ষণীয়। কিন্তু এই সব মিশে একটি বেদনার আর্তনাদ, ঈশ্বরের প্রতি একটি করুণ বিলাপ : গানের কোন অংশ কোন বিশেষ ঢঙের লোকসঙ্গীত থেকে আসছে বোঝা কঠিন। এ এক আশ্চর্য কীর্তি। চতুর্থ পংক্তি 'যত দেখি, শক, তুফান বন্যাকে', শেষ দুটি কথার ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ। এই তুফান ও বন্যা কেবল যে প্রাকৃতিক ঝড় ও প্লাবন বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাই বোঝায় না, যে মানবিক বা পাশবিক ঝড় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তাও শ্রোতাদের অনুভূতির মধ্যে এনে দেয়।

গানের শেষের দিকে বহুকণ্ঠে অপূর্ব 'হারমনি' শুনে যেন মনে হয় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর পীড়িত আর্তনাদ কোনো এক দাবানলের ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্তরীক্ষে উঠছে।

মুদারা মধ্যম ও তার গান্ধার মাঝে মাঝে ছুঁলেও মুদারা পঞ্চম ও তার ষড়জের গণ্ডীর মধ্যেই গানটি প্রধানত নিবদ্ধ। শুদ্ধ স্বরই সাধারণত ব্যবহার করা হয়েছে তবে অতি কোমল নিষাদের কাতর প্রয়োগ গানের যন্ত্রণার অভিব্যক্তিকে আরো মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

একতারার সবুজ, গেঁয়ো টঙ্কার, বাঁশির করুণ ধ্বনি ও সন্তুরের মুক্তধারা গানের স্রোতে মিশে এক অবিস্মরণীয় পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে।

তবে কেবল গানটি লিখেই রবিশঙ্করের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। যদিও তিনি মুলত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী, গানের রস ফুটিয়ে তোলার ভার তিনি নিজেই নিয়েছেন। এতে কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু কাজটি দুরূহও বটে। অবশ্য এ-গান গেয়ে রবিশঙ্কর নিজেকে যে-কোনো উৎকৃষ্ট লোকসঙ্গীতশিল্পীর সমকক্ষ প্রমাণ করেছেন। কথা ও সুর থেকে যত স্বাদ ফোটানো সম্ভব ফুটিয়ে, 'গেলে'-কে 'গ্যালা', 'দুখ'-কে 'দোখ', 'লোক'-কে 'লক' এবং 'এই'-কে 'ইয়েই', পূর্ববঙ্গের যে-কোনো চাষীর ন্যায় উচ্চারণ করে, অতি কোমল নিষাদ থেকে চরম যন্ত্রণার বিষ নিঙড়িয়ে ও দুটি নিখুঁত ভাটিয়ালি ডাকের দ্বারা রেকর্ডের অন্যান্য অংশকে তিনি ম্লান করে

দিয়েছেন।

এবং রেকর্ডের অন্যান্য অংশের মধ্যে বৃহত্তম, পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও আলি আকবর খাঁ সাহেবের ঝিঁঝিট রাগে বাজানো যুগলবন্দী—তাঁদের সকল যুগলবন্দীর মতোই এটিও উৎকৃষ্ট হয়েছে। এর থেকে 'ও ভগবান'-এর মহত্ত্ব বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে ঝিঁঝিট রাগের প্রভাব খুব বেশী এই মনে করেই বোধহয় এঁরা এই রাগটিকে বেছে নিয়েছেন। বাজিয়েছেনও লোকসঙ্গীতের প্রধান তাল দাদরায়। তাঁদের সকল যুগলবন্দীর মতোই এটি শুনে মনে হয় দুই যন্ত্রের সুরস্রষ্টা একজনই, দুজন নয়। ওস্তাদ আল্লাউদ্দিন খাঁ সাহেবের যুগলবন্দী তালিম এবং দুই শিল্পীর অপরিসীম শিল্পবোধের এটিও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রেকর্ডের শেষের দিকে আশ্চর্য, রঙিন, সওয়াল জবাবের পরে দুই শিল্পীই একই সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত তান বাজিয়েছেন, কিন্তু কোথাও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি, আবার এ অংশে 'হারমনি'-র ব্যবহারও ঘটেনি। এও যুগল যন্ত্রসঙ্গীত বাদনের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ঘটনা—ঠিক এইভাবে দুটি যন্ত্র বোধহয় পৃথিবীর সঙ্গীতের ইতিহাসে কখনো বাজেনি। দৃঢ় সংযমের পরিচয় দিয়ে তবলা সঙ্গত করেছেন ওস্তাদ আল্লারাখা।

রেকর্ডের প্রথম গান সমবেতকণ্ঠে গীত 'জয় বাংলা' কিন্তু আমাদের খানিকটা হতাশা করেছে। ছড়ার সুর ও ছড়াকাটা ছন্দে পরিপূর্ণ এই গান মন্দ না হলেও যেন 'জয় বাংলা' শব্দে যে মেজাজটি আছে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারেনি। একটু যেন দায়সারা ভাবে নির্মিত, ঠিক যেন পণ্ডিতজীর যোগ্য সৃষ্টি নয়।

নীলাক্ষ গুপ্ত

স মা লো চ না

বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ত বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলা ও কলকাতার উল্লেখ্য পুরাকীর্তিগুলির বিবরণ প্রণয়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই সমস্ত বিবরণ আলাদা আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হবে। এবং দামও হবে বেশ কম। পূর্ত বিভাগের প্রকাশন কমিটির সভাপতি মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন : 'এগুলি (এই বইগুলি) সাধারণের ভাষায় লিখিত হইলেও, সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি বিষয়ক এক আকরগ্রন্থ (archaeological encyclopaedia of West Bengal)-এর অভাব পূরণ করিবে।' আলোচ্য গ্রন্থটি এই সিরিজের প্রথম প্রকাশন।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশ ভূমিকা। এই অংশে বাঁকুড়া জেলার নানা পুরাকীর্তির ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাঁকুড়া জেলার মন্দিরস্থাপত্য এবং মন্দিরের গায়ের অলঙ্করণের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের বিষয়বস্তু বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলির বর্ণনা। এদের বৃহত্তম এক অংশ জুড়ে আছে মন্দির, মন্দিরের গায়ের অলঙ্কার ও প্রতিমা। বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই সমস্ত পুরাকীর্তির সৃষ্টি তাদের পরিচয় দিয়ে ভূমিকার শুরু। বাঁকুড়ার মতো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবাহের মিলনে-মিশ্রণে যে বিচিত্র রূপভেদের উদ্ভব, লেখক তাদের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গ এবং মন্দিরস্থাপত্যের উপর তার প্রভাব। পরবর্তী আলোচনার অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন রীতির মন্দিরগুলির সাধারণ পরিচয়। প্রচলিত রীতিগুলির বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভবের সূত্র আলোচনা করে লেখক মন্দিরগঠনের কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু বলেছেন। সবশেষে আছে মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণের আলোচনা। প্রাক-মুসলমান বাংলাদেশে পোড়ামাটির অলঙ্করণের ইতিবৃত্ত, মুসলমান আমলে পোড়ামাটির অলঙ্করণের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু, শিল্পীদের পরিচয় প্রভৃতি নানা তথ্য এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও চরিত্রের কথা মনে রেখে বলা যায়, আলোচনার পদ্ধতি ও তার কাঠামোটি যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা মোটামুটিভাবে গ্রাহ্য।

যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ সাজিয়ে ভূমিকার রচনা, তার একটি অংশ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা সম্ভব, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিন্যাস ও তার বিষয়বস্তুর প্রভৃত বিবরণ সম্পূর্ণ বলে গ্রহণ করা যায়। শিল্পীবৃন্দের পরিচয় ও তাঁদের কার্যপদ্ধতির বিবরণও আগ্রহের সঞ্চার করবে।

উপরের বক্তব্য ভূমিকার একটি দিক। কিন্তু ভূমিকার বৃহত্তম অংশ জুড়ে আছে আরো একটি দিক। সে দিকের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভূমিকার মধ্যে বারে বারেই দেখা যায়, লেখক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সুযোগ কতোখানি, সে সম্পর্কে প্রশ্নের

অবকাশ আছে। বিশ্লেষণগুলি যে কার্যকারণসম্পর্কের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করছে, এমন নয়। তরলভাবে কয়েকটি মন্তব্যের মাধ্যমে কার্যকারণের একটি সম্পর্ক নির্দেশের প্রয়াস মাত্র। যেমন, সমতল ছাদের মন্দিরগুলিকে লেখক আর্য ও আর্যেতর ধর্মসমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল বলে মনে করেন। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন : স্থানীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ওপরেও যে এই (ধর্মীয়) সমীকরণের প্রভাব পড়েনি এমন নয়। সাবেক প্রথায় গাছতলায় বা মাটির বেদীতে উপাসিত এসব দেবদেবীর কৌলীন্যলাভের ফলে পৌরাণিক দেবদেবীরাও কিছুটা লৌকিকতার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছেন। একেবারে গাছতলায় স্থানান্তরিত না হলেও সাধারণ দালান-মন্দিরে তাঁদের আরাধনায় কেউ ত্রুটি ধরেনি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে, কি পৌরাণিক, কি লৌকিক দেবতাদের জন্য সমতলছাদের দালান-মন্দিরের যে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তা যে আর্য ও আর্যেতর ধর্মসমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল এমন মনে করা হয়ত অসমীচীন হবে না। 'সমতলছাদের দালান-মন্দিরের সঙ্গে লৌকিকতার সম্পর্কটা যে কী, সে-কথা লেখক বলেন নি। ওর আর্যত্ব কতোটুকু, তাও অনুক্ত। এধরনের মন্দিরে লৌকিক ও পৌরাণিক উভয় প্রকার দেবতারই যে পূজা হয়, শুধু এতেই লেখকের মনে হয়েছে দালান-মন্দির 'আর্য ও আর্যেতর ধর্মসমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল।'

সমতল ছাদের মন্দিরগুলি দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে 'এসব অনাড়ম্বর দেবালয়ের দৃষ্টান্ত কাছাকাছি থাকার ফলে অন্য শৈলীর মন্দিরগুলিও আকারে-প্রকারে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।' মাত্রাটা যে কী, এবং কিভাবে তা নির্দিষ্ট হয়েছে, সে সমস্ত বিষয় নিয়ে অবশ্য লেখক আলোচনা করেন নি। তবে, ভূমিকাটি পড়ে মনে হয়েছে, মাত্রাটা হল 'খুব একটা বড়ো না হওয়া' ধরনের একটা কিছু এবং ষষ্ঠদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরগুলিই তাঁর এই মন্তব্যের লক্ষ্য। মন্তব্যটির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য লেখক কোনো তথ্য উপস্থিত করেন নি। বস্তুতপক্ষে এই বক্তব্য প্রমাণ করার পক্ষে কোনো তথ্যও নেই। সমতল ছাদের দালান-মন্দিরের জনপ্রিয়তা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ঊনবিংশ শতকে তা আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা প্রধানত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতেই ব্যাপকতা লাভ করেছিল, অন্য কোথাও নয়। তাছাড়া, মন্দিরগুলির আকার যে কী হবে তা তো অষ্টাদশ শতকের আগেই স্থির হয়েছিল। আশে-পাশে সমতলছাদের অনাড়ম্বর দালান-মন্দিরের দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হবার মতো কারণ ঘটে নি। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মন্দিরগুলি কেন স্বল্পায়তন করে গড়া হয়েছিল, সে সম্বন্ধে লেখক আরো দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন : প্রথমত, মন্দির প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের বিত্তের অভাব। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে বেশি পাথর পাওয়া যায় না বলে 'বাঙ্গালী স্থপতিরা স্বল্পস্থায়ী ভঙ্গুর ইট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন বলে ইমারত পরিকল্পনা তাঁদের কঠোরভাবে সংযত করতে হয়েছে।' প্রতিষ্ঠাতাদের বিত্তাভাব যে অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইট স্বল্পস্থায়ী নয়। তাকে ভঙ্গুরও বলা চলে না। বাংলাদেশের মতো বৃষ্টিবহুল অঞ্চলেও নবম-দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত ইটের মন্দির এখনও দণ্ডায়মান। এর প্রমাণ পশ্চিম জটা (২৪ পরগনা), সাত দেউলিয়া (বর্ধমান), বহুলাড়া ও সোনাতপাল (বাঁকুড়া), দেউলঘাট ও পারা (পুরুলিয়া) গ্রামের মন্দিরগুলিতে। লেখক নিজেও বহুলাড়া ও সোনাতপালের মন্দিরগুলির উল্লেখ করেছেন। আর, চতুর্দশ শতক থেকে নির্মিত মন্দির-মসজিদ তো প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। ইটের ব্যবহার করতে হয়েছে বলেই সৌধপরিকল্পনা 'কঠোরভাবে সংযত' করতে হয়েছে এমন কথা ভাববার কি যথার্থ কারণ আছে? পাহাড়পুরে, মহাস্থান,

ময়নামতী প্রভৃতি জায়গায় পালযুগে যে-সমস্ত বিপুলায়তন মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল তাদের সবকটিরই উপাদান তো ইট।[১] মন্দিরগুলি কেন স্বল্পায়তন করে নির্মিত হয়েছিল তার কারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। এসম্পর্কে আলোচনাও চলছে।[২] নির্মাণ উপকরণের ভূমিক এক্ষেত্রে খুব যে গুরুত্ব-পূর্ণ এমন নয়।

বাংলাদেশের স্থাপত্যে চালারীতির উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম-ভক্তির প্রভাবে বাঙ্গালী সুরলোক-বাসী দেবতাকে একেবারে ঘরের মানুষ করে নিয়েছিলেন; আর সেই 'কাছের মানুষ' দেবতার জন্যই 'বাঙ্গালী মনীষা' চালারীতির মন্দির সৃষ্টি করেছিল। বাঙ্গালী বলতে লেখক এখানে বাংলা-ভাষাভাষী হিন্দুধর্মাবলম্বী জনসাধারণের কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ভিন্ন। চালা কুটিরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্থায়ী উপাদানে ধর্মীয় স্থাপত্যের পরিকল্পনা তো মুসলমানের; পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এর সৃষ্টি। অতঃপর পঞ্চদশ শতক ও ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলাদেশের সর্বত্র মুসলমানগণ যে-সমস্ত ধর্মীয় সৌধ নির্মাণ করেছিল, তাদের সবগুলির সঙ্গেই চালা কুটিরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সুস্পষ্ট: নীচু করে তৈরি এবং স্বল্প আয়তন। বাংলাদেশে মুসলমানগণের আঞ্চলিক ধর্মীয় স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলি। পঞ্চদশ শতকের শেষদিক থেকে বাংলাদেশে আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্যের যে ধারা চালা ও রত্নরীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, তার কুটিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত স্বল্প আয়তনের ধর্মীয় স্থাপত্যের উত্তরাধিকার নিয়ে। চালা কুটিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত স্বল্প আয়তনের ধর্মীয় স্থাপত্যের ধারা কেন যে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল, এবং কেনই বা সেই ধারা পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিপুল জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কারণ দেখা যাবে চতুর্দশ শতক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। আর তদানীন্তন কাল থেকে বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সত্তার প্রভাবে তার সৃষ্টিশীল আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের ধারায়। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং চালা কুটিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ধর্মীয় স্থাপত্য উভয়েই ঐ সমস্ত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালীর সৃষ্টিশীল আঞ্চলিক সত্তা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রভাবজাত, একথা ভাবার কোনো যুক্তি নেই। আর আর প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র কালানুক্রমের কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, চৈতন্যদেবের জন্মের অনেক আগেই চালাঘরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ধর্মীয় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্পূর্ণ হয়েছে। [এবং চৈতন্যদেব যখন চার বৎসরের বালক, অর্থাৎ ১৪৯০ খৃস্টাব্দে চালারীতির প্রাচীনতম মন্দিরটি নির্মাণের পথে।[৩]]

---

[১] পাহাড়পুরে (রাজসাহী জেলা) ভারতবর্ষের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহারটি উত্তর-দক্ষিণ ৯৯২´ এবং পূর্ব-পশ্চিম ৯১৯´ বিস্তৃত কেন্দ্রস্থলে যে-মন্দিরটি আছে তা ৩৫৬´ (উত্তর দক্ষিণ)×৩১৪´ (পূর্ব-পশ্চিম)। ময়নামতীর (কুমিল্লা জেলা) নব আবিষ্কৃত বিহারটি প্রায় বর্গাকার। এক এক দিকের পরিমাপ ৫৫০´। বিহারটির মধ্যে বর্গাকার মন্দিরটি প্রতি দিকের মাপ ১৭০´। মহাস্থানের (বগুড়া জেলা) নিকটবর্তী গোকুল গ্রামের লক্ষীন্দরের মেড়ে যে মন্দিরটির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার অধিষ্ঠান ছিল ৩০´ উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর। দুর্ভবশ এই ভিত্তিবেদীটি সুউচ্চ একটি সৌধের জন্য তৈরি হয়েছিল।

[২] Indian Anthropological Society *Nirmal Kumar Bose Felicitation Volume* নামে একটি গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করতে চলছেন। এই গ্রন্থের 'Religious Architecture in Bengal (15th-17th Century): A Study of the Major Trends' নামে একটি প্রবন্ধে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[৩] আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায় চালারীতির প্রাচীনতম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল

লেখকের কতকগুলি মন্তব্য পড়ে মনে হয় যে যথেষ্ট গভীরে না গিয়ে এবং যথাযথ তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ না করেই তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ করার জন্য মহাবীর রাঢ় দেশ পরিভ্রমণে এসেছিলেন। পথবিহীন রাঢ় দেশ পরিভ্রমণের সময় স্থানীয় অধিবাসীরা মহাবীর ও তাঁর সঙ্গী যতিগণের উপর ঢিল মেরেছিল, এমনকি কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছিল। এই কাহিনীর উল্লেখ করে লেখক বলেছেন : 'এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় মহাবীরের সময় বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চল ছিল ঘোরতর অসভ্য এবং পশ্চাৎপদ।' এই মন্তব্য বাস্তবিক বিস্ময়কর! প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-পাঠক জানেন আর্যভূমির বাইরে যে সব জনগোষ্ঠীর বাস ছিল, বিভিন্ন সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে অসংখ্য ধিক্কার ও বিরূপ মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে এই ধরনের অনেক উক্তি শোনা যাবে। তবে এই সমস্ত উক্তি পড়ে গ্রন্থকারের মতানুবর্তী হলে বলতে হয়, আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে, বাংলাদেশের অধিবাসীরা ছিলেন সভ্যতাবিমুখ এক জনগোষ্ঠী। কিন্তু এই সকল উক্তির যাথার্থ্য সন্দেহাতীত নয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'মনে রাখা প্রয়োজন এই সমস্ত উক্তি আর্যভাষাভাষী এবং আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেদের উক্তি, গৌড়-পুন্ড্র-বঙ্গের অনার্য বা আর্যপূর্ব লোকেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচারব্যবহার সম্পর্কে এঁদের জ্ঞানও ছিল না, শ্রদ্ধাভক্তিও ছিল না। তাঁহারা সুপ্রাচীন কাল থেকে ইঁহাদের অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন।[*] উপরন্তু আর্যভূমির বহির্ভূত জনগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে আর্যভাষাভাষীদের বিরোধও ছিল প্রবল। আর্য সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ তাঁদের ওই বিরুদ্ধতা ও অবজ্ঞার কথা প্রায়ই প্রকাশ করতেন। আচারঙ্গসূত্রের কাহিনী সেই বিরোধ ও অবজ্ঞার ইঙ্গিত বহন করছে।'[*] এই সমস্ত সম্ভাবনার কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে গ্রন্থকার প্রাচীন রাঢ়দেশবাসীদের বিনাদ্বিধায় অভিযুক্ত করেছেন। আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে বাংলাদেশের অধিবাসীরা যে অসভ্য ছিলেন, এ ধারণা লেখকের মনে বদ্ধমূল। এ ছাড়াও তিনি মন্তব্য করেছেন, 'সভ্যতার উন্মেষকালেই জৈনধর্মের প্রথম তরঙ্গ বাঙ্গালাদেশে' এসে পৌঁছেছিল।

এধরনের আর একটি উক্তির উল্লেখ প্রয়োজন। মন্দিরের উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন : 'সহজলভ্য এই মূল উপকরণের (ইটের) ব্যবহার যখন শুরু হয়, তখন বাঙ্গালীর চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সব থেকে সরল রূপ দোচালার আদলেই যে প্রথম মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল, এমনই মনে হয়,' বক্তব্যের সমর্থনে যে কোনো তথ্য-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, এমন নয়। ইটে তৈরি যে সমস্ত প্রাচীন মন্দিরের পরিচয় জানা যায়, তাতে প্রাক-মুসলমান কালের মন্দিরেরও দোচালা হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। চালারীতির প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত ঘাটালের (মেদিনীপুর জেলা) সিংহবাহিনী মন্দিরের চারচালার অনুকরণে গঠিত। অতএব লেখকের অনুমান—ইটের প্রাচীনতম মন্দিরগুলি দোচালার আদলে নির্মিত—যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

গ্রন্থটির ভূমিকায় তথ্যগত ত্রুটিও অনেক। এই ত্রুটি অনেকখানি ঘটেছে বিষয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না করার ফলে। মন্দিরগুলির আভ্যন্তরিক আচ্ছাদনের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে মুসলমান বিজয়ের পরে 'এলেন মুসলমান

১৪৯০ সালে। মন্দিরটি ঘাটাল শহরের (মেদিনীপুর জেলা) কোন্নগর পল্লীতে অবস্থিত সিংহবাহিনীর উৎসর্গীকৃত দেবালয়।)

[*] নীহাররঞ্জন রায়। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব),' (কলকাতা, ১৯৪৯), পৃঃ ১৩২।

[*] উপর্যুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৮, ৫৯২-৯৩।

স্থপতিরা তাঁদের খিলান ও গম্বুজ নির্মাণের বিদেশী অভিজ্ঞতা নিয়ে। দু-এক শ বছরের মধ্যে তাঁদের হিন্দু সহকর্মীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে খাড়া দেওয়ালের চার কোণে, প্রয়োজনীয় উচ্চতায়, লহরার বিন্যাস করে তার উপর বৃত্তাকার গম্বুজ স্থাপন করা চলে। তারপর প্রতিস্তর ইট ধাপে ধাপে একটু একটু করে এগিয়ে দিয়ে গম্বুজের চারদিকের বৃত্তাকার দেওয়ালকে এক শীর্ষবিন্দুতে মিলিয়ে দিতে এজনাই অসুবিধা হয়নি যে মোটামুটি একইভাবে তাঁরা ছাদের চার দেওয়ালকে চারটি পৃথক চালার আকারে একত্র করতেন। মুসলমানরা বাংলাদেশে arcuate গঠনকৌশল প্রবর্তন করেছিলেন।' লেখকের বক্তব্য পড়ে মনে হয় arcuate গঠনকৌশল ও ঐ কৌশলে গম্বুজ নির্মাণের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। গম্বুজে গঠিত আচ্ছাদনের কথা বলতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে গম্বুজ দিয়ে যে-ক্ষেত্রটির আচ্ছাদন তৈরি করতে হবে তার আকার কেমন হবে? অর্থাৎ তা বর্গ কিংবা বৃত্ত অথবা অষ্টকোণাকৃতি হবে? বাংলাদেশের অধিকাংশ মন্দিরেই গম্বুজ ব্যবহার করা হয়েছে বর্গাকার ক্ষেত্রের আচ্ছাদনের জন্য। এধরনের কোনো ক্ষেত্রকে গম্বুজের জন্য বৃত্তাকারে পরিণত করা সমস্যা বিশেষ। Arcuated গম্বুজের ক্ষেত্রে এসমস্যার সমাধান করা হয় দেয়ালের উপর ভাগে, প্রত্যেক কোণে, pendentive অথবা squinch ও pendentive বসিয়ে। বাংলাদেশের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক মন্দিরেই squinch-এর ব্যবহার হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে এবং আরো দু-এক জায়গায়, যেমন কাশিমবাজারের (মুর্শিদাবাদ জেলা) কাছে ব্যাসপুর গ্রামে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেও squinch-এর ব্যবহার অব্যাহত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের আর আর মন্দিরগুলোতে pendentive-এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের মন্দিরগুলিতে pendentive-এর ব্যবহারই বেশি। Squinch-এর সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা যাবে খিলান ও তার দুপাশে স্বল্পবিস্তৃত pendentive। এরা একসঙ্গে গম্বুজের অবস্থানের জায়গা তৈরি করে দেয়। যেখানে শুধু pendentive-এর ব্যবহার, সেখানে pendentiveগুলির মধ্যবর্তী অংশে দেয়ালের শীর্ষদেশটি সাধারণত অর্ধবৃত্তাকার করে গড়া। এক্ষেত্রে pendentiveও দেয়ালের অর্ধবৃত্তাকার শীর্ষভাগে উপর দিয়ে গম্বুজটি ঘুরে যাবে। Squinch সমস্ত অবস্থাতেই arcuated, কিন্তু pendentive-এর গঠন arcuated ও corbelled (উল্টা কাটান বা লহরা প্রয়োগে গঠিত) দুরকমেরই হতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মন্দিরগুলিতে corbelled ও arcuated দুরকমের pendentive-এর দেখা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের মন্দিরে pendentive অধিকাংশ ক্ষেত্রেই arcuated। লেখক যে বলেছেন দেয়ালের কোণে লহরা সাজিয়ে অর্থাৎ corbel প্রয়োগ করে গম্বুজের অবস্থান ক্ষেত্র গঠন করা হয় তাতে স্বভাবতই মনে হবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের corbelled pendetive-কেই তিনি সাধারণ নিয়ম বলে করেছেন, গঠনকৌশল ও গঠনপদ্ধতির সাধারণ পার্থক্যটা বুঝে উঠতে পারেন নি।

আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলমানরা বাংলাদেশে যেধরনের গম্বুজ চালু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ arcuated। Voussoir প্রয়োগে নির্মিত এই সমস্ত arcuated গম্বুজে ধাপে ধাপে, একটু একটু করে শীর্ষের দিকে এগুবার কথা। অর্থাৎ লহরা প্রয়োগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশের মন্দিরগুলিতে যে ধরনের গম্বুজ দেখা যায়, তা প্রায় সব জায়গাতেই arcuated গম্বুজ। দু-চারটি ক্ষেত্রে, যেমন বিষ্ণুপুরের জোড়-বাঙ্গালা কৃষ্ণ রায় মন্দিরের গর্ভগৃহে, শ্যাম রায় মন্দিরের গর্ভগৃহে ও কেন্দ্রীয় চূড়ায় এর ব্যতিক্রম; তার অর্থ, corbelled গম্বুজের দেখা পাওয়া যাবে। মুসলমানরা এদেশে যে স্থাপত্যকৌশল ও নির্মাণপদ্ধতি

সঙ্গে করে এনেছিলেন, সে সমস্ত প্রচলিত হবার আগে মন্দিরের ভেতরের আচ্ছাদন গঠিত হত। উল্টা কার্টনির কৌশলে ইট বা পাথরের স্তরগুলিকে ধাপে ধাপে শীর্ষের দিকে তুলে দেওয়াই প্রথা। নীতি ও প্রক্রিয়ার প্রশ্নে উল্টা কার্টনির কৌশল arcuated গঠনকৌশল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সমস্ত মৌল পার্থক্য এবং মন্দিরগুলির গঠনকৌশল সম্পর্কে লেখকের ধারণাগুলি যে অস্পষ্ট, মন্দিরের গম্বুজ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তিই তার প্রমাণ।

উল্টো কার্টনি প্রয়োগ করে মন্দিরে যে লহরার ছাদ নির্মাণ করা হয় লেখক তাকে এক নতুন নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর দেওয়া নাম: 'ধাপযুক্ত চারচালা'। উল্টো কার্টনির গঠন-পদ্ধতিতে চারদিকের দেয়ালের উপর থেকে ইট বা পাথরের প্রতিটি স্তর তার নিচের স্তর থেকে আচ্ছাদিত ক্ষেত্রের কেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উপরের দিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পাথরের মন্দিরে ছাড় প্রশস্ত হয় বলে এধরনের আচ্ছাদন দেখতে হয় জিকুরাটের মতন। আর ইটের মন্দিরে ছাড় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলে আচ্ছাদনটি যতক্ষণ না চারটি অংশের মধ্যবর্তী অংশ একটি বা দুটি ইটের প্রসারে ঢেকে দেওয়া সম্ভব হয় সে পর্যন্ত টানা উঠে যায়। এই আচ্ছাদনগুলি দেখতে হয় উচ্চায়ত পিরামিডের মতো। উল্টো কার্টনি ছেড়ে গঠিত এই সমস্ত আচ্ছাদনের সঙ্গে খড় বা পাতার তৈরি আচ্ছাদনের (চালার অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয়) চরিত্র, আকৃতি বা কৌশলগত কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই এরকম উল্টো কার্টনির আচ্ছাদনকে কোনোভাবেই 'ধাপযুক্ত-চারচালা' নামে অভিহিত করা যায় না।

পঞ্চদশ-ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের মন্দিরনির্মাণপ্রচেষ্টায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব বলে লেখক আভ্যন্তরিক আচ্ছাদন গঠনের গম্বুজ ও ভল্টে এবং অলঙ্করণের পোড়ামাটির শিল্পের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। মন্দিরের তীক্ষ্ণাগ্র ফুলকাটা খিলান ও আটপলের স্তম্ভগুলিকেও ঐ প্রভাবের ফল বলতে তাঁর আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরগুলোতে মুসলমান স্থাপত্যের, বিশেষ করে বাংলাদেশের আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব আরো অনেক ব্যাপক এবং গভীর। Arcuate পদ্ধতি প্রবর্তন করে মুসলমানরা যে পরিবর্তন এনেছিলেন, তা একেবারেই মূলগত। তাঁদের তৈরি গম্বুজ, ভল্ট, খিলান এ সবই arcuate পদ্ধতিতে গঠিত। এই arcuate পদ্ধতির প্রভাবে আগের trabeated গঠনের অবসান ঘটেছে। ফলে লহরা সাজিয়ে আচ্ছাদন রচনা করা অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মন্দিরনির্মাণপ্রচেষ্টায় মুসলমান স্থাপত্যের সবথেকে বড়ো অবদান এই arcuate কৌশল এবং তারই প্রয়োজনে চুন-সুরকির মশলা।

পঞ্চদশ-ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত নির্মিত চালা ও রত্নমন্দিরের আসন ও তাদের আভ্যন্তরিক কক্ষ ও বারান্দার বিন্যাস চালাঘরের অনুকৃতিতে পরিকল্পিত। কিন্তু চালাঘরের আসন ও কক্ষবিন্যাস সর্বপ্রথম ধর্মীয় স্থাপত্যে অনুকরণ করেছিলেন মুসলমানগণ। স্থায়ী উপাদানে চালাঘরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে সৌধ গড়তে গেলে তার রূপরেখা যে কী হবে, তাও মুসলমানদের হাতেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আর যে ভাবকল্পনার ভিত্তিতে রত্ন-মন্দিরের সৃষ্টি, তাও এসেছে বাংলাদেশের আঞ্চলিক মুসলিম স্থাপত্য-ধারণা থেকে।

ভারতবর্ষের মন্দিরস্থাপত্যের আলোচনায় গ্রন্থকার শিল্পশাস্ত্রে লেখা নাগর, বেসর ও দ্রাবিড় এই তিনটি রীতির উল্লেখ করে বলেছেন 'প্রথমটি মোটামুটিভাবে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগে, দ্বিতীয়টি বিন্ধ্য পর্বত থেকে কৃষ্ণা নদী অবধি অঞ্চলে ও তৃতীয়টি কৃষ্ণার দক্ষিণে বিকশিত হয়েছিল।' কিন্তু একথা তো অনেক কাল আগেই স্বীকৃত হয়েছে যে বেসর রীতির নাম শিল্পশাস্ত্রে থাকলেও ওই রীতি অনুসরণ করে কোনো মন্দির কখনো

নির্মিত হয়নি। কিছু এগুবোর পর লেখক বলছেন, 'উড়িষ্যার অনুসৃত নাগর শৈলীটি কিন্তু আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলায় অনুপ্রবেশ করেনি। সে নির্মাণ-প্রকরণের প্রধান লক্ষণগুলি হ'ল সুউচ্চ শিখরসংলগ্ন জগমোহন, আর সামনের নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ, একাধিক উপ-মন্দির ও প্রাকারবেষ্টিত অঙ্গন।' কথাগুলি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। অন্যান্য অঞ্চলের মতো উড়িষ্যাতেও শিখর মন্দিরের আদি বৈশিষ্ট্য রথকাসন, রথ-পগ বিভক্ত প্রলম্ব দেওয়াল ও শিখর এবং শিখরের বক্ররেখায় বিধৃত ক্রমহ্রস্বমান আকারে ঊর্ধ্বগত। বাংলাদেশের শিখরমন্দিরে এসব কয়টি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। উড়িষ্যায় অনুসৃত 'নাগর' শৈলীর আদি বৈশিষ্ট্য বলে যে-লক্ষণগুলির কথা লেখক বলেছেন তাদের একত্র-সংস্থান ঘটেছিল উড়িষ্যায় নাগর, রেখ, মন্দিরের চূড়ান্ত বিকাশের সময়। আদিকালে এসবের একটিও দেখা যায়নি। আদিকালের রেখমন্দির অনতি-উচ্চ শিখরে আচ্ছাদিত এককক্ষবিশিষ্ট দেবগৃহ। সুতরাং, উড়িষ্যার সুবিস্তৃত মন্দির-সংস্থান বাংলাদেশে যে দেখা যায় না তার অর্থ এই নয় যে 'উড়িষ্যায় অনুসৃত 'নাগর' শৈলী তার আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলায় অনুপ্রবেশ করেনি।' যাহোক, উড়িষ্যার রেখমন্দির চর্চার প্রভাব যে বাঙ্গালাদেশে পড়েছে, একথাটি সত্য। তবে লেখক যেভাবে বলছেন, সেভাবে নয়। এই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে মন্দিরের আসনে, দেয়ালের অঙ্গবিন্যাসে ও গম্ভীর রূপ-রেখা রচনায়। উড়িষ্যায় রেখমন্দির নির্মিত হয়েছিল পাথরে। বাংলাদেশের পাথর ও মাকরা পাথরের মন্দিরগুলির গঠনকৌশলে উড়িষ্যার প্রভাব চোখে পড়ে। কিন্তু উড়িষ্যার প্রভাবেই যে বাংলাদেশের শিখরমন্দির নির্মিত হয়েছিল, এমন নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিখর-মন্দিরের নির্মাণ-উপকরণ ইট। পাথরের তৈরি শিখরমন্দিরের গঠনকৌশল থেকে ইটের শিখর মন্দিরের গঠনকৌশল অনেক আলাদা। এই পার্থক্য বাংলার শিখরমন্দিরগুলিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বহিরঙ্গের রূপরেখার প্রশ্নে পাল-সেন আমলের সমুন্নত ইটের শিখর-মন্দিরগুলির লঘুভার, উচ্চায়ত শিখরের রূপরেখায় আঞ্চলিক ভঙ্গী সুস্পষ্ট। এই মন্দির-গুলিতে অলংকরণের যে বিন্যাস দেখা যায় তাও আঞ্চলিক রীতি অনুসারে রচিত। পুরুলিয়া-বর্ধমান জেলার পাথরের মন্দিরগুলিতেও একই ঘটনা ঘটেছে। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় অঞ্চল জুড়ে যে ধরনের শিখরমন্দিরের প্রচলন দেখা যায় তার সঙ্গে উড়িষ্যার রেখমন্দিরের কোনো সাদৃশ্য নেই। বাংলাদেশের শিখরমন্দির ও তার উপর উড়িষ্যার প্রভাব আলোচনা করতে হলে এসব কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অথচ আলোচনা শুরু করে লেখক শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গেছেন।

একই বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। 'বাঁকুড়া অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মল্ল রাজবংশ' ভূমিকার এই অংশের শুরুতে লেখক বলছেন, 'খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বাঁকুড়া অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাস মোটামুটিভাবে জৈনধর্মের বিকাশ ও অবনতির ইতিহাস।' এর কিছু পরেই 'বাঁকুড়া অঞ্চলে ধর্মীয় বিবর্তন' সম্বন্ধে বলবার সময় লেখক মত বদল করেছেন। এখানে তাঁর মনে হয়েছে 'শুশুনিয়া পাহাড়ে রাজা চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপিটির উদাহরণে একথা প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এই অঞ্চলে বিষ্ণু (বাসুদেব) পূজা সম্ভবত প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলায় ইতস্তত প্রাপ্ত বহু বাসুদেব মূর্তি থেকেও মনে হয় জৈনধর্মের প্রতাপের কালেও হিন্দু উপাসনার এই ধারাটি কিছুমাত্র শুকিয়ে যায়নি।' অর্থাৎ 'সুপ্রচলিত' ছিল। তাহলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঁকুড়া অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাস জৈনধর্মের বিকাশ ও অবনতির সমর্থক হবার প্রশ্ন ওঠে না। আবার, 'বাঁকুড়া অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্য রীতি'

বিষয়ে আলোচনায় বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর শিবমন্দির অভিনব গঠনের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত। 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশের 'বিষ্ণুপুর' প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরের দেউল বা শিখর রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে যার জায়গা ছিল সব থেকে আগে বলে লেখকের ধারণা, তাও কিন্তু মল্লেশ্বরের এই মন্দিরটিই। বহু সংস্কারের ফলে মন্দিরটি যে অদ্ভুত আকার লাভ করেছে একথাও লেখকের জানা। তথাপি, ভূমিকা লেখার সময় এই মন্দিরটিকে অভিনব দৃষ্টান্তের নিদর্শন বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

লেখকের অভিব্যক্তিগুলিও ভিন্ন ধরনের মনে হয়। যেমন, 'সে (জৈন) ধর্মের জীবদ্দশায় তার অঙ্গ থেকে পুরাকীর্তিরূপে সে সব আভরণ খসে পড়েছিল' (পৃঃ ৪) বা 'এত যাঁরা (প্রচলিত দেবদেবীরা) কাছের, এত যাঁরা আপন, তাঁদের পাষাণে রচিত মজবুত কয়েদখানায় বন্দী ক'রে রাখতে বাঙ্গালীর প্রাণ চায়নি' (পৃঃ ৯)। শব্দের ব্যবহারেও লেখক মননের স্বাক্ষর রাখেননি। এবং শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থের প্রতি কোনো লক্ষ্য না রেখেই। বৈষ্ণব ও শৈব বিষয়বস্তুর রূপায়ন লেখকের কাছে 'পরমতসহিষ্ণুতা' ও ধর্মীয় উদারতার প্রতিচ্ছবির মতো 'ধর্মনিরপেক্ষতার' উদাহরণ বলেও মনে হয়েছে। শৈলী, রীতি ও আঙ্গিক এই শব্দ তিনটি যত্রতত্র এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে এদের যে কোনোটিকে অপর দুটির সমার্থক বলে মনে হবে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে 'পুরাকীর্তি পরিচিতি।' সবশুদ্ধ সাতাশিটি জায়গার পুরা-কীর্তির বিবরণ সম্বলিত এই অংশটি গ্রন্থের মধ্যে সব থেকে প্রয়োজনীয়। এই অংশে তথ্যেরও সন্নিবেশ ঘটেছে অনেক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন বিবরণগুলির বেশির ভাগই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। শুধুমাত্র এই কারণেই 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশটির বেশ খানিকটা গুরুত্ব পাবার কথা।

সরেজমিনে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশের মধ্যে ভুল এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের দৃষ্টান্তও অনেক। বাঁকুড়া জেলার প্রধান মন্দির-নির্মাণকেন্দ্র বিষ্ণুপুর সম্পর্কে তথ্যের অসম্পূর্ণতা বা ভুল-ভ্রান্তি যে অত্যন্ত গুরুতর সে কথা বোধ করি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। মন্দিরের ভেতরকার আচ্ছাদনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক অনেক তথ্যই অসম্পূর্ণ রেখেছেন। যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যেও ভুলত্রুটি চোখে পড়বে। লেখকের বক্তব্য: 'দুটি দোচালার ছাদই 'ভল্ট'-এর উপর স্থাপিত।' কিন্তু বিষ্ণুপুরের এই জোড়বাংলা মন্দিরটি সাধারণ জোড়বাংলার মতো করে গঠিত নয়। ভিতরে ও বাহিরে, দুক্ষেত্রেই মন্দিরটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। সাধারণ জোড়বাংলার মতো দুটি পৃথক আয়তক্ষেত্রের সমাহার রূপে নয়, একটি চতুরস্র ক্ষেত্র হিসেবে মন্দিরের ভিতরটা ধরা হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় বর্গাকার কক্ষকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মন্দিরটির আভ্যন্তরিক বিন্যাস। বাইরে এই চতুরস্র কক্ষটি দুটি দোচালার দিকে উঠে গিয়েছে। দোচালাগুলির শীর্ষ এর অনেকটা নিচে অবস্থিত। ভিতরে এই কেন্দ্রীয় কক্ষটির অন্তরা লহরা-বসানো গম্বুজে গঠিত এবং এই কক্ষটি ও তার পার্শ্ববর্তী পথগুলির জন্যই মন্দিরটির পিছনের চালা দুটির অন্তরা পুরোপুরি 'ভল্ট'-এর উপর বসানো যায়নি। এদের আচ্ছাদনের অনেকটা 'ভল্ট'-এর উপর, তাও আবার দুটি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত; আর কিছুটা ওই কেন্দ্রীয় চারচালা ঘরটির মধ্যে পড়ে গেছে। সামনের দিকের দুটি চালাই পুরোপুরি 'ভল্ট'-এর উপর অবস্থিত। দ্বারপথগুলির আচ্ছাদন রচিত হয়েছে প্রকৃত খিলান ও অংশবিশেষে লহরা প্রয়োগ করে। বিষ্ণুপুরের রত্নমন্দিরগুলির অন্তরা গঠনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যর সন্ধান পাওয়া যাবে squinch-এর ব্যবহারে। প্রথম দিকের

মন্দিরগুলিতে তো বটেই, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে নির্মিত মন্দিরেও squinch-এর ব্যবহার দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরসমূহের অন্তরা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই প্রশ্নটি বাদ দেওয়া ঠিক নয়।

বিষ্ণুপুরে বিষয়ে প্রবন্ধে ভুল তথ্য থেকে গেছে। নবরত্ন মন্দির প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন বসুপাড়ায় শ্রীধর মন্দির প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন: বসুপাড়ার শ্রীধর মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের একমাত্র নবরত্ন মন্দির। বিষ্ণুপুরে কিন্তু আরো একটি নবরত্ন মন্দির আছে। এটি কুনকুনা বাজারের একটি পরিত্যক্ত মাকরা পাথরের মন্দির। লেখক বিষ্ণুপুরে আটচালা মন্দির দেখেছেন মাত্র দুটি। কিন্তু বিষ্ণুপুরে আরো চারটি আটচালা মন্দির আছে। এদের দুটি মহাপাত্র পাড়ায়, একটি কবিরাজ পাড়ায় এবং একটি রাসমঞ্চের কাছে গোশালার মধ্যে। এদের সবগুলিই পুরা-কীর্তি হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। গোশালার শিবমন্দিরটিতে একটি লিপি আছে। লিপিটি মল্লরাজের দেওয়া প্রতিষ্ঠালিপি। গড় এলাকার মধ্যে জোড়বাংলা মন্দিরের কাছে শিখরমন্দির দুটি কেশর রায় ও নিকুঞ্জবিহারীর মন্দির নয়, মন্দির দুটি উত্তরমুখীও নয়। দক্ষিণমুখী মন্দির দুটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল রামেশ্বর ও রামনাথ শিবের উদ্দেশে। জোড়মন্দির নামে পরিচিত তিনটি মন্দিরের সবগুলিই নামহীন নয়। বড়ো মন্দির দুটির মধ্যে যেটি উত্তরদিকে, তার বিগ্রহ ছিলেন দোলগোবিন্দ। অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে সেটি এখন রাধাশ্যাম মন্দিরে।

সৈবতল-দক্ষিণরাঢ় গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দিরের অন্তরা সম্পর্কে লেখক বলেছেন: 'আটকোণা গর্ভগৃহের ছাদ কেন্দ্রীয় চূড়ার পদ্ধতিতে নির্মিত।' এই বক্তব্যের ভিত্তি কিন্তু ভুল তথ্য। গর্ভগৃহটি প্রকৃতপক্ষে বর্গাকার এবং তার আচ্ছাদন squinch এবং মধ্যবর্তী খিলানের উপর বসানো একটি গম্বুজ দিয়ে তৈরি। গর্ভগৃহ আটকোণা হলেও 'কেন্দ্রীয় চূড়ার পদ্ধতিতে' তার ছাদ নির্মাণের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ছাদ নির্মাণের এমন কোনো পদ্ধতি কখনো আবিষ্কৃত হয়নি। হতে পারে, squinch ও তার মধ্যবর্তী খিলান-গুলির উপরে স্থিত গম্বুজের বিন্যাস দেখে প্রকৃত ঘটনা না বুঝে লেখার ফলেই গ্রন্থকারের বক্তব্য এমন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ময়নাপুরের হাকন্দ মন্দিরটিকে লেখক পীড়া দেউল বলে উল্লেখ করেছেন। এও কিন্তু তাঁর ভুলের ফল। হাকন্দ মন্দির বস্তুতপক্ষে শিখর মন্দির। গন্ডীর (আচ্ছাদনের) মাঝখানে কাটা খাঁজটি লেখকের এই সিদ্ধান্তের কারণ। এধরনের শিখরমন্দির বাঁকুড়া জেলায় বিরল নয়। এল্যাটি এবং কোতুলপুর গ্রামে এর অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে। গন্ডীতে খাঁজ থাকলেই যে পীড়া-দেউল হয় না, সে কথা লেখক নিজেও জানেন। গ্রন্থে এল্যাটির মন্দিরটি তো শিখরমন্দির বলেই উল্লিখিত। গ্রন্থের শেষ অংশে আলোকচিত্রগুলির মধ্যে বিক্রমপুরের গোপাল মন্দির ও সিহরের শান্তিনাথ মন্দিরে শিখরদেউলসংলগ্ন পীড়া-দেউলের চিত্র দেখা যাচ্ছে। হাকন্দ মন্দিরের চিত্রটিকে একদিকে এই দুটি পীড়া-দেউল এবং অন্যদিকে এল্যাটি মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে মন্দিরটি আসলে কোন রীতির।

দেউলভিড়া গ্রামে (তালডাংড়া থানা) একটি পার্শ্বনাথের মূর্তিসহ কিছু জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মূর্তিগুলি দশম শতকের। গ্রামটিতে জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে এই যুক্তিতে মন্দিরটিকে লেখক জৈন মন্দির বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই সমস্ত মূর্তির সঙ্গে মন্দিরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কী, সে কথা বলেন নি। কিন্তু এই সূত্র ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে মন্দিরটির নির্মাণকাল পর্যন্ত নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। 'খৃষ্টীয় বারো শতক নাগাদ বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে জৈন ধর্মের প্রভাব একেবারে

বিলুপ্ত হয়েছিল। অতএব, এ পুরাকীর্তিটি নিশ্চয়ই তার আগের তৈরি। শিখরের ত্রিরথ বিন্যাসটিও লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ত্রিরথ বিন্যাসটি যে সব থেকে পুরনো; পঞ্চরথ, সপ্তরথ প্রভৃতি ব্যবস্থা যে পরবর্তীকালের, সে কথা সকলেই জানেন। সেদিক থেকেও মন্দিরটি যে প্রাচীন, সেই ব্যাখ্যাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বিশেষ ভুল আছে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে দেউলভিড়্যার এই পাথরের দেউলটিকে বাঁকুড়া জেলার সম্ভবত প্রাচীনতম দণ্ডায়মান মন্দির বলে সাব্যস্ত করতে হয়।' মন্দিরটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে রাখালদাস কী বলেছেন তার উল্লেখ না করেই লেখক তা সমর্থন করেছেন। তাছাড়া, লেখক নিজে যা বলেছেন, সেটুকুই অনুধাবন করা যাক। কাল নিরূপণের প্রচেষ্টায় যে দুটি যুক্তি দেওয়া হয়, তার প্রথমটির সপক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় যুক্তিটিও সারবত্তাহীন। শিখরমন্দিরের রথাকাসন গঠনের প্রশ্নে ত্রিরথ বিন্যাস যে সবথেকে পুরনো, সে কথা ঠিক। কিন্তু সমস্ত ত্রিরথ মন্দিরই যে পঞ্চরথ মন্দিরগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত আরো পুরনো, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। পঞ্চরথ আসন সুপ্রচলিত হওয়ার পরেও ত্রিরথ আসনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। একথা লেখকের জানা না থাকা অনুচিত। 'শিহর' নিবন্ধেই তার প্রমাণ আছে। শিহরের শান্তিনাথ শিরের মন্দিরটি ত্রিরথ হওয়া সত্ত্বেও লেখক 'স্থাপত্যশৈলীর বিচারে' তাকে সপ্তদশ শতকের বলে উল্লেখ করেছেন। দেউলিভিড়্যা মন্দির সমকালীন বলে উল্লেখ করেননি। আসনের আকারের ভিত্তিতে শিখরমন্দিরের নির্মাণকাল নিরূপণ করা যায় না। অন্য রকমের তথ্য-প্রমাণের দরকার হয়। এ ধরনের কোনো তথ্যপ্রমাণ 'দেউলিভিড়্যা' নিবন্ধে নেই।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। সে মন্দিরের আভ্যন্তরিক আচ্ছাদন সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার কথা। 'ধাপযুক্ত চারচালা' ও 'কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজ' এই আখ্যা দুটির ব্যবহার মন্দিরের অন্তর নিয়ে। লেখক যা বলেছেন তার অনেকটাই অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর করে তুলেছে।

গ্রন্থটির তৃতীয় অংশের বিষয়বস্তু, পুরাস্থান প্রভৃতির আলোকচিত্র। তবে একটি ছাড়া সবকটি আলোকচিত্রই লেখক কর্তৃক গৃহীত ও পরিস্ফুটিত। লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। বোধহয় আরো প্রশংসনীয় তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ ও তা পরিস্ফুটনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। তবে গ্রন্থের এই অংশ সম্পর্কেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমেই বলা উচিত বিন্যাসের কথা। বিষয় কাল কিংবা অঞ্চল অনুযায়ী এদের কোনোটিরই বিন্যাস আলোচনা হয়নি। আলোকচিত্রগুলি যেখানে গৃহীত, সেই জায়গাগুলির নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে আলোক-চিত্রগুলিকে সেই অনুযায়ী তিনি সাজিয়েছেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত শিখরমন্দিরগুলি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্যে কোথাও পালযুগের প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন, কোথাও সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন রীতির মন্দির; কোথাও বা ঐ সময়ের টেরাকোটার সজ্জা। বিষয়বস্তু নির্বাচনও ত্রুটিমুক্ত নয়। বিষ্ণুপুর-কেন্দ্রিক অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রত্নরীতির একরত্ন মন্দিরের নিদর্শনমাত্র একটি দেওয়া হয়েছে। সেটিও আবার ভাঙা। ভাঙা অংশের মধ্য দিয়ে গঠনকৌশল বা পদ্ধতির বিশেষ একটা কিছু যে বোঝা যাচ্ছে এমনও নয়। তবে অক্ষত মন্দিরগুলি বাদ দিয়ে এই চিত্রটি কেন দেওয়া হল, তা বোঝা দুষ্কর। এদিকে শিখরমন্দিরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে চোদ্দটি। পোড়ামাটির অলঙ্করণের যে সকল চিত্র দেওয়া হয়েছে, তাদের সবগুলিই সপ্তদশ ও ঊনবিংশ শতকের মন্দির থেকে নেওয়া। অষ্টাদশ শতকের কোনো নিদর্শন নেই। ইন্দাস, আকুই ও মেট্যালা গ্রামের অষ্টাদশ

শতকের মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিদ্যমান। এই সমস্ত মন্দিরগুলি থেকে অষ্টাদশ শতকের পোড়ামাটি শিল্পের দৃষ্টান্ত দেওয়া চলত।

'গ্রন্থকারের নিবেদনে' প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগ কর্তৃক গঠিত একটি প্রকাশন কমিটি রয়েছে। এই কমিটির 'বিশেষজ্ঞ সভ্যগণ......স্বেচ্ছায় তাঁদের বহুমূল্য সময় ব্যয় ক'রে প্রস্তাবিত প্রতিটি পাণ্ডুলিপির উৎকর্ষ সাধনে প্রতিশ্রুত।' স্পষ্টতই এই কমিটির সভ্যগণ আলোচ্য গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির জন্য বিশেষ সময় ব্যয় করেন নি। প্রকাশন কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মুখবন্ধে বলেছেন, 'গ্রন্থটি প্রস্তাবিত এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হওয়ায় ইহার লেখকের দায়িত্ব খুব বেশী। কারণ, ইহা যে প্রণালী ও আদর্শ সূচিত করিবে ভবিষ্যতেও তাহাই অনেক পরিমাণে অনুসৃত হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার এই দায়িত্ব সুচারু রূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন।' গ্রন্থকারের দায়িত্ব যে অনেকখানি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকাশন কমিটির সভাপতি মহাশয় যে কারণের উল্লেখ করেছেন, সে কারণে তো বটেই, অন্য কারণেও একই কথা বলতে হয়। গ্রন্থটির অন্যতম উদ্দেশ্য সাধারণভাবে আগ্রহী পাঠকের কাছে বাঁকুড়া জেলার শিল্প-সংস্কৃতির একটি বিবরণ উপস্থিত করা। লেখক যে সমস্ত জায়গার পুরাকীর্তির বিবরণ দিয়েছেন, অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে উক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেখে আসা সম্ভব নয়। অধিকাংশ পাঠকের কাছে এই গ্রন্থটি প্রাথমিক তথ্যের সূত্র। তাই যথাযথভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব লেখকের অনেকখানি। সাধারণভাবে আগ্রহী পাঠকের কাছে 'ভূমিকা' অংশটিও বেশ গুরুত্বের অধিকারী। বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের যে ধারণা হবে, তা তো এই ভূমিকানির্ভর। এই সমস্ত কারণেও লেখকের দায়িত্বের পরিমাণ যথেষ্ট।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

একটি দিনের জন্মদিনে—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পিলগ্রিম পাব্লিশার্স। কলিকাতা ৯। মূল্য ৩·৫০।

কবিতার সূক্ষ্মতা চিত্রভাষিত, শুধুমাত্র মনোময় সৃষ্টিতত্ত্ব বা আঙ্গিকের আলোচনায় তা ধরা পড়ে না। হয়তো সামান্য পরিচয় দেয়া যায় কবিতার একটি দুটি 'সুরঞ্জিত দিন' আলোয় তুলে ধরে, দরদী চোখের সামনে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় সেই প্রস্ফুটিত দিনের কথা বলা হয়েছে যা কবির 'মুগ্ধ মুকুরে' প্রতিফলিত; সম্পূর্ণ জন্মদিনকে তিনি সমর্পণ করেছেন পরমাত্মীয়ের উদ্দেশে—তাতেই তাঁর সার্থকতা। কিন্তু কবি জানেন সংবেদনশীল প্রত্যেক পাঠকই কবির এই জন্মদিনের অংশ গ্রহণ করবেন কেননা কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সার্বজনীন, সেখানে সকলেরই অধিকার।

জীবনের দানকে তৃতীয় কবিতায় বর্ণনা করা হল একটি বাক্যে,—'আশ্চর্য'। এর চেয়ে বেশি বলবার উপায় নেই :

'আমার ফুলের কাছে একটি মৌমাছি আসে রোজ,
জীবন আশ্চর্য—'

যৌগিক দিব্যতায় এখানে কবির তন্ময় আরাধনা। 'সুখে-দুঃখে সুখী' সমতায় চৈতন্য

ভরে উঠল, কোনো ভেদ নেই অথচ বৈচিত্র্য আছে। জন্মমৃত্যু একই সূত্রে বিধৃত; আশ্চর্যের আবর্তন চলেছে।

'অলক্ষ্য আঙুলে কার দিন-রাত্রি জপমালা ঘোরে।'

'উদ্যানী' কবিতা এই প্রসঙ্গে পড়া চাই। কবি সৌন্দর্যের প্রকাশে মুগ্ধ অথচ তিনি চান আরও বেশি সত্যকে, যা অন্তর্গত। বৃক্ষরোপণের ক্ষণে তিনি লৌকিক-অলৌকিক দূরের দ্বন্দ্বে ব্যথিত, কোথায় সেই 'গাছের চারা' যার সন্ধান প্রয়াসের দ্বারা পাওয়া যায় না। যা চরম আবির্ভাব। উপনিষদে যে 'অবাক শাখ' আশ্চর্য বৃক্ষের বন্দনা আছে, এ যেন তারই আবাহন। কিন্তু কোনো প্রকরণের ফলে সেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি, সম্যক দর্শন, জৈবিক সৃষ্টিশক্তি আয়ত্তাধীন হয় না যা একটি বৃক্ষরূপী সত্যে নিহিত। 'ইচ্ছার স্বভাবে' এবং 'ইচ্ছার প্রভাবে' সংযুক্ত মানস প্রতিভাত হয় হঠাৎ কোন একীভূত মুহূর্তে। কবিতাটি দুরূহ। অনেকগুলি চিত্রকল্প উপমার ব্যবহারে গ্রথিত হয়েছে পারমিক দৃষ্টির প্রসঙ্গ। উদ্যান, বৃক্ষ, ঊর্ধ্বে চিল এবং সামনের ধু-ধু সমুদ্র একটি সমগ্র ছবির আধার, তাকে অতিক্রান্ত অথচ প্রত্যাগত চেতনায় গ্রহণ করে শিল্পীর এই স্বগতোক্তি—

'আমার দুচোখে জ্বলে দৃশ্যহীন সাত সমুদ্রের
ধু-ধু নীল জল'

মন্ত্রবীজ এখানে সত্তার বিরাট ধারণায় পর্যবসিত,- উদ্যানের বৃক্ষরোপণপর্ব সর্বাস্তিত্ববোধের প্রতীক হয়ে দেখা দিল, সেই বোধ যা সাধনাকে ছাড়িয়ে যায়। খুব কম কথায় এই লিরিকের রচনা।

কবি কল্যাণকুমারের 'ত্রয়ী' কাব্যসংগ্রহের মূল ধুয়ো বোধহয় আত্মবিস্মৃতির সেই সুর যা 'সুখের ঊর্ধ্বে'; কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে আত্মহীনতা নয়, অন্যের সেবায় বিলীনতা।

'আমার দুঃখের পলি যদি কারো দ্বীপ হয়ে ওঠে'

অথবা 'আমার বৃষ্টিতে যদি কারো মাঠে জাগে ধান, গান'

এতেই কবির তৃপ্তি। সংসারে তিনি নির্লিপ্ত, চৈতন্যময়, এবং সহযোগী - একই সঙ্গে ত্রয়ী যোগ, যাকে গীতায় বলা হয়েছে 'অনাসক্তি যোগ'; কর্মযোগ তারি অন্তর্গত। অনেকগুলি আপাতবিরুদ্ধ বিরতি এবং নিবিড় সংগতি একই বৃন্তে ফুটে উঠেছে। শিল্পী, ধ্যানী, বিজ্ঞানী প্রত্যেকেই আপন অভিজ্ঞতায় এই রহস্যকে জেনেছেন।

তা ছাড়া এই কাব্যগ্রন্থের আরেকটি তন্ত্র থাকা-না-থাকার অবিচ্ছেদ্য তথ্যে প্রশ্নময়। মনের বিচারে যা বিভিন্ন, বিভঙ্গ, অনুভূতির সূক্ষ্ম স্বরে তা আবার এক হয়ে দেখা দেয়; কিন্তু নূতন সংশয়েরও যেন বিরাম নেই। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বিরহ সংসারের ভিতরে-বাহিরে আমাদের ঘিরে আছে, নিরন্তর প্রবাহের মধ্য দিয়েই চৈতন্যের আদ্রি-শক্তিকে প্রেতিকে খুঁজতে হয়। নানাভাবে এই কথা বলা হয়েছে—

'কালিন্দীর জলে দেখি কৃষ্ণ নেই, দিয়ে গেছে জলে
কে যে ঢেউ—'

রাধিকা সেই ঢেউকে দেখছেন, সেইখানেই প্রবল সান্নিধ্য এসে পৌঁছেছে। স্পষ্টত যে-অস্তিত্বের পরিচয় তা অনেক সময়েই অবাস্তব কিন্তু "কয়েক লক্ষ মৃত্যু যখন দেখি..." তখন 'ধ্বনি ফেরে মন্ত্রের মতন।' সুন্দর উক্তি। সেই ধ্বনিকে বলা যায় সেই শূন্য যাতে বেজে উঠেছে 'ওঁ'।

সহজ কথায় এই নিত্যমিলন নিত্যবিরহের কাহিনী অন্যত্র বলা হয়েছে; যেমন 'কাছে-দূরে' কবিতায়।

'যখন তুমি কাছে থাকো
তখন বলে মন,
'ভালো করে দ্যাখরে চেয়ে
নেই সে কাছে নেই'—

অথচ নেই-এর চমকেই জাগিয়ে তোলে পূর্ণের আভাস, "সে-এই"-এর উত্তর। সান্ত্বনা নয়, নিভৃত চরম প্রাপ্তির মূল্যে সব ভয়, বিচ্ছেদকে স্বীকার করেও জয়ী হবার এই আস্তিকতা।

মনে পড়ে একদা চিন্ময় অনুভূতিকে বলেছিলাম "দৃষ্টির দর্শন" -এই কবিতাগুচ্ছে তার পরিচয় স্পষ্ট। তালিকা দেবো না—ইঙ্গিতে জানাবো 'আঁধারী ট্রেন' পাহাড়ী নদী মাঠ পেরিয়ে চলেছে, স্বপ্নে-জাগার ভর্তি শত ছবি ভিড় করল; 'ভুতুড়ে গ্রাম, টেলিগ্রাফের তার, দূরের গাছ,' তেপান্তরের অন্ধকার -তার পর হঠাৎ তন্দ্রা-প্রখর সমস্ত চিত্রাবলী অদৃশ্য 'সশব্দে ট্রেন থামে তখন।'

অন্য একটি কবিতায় একফালি জোৎস্না-বাঁধা দৃশ্য, -তাতে 'বেদনায় পুরনো ভিটের নিঃসঙ্গতা' জ্বলে উঠলো -বাহিরে বেরোতে হল-

'মধ্যরাত্রির ডাকে নিশিতে-পাওয়া অবোধের মতো
চাঁদকে শরীরের বোধে পেতে ঘর ছাড়লাম।'

অবচেতনার পটে ঘটনার সারি চলেছে, কিছুই হারায় নি, নৈশ ভ্রমণের 'সেই মাঠে জোৎস্না অবিরাম টুপটাপ শিশিরে ভিজছিল।' রাত্রিকাহিনীর দরজা খুলে ঠেকল নতুন দিন: 'আকস্মিক ভোরবেলায়' আবার ফিরে আসা।

এই জাতীয় কবিতার আরেকটি বহুচিত্রভূষিত পরিচয় 'ভোরের রাস্তায়'। বিষয় দৈনিক। 'ভোর চারটেয়' প্রত্যহের জটিল সংসার প্রবাহিত, কখন শুরু হয়েছে কে জানে।

'কাক-ডাকা ভোরে শিশুকে মায়ের মতো রাস্তাকে স্নান করাচ্ছে দুই ওড়িশী মজুর। ফুটপাথে বেহারী ঠেলাওলা গায়ে তেল মেখে শরীরচর্চায় ভ্রূক্ষেপহীন। চায়ের দোকানে বড়ো গেলাসে চা খাচ্ছে পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-ড্রাইভার যেন আসন্ন ক্লান্তিকে চাপা দিতে।'

আরো বর্ণনা,

'মাড়বার বণিক পুণ্যলোভী অভ্যাসে ধান খাওয়াচ্ছে পায়রাদের। দুজন আধবুড়ো ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গঙ্গাস্নানে চলেছে।'

কলকাতার ভোরে কতরকম লোক, ব্যবসায়, জীবনের প্রথা এবং নামাবলী একটি দিনের পাত্রে ধরা পড়ল। 'জম্বুদ্বীপ' এই ভারতবর্ষের যে-গলিতে এত রং রূপ দেখা দেয় তার পরিণাম কোথায়, স্রোতোধারা চলেছে কোনদিকে—

'আমার গলিটা ভোরের রাস্তায় গিয়ে
কবে সমুদ্র হবে?'

এই কাব্যগ্রন্থের ধারণা অনেকখানি। এখানে 'রাম-রহিমের' বাংলা; বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির ভারতীয় পরিচয়; মিত্রাচারী কর্তাদের ভিয়েৎনাম (কাম্বোজ, চম্পা) এবং ভারত (কাম্বোজ, চম্পা) আবার মিলেছে সমবেদনায়, 'মেকঙে গঙ্গায়' সেই একই পুণ্যস্রোত বহমান, চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে। (বাংলাদেশের নূতন অসহ যন্ত্রণা শুরু হবার পূর্বে এই কবিতা রচিত)।

পূর্বদিগন্ত যেমন বারম্বার জেগেছে, তেমনি পশ্চিমের মানবসংগীত ধরা দিয়েছে এই কাব্যে। মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যু একটি কবিতায় অমরণ শক্তি পেল, অন্ধকার জাগল

'অসংখ্য সূর্যের সম্ভাবনায়'। কবিতায় আঁকা হল 'সাম্প্রত প্রমাণ মেমফিস' যেখানে একটি মৃত্যু 'সময়ের সীমা' পেরিয়ে গেছে। যেমন বিসমিল্লা সাহেবের সাহানা 'হাজার বিবাহের' শ্রুতি-মেশা, তেমনি ভারতের আকাশে বিশ্বের নহবত বেজে উঠেছে। কোথাও যেন চৈতন্যের বাধা ঘটেনি। অনেকগুলি কবিতায় এই প্রসঙ্গ ব্যক্ত হল (বিশেষ উল্লেখ করেছি তিনটি কবিতার থেকে—'প্রতিদিন আমি', 'অমৃত প্রার্থনা' এবং 'হাইকু ১০'।) পাঠক 'ফেরিওলা' কবিতাটি পড়তে ভুলবেন না। 'অমর্ত্যের নিবেদন' কবিতায় ভগিনী নিবেদিতার প্রতি অর্ঘ্য সার্বজনীন মাতৃহৃদয়ের বন্দনা।

এই কাব্যসংগ্রহ বুদ্ধ-স্তবে প্রণমিত, মহাপরিনির্বাণের স্বাক্ষরে সমাহিত, সমাপ্ত। পুজা এবং উজ্জ্বল-প্রখর অথচ শান্ত বৌদ্ধ দীপ্তি শেষ অংশের কবিতাগুলিকে ছুঁয়ে গেছে। কোথাও বা ভগবান বুদ্ধের আত্মকথা কবিতার ভাষায় একটু অধিক আত্মগত রূপ নিয়েছে, তাঁরই প্রশমিত বাক্যে দৃঢ়তর করা যেত। 'রেডিয়ো'তে ব্যবহারের জন্যে হয়তো মহাভিক্ষু আনন্দের প্রশ্নসুরে কিছু বদল হয়েছে। কিন্তু মহাকারুণিক একটি অনন্ত জীবনের আবহাওয়া ঘিরে আছে সর্বত্র, কাব্যে এই মহনীয়তা দুর্লভ।

দু-চার জায়গায় ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে এবং 'সাধু-অসাধু' ভাষার একত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে কবিকে একটুখানি সতর্ক করতে চাই। (বলা বাহুল্য বাংলা কাব্যে আজ 'অসাধু' ভাষাই নির্মল এবং প্রাণবন্ত।) প্রত্যক্ষ দোষী হিসাবেই এই কথা বলছি—কেননা আমার নিজের বহু অসার্থক ছন্দ পরীক্ষা কোনোদিনই ভুলিনি। তরুণ, বিদগ্ধ কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই যে ঐশ্বর্যময় শিল্পাধিকার এবং শুভ্রতা অর্জন করেছেন তারই সংবর্ধনায় এই ক্ষুদ্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করলাম। 'একটি দিনের জন্মদিনে' বাংলা কাব্যে উৎকৃষ্ট নবীন সৃষ্টি।

অভিনব এবং তেজস্ক্রিয় একটি কবিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কবিতার নাম 'প্রেম, মৃত্যু, প্রার্থনা'। শচীশ এবং দামিনীর সম্বন্ধকে "চতুরঙ্গ" আখ্যায়িকা থেকে তুলে নিয়ে সজীব অন্যতর মূর্তি দেবার সাহস এই কবিতায়। আধুনিক কাব্যের দেশী বিদেশী একটি প্রধান লক্ষ্যস্থল দৈহিক বাসনা এবং তারি হুতাশনে সর্বস্ব ত্যাগকে বড়ো করে তোলা। দেহকে অবজ্ঞা করার চেয়ে তাকে সত্যের অনেকখানি মূল্য দেয়া নিশ্চয়ই ধর্মের কোঠায় উচ্চতর, কিন্তু মাত্রা হারানো সমূহ বিনষ্টি। উল্লেখিত কবিতায় শরীরমনের উন্মত্ত 'অগ্নিময়' প্রেমকে জীবনের কাম্য বলতে বাধেনি অথচ কবি শ্রীমতী মিনি সেনের জবানিতে ত্যাগী শচীশের কাছেও 'শুদ্ধ' হবার ব্রত চেয়েছেন। কবিতাটি 'সর্ববাদিসম্মত' আধুনিক।

অমিয় চক্রবর্তী

বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ২৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

একটা সময় ছিলো যখন কারো জীবনী লিখতে গেলেই সেই মানুষটি হ'য়ে উঠতেন মহাত্মা বা দানশীল, কর্মবীর বা মহর্ষি। নায়কপুজার সে-যুগ শেষ হয়েছে। কিন্তু এ-কালের জীবনী-গুলো লোকপ্রিয় হওয়ার প্রত্যাশায় ঝুঁকে পড়ছে উপন্যাসধর্মের দিকে। একদিকে উপন্যাসের রম্যতার প্রলোভন, অন্যদিকে নিছক তথ্যের সংকলনে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা—এই দু-দিক

বাঁচিয়ে জীবনীকারকে তাই প্রায় বাজিকরের মতো চলতে হয়। শ্রদ্ধা তাঁর অবশ্যই থাকবে কিন্তু নির্মোহ হতে হবে তাঁকে। তথ্য ছাড়া জীবনী অসম্ভব, কিন্তু সেগুলোকে বেছে সাজাতে হবে তার গুরুত্ব—শুধু ঘটনার নিজস্ব গুরুত্বই নয়, জীবনের পরিণতিতে সেই তথ্যের আপেক্ষিক প্রাসঙ্গিকতা—অনুযায়ী। অর্থাৎ কোনো ঘটনায় চরিত্রটি কতোটা উদ্ভাসিত হচ্ছে বা মাত্রা পাচ্ছে তার অনুপাতে। আর সেই কারণেই একজন সমাজসংস্কারক কর্মীর জীবনে যে-ঘটনা যতোটা প্রয়োজনীয়, একজন কবি শিল্পী বা সাহিত্যিকের জীবনে অনুরূপ ঘটনা ততোটা প্রয়োজনীয় না-ও হতে পারে। কোনো দা ভিঞ্চি, গোটে বা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এই বিধির ব্যতিক্রম হবেন।

"বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য" লেখার সময় সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায় তথ্যের এই বাছাই করার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন মনে হয় না। অথবা বলা ভালো, বিভূতিভূষণের জীবনী লেখার পক্ষে বড়ো বেশি উপাদান তাঁর সংগ্রহে ছিলো, এবং তার কোনোটিকেই বাদ দিতে তাঁর মন সরেনি। বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের যাঁরা জীবিত, তাঁরা অকুণ্ঠভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এমন-কি যা নিতান্তই ব্যক্তিগত, এমন তথ্যও জানাতে দ্বিধা করেননি। প্রাথমিক এইসব তথ্যের মূল্যেই বইটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর কুড়ি বছরের মধ্যে প্রকাশিত হলো তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী। সুনীলবাবুর মন জীবনীকারের। কোনো আতিশয্য বা উচ্ছ্বাস নেই তাঁর রচনায়। প্রায় প্রতিটি ঘটনা এবং সেই ঘটনায় বিভূতিভূষণের প্রতিক্রিয়া সুনীলবাবু সঙ্কলন করেছেন অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে। প্রতিটি তথ্যই তিনি সূত্র সমেত উপস্থিত করেছেন। [যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে (যেমন, পৃ. ১১৬-৮, ১২৩-৪, ১২৭), সেগুলো কি ইচ্ছাকৃত?]

সুনীলবাবুর বিচার নিরাসক্ত হলেও বিষয়ের প্রতি ভালোবাসার অভাব নিশ্চয়ই নেই। তা না-হ'লে জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি বিভূতিভূষণের জীবনী রচনায় ব্যয় করতেন না, কেবলমাত্র বিভূতিভূষণেরই খাটের ওপর বই পড়াটাকে সময়ের অপব্যয়ই মনে করতেন। কিন্তু রচনার ভঙ্গী বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি তিনি। প্রলুব্ধ হয়েছেন বিভূতিভূষণের দিনলিপির মুগ্ধতাকে তাঁরই ভাষার কাঠামোর মধ্যে যথাসম্ভব রক্ষা করতে। তাই সমগ্র বইটিকে মনে হয় বিভূতিভূষণের আত্মকথার সুনির্বাচিত সঙ্কলন। শুধু উত্তমপুরুষ সর্বনামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিভূতিভূষণ নামটি আর ক্রিয়াপদের রূপও পাল্টায় সেই অনুসারে। যেমন, সুনীলবাবু লিখছেন:

> বিভূতিভূষণ সে সময় ঘোর অজ্ঞেয়বাদী, লেসলি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত। ঈশ্বর যে মানেন না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মানেন– তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, কেউ দিতে পারে না। (পৃ. ৩৫)

আর বিভূতিভূষণের নিজের লেখায় আছে:

> 'সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic, লেসলি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত, ভগবানকে মানি না যে তা নয় কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, দিতেও পারে না এই ছিল আমার মত।' (পৃ. ৩৭০)

অথবা সাতবেড়ের 'সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত' সেই লেখকের প্রসঙ্গে (পৃ. ১১৪ ও ৩৭১-২)।

সাহিত্যবিচার পর্বের প্রবন্ধগুলো সুলিখিত। সুনীলবাবু নির্মোহ হলেও যে নিঃসাড় নন, তার পরিচয় আছে এই অংশে। তাঁর মতামত নিয়ে তর্ক চলতে পারে, তাঁর বিচার প্রাচীনপন্থী হতে পারে, কিন্তু সেগুলোও নন্দনতত্ত্বের একটি স্বীকৃত ধারার অনুগত। তাঁর ভাষাও

এখানে বিভূতিভূষণের ভাষার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে। তবে সুনীলবাবু উপন্যাসের গঠন, তার শিল্পরূপ বিষয়ে আলোচনা করবেন, আশা করেছিলাম। 'অক্রুর সংবাদ' বাদ দিয়েই অভিজাত্য গ্রন্থমালায় "পথের পাঁচালী" অনুবাদ হয়ে গেলো। সেই অনুবাদের পাঠককে কি বঞ্চিত করা হলো, নাকি বিভূতিভূষণের রচনার সম্পাদনা করে তাকে শিল্পগুণে সংহত করা হলো? যদি শেষেরটা সত্যি হয়, তাহলে আজকের পাঠকের বিভূতিভূষণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কি একটাই কারণ—ক্ষয়িত গ্রামবাংলার কথাচিত্রী হিসেবে? "বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য" গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলাম না। 'প্রকৃতিবোধ' আলোচনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার ছাত্রসুলভ অবতারণা যেন বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের কথা মনে রেখেই করা হয়েছে। সব থেকে মজার, সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের 'সাহিত্যবোধ' বিষয়ক নিবন্ধটিই এই বইয়ের ক্ষুদ্রতম অধ্যায় (পৃ. ২২৬-২৯)। তবে এর জন্য দায়ী সুনীলবাবু নন, স্বয়ং বিভূতিভূষণ।

ডিগেলাম্ভের জীবনতরুর উপমা সুনীলবাবুর এতোই ভালো লেগেছে যে তার প্রায় একই ধরনের অবতারণা আছে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে (পৃ. ২০২, ২৩৬ ও ২৫৬)। আসলে সম্পাদনার অভাবই বইটির একটি বড়ো ত্রুটি। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভূতিভূষণ বিষয়ে অন্তত তিনটি বই বাঙলায় লেখা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, এই বইটি প্রথমে পরিকল্পিত হয় শুধু জীবনী ও সাহিত্যবিচার হিসেবে। ক্রমে বিভূতিভূষণের রচনার 'উৎস ও প্রসঙ্গ' পর্যায়ের অধ্যায়গুলো সংযোজিত হয়। ফলে জীবনী অংশে উৎস উল্লেখ করা সত্ত্বেও তথ্যপঞ্জি অংশে সেই প্রসঙ্গগুলোই আরো বিশদভাবে পরিবেশিত হয়। প্রায় আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে বিভূতিভূষণ ও অপুর কথকতা (প. ৭ ও ৩৫১), 'নূতনের আহ্বান' প্রবন্ধ পাঠ (পৃ. ১৩ ও ৩৪৪), মেনকা পিসিমা—ইন্দির ঠাকরুন (পৃ. ২-৩ ও ৩৫৩) প্রভৃতি প্রসঙ্গে। এই পুনরুক্ত পর্ব থেকে পাঠক বিশেষ কোনো নতুন তথ্যই জানতে পারেন না। যদি উপন্যাস বা গল্প অনুযায়ী উৎস নির্দেশের প্রয়োজনেই এই অধ্যায়গুলো সংযোজিত হয়ে থাকে, তাহ'লেও বলবো, একটি নির্দেশিকা দিয়েই এই কাজ চালানো সম্ভব ছিলো।

১৯৭১ সালে বইটি প্রকাশিত হলেও লেখক আধুনিক গবেষণারীতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত বলে বোধ হয় না। পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখে তিনি যে অভ্যস্ত নন, অনিয়মিত উল্লেখই সেটা চোখে পড়িয়ে দেয়। 'গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি' তালিকার বেশি কিছু হয়নি। ইংরেজি অনুবাদ দুটির ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশকের নাম নেই।

গাছপালার নাম বা উদ্ভিদতত্ত্বের পরিভাষা আমার আদৌ জানা নেই। তবে কয়েকটা হয়তো অনেকেই জানেন। যেমন প্রথম নামটি: 'অতিমুক্তলতা' (বইতে এর পরিচয় অনুল্লিখিত) আসলে বাঙলায় যাকে মাধবীলতা বলে তারই সংস্কৃত নাম। 'উলুটি বাচড়া' বা 'ছালট' কোনো উদ্ভিদের নাম নয়। বাচড়া শব্দের অর্থ পতিত জমি। 'ছালট' হলো গাছের বাকল। 'ছোয়ারা' খুর্মা বা গাছপাকা খেজুরের আটপৌরে নাম। 'ঝোড়' বলে সুপুরি গাছকে। 'বেনা ঝোপ' ('ঝোপ' আবার কেন?) খসখস। "অপ্রচলিত শব্দের অর্থ"-র তালিকায় উল্লেখসূত্র দেওয়া হয়নি। অনেক শব্দেরই একাধিক মানে আছে। যেমন 'আগুট' শব্দে 'কাপড়ের পাড়'ও বোঝানো হয়। সূত্রের উল্লেখ থাকলে প্রাসঙ্গিক অর্থ করা সম্ভব হতো।

'পরিশিষ্ট'-এ সংকলিত প্রবন্ধগুলি বইটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

স্বপন মজুমদার

Seven Samurai, A Film Script. *By* Akira Kurosawa. Lortimer Publishing Limited. London. £1·26.

চিত্রনাট্য ছাপানোর চল বিদেশে সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তার মধ্যে লরিমার প্রকাশনী নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহের পর্দা ছাড়া কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই। পুরোনো ছবির বিলুপ্তি এক হিসেবে অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি বিদেশে ফিল্ম লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে যেখানে পুরোনো ভালো ছবির প্রিন্ট সংরক্ষিত হয়। আর, এই ধরনের চিত্রনাট্য ছাপিয়ে ছবির বিষয় ও গঠনভঙ্গীর পরিচয় স্থায়িভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। চিত্রনাট্য হলো চলচ্চিত্রের মূল কাঠামো, যাকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। একটি চলচ্চিত্র রচনা করা, বলা বাহুল্য, প্রচুর শ্রম- ও সময়-সাপেক্ষ। কোন চলচ্চিত্র নির্মাণপর্বে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করা হয় না, তা হয় স্যুটিং সম্পূর্ণ হলে, সম্পাদকের টেবিলে, কাজের সুবিধামতো চলচ্চিত্র পরিচালক পরের ঘটনাকে আগে বা আগের ঘটনাকে পরে চিত্রায়িত করেন, সেজন্য পরিচালক যদি আগের থেকেই সমস্ত খুটিনাটি সমেত একটা চিত্রনাট্য করে নেন তবে পরে তাঁর কাজের পরিকল্পনা করে নিতে সুবিধা হয়। তবে সকল ছবির জন্য বা সকল পরিচালকের পক্ষে চিত্রনাট্য রচনা অপরিহার্য না-ও হতে পারে। এটা নির্ভর করে কাজের ধরনের উপর। সত্যজিৎ রায় যেমন, ছবির কাজ শুরু করার আগে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটি চিত্রনাট্য তৈরি করে নেবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন এতে তাঁর কাজের সুবিধা হয়, সময় বাঁচে, খরচও লাগে কম। আবার অনেকে একটা সামান্য খসড়াকে ভিত্তি করে, মূল ভাবকে মাথায় রেখে কাজের মধ্যে থেকে তাৎক্ষণিক ভাবনাকে অবলম্বন করে ছবি রচনার পক্ষপাতী।

নানা শিল্পের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাটক, সাহিত্য, সঙ্গীত সব কিছুরই অংশ রয়েছে। সব কিছুর নির্যাস নিয়েই এর মৌলিকতা একটি স্বতন্ত্র শিল্পমর্যাদা। কিন্তু চলচ্চিত্র যেহেতু চলমান, প্রতি সেকেন্ডে যার গতি চব্বিশটি ফ্রেম, তাই একে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে হলে নিয়মিত চর্চা আর অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব না। একই সময়ে কাহিনীর বিন্যাস, সঙ্গীতের প্রয়োগ, চিত্রকল্পের তাৎপর্যকে বুঝে একটি চলচ্চিত্রের প্রকৃত রসগ্রহণ সম্ভব। দুবার তিনবারের বেশী একটি ছবিকে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠে না, পরের ছবিটি কোথায় হারিয়ে যায়। ভবিষ্যতে কোন প্রসঙ্গে তার আলোচনার সময় একমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্যবিধ কোন উপায় নেই। অথচ সূক্ষ্ম ডিটেইলের কাজে সঙ্গীতের কোন প্রয়োগে, কোন দৃশ্য নির্বাচনে চলচ্চিত্র অনায়াসে এমন অনির্বচনীয়ভাব ধারণ করা সম্ভব যাকে দ্বিতীয় কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। তাই, চিত্রনাট্য ছাপা হলে পাঠকের প্রধান সুবিধা এই যে, যে ছবি ইচ্ছেমতো আর একবার দেখার সুযোগ নেই সে-ছবির কোন প্রসঙ্গকে চিত্রনাট্য পড়ে আর একবার মনে করে নেওয়া যায়। তবে সিনেমার রসগ্রহণ এতোই দর্শন- ও শ্রুতিনির্ভর যে যারা ছবিটিকে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় দেখেনি তাদের চিত্রনাট্য পড়ে ছবির পরিপূর্ণ রসগ্রহণ কোনমতেই সম্ভব নয়। সেজন্য বলা হয়, কোন একটি ছবির পর্দায় স্থায়িত্বকাল যেটুকু সময় তা ছাড়া দর্শকের কাছে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। কোন উপন্যাসের পাতা যেমন ইচ্ছেমতো পুনর্বার পড়া যায় চলচ্চিত্রের বেলায় তা সম্ভব কি? এজন্যেই, একালের আমরা বিগতকালের অনেক প্রতিভাধরের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন এইসকল ছাপানো চিত্রনাট্য পড়ে বুঝে নিতে পারি কোন ছবির বিষয় কী ছিল, গঠনভঙ্গীর প্রক্রিয়াই বা কিরূপ। যেমন ধরা যাক আলোচ্য ছবিটির কথা। ডোনাল্ড

রিচি, যিনি প্রায় তিন বছর জাপানে কাটিয়েছেন, জাপানের [illegible] সাথে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং চলচ্চিত্রের একজন [illegible] তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাপানী চলচ্চিত্র বলে গণ্য করেন। [illegible] একটি গ্রাম, চাষবাস করে, সেখানকার অধিবাসীদের বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়, কিন্তু [illegible] যে, বাইরের দস্যুরা এসে প্রতিবছরই উৎপাত করে সব ফসল কেড়ে নিয়ে [illegible] করে, বাধা দিতে গেলে মারমুখী হয়ে খুনজখমও করে। এজন্যে তাদের [illegible] শান্তি নেই। এ বছর গ্রামের প্রবীণেরা একজোট হয়ে ঠিক করল যে এর একটা নিষ্পত্তি [illegible] দরকার। লোকপরম্পরায় তারা শুনেছে যে অন্য এক গ্রাম সামুরাইদের নিয়ে [illegible] গ্রামকে দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। তারাও ঠিক করল যে তারাও সামুরাইদের [illegible] আনবে। এই সামুরাইরা হলো যুদ্ধ-বিগ্রহে নিপুণ ও সমস্ত দেশে বেশ উচ্চ মর্যাদায় আসীন, বীরের জাত, আমাদের দেশের রাজপুতদের মতো। এই গ্রামবাসীর ভাগ্য বেশ সুপ্রসন্ন, কেননা তারা প্রথমেই এমন একজন লোকের দেখা পেলো, যে তাদের মুখে সকল কথা শোনার পর তাদের সমস্যাকে নিজের মনে করে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হলো। ক্রমে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করে, নানা কায়দায় শক্তির বিচার করে সাতজন সবল ও নিপুণ যোদ্ধাকে বাছাই করে তারা গ্রামের অভিমুখে রওয়ানা হলো। গ্রামবাসীরা এই সাতজন সামুরাইয়ের রণকৌশলের সাহায্যে কিভাবে দস্যুর হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করলো সেভেন সামুরাই ছবিটির বিষয়বস্তু তাকে-কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে সামুরাইরা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে দস্যুদের ঘাঁটিগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য অভিযান চালায়, আক্রান্ত হয়ে পরাস্ত দস্যুরা প্রতিহিংসায় যখন গ্রামকে আক্রমণ করে তখন অনেক উন্নত ধরনের রণকৌশলে সামুরাইরা তাদের নিঃশেষ করে দেয়। এই যুদ্ধে চারজন সামুরাই নিহত হয়, বাকী তিনজন যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তখন সমস্ত বিষাদগ্রস্ততার মধ্যেই আনন্দ এই ভেবে যে সমস্ত গ্রামবাসী এখন নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। গ্রামবাসী আবার ফসল বোনার আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। যে বিষয়কে নিয়ে এই ছবি এবং যে প্রয়োগভঙ্গীতে তা প্রদর্শিত সেই বিচারে সেভেন সামুরাইকে বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ ছবির সাথে তুলনা করা চলে। ডোনাল্ড রিচি এই চিত্রনাট্যটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই সাথে তার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন 'Seven Samurai is an epic all right—it is an epic of the human spirit because very few films indeed have dared to go this far, to show this much, to indicate the astonishing and frightening scope of the struggle, and to dare suggest personal bravery, gratuitous action and choice in the very face of the chaos that threatens to overwhelm. চলচ্চিত্র কাহিনী এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, যে তাকে না-দেখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম সম্ভব না। এই ছবির প্রয়োগভঙ্গী সম্পর্কেও তার মতামত অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে খুবই [illegible]। জাপানী ছবি [illegible]সম্পন্ন বলে যে মামুলী ধারণা আছে, এই ছবির চিত্রনাট্য [illegible] দেখে [illegible]) সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। আকিরা কুরোসোয়ার ছবিগুলি [illegible], চলচ্চিত্রের [illegible] কতখানি সচল হতে পারে তার নমুনা এ ছবিতে পাওয়া [illegible]